গল্পলহরী

[গল্প ও উপন্যাসসম্বলিত মাসিক পত্রিকা]

৪র্থ বর্ষ

১৩২৩ ।

সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু

কার্য্যালয়

২৯ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য সডাক আড়াই টাকা

বর্ষসূচী ।

গল্পলহরী

৪র্থ বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩২৩ { প্রথম সংখ্যা

আলেয়া

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ, লিখিত]

(১)

সন্ধ্যার পরেই সুরেশ নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া সহাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পত্নী শশিমুখী সবেমাত্র ভাতের হাঁড়িটি চাপাইয়া দিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া উনানের সাম্‌নে বসিয়াছিল। সুরেশ সেখানে আসিয়া দ্রব্যগুলি নামাইল।

শশিমুখী অবাক্ হইয়া কহিল,—"এত জিনিষ কার গো?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—"কার আবার, গোটাকতক টাকা লাভ হয়ে গেল, তাই কিনে আন্‌লাম!"

তিন বৎসরের কন্যা বিধুমুখী জননীর কোল হইতে উঠিয়া সেই খাবারগুলি আক্রমণ করিতে ছুটিল। শশিমুখী ক্ষিপ্রহস্তে কন্যাকে ধরিতে গেলে, সুরেশ বাধা দিয়া কহিল,—"ওকে কেন ধর্‌ছ, নিক্ না, ওর যে কটা ইচ্ছে।"

শশিমুখী কহিল,—"তার পর, খেয়ে যখন অসুখ কর্‌বে?"

ততক্ষণে খুকী দুই হাতে দুইটী বড় বড় সন্দেশ তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল,—"ও সন্দেশগুলো খুব ভাল, ও খেলে খুকীর অসুখ কর্‌বে না।"

শশিমুখী কন্যা সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যা গো লাভ কর্‌লে কি করে শুনি, কুড়িয়ে পেলে নাকি?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—"একরকম কুড়িয়ে পাওয়া বৈ কি?" পত্নী কি বলিতে যাইতেছিল, সুরেশ বাধা দিয়া কহিল,—"শোনই না আগে সব কথা, তা হলেই বুঝ্‌বে খ'ন। হরকুমারকে জান ত, আপিস থেকে বেরিয়ে খানিকদূর এসেছি, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা, আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, কি হে এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ, সে বল্লে, 'আজ যে ঘোড়দৌড়, তুমিও চল না হে দেখে আস্‌বে। অনেক দিন ধরে আমারও ঘোড়দৌড় দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল, তার সঙ্গে গেলাম ত মাঠে, পথে যেতে যেতে সে বল্লে আর শনিবারে খুব মেরে দেওয়া গেছে, মোটে গোটা দশেক টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ফেরবার সময় একেবারে আড়াইশ টাকা নিয়ে ফির্‌লাম—আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, বল কি হে, তোমার যে প্রায় এক বছরের মাইনে, আচ্ছা কি করে খেল্‌তে হয়, আমাকে শিখিয়ে দিও দেখিনি, দু এক টাকা খেলে দেখা যাবে।—"

শশিমুখীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে তাহার জননীর নিকট সে দিন শুনিয়া আসিয়াছে, তাঁহার খুল্লতাতভ্রাতা অমল দাদা ঘোড়দৌড় খেলিয়া ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছে। দুদিন পরে হয় ত সে পথের ভিখারী হইবে! তাই সে বিষণ্নমুখে কহিল,—"কি সর্ব্বনাশ ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছিলে?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশটা কি হ'ল! এই ত দুটো টাকার বেশী ত খেলিনি, আর দেখ ঘোড়াটোড়াও আমি চিনি না, হরকুমাররা ত তবু কতক খবর রাখে। আমি কিছু না জেনেই প্রথমে গিয়েই এক টাকা লাগিয়ে দিলাম, একেবারে চার চার টাকা এসে গেল, ফের দু'টাকা লাগ্‌লাম, ফের তিনটাকা এল, কি মজা বল দিকি, এমনই করে পাঁচ বাজিতে আমার পনর টাকা লাভ হ'য়ে গেল, তখনও আরও দুই বাজি বাকি, বুঝ্‌লে আমি কি তেমনই বোকা আর খেলি, কি জানি যদি হেরে যাই, ফাঁকি দিয়ে পনর টাকা পাওয়া গেল, এই ঢের—এই ভাবা, আর সোজা ট্রামে উঠে সরে পড়া, পথে চার পাঁচ টাকার খাবার কিন্‌লাম, বাকি যে কটা টাকা আছে, খুকীর জন্যে একটা ভাল জামা কেনা যাবে, আর তোমার একখানা কাপড়, কি বল?"

শশিমুখী নির্ব্বাক্ হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন আপনা আপনি আশঙ্কার মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। তাহার

কেবলই মনে হইতে লাগিল, হায়, এই ঘোড়দৌড় বুঝি দুষ্ট কপট রাক্ষসের মত আসিয়া তাহাদের সাজান ঘরকন্নাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে! কেন কিছুরইত অভাব নাই, স্বামী চাকুরী করিয়া যাহা আনিতেছেন, তাহাতে বেশ সুখশান্তিতে দিন কাটিয়া যাইতেছে, শ্বশুরও অল্প বিস্তর যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের জীবনকালে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। চাকুরীতে স্বামীরও দিন দিন উন্নতি হইবে। তাহাদের পুত্রকন্যাদের অবধি কোন অভাব অনুভব করিতে হইবে না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই ঘোড়দৌড় খেলার প্রবৃত্তিটা সত্যই যেন শনির মত তাহার স্বামীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে সেই দুষ্ট শনি স্বকার্য্য সাধিতে অগ্রসর হইবে! এই চিন্তায় সে অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল! প্রকাশ্যে তাহার স্বামীকে কহিল,—"ওগো তোমার দু'খানি পায়ে ধরে বল্‌ছি,তুমি ঘোড়দৌড়ের কথা মন থেকে দূর করে দাও, আমাদের অমন টাকায় কাজ নেই, ভগবান্ যা আমাদের দিয়েছেন, এই ঢের, খাবারগুলো যা এনেছ, পাড়ার পাঁচ জনকে বিলিয়ে দাও, বাকি যে কটা টাকা আছে, আমায় দাও. আমি কাল সকালেই গরীব দুঃখীদের তোমার নাম করে বিলিয়ে দেব, তারা মনে মনে তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করে যাবে, সেই সঙ্গে তোমার এ শনির দৃষ্টি কেটে যাবে। তুমি অমল দাদাকে জানত? ঘোড়দৌড় খেলে তার কি অবস্থা হয়েছে বল দিকি। অমন ভাল চাকরী ছিল, শনিবার সাহেব সকাল সকাল ছুটি দেয় নি ব'লে অমন চাকরীটা কি না এক কথায় ছেড়ে দিলে! অমন সুখের সংসার একেবারে ছারখারে গেছে। বুড়ো মা, একটি তিন বছরের ছেলে, বউদিদি কি কষ্টই না পাচ্ছে। সে কথা ভাব্‌লেও বুকটা কেঁপে ওঠে—দোহাই তোমার তুমি ও ঘোড়দৌড়ের আর নাম কর না।"

সুরেশ গম্ভীরভাবে বসিয়া পত্নীর এই কথাগুলি শুনিল, এবং এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। শশী যাহা বলিল, তাহা খুবই সত্য, ঘোঁড়াদৌড়ে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শশীর এতটা ভয় পাইবার কোন সঙ্গত কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। সে ত আর জুয়াড়ী নয়, তাহার এত বড় বয়সের মধ্যে এই ত একদিন মাত্র সে ঘোঁড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিল, পাঁচজন খেলিতেছিল দেখিয়া মাত্র দুইটি টাকা সে খেলিয়াছে। থিয়েটার দেখিতেও ত এমন দুইচার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, জোর যদি কিছু হইত, না হয় ওই দুইটাকাই যাইত! আর

ওদিকে না ঘেঁসিলেই ত হইবে। শশীর মন হইতে বৃথা আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সে প্রকাশ্যে কহিল,—"তোমার যেমন মিছে ভয়, আমি আর ঘোঁড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছি না, তা হলেই ত হ'ল।"

শশী তখন ভাতের হাঁড়িটি নামাইয়া ফ্যান গালিবার উদ্যোগ করিতেছিল, খুকী অর্দ্ধভুক্ত সন্দেশ দুইটি তাহার শিথিল মুঠার ভিতর ধরিয়া মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শশী ফ্যান গালিতে গালিতে কহিল,—"তা বৈকি, তোমার ও সব জায়গায় যাবার দরকার কি! আমাদের সেই পুরাণ বাড়ীর জ্যেঠামহাশয়ের ছেলের কথা শুনে অবধি, ঘোঁড়দৌড়ের নাম শুন্‌লে বুকটা যেন কেমন ছাঁৎকরে ওঠে, যাক্ গে ও সব কথা, তুমি আর ওদিকে যাচ্ছ না, তা হলেই হল। আপিস থেকে এসে হাতমুখ ধোওনি, ধুয়ে এসে খাবার খাও, আমি ততক্ষণে রান্নাবান্না সেরে নি।"

সুরেশ কাপড় জামা ছাড়িবার জন্য রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, শশী ডাকিয়া বলিল,—"মেয়েটাকে নিয়ে যাও না গো, ও'পরে বিছানায় শুইয়ে দাওগে।"

(২)

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আবার শনিবার আসিল। সুরেশের এক একবার মনে হইতে লাগিল, একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার পত্নীর নিষেধবাক্য মনে করিয়া জোর করিয়া মন হইতে সে ঘোড়দৌড়ের কথা দূরে ঠেলিয়া দিয়া আপিসের কাজে মনঃসংযোগ করিতে লাগিল। এমনই করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপিসের ছুটি হইবে। সুরেশ তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিতে লাগিল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল, আজ কিছুতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইবে না। হয়ত সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু হরকুমার শনির মত আসিয়া তাহার সমস্ত ওলট পালট করিয়া দিল। সে সবে আপিস হইতে বাহির হইতে যাইবে এমন সময় ফটকের সম্মুখেই হরকুমারের সহিত দেখা হইয়া গেল। হরকুমার তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"এই যে সুরেশ, আমি তোমারই খোঁজে যাচ্ছিলাম, ওহে আজ খুব জোর খবর আছে!

সুরেশ কোন কথা কহিল না। হরকুমার আবার বলিতে লাগিল, "বুঝ্‌লে সুরেশ নর্টনের আস্তাবলের সহিসের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নেওয়া গেছে, আজ তিনটা ঘোড়ার যা খবর দিয়েছে, তা একবারে নির্ঘাত, তাতে আর মার নেই। দুচারটে টাকা সঙ্গে আছে ত!"

সুরেশ পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এক দিকে তাহার সমস্ত সুখদুঃখের চিরসহচরী পত্নীর নিষেধ; অন্য দিকে হরকুমারের তীব্র প্রলোভন, দুইটী বিভিন্নমুখী নদীর প্রবাহের মত এই দুইটী চিন্তা তাহার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। সে যে কি করিবে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় সম্মুখে ট্রাম আসিতেই হরকুমার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ট্রামে তুলিল। কিছু ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিল, ট্রামখানি তাহাকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে ট্রামখানিতে যাত্রীর গাঁদ লাগিয়া গেল। প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজনের স্থানে সাতজন করিয়া বসিল। ট্রামখানির সম্মুখে পিছনে কোন প্রকারে দুইখানি পা রাখিবার জন্য ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সহসা কোন দুর্গ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, দুর্গরক্ষকেরা যেরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে, এই লোকগুলি বোধ করি তদপেক্ষা কম ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে ছিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সুরেশের কাণের চারিদিকে কেবলই ঐ এক কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ বলিল, অমুক ঘোড়া জিতিবে, অপর একজন অমনই বলিয়া উঠিল ও ঘোড়াটা কিছুতেই জিতিতে পারে না, আমি টমাস সাহেবের আস্তাবলের খবর পাইয়াছি, দশ নম্বরের ঘোড়াটা আজ নিশ্চয়ই বাজি মারিবে, খুব দর পাওয়া যাইবে হে, দশের কম ত কিছুতেই নয়, দুই এক ব্যক্তি আবার আপনা আপনিই একবার এ ঘোড়া একবার সে ঘোড়ার নাম করিতে লাগিল। এমনই উৎকণ্ঠিত যাত্রিবর্গ লইয়া ট্রাম তাহাদের সেই বাঞ্ছিত মহাতীর্থে নামাইয়া দিল। মহাকলরব করিতে করিতে সম্ভাবিত জয়াশায় উল্লসিত সৈন্যদেরই মত তাহারা ক্রীড়াক্ষেত্রে গিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সেদিনও সুরেশ তেইশ টাকা জিতিল। উৎকণ্ঠা-উপশমিত হৃদয়ে প্রফুল্ল মুখে সে বাটীর অভিমুখে ফিরিল। পথে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, লোকে বলে বটে, ঘোড়দৌড় খেলিয়া অনেকের ভিটামাটি উচ্ছন্ন

গিয়াছে। কিন্তু এই দুই দিনেই আমি বেশ বুঝিলাম, লোকের ধারণা অমূলক ; বুঝিয়া হিসাব করিয়া খেলিলে হারের কোনই সম্ভাবনা নাই। যদি হারিতেই হয়, তাহা হইলে ঐ জিতের টাকা কয়টার বেশী ত আর যাইবে না। শশিমুখী ত ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার কিছুই জানে না, তাহার নিকট হয়ত কেহ গল্প করিয়া থাকিবে, অমুকের ঘোড়দৌড়ে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাই সে ঘোড়দৌড়ের নামে অতটা চঞ্চল হইয়া উঠে। নানাদিকে নানা রকম করিয়া সে ঘোড়দৌড় খেলার সম্বন্ধে আলোচনা করিল, কিন্তু ইহাতে লোকের যে কি করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা সে কিছুতেই কল্পনা করিতেও পারিল না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চিন্তার গতি অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। শশিমুখীকে এ কথা জানাইবে কি না! জানাইলেই বা দোষ কি! কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে পত্নীকে দেখিয়া সে আর কিছু বলিতে পারিল না। শশী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপিস থেকে ফিরতে এত রাত হ'ল যে ? ঘোড়দৌড়ে যাও নি ত ?"

সুরেশ প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল,—"তুমিও যেমন, আর আমি সে মুখো হই, ঘোড়দৌড় আবার ভদ্রলোকের খেলা। আজ দশ বছর পরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাই তার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে এত দেরী হয়ে গেল। সে এমনই বক্‌তে পারে, শরীরটা যেন একেবারে ঝিমিয়ে গেছে, শীগ্‌গির এক পেয়ালা চা করে দাও দিকি।"

শশিমুখী কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল,—"তাই ভাল, আমার ত সত্যি ভাবনা হয়েছিল, শনিবার তুমি বুঝি আবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়েছিলে। তুমি হাতমুখ ধোও, আমি ততক্ষণে চা তৈরী করে আনি।"

সুরেশ আপিসের কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে মনে মনে ভাবিল, না বলে ভালই করিয়াছি।

আজ সাতবৎসর সুরেশের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে সে তাহার স্ত্রীর নিকটে একটি কথাও গোপন করে নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ সে স্ত্রীর সম্মুখে এতবড় মিথ্যা কথাটা বলিয়া বসিল !

সুরেশ জামা কাপড় ছাড়িয়া দালানের তক্তাপোষের উপর রাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া সেখানে ফিরিয়া আসিতেই শশিমুখী চা লইয়া সেখানে উপস্থিত

করিল। শশিমুখীর কোলে তাহার কন্যাটি এবং হাতে চায়ের পেয়ালা ছিল। কন্যাটিকে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া চায়ের পেয়ালা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

হরকুমার অন্যমনস্ক ভাবে চা খাইতে লাগিল। শশিমুখী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। অন্য দিন সে তাহার সহিত আপিসের গল্প, আরও কত কি গল্প করিত, কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। অপরাধীর মত সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! শশিমুখী যে তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিল না, তাহা নহে, কিন্তু কেন যে তাহার স্বামী আজ এরূপ অন্যমনা তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্বামী যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়াছিল এবং সে কথা তাহার নিকট গোপন করিয়াছে, এ কথা তাহার একবারও মনের মধ্যে উদিত হইল না, তাঁহার স্বামী যে কোন কথা তাহার নিকট হইতে গোপন করিবে, একথা সে যে কল্পনাও করিতে পারে না। তাই তাহার মনের মধ্যে আশঙ্কা হইতে লাগিল, সুরেশের নিশ্চয়ই কোনরূপ অসুখ করিয়াছে। সে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁগো, তোমার কি হ'য়েছে?"

সুরেশ হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিয়াই সে আবার মুখটি নীচু করিল। শশীর মুখখানা আশঙ্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সুরেশের মনে হইল, শশী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গিয়াছিল। তাই সে পত্নীর ব্যাকুল প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না, শশী আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"চুপ করে রইলে যে? তোমার পায়ে পড়ি, লুকিয়ো না, সত্যি বল, তোমার কি হয়েছে? আজ এই সাত বৎসরের মধ্যে আমার কাছে ত তুমি কখনও কিছু লুকোয় নি।"

পত্নীর এই ব্যথিত কণ্ঠস্বরে সুরেশ মনে মনে ভারি ব্যথা অনুভব করিল, তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শশীকে বলিয়া ফেলে, "আমি তোমায় লুকিয়ে ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছিলাম, এবারটির মত ক্ষমা কর, আর কক্‌খনও যাব না।" কিন্তু আবার ভাবিল, ঘোড়দৌড়ের নামে শশী যেরূপ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া উঠে, তাহাতে তাহাকে না বলাই ভাল। সে যে কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমন সময় বাহিরে কে একজন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল, পত্নীর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর দিবার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে সত্যই যেন হাঁফ ছাড়িয়া

বাঁচিল। যাইবার সময় হাসিয়া পত্নীকে বলিয়া গেল,—"আমার কিছু হয় নি, মাথা ধরেছিল কি না, তাই। শুনে আসি কে ডাকছে।"

সুরেশ চলিয়া গেল, শশী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার স্বামী যেন তাহার নিকট হইতে কি একটা লুকাইবার জন্য ব্যস্ত! এতদিন পরে কি কারণে সে তাহার স্বামীর বিশ্বাস হারাইতে বসিল, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, সে যে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে, সুধু এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার ব্যথিত অন্তর তীব্র হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে দুই হাতে বুক চাপিয়া স্বামি-পরিত্যক্ত সেই স্থানটিতে বসিয়া পড়িল। কিন্তু বেশীক্ষণও সে বসিতেও পারিল না, স্বামী আপিস হইতে ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এখনই তাহার আহার প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই তক্তাপোষের একধারে সুরেশের আপিসের জামাটি পড়িয়াছিল। শশী পাশের আন্‌লার উপর সেটাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া রসুই ঘরের অভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু জামাটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় সেটা আবার তুলিতে গিয়া দেখিল, পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেইগুলি তুলিতে গিয়া দুইখানির উপর চোক পড়িতেই সে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেল! এ যে ঘোড়দৌড়ের টিকিট! সেদিন শনিবার—ঘোড়দৌড়ের দিন! তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, তাহার স্বামী তাহাকে লুকাইয়া ঘোড়দৌড় খেলিতে গিয়াছিলেন, সেইকথা গোপন রাখিবার জন্য তাহার স্বামীকে আজ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে! সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

(৫)

মাস দুই পরে এক শনিবারে সুরেশ তাড়াতাড়ি তাহার হাতের কাজ সারিতেছিল, এক একবার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রায় দেড়টা হইয়া আসিয়াছে। আর আধঘণ্টার মধ্যে সে সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিতে পারিবে। সে দ্রুত কলম চালাইতে লাগিল। এমনই ভাবে সে হাতের কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, আর পাঁচ মিনিট হইলেই সে আপিস ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিবে। এমন সময় বেহারা আসিয়া একটা প্রকাণ্ড ফাইল তাহার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল! সুরেশ চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কিসের ফাইল রে; এমন অবেলায় নিয়ে এলি?"

বেহারা কহিল,—"আজ্ঞে বড়বাবু বলে দিলেন জরুরি কাজ !"

সুরেশ ফাইলের দিকে চাহিয়া দেখিল, লালকাগজে আঁটা রহিয়াছে, "জরুরি।" বড়বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এই ফাইলটি আজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে, বড় সাহেবের চারিটার মধ্যে দরকার ? সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, সর্ব্বনাশ ! এ শেষ করিতে ত চারিটা বাজিয়া যাইবে। গত শনিবার সে অনেকগুলো টাকা হারিয়া আসিয়াছে, আজ সেই টাকা তুলিবার দিন। এখন সে কি করিবে ! ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করিলে সে সময় মত পৌঁছিতে পারিবে না ! সে তাড়াতাড়ি কলমটা রাখিয়া দ্রুতপদে বড়বাবুর ঘরে গিয়া হাজির হইয়া কহিল, "মশায়, আজ আমায় এখুনি ছুটি দিতে হবে। আপনি যে কাজ পাঠিয়েছেন, আমি সোমবার এসে করে দেব।"

বড়বাবু অবাক্ হইয়া কহিলেন,—"তুমি বল কি হে, একি ঘরের কাজ পেলে যে পরে এসে করে দেবে। যাও কাজটা সেরে তারপর বাড়ী যেও।"

সুরেশের মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু কহিলেন,—"দাঁড়িয়ে রইলে যে, চারটের মধ্যে কাজটা সেরে দেওয়া চাই, জরুরি কাজ।

সুরেশ কহিল,—"আজ আমি কিছুতেই পারব না। দেরী হলে আমার ভারি ক্ষতি হ'বে।"

বড়বাবু একটু উষ্ণ হইয়া কহিলেন,—"তা হ'লে বলতে চাও, কাজটা আমি করব, যাও বিরক্ত কর না।"

কথায় কথায় প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গিয়াছে। তিনটার সময় ঘোড়দৌড় আরম্ভ। সুরেশও উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"তা আমি জানি না, আপনি যাকে দিয়ে হ'ক কাজটা করিয়ে নিন।"

বড়বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"তোমার হুকুমে ! তোমার করতেই হ'বে।"

সুরেশও উত্তেজিত গলায় উত্তর করিল,—"আমি কিছুতেই করতে' পারব না, আপনি যা করতে পারেন করবেন।"

বলিয়া সুরেশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বড়বাবু হাঁকিয়া কহিলেন,—"বেয়াদব, এখনই তুমি আপিস থেকে বেরিয়ে যাও।"

সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"ভারি ভয় দেখাচ্ছেন! রইল আপনার চাকরি, ভারি ত পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি—একমাস হাড়ভাঙ্গা খাটলে পঞ্চাশ টাকা পাব; অমন পঞ্চাশ টাকা আমি তিন ঘণ্টায় রোজগার করতে পারব।" বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে একদিন পত্নী শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাগো আপিস যাবে না?"

সুরেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"তোমাকে বলব বলব ক'রে বলা হয়নি. আজ পাঁচদিন হ'ল কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি, আর গালাগালি সহ্য হ'ল না। সারাদিন এই খাটুনি, তার উপর কেবলই গালাগালি কত সহ্য হয় বল দিকি?"

শশিমুখী অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল,—"তা সত্যই ত। এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়ে নিয়ে আবার গালাগালি! তাদের শরীরে মায়াদয়া নেই বাপু। ভালই হয়েছে, তোমার শরীরটা কদিন থেকে ভাল বোধ হচ্ছিল না। কদিন জিরিয়ে নাও, তারপর একটা কাজ দেখে নিলেই চলবে।"

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল,—"তা বৈ কি।"

বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। শশীর অনেকক্ষণ রান্না হইয়া গেছে, সে ভাতের হাড়ীর সম্মুখে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুরেশ তখন বাহিরের ঘরে কাহার সহিত এমনই গল্পে মাতিয়াছে যে, আহারের কথা তাহার একেবারে মনেই নাই। তাহাদের হাসির রব থাকিয়া থাকিয়া রান্না ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছিল। শশিমুখীর আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের পর্দ্দার অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পর্দ্দা সরাইয়া একবার বাহিরের ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াই হাত সরাইয়া লইল। দেখিল, কিন্তু ঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। তাহার বোধ হইল, তাহাদের বাড়ীতে যে মুসলমান ছেলেটী মাঝে মাঝে মাছ বেচিয়া যাইত, ঠিক সেই রকমের কে একজন ফরাসের একধারে বসিয়া আছে, আর তাহার স্বামী তাহারই কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কি গল্প করিতেছে।

আধঘণ্টা পরে সুরেশ ভিতরে আসিলে শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিল,—"ভাত

যে একেবারে জুড়িয়ে গেল!" তারপর একটু থামিয়া আবার কহিল,—"আচ্ছা বাইরে কার সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলে, চেনা চেনা বলে বোধ হল না?"

সুরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"ও আমাদের সেই কাসিমের ছেলে গা?"

শশী কহিল,—"আমারও তাই বোধ হয়েছিল, তা ওকে আবার ফরাসের ওপর বসান কেন, গলা ধরিয়া গল্প করাই বা কেন—লোকে যদি দেখে কি মনে কর্‌বে বলত?"

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল,—"না না, ও ভারি কাজের লোক, ও যা টিপ বল্‌তে পারে—" বলিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। ফস্ করিয়া এই টিপের কথা উল্লেখ করিয়া সে মনে মনে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এতদিন যে কথা সে অতিযত্নে পত্নীর নিকট হইতে গোপন করিয়া আসিতেছিল। আজ কথার ঝোঁকে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিতে চলিয়া গেল। শশিমুখী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

সেদিন শনিবার সুরেশ উপর হইতে নামিতে গিয়া দেখিল, শশিমুখী সিঁড়ির নীচে মেঝের উপর দুই হাতে বুক চাপিয়া পড়িয়া আছে। সুরেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে গো তোমার, এমন করে পড়ে আছ যে?"

শশী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—"আমার বুকে পিঠে ভারি ব্যথা ধরেছে, আমি উঠ্‌তে পার্‌ছি না।" আমার বুকটা একটু চেপে ধর না, কত কষ্টে যে শশী এই কথাগুলি বলিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন!

সুরেশের সেদিন এমনই একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পত্নীর এই আকস্মিক পীড়ায় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ব্যথাটা কি খুব বেশী? আমার যে এখনই বিশেষ কাজ আছে—"

কাজটা যে কি তাহা শশীর বুঝিতে বাকি রহিল না? তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে চাহিল! সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

সুরেশ আরও ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"চুপ করে রইলে যে, ব্যথা কি খুব বেশী—আমার যে একজনের সঙ্গে এখনই দেখা করতে হ'বে, না হ'লে চাকরীটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

সুরেশ জানে চাকরীর কথা শুনিয়া শশীর মনে খুব আনন্দ হইবে, তাহা হইলে হয় ত তাহার ব্যথাটা একটু কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইল না। শশী কাঁদিয়া উঠিল! তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া তাহাকে একলা ফেলিয়া প্রতারণা করিয়া তাহার স্বামী ঘোঁড়দৌড়ের মাঠে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে! শশীর মনে পড়িল, এমন দিন গিয়াছে, যে দিন শশীর মাথা ধরিয়াছে শুনিলে সুরেশ আর সে দিন আপিস অবধি যায় নাই! শশীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে বলিয়া ফেলে,—"ওগো তুমি যাও।" কিন্তু সে ভাবিল. না এই আলেয়ার আকর্ষণের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেই হইবে। তাই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল. "ওগো তোমার দু'খানি পায়ে পড়ি, আমায় আজ একলা ফেলে তুমি কোথাও যেয়ো না তা হ'লে আমি মরে যাব। ওগো দুখানি পায়ে ধরে মিনতি করছি, তুমি যেও না—আমায় যে দেখ্‌বার কেউ নেই।"

আজ এক বৎসরের উপর সুরেশ চাকুরী ছাড়িয়া ঘোঁড়দৌড়ে মাতিয়াছে। এবং এই আলেয়ার পাছে পাছে অন্ধ আবেগে ছুটিতে ছুটিতে কোথায় কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা শশিমুখী ঠিক না বুঝিলেও এটা বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের পাতান সংসার ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে! এই একবৎসরে সুরেশের আর কিছু লাভ হউক আর না হউক, মধুচক্রের চারিধারে মৌমাছির মত বন্ধুর দলে তাহার বাড়ী ছাইয়া ফেলিয়া ছিল। সপ্তাহে এক দিন, মাঝে মাঝে দুই দিনও তাহার গৃহে কাসেম জেলে, নিমাই ছুতোর, হরে বোষ্টম, নিমাই মুদী, জগাই কাঁসারি, পিরবক্‌স খানসামা প্রভৃতি বন্ধুগণের মাংস পোলাওয়ের প্রীতি ভোজ চলিত। শশিমুখী কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়া দিত! কি করিয়া সে তাহার স্বামীকে এই সর্ব্বনেশে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে মনে মনে তাহার কত উপায়ই না সে গড়িয়া তুলিয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে, আবার গড়িয়া তুলিয়াছে।

সে আজ স্থির করিয়াছিল, অসুখের ভান করিয়াই হউক, আর যে ভাবেই হউক না কেন, সে আজ তাহার স্বামীকে কিছুতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইতে দিবে না! স্বামীকে ফিরাইবার জন্য অন্ততঃ সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে!

সুরেশ মহা বিপন্ন হইয়া ভাবিতেছিল, কাহার তত্ত্বাবধানে সে তাহার পীড়িতা পত্নীকে রাখিয়া যাইবে? এমন সময় বাহির হইতে হরে বোষ্টম

হাঁকিল,—"সুরেশবাবু এস না হে, মোটর এসেছে, জগাই নিতাই ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।"

সুরেশ মহা বিব্রত হইয়া কহিল,—"ওই শোন, ওরা ডাকাডাকি করছে, এখন না গেলে সব মাটি হয়ে যাবে, তোমার অসুখ, কি করি!"

শশী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সে উঠিয়া বসিয়া দুইহাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"আজ আমি তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না। আমাদের অমন পয়সার দরকার নেই।"

শশীর এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সুরেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার সঙ্গীর দলের ঘন ঘন চীৎকারে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল; কেহ কেহ বা তাহাদের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

সুরেশেরও আজ না যাইলে নয়। তাহার পিতৃদত্ত যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল এবং কয় বৎসরের চাকরী করিয়া অল্প যাহা কিছু সে জমাইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেছে। তাহার বন্ধুরা বরাবর বুঝাইয়া আসিয়াছে এবং এখনও আসিতেছে যে, অমন পাঁচ দিনে হয়ত পাঁচশত টাকা চলিয়া যায়, কিন্তু আবার একদিনে পাঁচ হাজার আসিয়া পড়ে। এ যাওয়া আসার এমনই বিচিত্র গতি! কখন যে কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়া দেখিতে দেখিতে হাতের কড়ি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা যেমন কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তেমনই একদিনে আর পাঁচজন হতভাগ্যের কত কষ্টের অর্থ একত্র হইয়া কি করিয়া যে একজনের হাতে আসিয়া উঠে, তাহাও কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না! সুরেশের সমস্ত টাকাই তাহার বুঝিবার পূর্ব্বেই এইভাবে চলিয়া গিয়াছে! তাহার হাতে নগদ টাকা বলিতে আর একটিও নাই, তাই পরমাহিতার্থী বন্ধুবর্গের সুপরামর্শে ও চেষ্টার ফলে বাস্তভিটাটি বন্ধক রাখিয়া তাহার হাতে আবার অর্থাগম হইয়াছে। বিশষ প্রয়োজন এবং তাড়াতাড়ি বলিয়া সুদের হারটা শতকরা আঠার টাকা হইয়াছে এবং তাঁহার বন্ধুগণ বুঝাইয়া দিয়াছে, চব্বিশ টাকা সুদ হইলেও কোন লোকসান নাই! একদিন যদি তিন্‌টা বাজি মারিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক দিনেই পাঁচ বৎসরের সুদ আদায় হইয়া আসে। সুদের আবার ভাবনা!

সুরেশ আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহার হারাণ টাকা উদ্ধার করিবার

আয়োজনে বাহির হইতেছে, আর তাহার নির্বোধ পত্নী এমনই করিয়া সব পণ্ড করিয়া দিবে? ইহা কিছুতেই হইতে পারে না!

সুরেশ বিরক্ত হইয়া কহিল,—"কি কর, পা ছেড়ে দাও, মিছিমিছি অসুখের কথা বলে আমার দেরী করে দিলে, তোমরা কাজের ত কোন খোঁজ খবর রাখ না, কেবল বাধা দিতেই মজবুত।"

শশী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"তুমি যাই বল না কেন, আমি কিছুতেই তোমার পা ছাড়্‌ব না' তোমায় যেতে দিব না।"

বাহির হইতে জগাই যুগী হাঁকিল,—"ওহে সুরেশবাবু, ব্যাপারটি কি বল দিকি, না যাও সোজা বলে দাও, তোমার জন্যে আমাদেরও দিনটা মাটি হয়ে যাবে না কি?"

সুরেশ পাদপতিতা পত্নীর বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া কহিল,—"শীগ্‌গির পা ছেড়ে দাও, না হ'লে ভাল হ'বে না বল্‌ছি।"

শশী কোন উত্তর করিল না, পাও ছাড়িল না। বরং আরও সবলে স্বামীর পা চাপিয়া ধরিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল!

বাহির হইতে হরে বোষ্টম চীৎকার করিয়া কহিল,—"তা হ'লে অ মরা চল্লাম হে সুরেশ, আর দেরী কর্‌তে পারি না।" সুরেশের বোধ হইল, সত্যই যেন তাহারা চলিয়া গেল। সে উন্মত্তবৎ হইয়া এমন জোরে পা টানিল যে, শশী ললাটে বিষম আঘাত পাইয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িল. তাহার মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সুরেশ তাহা দেখিয়াও ফিরিল না, দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

মাস ছয়েক পরে একদিন শশী তাহার মেয়েটিকে কোলে করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছে। সুরেশ বাড়ী নাই, কোথায় বাহির হইয়াছে। সে বসিয়া বসিয়া কত কথাই না ভাবিতেছিল, কি সুখের পর কি দুঃখেই তাহারা পড়িয়াছে। এখনও ফিরবার সময় আছে, কিন্তু উপায় নাই। ছয়মাস পূর্ব্বে যে দিন সুরেশ তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে আর বাধা দিতে যায় নাই, কারণ তাহাতে ফল ভাল না হইয়া আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। সে তখন অন্য পথ ধরিয়াছে, পুরোহিত ডাকিয়া লুকাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে। তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল, শশীর জ্যেঠামহাশয়ের বড়ছেলে,তাহাদের বড়দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শশী উঠিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বড়দা, তোমাদের সব খবর ভাল ত, অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নি।"

বড়দাদা কহিলেন,—"হ্যাঁরে, নানা কাজে আসা ঘটে ওঠে না। সুরেশ কোথায় রে?"

শশী কহিল,—"কোথায় বেরিয়েছেন?"

বড়দাদা কহিল,—"কখন ফিরবে বল্‌তে পারিস?"

শশী কহিল,—"তা ত বল্‌তে পারি না বড়দা, তাঁর সঙ্গে কি দরকার আছে?"

বড়দাদা কহিল,—"তাই ত, আমি ত বেশী দেরী কর্‌তে পার্‌ব না। তার কাছে একটু দরকার ছিল।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল,—"না তা এমন কিছু না, তুই কোথায় নেমন্তন্নে যাবি বলে সুরেশ তোর বউদিদির কাছ থেকে হারছড়া চেয়ে এনেছিল, সেই হারটা যে একবার চাই।"

বড়দাদার কথায় শশী আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় নিমন্ত্রণ, আর কোথায় বা তাহার বউদিদির হার! তাহার স্বামী যে মিথ্যা কথা বলিয়া হারছড়াটি আনিয়াছে, তাহা ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে সে অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল! যদি হারছড়া তাহার স্বামী নষ্ট করিয়া থাকে, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে! কিন্তু স্বামী না আসা অবধি তাহাকে ত কোন রকমে এ বিষয় ঢাকিয়া লইতে হইবে। তাই যথাসম্ভব মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া সে বড়দাদাকে কহিল, —"তিনি যে চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন! ফিরে এলেই আমি পাঠিয়ে দেব'খন।"

বড়দাদা চলিয়া যাইবার পর সে মনে মনে স্থির করিল, যদি তাহার স্বামী হারছড়া নষ্ট করিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার নিজের একছড়া হার পাঠাইয়া দিয়া এ যাত্রা অপমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে! হঠাৎ সে যেন কি ভাবিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং গহনার বাক্স খুলিতেই মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। বাক্সের মধ্যে একখানি অলঙ্কারও নাই, তাহার মেয়ের অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বাপের বাড়ী হইতে যে হারছড়া ও কয়গাছি চুড়ি দিয়াছিল,তাহাও নাই। সে যে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, তাহার নিজের হার পাঠাইয়া বউদিদির ঋণ শোধ করিবে! হা ভগবান্, এমনই করিয়া তাহার শেষ আশা আবার নির্ম্মূল করিয়া দিলে! তাহার স্বামী যে

তাহার কোন অনুরোধ উপরোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে এটা সে জানিত, কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াইয়াছে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই! তাহার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল, আর বুঝি পথে দাঁড়াইবার বিলম্ব নাই! সে ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে হরি, তোমায় এতকরে ডাকিলাম, তবুও একবার অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলে না, দয়া করিলে না! এখনও তাঁকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দাও ঠাকুর!"

রাত্রি প্রায় একটা। খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া শশী উদ্বিগ্নচিত্তে স্বামীর জন্য বসিয়াছিল! এমন সময় সুরেশ টলিতে টলিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সারা দেহে কাদা মাখা। জামার পিছনের দিক একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পায়ে একপাটি জুতা নাই। দুইটী চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ। সে আসিয়াই মেঝের উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। মাথাটি তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পূর্ব্বে সুরেশ মাঝে মাঝে রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, এমন কি দুই একদিন শশী তাহার মুখে মদের গন্ধও পাইয়াছে, কিন্তু এমন দীন-হীনবেশে, এমন মত্তাবস্থায় সে তাহাকে কোন দিন দেখে নাই!

ঘণ্টা দুই পরে তাহার জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে একবার ভাল করিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। এ যে তাহারই গৃহ। তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার পত্নী পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। সে প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল,—"শশি!"

তাহার এই সহজ কণ্ঠস্বরে শশীর মনের ভারটা অনেক লঘু হইয়া গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

সুরেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"হ্যাঁ শশি।" তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া শশীর দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"আমায় মাপ কর শশি, তোমার কথা না শুনে, না বুঝে আমি নিজের সর্ব্বনাশ করেছি।"

শশী বাধা দিয়া কহিল,—"ঠাণ্ডা হও, শোও, আমি হাওয়া করি, তাতে হয়েছে কি! অমন ভুল লোকের হয়ে থাকে, এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না!"

সুরেশ পত্নীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কহিল,—"তুমি কিছু জান না তাই একথা বল্‌ছ। আমি যে তোমাদের পথের ভিখারী করেছি, বাড়ী

বন্ধক দিয়েছি। তোমার গয়নাগুলো চুরি করে আধা কড়িতে বেচেছি— তোমার বউদিদির গয়না ফাঁকি দিয়ে এনেছি, এখনও শেষ হয় নি, আরও শোন—"

শশীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিলেও সে তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া বাধা দিয়া কহিল,—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ও সব কথা আর আমায় শুনিয়ো না।— আমার গয়নায় দরকার নেই, কিছুতেই দরকার নেই, ভগবান্ তোমায় যে সুমতি দিয়েছেন এই আমার যথেষ্ট। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার আবার ভাবনা কিসের, যা গেছে আবার ফিরে আস্‌তে কতক্ষণ!"

সুরেশ কাঁদিয়া ফেলিল। ক্রন্দনজড়িতকণ্ঠে কহিল,—"পাড়ার লোকের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছি, তারা পথেঘাটে আমায় জোচ্চোর বলে গাল দেয়। কাবুলিওয়ালার কাছে চার আনা সুদে দশটাকা ধার করেছি, কাল সন্ধ্যে থেকে তারা সুদের জন্যে লাঠি হাতে আমার পেছন পেছন বেড়িয়েছে—শাসিয়ে গেছে কাল পথে ধরে মার্‌বে, আমায় খানিকটা বিষ এনে দাও শশি, আমি তাই খেয়ে মরি। আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। কেন আমার দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল, কেন তোমার কথা শুনিনি!

শশীরও দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"তুমি অমন কর না, ঠাণ্ডা হও, ভয় কি, কাল সকালে উঠে কাবুলিদের টাকা কটা ফেলে দিও। তারপর বাড়ীঘর বেচে লোকের টাকা ফেলে দিলেই হ'বে। আমার অসুখ ত সেরে গেছে, আর মাদুলিতে দরকার কি? এ মাদুলি বেচলেও ত পনরটা টাকা পাওয়া যাবে!" এই বলিয়া শশী মাদুলিটি খুলিয়া স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল। সুরেশ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই ভাবে মাথা রাখিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িয়া রহিল।

এমন সময় পাশের ঘরে খুকী কাঁদিয়া উঠিল। শশী স্বামাকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া খুকীর কাছে উঠিয়া গেল। তারপর খুকীকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর বুকের কাছে বসাইয়া দিয়া কহিল,— "খুকীকে কোলের কাছে নিয়ে শোও দিকি। কোন ভাবনা থাক্‌বে না, কোন ভয় থাক্‌বে না।"

সুরেশ দুইহাতে খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল!

মৃত্যুর পর *

(লেখক—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল)

১

অজয় সিংহ, তোমায় আবার বলিতেছি, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, এখনও আমার কথা শোন। তুমি ঘোরতর ভুল বুঝিতেছ,—এ যুদ্ধে আমাদের দুইজনের একজনকে রণ-শয্যায় শায়িত হইতে হইবে,—কেন মহা ভ্রমে পড়িয়া এ ভয়াবহ কাজ করিতেছ? আমি তোমায় বিশবার বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি;—এখনও আবার অনুনয় করিয়া বলিতেছি;—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—

অজয় গর্জ্জিয়া বলিল,—"চুপ, কাপুরুষ! তোর মত দুরাত্মার অঙ্গে আমি পদাঘাত করি,—অসি নিষ্কোষিত কর।"

দুই জনই যুবক,—দুইজনই রাজপুত বীর, কাহারই বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে, একজন অতি সুপুরুষ, অপর সুপুরুষ নহেন, তবে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি।

উভয়েই আকবর বাদসাহের মাননীয় মনসবদার। অজয় সিংহের স্ত্রী লইয়া এই বিবাদ। তাহাই আগ্রার প্রান্তভাগে উভয়ে এই জাতক্রোধ, অসিতে অসিতে মিটাইবার জন্য উপস্থিত, কয়েকটী বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন। তাহারা অজয় সিংহকে অনেক বুঝাইয়াছেন, কিন্তু উত্তপ্তরক্ত রাজপুত বীর কিছুতেই কাহারও কথায় কাণ দেন নাই; তিনি বলবন্ত সিংহের হৃদয়ের রক্ত পান করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন।

যখন বলবন্ত সিংহ দেখিলেন যে, অজয় সিংহ কিছুতেই বুঝিলেন না। তিনি তাহার অনুনয় বিনয় শপথ কিছুই মানিলেন না, তখন তিনি নিতান্ত

---

* এই গল্পটি আমরা বহু আয়াসে বঙ্গ-বিশ্রুত সাহিত্যিক স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ পালের অপ্রকাশিত "পঞ্চরং" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার অদ্ভুত মনীষার সম্যক্ পরিচয় আবাল বৃদ্ধের সুপরিচিত থাকিলেও এখন যাহাতে তাঁহারা সেই সকল চমৎকার গল্পের রসাস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য আমাদের এই বিপুল উদ্যম। এই পঞ্চরং পুস্তকের জন্য পাঁচটী গল্প লিখিত হইয়াছিল তাহার সমুদয় গল্পগুলিই আমরা পাইয়াছি, এখন হইতে প্রতিমাসেই তাঁহার এক একটী গল্পলহরীর শোভা বর্দ্ধন করিবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বে ধীরে ধীরে অসি নিষ্কাশিত করিলেন। অমনই উন্মত্তের ন্যায় অজয় সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, উন্মত্তের ন্যায় বলবন্ত সিংহের উপর অসি চালনা করিতে লাগিলেন.—বলবন্ত সিংহ বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অজয় সিংহ যেরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন তাহাতে সাবধান হইয়া যুদ্ধ করা অসম্ভব,—একবার বলবন্ত সিংহ অসি উত্তোলিত করিলে অজয় সিংহ লম্ফ দিয়া সেই অসির উপর পতিত হইলেন,—বলবন্ত সিংহের অসি আমূল তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, বলবন্ত ভীত হইয়া সত্বর অসি টানিয়া লইলেন, তীব্রে বেগে রক্ত ছুটিল, লম্ফদিয়া অজয় সিংহ সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর তিনি ভূপতিত হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

তাহার পর অজয় সিংহ দেখিলেন যে, তিনি ধীরে ধীরে তাহার ভূপতিত দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতেছেন না,—একটু পূর্ব্বে তাহার মনে হইয়া ছিল যে, তিনি যেন সহসা নিকটে অতি গুরুতর আঘাত পাইলেন, তাহার পর তাহার আর যেন জ্ঞান ছিল না, এখন তাহার জ্ঞান হইল, এখন তিনি দেখিলেন, তাহার দেহ আর জড় স্থূল নাই,—ইহা যেন এক অভূতপূর্ব্ব বাষ্পে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহারই মৃত দেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সে দেহ ভূমে রক্তাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে ; তিনি অতি কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

তিনি নিজের দিকে চাহিলেন,—হাঁ,—তাহার দেহের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই,—এমন কি তিনি যে বেশে ছিলেন,—এখনও সেই বেশই পরিধান করিয়া রহিয়াছেন,—কেবল তাহার দেহে আর কোন জড়তা নাই ;—তিনি তাহার দেহের ভিতর দিয়া সকলই দেখিতে পাইতেছেন। তিনি তাহার হাত তুলিয়া চক্ষের উপর ধরিলেন, হাতের ভিতর দিয়া সকলই দেখিতে পাইতেছেন, —তিনি বুকের দিকে চাহিলেন,—ঠিক যেন কাচের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন।—তাহার হাসি পাইল,—কিন্তু হাসিবার অবস্থা তাহার মনের আদৌ ছিল না।—তিনি সকলই দেখিতে পাইতেছেন,—কিন্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না,—তবে এই মাত্র মনে হইতেছে যে, একটু আগে তিনি ক্রোধে

উন্মত্ত হইয়া ছিলেন,—এক্ষণে তাহার হৃদয়ে ক্রোধ একবারেই নাই,—তাহার হৃদয় এক গভীর শান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছে!

তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সমভিব্যাহারী সকলে নিচু হইয়া তাহার মৃত দেহ দেখিতেছে, তিনি যে তাহাদের ভিতর দণ্ডায়মান আছেন; তাহা তাহারা জানিতে পারিতেছে না—একজন বলিলেন, "তারামল একেবারে হৃদপিণ্ড ভেদ করিয়াছে, অজয় সিংহ আর নাই।"

(২)

কিয়ৎক্ষণ কেহ কোন কথা বলিলেন না,—অবশেষে বলবন্ত—সিংহ—অতি বিপন্ন স্বরে বলিলেন। "তোমরা সকলেই জান যে আমি কতবার তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ছিলাম,—কিন্তু অজয় সিংহ রাগে অন্ধ হইয়াছিল,—ভগবান্ জানেন আমি কোন দোষে দোষী নই। কোন পিশাচ তাহার মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়াছিল।—তাহার বিশ্বাস যে আমি তাহার স্ত্রীর উপপতি হইয়াছি,—ভগবান্ জানেন, আমি তাহার স্ত্রীকে কখনও চক্ষেও দেখি নাই—তাহাকে একথা কতবার শপথ করিয়া বলিয়াছি, কিন্তু সে কোন কথা শুনে নাই,—সে এই যুদ্ধে আমায় আহ্বান করিল। আমি রাজপুত, কিরূপে যুদ্ধে অস্বীকার করি। তাহাও তোমরা—দেখিয়াছ,—আমি তাহাকে আদৌ আক্রমণ করি নাই,—সে পাগল হইয়া আমার তরোয়ালের উপর পড়িয়াছিল,—আমার কোন দোষ নাই!"

অজয় সিংহ—তাঁহার পার্থিব শত্রুর এই দীর্ঘ বক্তৃতা অতি অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া শুনিলেন,—যেন এই সকলের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র কোন সম্বন্ধ নাই; তাহার হৃদয় ও অনুভব শক্তি যেন তাহার ভিতর আর নাই,—তবে ইহারা তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে কি না ইহা দেখিবার জন্য তিনি এক জনের গায়ে হাত দিলেন, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এখানে বড় ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হইতেছে,—আর এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি; বলবন্ত সিংহ,—তুমি যাও,—আমরা অজয় সিংহের দেহের বন্দোবস্ত করিব। একটা গোল হইবে,—তবে আমরা উপস্থিত ছিলাম,—আমরা সকলেই বলিব ন্যায় যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বলবন্ত সিংহ আর কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল। অজয়সিংহ এখন দেখিলেন যে, তাহার ধীরে ধীরে উপলব্ধি শক্তি জন্মিতেছে;—সহসা তিনি তাহার পার্থিব দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন

বলিয়া প্রথম প্রথম কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই,—এখন একটু একটু ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিতেছেন।

তাহার মনে হইল, তবে কি যথার্থই ভুল বুঝিয়াছিলেন,—বলবন্ত সিংহ নির্দ্দোষী! তবে কি তিনি রাগে তাহার সমস্ত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন,—তাহার মনে হইল তিনি ছুটিয়া গিয়া বলবন্ত সিংহকে ধরেন,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, প্রেতাত্মা জীবিত মনুষ্যের সহিত কথা কহিতে পারিবে না,—সুতরাং তাহার সঙ্গে যাওয়া বৃথা, তিনি তাহার মৃত দেহের দিকে ফিরিলেন,—তাহার বন্ধুগণ তাহার নশ্বর দেহ লইয়া কি করিতেছে,—তাহাই দেখিবার জন্য তাহার একটু কৌতুহল হইল। তিনি দেখিলেন, তাহারা একখানা গোযান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। অতি যত্নে তাহারা তাহার মৃতদেহ গোযানে স্থাপিত করিতেছে। পরে তাহারা সকলে কি করা এখন কর্ত্তব্য এই বিষয় লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল,—অজয়সিংহ তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, শেষ তাহারা স্থির করিল যে মৃতদেহ তাহার বাড়ীতেই লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য,—তাহারা গাড়োয়ানকে তদনুরূপ আজ্ঞা দিল।—অজয় সিংহের মনেও সহসা উদিত হইল, "আমিও একবার বাড়ী যাই না কেন!"

(৩)

তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে এমন করে গমনাগমনে কোন ক্লেশ নাই। কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, তিনি অনায়াসেই উচ্চ প্রাচিরের ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে সক্ষম হইতেছেন,—সম্মুখে একটা পুষ্করিণী,—তিনি অনায়াসে তাহার উপর দিয়া হাটিয়া চলিয়া গেলেন,—তখন তাহার মনে হইল, তিনি হয়তো আকাশে উড়িয়া যাইতেও পারেন। তিনি শূন্যে লম্ফ দিলেন,—তাহার পর শূন্যে একটা বাড়ীর উপর দিয়া চলিলেন,—কিন্তু ইহা উড়া নহে,—ইহাতে কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা করিতে হইতেছে না, তিনি যেন আপনা আপনি শূন্যের উপর ভাসিয়া চলিয়াছেন,—এদৃশ্যে তাহার হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল,—তিনি আর পূর্ব্বের অজয়সিংহ নাই, তাহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মিয়াছে।

এইরূপে তিনি আগ্রা সহরের দ্বারে আসিলেন,—দেখিলেন একখানা খালি এক্কা যাইতেছে,—তিনি এক্কা ওয়ালার পাশে আসিয়া বসিলেন,—ভাবিলেন যদি এক্কাওয়ালা জানিতে পারে যে একটা জীবন্ত ভূত তাহার পার্শ্বে

বসিয়া যাইতেছে। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মহা আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইবে।

তিনি আরও দেখিলেন—তিনিই কেবল একমাত্র ভূত নহেন,—আগ্রা সহরের জনতার মধ্যে তাহারই ন্যায় আরও অনেক প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! একস্থানে তিনি দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক ব্যাকুল ভাবে ভুমে পড়িয়া কাঁদিতেছে,—তাহার পার্শ্বে একটী প্রেতাত্মা ব্যাকুল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে,—অজয়সিংহ মনে মনে ভাবিলেন, "আমার স্ত্রীও নিশ্চয়ই এমনই ভাবে কাঁদিতেছে!

সহরে আসিয়া তিনি এক্কা হইতে নামিলেন,—সহর লোকে লোকারণ্য; কিন্তু প্রেতাত্মার সংখ্যা অতি কম। সহরবাসিগণ যে যাহার কার্য্যে ব্যস্ত; অপরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে তাহারা সকলে পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কিন্তু প্রেতাত্মাগণ কাহারও সহিত কেহ কথা কহিতেছে না, তাহারা নীরবে চলিয়া যাইতেছে। কিছুই তাহাদের গতির প্রতিবন্ধক দিতে পারিতেছে না, তাহারা অনায়াসে মানুষের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে!

অজয় সিংহ নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন, দেখিলেন দরজা খোলা রহিয়াছে। দরজার পার্শ্বে তাহার প্রিয় কুকুর শয়ন করিয়া আছে। অজয় সিংহ তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই কুকুরটা দাঁড়াইয়া উঠিল, ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রো সমস্ত উচু হইয়া উঠিল, সে একরূপ অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার এই বিকট শব্দ শুনিয়া একজন চাকর তথায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কুক্কুরটা অর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাড়ীর পশ্চাৎদিকে ছুটিল?

অজয় সিংহ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, শুনিলেন একজন চাকর অপর একজন চাকরকে বলিতেছে, "কুক্কুরটা কি দেখিয়া এমন ভয় পাইল,—ভাই, আমার বড় ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। আমার গাটা ঝম্ ঝম্ করে উঠ্‌ছে!"

অন্য লোক হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কুকুর ডাকলেও তোর ভয়।"

সে কেবল মাত্র বলিল,—"না ভাই, আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না?"

অজয় সিংহ আর তাহাদের কথা শুনিলেন না;—তিনি তাহার স্ত্রীর শয়ন গৃহে আসিলেন। দেখিলেন তাহার আর ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্বার দিয়া যাইতে

হয় না। তিনি সোজা সুজি অনায়াসে প্রাচিরের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে আসিলেন,—দেখিলেন তাহার স্ত্রী গৃহে নাই !

তিনি তাহার স্ত্রীকে কত ভাল বাসিতেন, কত ভাল ভাল জিনিস, ভাল ভাল অলঙ্কার,—ভাল ভাল পরিচ্ছদ তাহাকে দিয়াছেন,—সেই সকল সুন্দর দ্রব্যে এই গৃহ পূর্ণ! তিনি বহুক্ষণ এই সকল দ্রব্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তিনি তাহার স্ত্রীকে এত ভাল বাসিতেন,—সে কি তাহাকে একটুও ভালবাসে ?

তিনি কখনও স্ত্রীকে অবিশ্বাস করেন নাই ;—তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রাণাধিকরূপে ভালবাসিতেন,—কোথা হইতে বলবন্ত সিংহ আসিয়া তাহার সমস্ত সুখ নষ্ট করিয়া তাহার হৃদয়ে অসহনীয় যন্ত্রণা ছড়াইয়া দিয়াছিল, অথচ সে তাহার নির্দ্দোষিতার জন্য কত শপথ করিয়াছে,—তবে কি তিনি বিনা কারণে তাহার স্ত্রীর উপর সন্দেহ করিয়াছেন ?

তিনি বহুক্ষণ সেই গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন,—তাহার পর তাহার সহসা তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যার কথা মনে পড়িল। তিনি জানিতেন বৃদ্ধা দাসী তাহার ক্ষুদ্র কন্যাকে লইয়া অপর গৃহে থাকিত। তিনি নিঃশব্দে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন তাহার প্রাণের কন্যা, পঞ্চম বর্ষীয়া ফুল তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে দুগ্ধ ফেননিভ-শয্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছে, তিনি তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিলেন, তখনই ফুল চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, তাহার পর ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। তখন অজয় সিংহের স্মরণ হইল তিনি আর নর লোকে নাই, নিশ্চয়ই তাহার স্পর্শে তাহার ক্ষুদ্র কন্যা ভয় পাইয়াছে ;—তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আর কখনও কোন পার্থিব কাজ করিবেন না।

ফুলের ক্রন্দন শুনিয়া বৃদ্ধা দাসী ছুটিয়া আসিল। সে ফুলের দিকে চাহিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার কপালে গায় হাত দিয়া দেখিল,—তাহাতেও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না,—বহুক্ষণ নাড়ি দেখিতে লাগিল,—তিনি দেখিলেন ফুলের চক্ষু হইতে এক অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে,—তাহার চোক লাল হইয়াছে,—তাহার ওষ্ঠ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—অজয় সিংহ বুঝিলেন যে তাহার কন্যার জ্বর হইয়াছে।

বৃদ্ধা দাসী ফুলের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া—তাহাকে চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া শান্ত করিল,—তখন ফুল আবার বোধ হয় নিদ্রিত হইয়া পড়িল,—তবে অজয় সিংহ দেখিলেন তাহার নিশ্বাস প্রবল বেগে পড়িতেছে !

তিনি তাহার বৃহৎ অট্টালিকার কোন স্থানেই তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না,—তখন তিনি তাহার নিজের বৈঠকখানায় আসিলেন। তাহার গৃহ নানা আসবাবে সজ্জিত ছিল,—এক দিকে আলমারি বই ছিল,—তিনি দেখিলেন, বই লইবার জন্য তাহাকে আর আলমারির কাছে যাইতে হয় না,—তিন যেখানে বসিয়া আছেন,—সেইখান হইতেই ইচ্ছামত বই লইতে পারিতেছেন,—তিনি দেখিলেন তাহার বাক্সের তালা খুলিতে হয় না,—তিনি এমনই তাহার ভিতর হইতে টাকা বাহির করিতে পারিতেছেন?

এতো খুব মজা? এই সময়ে একজন ভৃত্য ঘরটা ঝাঁট দিতে আসিল,—অজয় সিংহ তাহার সহিত একটু মজা করিতে ইচ্ছুক হইলেন,—সে ঝাঁটা গৃহমধ্যে রাখিয়া দ্রব্যাদি গুছাইতে আরম্ভ করিল, অজয় সিংহ ঝাটা তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্য ঝাঁটা যেখানে রাখিয়াছিল,—সেখানে না পাইয়া বিস্মিত হইল,—তবে ঘরের বাহিরে ঝাঁটার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল।—হয়তো ভুলিয়া সে ঝাঁটা বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিল, ভাবিয়া সে ঝাটা কুড়াইয়া আনিল। অজয় সিংহ তাহার হস্ত হইতে ঝাটা কাড়িয়া লইলেন,—প্রথমে সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাহার পর ঝাঁটা শূন্যে এদিক্ ওদিক্ করিতেছে দেখিয়া সে বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তথা হইতে পালাইল।

তাহার বিকট চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল,—দেখিল ভৃত্য উঠানে গিয়া পড়িয়াছে,—তাহার জ্ঞান নাই,—তাহার দাঁতকপাটী লাগিয়াছে।

বলা বাহুল্য ইহাতে সমস্ত বাড়ীতে এমনি মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল,—এই বিপর্য্যয়ের উপর আর এক বিপর্য্যয় ঘটিল,—এই সময়ে তাহার বন্ধুগণ তাহার মৃত দেহ সহ গাড়ী লইয়া তাহার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল,—ভৃত্যগণ চক্ষু মুছিতে লাগিল,—দাসীগণ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল,—চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া শোকসন্তপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, এমন লোকও এমন হঠাৎ মারা যায়!"

অজয় সিংহ এই সকল ব্যাপারে মনে মনে এক অভূতপূর্ব্ব আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না। তিনি

সকলকেই দেখিতে পাইতেছিলেন —এ পর্য্যন্ত আর কেহ নিজের সংকারের আয়োজন নিজে দেখিতে পান নাই ;—অজয় সিংহ আজ তাহাই দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইতেছিলেন।——

খাট আসিল,—সকলে ধরাধরি করিয়া তাহার মৃতদেহ খাটের উপর শায়িত করিল, বহুমূল্য এক শাল আনিয়া মৃতদেহ আবরিত করিয়া দিল, তাহার পর নানাবিধ ফুলে খাট সজ্জিত করিল। তখন মৃতদেহের বড়ই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইল! একজন ব্রাহ্মণ তাহার মৃত দেহের মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া ভজন গাহিতে লাগিল। ইহাতে অজয় সিংহ মনে মনে বড়ই আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন!

তিনি ভাবিলেন, ইহারা মৃতদেহটা শ্মশানে লইয়া যাইতেছে না কেন? তখন সহসা তাহার স্ত্রীর কথা স্মরণ হইল,—যে স্ত্রীর জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, —সে স্ত্রী তাহার কোথায়? সে কি তাহার জন্য এক বিন্দুও চক্ষের জল ফেলিবে না!

(৫)

এই সময়ে বাড়ীর ভিতরের দিকে একটা গোল শুনিতে পাইলেন,—তাহার স্ত্রী আসিয়াছে ভাবিয়া তিনি সেই দিকে চলিলেন,—এখন কোন খানে যাইতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, তিনি হাওয়ার ওপর ভাসিয়া বেড়াইতেছেন।

তিনি অন্দরে আসিয়া দেখিলেন,—তাহার স্ত্রী কোথায় কোন আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়াছে,—দাসদাসীরা কেহ তাহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতেছে না। দূরে আসিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে,—সত্য সত্যই কাঁদিতেছে কি না,—তাহা অজয় সিংহ স্থির করিতে পারিলেন না।—

তাহার স্ত্রী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে চারিদিকে চাহিতেছে,—বাড়ীতে যে একটা কিছু হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে, —কিন্তু কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না,—সে তাহার দাসীকে ডাকিল,—কিন্তু দাসী আসিল না। সে রাগত হইয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু সেই সময়ে অজয় সিংহের এক অতি বৃদ্ধ আত্মীয় তথায় আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া অজয় সিংহের স্ত্রী অতি কৌতূহলাক্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে কি হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন,—সহজে কথা কহিতে পারিলেন না।—অতি কষ্টে বলিলেন, "মা—বড় ভয়ানক———"

অজয় সিংহের স্ত্রী বিরক্তিভাবে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "কি হইয়াছে,—আমার মেয়ের অসুখ বাড়িয়াছে—তাহার জ্বর দেখিয়া গিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না—মেয়ে ভাল আছে—"

"তবে কাহার কি হইয়াছে।"

"অজয় সিংহ———"

"তাহার কি হইয়াছে ?"

"তিনি—তিনি———"

"কেন,—স্পষ্ট কথা কি বলা যায় না ?"

"তিনি—তিনি—মারা গিয়াছেন।"

অজয় সিংহের স্ত্রী ভ্রুকুটী করিল, বলিল, "তাহার ঐ রকম কিছু হইবে আমি জানিতাম,—কিসে মারা গিয়াছেন ?"

"যুদ্ধে !"

"যুদ্ধে !—সে কি—কার সঙ্গে যুদ্ধ ?"

"বলবন্ত সিংহের সঙ্গে !"

"কেন ?"

বৃদ্ধ কি বলিবেন,—ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—অজয় সিংহের স্ত্রী রাগত হইয়া উঠিল,—বলিল, "আপনি কি স্পষ্ট কথা কহিতে জানেন না।" তখন বৃদ্ধ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন, "তিনি—তিনি—অজয় সিংহ ভাবিয়াছিল যে তোমার সহিত বলবন্ত সিংহের অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে ?"

অজয় সিংহের স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "বলবন্ত সিংহের সহিত আমার প্রণয় ? আমি তাহাকে চিনিও না ? তাহাই লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ ! রাগী মূর্খের এই রকমই ঘটে !"

অজয় সিংহের স্ত্রীর ব্যবহারে বৃদ্ধ বোধ হয়, হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইলেন,—তিনি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অজয় সিংহের প্রেতাত্মা নিকটে দাঁড়াইয়া স্ত্রীর কথা শুনিতে ছিল ;—তিনি ভাবিয়াছিলেন পথে তিনি যেরূপ শোকাতুরা বিধবাকে স্বামি-শোকে বিহ্বলা দেখিয়াছিলেন,—তাহার স্ত্রীকেও তাহাই দেখিবেন,—কিন্তু তিনি

দেখিলেন যে তাহার স্ত্রী শোকে বিহ্বলা হওয়া দূরে থাকুক, বোধহয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

তবে শোক করিল না,—তাহাও নহে। অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মৃদুস্বরে একটু ক্রন্দনের রোল তুলিল,—তখন দাসীগণ তথায় আসিয়া একটা ক্রন্দনের মহা গণ্ডগোল তুলিল, কিন্তু এই সময়ে অজয়সিংহের কন্যার বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল, "যে গেছে,—সে তো গেছে,—যে আছে, তাকেও কি তোরা বাঁচ্‌তে দিবি না? খুকীর অসুখ বেড়েছে।"

এই কথায় সহসা যেরূপ ক্রন্দনের গোল উঠিয়াছিল, সহসা তেমনই তাহা নীরব হইয়া গেল,—দাসীগণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল,—অজয় সিংহের স্ত্রী নিজগৃহে আসিয়া মুখের অঞ্চল সরাইল,—তখন অজয় সিংহ দেখিলেন, তাহার চক্ষে একবিন্দু জল পড়ে নাই। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সংসারটা কি জাল?"

(৬)

এই সময়ে বাহিরে "রাম রাম সত্য হায়" শব্দ উঠিল,—অজয় সিংহ সেই দিকে ছুটিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তাহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিয়াছে,—তিনি তথায় নিজের মৃত দেহের সহিত কিয়দ্দূর আসিলেন,—তাহার পর ফিরিলেন,—ভাবিলেন, "ইহারা তো এখনই এ দেহ পুড়াইয়া ফেলিবে,—তাহার আর কি দেখিব,—বরং বাড়ীতে কি হইতেছি দেখি!"

তিনি সহরের জনতার মধ্য দিয়া চলিলেন,—কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছিল, না, তিনি যথা ইচ্ছা যাইতেছেন,—সকলই দেখিতে পাইতেছেন। কি মজা?

তাহার মত আরও কয়েকটা প্রেতাত্মা ঘুরিতেছে,—তিনি তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন,—তাহারা কি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না,—হয়তো পাইতেছে না—পাইলেও হয়তো প্রেতাত্মার সহিত প্রেতাত্মার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।

রামসিং তাহাদের বাড়ীর নিকট বাস করিত,—তাহার ন্যায় পেটুক আত্মা সহরে আর কেহ ছিল না।—সে আদমন পেঁড়া খাইতে পারিত।—পেঁড়া পাইলে জগত সংসার ভুলিয়া যাইত। অতিরিক্ত আহারের জন্যই এই কয় মাস হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অজয় সিংহ দেখিলেন রাম

সিংহের প্রেতাত্মা পেঁড়ার দোকানে বসিয়া আছে। সে লোল জীহ্বার পেঁড়ার দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু খাইবার উপায় নাই। সে যে ইহাতে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে, তাহা তহার মুখ দেখিয়া অজয় সিংহ বেশ বুঝিলেন। অজয় সিংহ মনে মনে বলিলেন, সংসারের কোন দ্রব্যের উপর মমতা থাকিলে দেখিতেছি ভূতদের ভারি কষ্ট! তাহারা সবই দেখিতে পাইবে, হাতের নিকট আসিবে, অথচ উপভোগ করিতে পারিবে না। ইহাপেক্ষা আর কষ্ট কি? এই সকল ভূত চিরকালই কি এই রকম পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবে?"

তিনি ধীরে ধীরে নিজের বাড়ীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন তাহার কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু এক স্থানে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। তাহার একটু কৌতূহল হইল, ইহারা কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। নিশ্চয়ই তাহার হঠাৎ অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেখিলেন, তাহার কয়েকটী বিশেষ বন্ধুও সেইখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহাতে তিনি একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। রাগে তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন।

এক জন বলিতেছে—"অজয় সিংহটা যে চিরকালই মূর্খ ছিল, তা কে না জানে!"

একজন বলিল—"তার মনটা ভাল ছিল!" অপরে বলিল—"মুর্খ হইলে মন চিরকালই গাধার মত ভাল হয়।"

এই সকল লোকই তাহার জীবিতাবস্থায় তাহাকে কত তোষামোদ করিয়াছে,—তাহার কত প্রশংসা করিয়াছে, আর তাহার চিতার আগুন নিবিতে না নিবিতে তাহারা তাহাকে এইরূপে গালি দিতেছে,—এইরূপ কুৎসিত ভাবে তাহারা ব্যাখানা করিতেছে! সংসার কি এতই জাল?

তাহার ঘোরতর রাগ হইল, তাহার জাল-কপটবন্ধু ও আত্মীয়গণ এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার এই সকল কুৎসা করিতেছিল,—তিনি মড় মড় করিয়া একটা বড় ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা "বাপ্‌রে" বলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইল।

[আগামীবারে সমাপ্ত।

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১)

"আজই ?"

"হাঁ আজকেই আমায় যেতে হচ্ছে নিখিল, কতগুলি জরুরী কাজও হাতে রয়েছে, তা ছাড়া এয়েছি তাওত কম দিন হয় নি।"

নিখিল একেবারে উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিয়া বুকের বালিসটা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—"ওঃ, তাই বুঝি, থাকতে ভয় হচ্ছে, শেষটা যদি তাড়িয়ে দি।"

শুষ্ক মুখের কোণে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া পুরাণ স্মৃতিটার একটা খোঁচা সাম্‌লাইয়া লইয়াই যেন ললিতমোহন বলিয়া উঠিল—"নারে না, সে আবার একটা কথা হ'ল, ওবে আমি ভাবতেই পারি না। তোদের এখানে এলে আমি যেন আমাতেই থাকি না, এক মুহূর্ত্তেই পুরণো ভাবনাগুলো ছাড়িয়ে দিয়ে তোরা যেন আমার একটা নূতন রাজ্যে দাঁড় ক'রে দিস্।

নিখিলেশ চকিতের মত কি একটু চিন্তা করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে ললিত-মোহনের বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তাহার সেই শুষ্ক মুখের বিষাদের ছায়াটুকুকে সজোরে কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াই যেন বলিয়া উঠিল,—"রেখে দে না, তোর ওসব ভাবের কথা।"

ললিতমোহন তাড়াতাড়ি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগটা চাপিয়া রাখিয়া উদ্বিগ্নভাবে নিখিলেশের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চকিত বেদনাতুর নেত্রে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়াই বলিল—"ভাবের কথা নয় রে নিখিল, এর মধ্যে কোন ভাব ভাবনা নেই, এখানে যখন আসি, আর তোদের আদর-যত্নের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি, তখনই যেন আমার নূতন ক'রে মনে হয়, আমিও এ পৃথিবীরই একটা মানুষ, আমার জন্যেও যেন বিধাতার ভাণ্ডার হ'তে খসে পড়ে সত্যকার একটা সুখ শান্তি তোদের দু'জনার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া হতাশার একটা গুরুভার শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন যেমনই দোরের দিকে দৃষ্টি করিল, অমনই একখানা সহাস্যমুখের স্নিগ্ধ আলোকে তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার যেন মুহূর্ত্তে কোন্ এক অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। সরসী একখানা জল-খাবারের থালা হাতে করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই ললিতমোহন চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিল,—"এ আবার কি সরসী!"

সরসী খাবারের থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—"দেখে টের পাচ্ছেন না আপনি, আচ্ছা না হয় একবার মুখে দিয়েই দেখুন, এর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি নেই?"

"না ঐটে আমায় দিয়ে এখন হচ্ছে না, ওতে যে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই।"

নিখিলেশ যেন বিস্ময়ে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"কি সব যে বল্‌ছিস! বিকেলে জল খাস্‌নি?"

"নারে না, তোদের মত এমনই একটা অকর্ম্মণ্য জীবন নিয়ে সুখের মধ্যে আমি ত আর বেড়িয়ে বেড়াই না। আমার আবার জল খাওয়া, প্রাণটা যে রয়েছে, সেত কেবল তা'রই জোরে, ওর যেন আর যেতেই নেই।" বলিতে বলিতে ললিতমোহনের মুখের উপর সহসা নিবিড় বিষণ্ণতার একটা কাল ছায়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সরসী ও নিখিলেশ উভয়েই জানিত, ললিতমোহনের এই পরার্থে উৎসৃষ্ট মুক্ত উদার অনাবৃত হৃদয় কোন্ অভাবের তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইবার মতই হইয়াছিল। বোঁটায় থাকিয়া বাহিরে যেমন নারিকেল ফলটা সাধারণের চক্ষে তাহার ভিতরের নীরস শুষ্ক অবস্থাটাকে জানিতেই দেয় না, ললিতমোহনও তেমনই ভিতরে ভিতরে পচিয়া সাধারণের চক্ষের বাহিরে থাকিয়া একেবারেই যে শুকাইয়া যাইতেছিল, তাহা আর কেহ লক্ষ্য করিতে না পারিলেও প্রাণপ্রিয় নিখিলেশ ও সরসীর অগোচরে ছিল না। দেবতার মত এমনই একটা মানুষ যে বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলের তীব্র-তাপে ঘরের মধ্যে থাকিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে এমনই করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তাহা স্মরণপথে আসিতেই সরসীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। সে ব্যথিত ভারাক্রান্ত মনের ভাবটা তখনকার মত গোপন করিয়া লইয়া তিরস্কারের স্বরেই বলিল,—"এতে দোষই বা কার, একটা মানুষকে

আপনিই যদি পায়ের তলা দিয়ে মাড়িয়ে চলেন ত, সেই বা কি করে আপনাকে বুকে টেনে নেবে ?"

ললিতমোহন বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বড় রকমের একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া গাঢ় স্বরে বলিল,—আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, ধ'রে নিলুম দোষটা আমারই। কিন্তু এও তোমাকে জিজ্ঞেস কচ্ছি সরসী, মন যদি আমার তাকে নিয়ে সুস্থ নাই হয়ত আমিই বা কি কত্তে পারি ?"

"সেটা কি তাহ'লে দিদিরই দোষ বলতে চান।"

"বিধাতার মার, ওর ও'পর কথা কইতে নেই। তারত সত্যি কোন দোষ নেই।"

আমি কিন্তু দেখছি, সব দোষই আপনার। দিদি কিন্তু কখনও এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে আপনি এমনই কতকগুলো দুঃখের মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে নিয়েছেন। ভগবানের সৃষ্টি, রূপ নেই বলে ত, তাকে আর ফেলে দেওয়া চলে না।"

ললিতমোহন ঘরের মধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিতে করিতে যেন অসামাল হইয়াই বলিয়া ফেলিল,—"তুমি কি জানবে সরসী, সৌন্দর্য্যের তৃষা মানুষকে কি ক'রে তোলে! আর তাই বা কি, তাকে নিয়েত আমার কোনই শান্তি নেই, সে কি আমার মনোমত হ'য়ে কোন একটা কাজই কত্তে পারে ?"

"কেউ পারে না ললিতবাবু! আপনার মত ছিষ্টিছাড়া লোক নিয়ে ঘর-সংসার করা, সেও বড্ড শক্ত কথা।"

নিখিলেশ হাসিয়া উঠিয়া ললিতমোহনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইয়া বলিল,—"না রে ললিত, সে কেউ পারে না, এই যে সোণার মানুষটি দেখছিস্ এও যদি তোর মতই একটা স্বামী পেত ত, কি কত্ত, বলতে পারি না।"

সরসী ভ্রূকুটী-কুটিল চক্ষে একবারমাত্র নিখিলেশের দিকে দৃষ্টি করিয়াই সলজ্জ-হাস্যে গাঢ় স্নেহজড়িতস্বরে বলিল,—"ললিতবাবু, আমি অনুরোধ কচ্ছি, আপনি এই খেয়ালগুলি ছেড়ে দিয়ে যাতে একটু একটু ক'রে সংসারের দিকে ঘেষতে পারেন, তাই করুন। মনে করবেন না, এতে শুধু আপনিই কষ্ট পাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দিদিও যে প্রাণের মধ্যে ছটফট ক'রে মরছে, সেটা আমি আপনায় নিশ্চিত ভাবেই বলে রাখছি।"

গভীর দীর্ঘশ্বাসে কম্পিত বক্ষটাকে আরও জোরে কম্পিত করিয়া দিয়া

ললিমোহন এবারও গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"সে জানি সরসী. আমি সব বুঝ্‌তে পারি, জানত ছোটকাল থেকে পরের দোরে ঘুরে ঘুরে আমি আমাকে পরের মধ্যেই সঁপে রেখেছি। তাতে আর কিছু না হক্‌, অন্ততঃ এটা হয়েছে, ভিতরের সত্যিকার জিনিষটা আমি খপ করেই ধত্তে পারি।"

নিখিলেশ হাসিয়াই বলিল,—"তাহ'লে তুই বুঝি বল্‌তে চাচ্ছিস্‌, তোর স্ত্রী তোকে মোটেই চায় না।"

"নারে না, এতবড় একটা মিথ্যে কথা আর হ'তে নেই, যাতে আমি যদি বলি সে আমায় চায়ই না। সে চায় খুবই, কিন্তু চেয়ে পাবার মত জিনিষটা যে তার মধ্যে মোটেই নেই।"

নিখিলেশ হা করিয়া ললিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কেবলই ভাবিতেছিল, কি জিনিসের পরিবর্ত্তে তাহার এই প্রাণের বন্ধুটিকে বন্ধুপত্নী প্রিয়ম্বদা সকল দুঃখের হাত হইতে টানিয়া আনিয়া সুখের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে। সে জিনিষটা কি, যার একারই অভাবে ললিত-মোহনের ন্যায় একটা মানুষ বাতাহত বন্যকুসুমের মত এমনই ভাবে অকালে শুকাইয়া যাইতেছে। ভগবানের রাজ্যে এমনই পরদুঃখকাতর ললিতমোহনের জন্য তাহার পবিত্র অতলস্পর্শ প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ প্রিয়ম্বদা কি একবিন্দু ভালবাসাও দিতে পারে না। সস্নেহ দৃষ্টিতে সরসীর দিকে ক্ষণেকের জন্য একবার মাত্র চাহিয়া লইয়া নিখিলেশ মনে মনে ভাবিল, সে যে ভগবানের দান, সমুদ্র ছেঁচিয়া ভগবান্‌ই যে সুধাস্বরূপ সে অপার্থিব অমৃতের কণাটুকু পুরুষের জন্যই নারীর হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা কি ভগবানের সে দান হইতে বঞ্চিত ?

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, মুক্ত গবাক্ষপথে সারাদিনের শ্রান্ত বায়ু অতি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িয়া সরসীর গোলাপী কাপড়ের আঁচল লইয়া ক্রীড়া করিতে-ছিল, আর থাকিয়া থাকিয়া ললিতের সেই কর্ম্মক্লান্ত আশা ও আশ্বাসহীন হৃদয়টী শান্তির স্নিগ্ধ স্পর্শে একটু শান্ত করিয়া দিয়া দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

ললিতমোহন সহসা যেন একটা চিন্তার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া জল খাবারের থালাটা টানিয়া আনিয়া একেবারেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ভাবছিলুম, এ আর খাব না, কিন্তু এ যে প্রাণের দান। একে উপেক্ষা কত্তে প্রাণ কেঁদে ওঠে, মনে হয় এ হতভাগ্যের জন্য এ দানই হয়ত আর ক'দিন পরে জুট্‌বে না।"

(২)

ষ্টীমার হইতে নামিয়া আসিয়া লীলাদের বাড়ীতে পা ফেলিতেই ললিত-মোহনের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। পশ্চিমাকাশের পরিণত অরুণ কিরণটুকুকে নিজের গ্রাসের মধ্যে টানিয়া লইয়া এইমাত্র চন্দ্রের অস্পষ্ট ছায়া পৃথিবীর উপর একটা মিশ্র কাল রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতেছিল।

লীলা অপরাহ্নের কাজগুলি সারিয়া লইয়া, স্থাপিত শালগ্রাম-শিলার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া একমনে এমনই কি একটা প্রার্থনা করিতেছিল যে, যাহার জোরে তাহার হৃদয় হইতে তখনকার মত বাহ্য জগতের কোলাহলটা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহমধ্য হইতে ধূপধূনার পূত গন্ধ বহিয়া আনিয়া সান্ধ্য মন্দ মারুত গললগ্নীকৃতবাসা ঈষদুন্মুক্তাবগুণ্ঠনা লীলার অবগুণ্ঠন-বাস লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। চিরটা কাল ধরিয়া অবজ্ঞা ও উপেক্ষার তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ লইয়া যে অসহনীয় দুঃখটা সে ভোগ করিয়া আসিতেছিল, আজ যেন অনন্যমনে ভগবানের নিকট তাহারই প্রতিকার প্রার্থনা করিতে গিয়া তাহার চোখ হইতে মুক্তাপঙ্ক্তির ন্যায়ই সূক্ষ্ম অশ্রুবিন্দুগুলি ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িয়া এমনই ভাবে বক্ষ ও গণ্ডদ্বয় সিক্ত করিয়া দিতেছিল যে, ললিতমোহন সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে একবারের জন্য দেখিয়া লইতেই ভক্তি ও ভালবাসায় একেবারে গলিয়া গিয়া এক দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রুপ্লাবিতমুখী লীলার সেই ভক্তিবিহ্বলকান্তি, দেববিগ্রহে বদ্ধদৃষ্টি ও অনন্য-পরায়ণতাজনিত স্পন্দহীন অবয়ব ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর যুগপৎ একটা অবিমিশ্র মুগ্ধ, বিস্মিত ও তীব্র জ্বালার ভাব টানিয়া আনিয়া দিয়া গেল। সে একটু পরে উচ্ছ্বাসের প্রবল আবেগে কাঁপিয়া উঠিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল,—"লীলা।"

দীর্ঘ কাল পরে আজ এমনই অসময়ে সহসা ললিতমোহনের স্বর কাণে যাইতেই লীলা চমকাইয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিতে পাইল, ললিতমোহন তাহারই দিকে চাহিয়া মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বিস্মিত হৃদয়ের উপর দিয়া যেন আবেগের একটা তীব্র ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্য ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অপরিজ্ঞাত একটা অনির্ব্বচনীয়তায় থাকিয়া থাকিয়া তাহার বক্ষঃপঞ্জরগুলি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। একটু পরে আরব্ধ

বেগটা কথঞ্চিৎ সংযত হইলে বিস্ময়বিমিশ্র-স্বরে লীলা বলিয়া উঠিল,—"দাদা, তুমি এই সন্ধ্যাকালে কোত্থেকে এলে? এদ্দিন পরে কি এ অভাগিনীকে তোমার মনে পড়্ল?"

স্বামীর তীব্র উপেক্ষার আঘাতে লীলার জীবনটা যে এমনই ভাবে অসার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা মনে করিতেই ললিতমোহনের চোখ জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কোনও কথা বাহির হইল না। ক্ষুব্ধ ব্যথিত হৃদয়ের মধ্যে হতাশার এমনই একটা প্রকাণ্ড ঝাপ্টা বহিয়া যাইতেছিল, যাহার ঝাঁকানিতে বহুচেষ্টা সত্ত্বেও সে আপনাকে সাম্লাইয়া লইতে সমর্থ হইল না।

ললিতমোহনের এ ক্ষণিক নীরবতাও লীলার পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িল। তাহার অবরুদ্ধ হৃদয় শৈশব-সহচর, একাধারে ভ্রাতা, বন্ধু, শিক্ষক, গুরু,—প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ললিতমোহনের আগমনে আজ যেন আবরণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া কারাগৃহ হইতে মুক্ত কয়েদীর মতই পুরাণ পুঞ্জীভূত দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিবার জন্য শত হৃদয়ে পরিণত হইয়া দুঃখস্মৃতিগুলির তীব্র অভিব্যক্তিতে তাহাকে পথহারা করিয়া তুলিতেছিল। লীলা কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল,—"দাদা, এস ঘরের ভিতর বস্বে।" বলিয়াই লীলা গৃহের দিকে চলিল। ললিতমোহনও তাহার অনুগামী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন আছ লীলা, তোমার শাশুড়ী কোথায়, এই সন্ধ্যাকালে তুমি একাকিনী কেন?"

চিরকাল অবজ্ঞা ও অপরিসীম দুঃখের মধ্যে পচিয়া মরিতে গিয়া লীলার সান্ত্বনা ছিল, ললিতমোহনের সদুপদেশ; যাহা তাহাকে বাল্যে স্নিগ্ধ করিত, কিশোরে মুখরতা হইতে রক্ষা করিত, যৌবনে যাহারই জোরে সে মরিতে মরিতেও এতকাল ধরিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। ভগবান্ তাহাও সহ্য করিলেন না; এ অভাগিনীর জন্য তিনিই কোমল হস্তে যে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ ললিতমোহনের মধ্যে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, অবিচারের তীব্র তাপে কিছুদিন হইতে একেবারেই তাহা শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছেন। লীলা ললিতমোহনের সাক্ষাৎকারের আশাও ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার কাছ হইতে দুটা সান্ত্বনার কথা, দুটা সদুপদেশ, যাহা তাহার প্রাণের কালিমাটুকু কমাইয়া দিবার জন্য মুমূর্ষুর নিকট মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায়ই কাজ করিত, তিনি তাহাও ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। তাই আজ অনেক কাল পরে ললিতমোহনকে দেখিয়া তাঁহার মুক্ত, স্নিগ্ধ, অনাবিল ভালবাসার কথা মনে করিয়া যেমনই

লীলা আনন্দে দিশাহারা হইতেছিল, তেমনই আবার জীবনময় দুঃখ-স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল। অতিকষ্টেও সে তাহার বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু আজ আর চাপা দিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠেই সে বলিল,—"মা এই পাশের বাড়ীতেই গেছেন, আমার কথা আর কি জিজ্ঞেস কচ্ছ দাদা, সবাকারি দিন যায়, আমারও যাচ্ছে।"

এত কষ্টের মধ্যেও সান্ত্বনার স্বর টানিয়া আনিয়া জোর করিয়াই যেন ললিতমোহন বলিল,—"আমি কিন্তু ভেবেছিলুম, এতকালেও তোমার একটা সুখের পথ হয়েছে লীলা ? মানুষের দুঃখেরও ত সীমা আছে !"

ললিতমোহনের এই যুক্তিতর্কহীন কথাটার মধ্যে লীলা যেন এমনই একটা বিস্ময়ের ছায়া দেখিতে পাইল, যাহাতে ক্ষণেকের জন্য তাহার অশ্রুপূর্ণ মুখের উপরও ক্ষীণ একটা হাসির রেখা উঁকি মারিয়া তখনই আবার আকাশের গায়ে বিদ্যুদ্বিকাশের মত একটা নূতন শোভা, নূতন তেজ বিস্তার করিয়া দিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। লীলা ধীরভাবেই উত্তর করিল,—"দাদা, সে ত তুমি বুঝ্‌বে না। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের যাতনা—।" লীলা আর বলিতে পারিল না, দুঃখ ও লজ্জার যুগপৎ আক্রমণে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল।

অদূরে সন্ধ্যার সেই গাঢ় নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া পাড়ায় পাড়ায় কাঁসর, শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া শূন্য-আকাশের গায়ে একটা বিরাট শব্দের প্রবর্ত্তনা করিয়া দিয়া বাতাসের সঙ্গেই মিলাইয়া গেল।

(৩)

লীলা কুলীন-কন্যা, ললিতমোহনেরই সমবয়সী। অতি শৈশবেই পিতার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা মাতা অন্য কোন আশ্রয় না পাইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ললিতমোহনদেরই পাশের বাড়ীতে ভ্রাতার আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাই ললিতমোহন ও লীলা অতি শৈশব হইতেই এক সঙ্গে খেলা করিয়াছে, বেড়াইয়াছে, ক্রীড়ায় কলহে মানে অভিমানে সময়টা সুখে দুঃখে কাটাইয়া দিয়াছে। বাল্যের সেই প্রাণভরা ভালবাসার মধ্যে এই দুইটী প্রাণী এমনই ভাবে খাওয়া দাওয়া চলাফিরা করিয়া বেড়াইয়াছে যে, কেহ অনুমানই করিতে পারে নাই, লীলা ললিত-মোহনের সহোদরা নহে। নিরাশ্রয়া লীলার প্রতি স্বজনহীন ললিতমোহনের

প্রীতির আকর্ষণটা যেন আপনা হইতেই দিন দিন প্রবল আকার ধারণ করিতেছিল ; উভয়েই উভয়কে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। আশ্রয়হীনা, দীনা বিধবার কন্যা বলিয়া লীলার প্রতি ললিতমোহনের আদর যত্নটা এমনই মাত্রা ছাড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহারই ফলে লীলার সামান্য অভাব অভিযোগগুলিকেও অসামান্যরূপে গ্রহণ করিয়া ললিতমোহন যখন সতর্ক যত্নে সংশোধন করিয়া লইত, তখন ললিতমোহনের নিতান্তই অন্তরঙ্গ বন্ধু যাহারা তাহারাও ললিতমোহনের ভালবাসার পক্ষপাত কোন্ দিকে বেশী এই উৎকণ্ঠিত চিন্তায় অবনত হইয়া পড়িত। এমনই ভাবে ললিতমোহন কতদিন লীলার জন্য কতই জিনিষ আনিয়া দিয়াছে, আদরে আব্দারে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজে গাছে উঠিয়া পাখীর ছানা পাড়িয়া দিয়াছে ; আবার কত বন্য কুসুমের মালা গাঁথিয়া উভয়ে উভয়ের গলায় পরাইয়া আনন্দে হাসিয়াছে, নৃত্য করিয়াছে, হাতাতালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে।

* * * * * *

সুখে দুঃখে খেলায় ধূলায় দশ দশটা বৎসর অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গেল। নিদাঘের অসহনীয় তাপ হইতে দূরে থাকিবার জন্য একদিন দ্বিপ্রহরে ললিতমোহন শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া একান্তমনে কি একটা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছিল, এমনই সময়ে লীলা আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"দাদা, তোমায় মা ডাক্‌ছে।"

ললিতমোহন কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া সম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"মা ডাক্‌ছেন, কৈরে তিনি ?"

"মা আর মামাবাবু বসে আছে, আমায় ডাক্‌তে পাঠালে।"

"কেন রে ? জানিস্ কেন ডেকেছেন।"

সহসা লীলার গোলাপী গণ্ড রক্তরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ডাকিবার কারণটা সে জানিত বটে, কিন্তু ললিতমোহনের প্রশ্নে সেটা যেন তাহার কাছে এবার আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর যতই স্পষ্ট হইতেছিল, ততই যেন লজ্জায় লীলার ঘাড় মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। এত আপনার ললিত-মোহনের নিকটও কথাটা সে কোন রকমেই বলিয়া উঠিতে পারিল না। লীলার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিয়া ললিতমোহন যখন পাশের বাড়ীতে লীলাদের গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন লীলার মাতুল একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া অনন্যমনে তাম্রকূটের মধুর আস্বাদ অনুভব করিতে

করিতে লীলার মাতার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। ললিতমোহন গৃহে ঢুকিবামাত্রই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—"এস বাবা এস, রোদের ভিতর আস্‌তে তোমার বড্ড কষ্ট হয়েছে, না ?"

ললিতমোহন পরিষ্কার ভাবেই জানাইল, কোন কষ্টত তাহার হয়ই নাই, তা ছাড়া সে যে একা পড়িয়া পড়িয়া কতগুলি অনাছিষ্টির চিন্তা করিতেছিল, তাঁহারা ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে সে যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া একটা মস্ত উপকারই করিয়াছেন। লীলার মাতুল সে কথাটায় মোটেই কাণ না দিয়া হাত দিয়া মোড়াটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"বস বাবা ?"

আজ এমনই একটা অপ্রত্যাশিত ভদ্রতায় ললিতমোহন যেন প্রথমটা একটু কেমন হইয়া পড়িল, পরক্ষণেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল—"বসুন আপনি, এই এতক্ষণ ত আমি বসেই ছিলাম, এখন কিন্তু দাঁড়িয়েই বেশ আছি।"

মাতুল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"তোমায় ডাকছিলেম,—লীলার ত বের বয়েস হ'ল, একটা ছেলে না দেখ্‌লে ত আর চল্‌ছে না।"

ললিতমোহন একটু চিন্তা করিয়া কথাটার জবাব দিতে যাইবে, এমনই সময় আবারও তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমাদের বরাত মন্দ, সম্বন্ধে যদি না আটক খেত ত তোমারই হাতে—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া ললিতমোহন উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"ছিঃ, কি বল্‌ছেন আপনি, লীলা যে আমার বোন !"

বৃদ্ধ মাতুল থমকিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন, সম্বন্ধটা নিতান্তই হাতগড়া, তাহারই জন্য মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সুযোগটা ঘটিয়াই যায় ত, একটা কাজের মত কাজই হইবে। এখন ললিতমোহনের এই তীব্র বাক্যে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল আশায় হতাশ হইয়া তিনি বড়ই ব্যথিত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। এক মুহূর্ত্ত আর কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। এই অবকাশে লীলার মাতা বলিলেন—"মেয়ের ত বয়স হল রে ললিত, একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা করে দেখ্, যাতে মাঘ ফাল্গুন পর্য্যন্ত দিতে পারিস্।"

বাল্যকাল হইতে পরোপকারে বদ্ধপরিকর ললিতমোহনের হৃদয় নিজ হইতেই এ চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল। লীলার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সে নিজের

কাজ বলিয়াই মনে করিত। লীলার মত এমনই একটা স্ত্রীরত্ন যার তার হাতে ফেলিয়া দিয়া কোন প্রকারেই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইবে না, সে কেবল একথা ভাবিয়াই আজও এ বিবাহের কোন কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া অনিশ্চিত বিষয়টাকে একেবারে দৃঢ় নিশ্চয়ের মধ্যে টানিয়া আনিয়া সে বলিয়া উঠিল—"তা সেজন্যে আপনারা ভাব্‌বেন না, লীলার বের যাহ'ক একটা আমিই করে দিচ্ছি।"

অদূরে দাঁড়াইয়া লীলা একটা লোহার পেরেক লইয়া প্রাঙ্গণে পোতা বাঁশের খুটিটার মধ্যে ছেঁদা করিতেছিল। ললিতমোহন অতিবড় বালিকার মত তাহার এই কাজটা দেখিয়া মনে মনে আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না. লীলাও একবারমাত্র ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া পরক্ষণেই সলজ্জ মৃদু হাস্যে মাথা নীচু করিয়া লইল, সেই মুহূর্ত্তে ললিতমোহনের দৃষ্টিটা লীলার ঈষদ-পূর্ণ অবয়বের প্রতি পড়িতেই ললিতমোহন একবারের জন্য চমকিয়া উঠিল। অনিন্দ্যকান্তি মাধুরীময়ী লীলার প্রথম যৌবনপাতে ঢলঢলায়মান অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইহারই মধ্যেই লীলা সত্যই এতটা বড় হইয়া পড়িয়াছে, মনে করিয়া সে বিস্মিত হইল, এটা যে সে, এতদিন ধরিয়া এক সঙ্গে থাকিয়াও তাহার নির্দ্দোষ নির্লিপ্ত স্নেহপ্রবণ দৃষ্টি লইয়া এক দিনের জন্যও লক্ষ্যই করিতে পারে নাই! আজ একবার মাত্র দেখিয়াই ললিতমোহন এটা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া লইল, লীলার বিবাহের যাহা হউক একটা শীঘ্রই তাহাকে করিয়া ফেলিতে হইবে, তাই সে আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দ্রুত পদে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

বিবাহের পর বৎসর অতীত হইতে না হইতেই পাশাপাশি দুখানা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নালোকে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া লীলা আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিল। তাহার একি হইল! দাদা বড় সাধ করিয়া, বড় আশা করিয়া নিজের বিশ্বাসভাজন বন্ধু সুবোধের হাতের উপর লীলার হাত দুইখানা তুলিয়া দিয়া সজলনেত্রে একবৎসর পূর্ব্বে যেদিন বলিয়াছিলেন—"সুবোধ, ভাই, আমার ত আর কেউ নেই রে ; এই একটিমাত্র বোন, ওকে তোর হাতে দিলুম, তুই কিন্তু ওকে দেখিস।" সে দিন লীলাও আপন ভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিল ; অজ্ঞাতে তাহার হৃদয়টাও দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়স্পর্শে সেও একবারের মত চমকিয়া

উঠিয়া মনে মনে বলিয়াছিল "যাহার এমনই ভাই, এমনই স্বামী, সেই আমার মত অদৃষ্টই আর কার?" আর আজ, চিন্তায় চিন্তায় লীলার শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছে, সপত্নী, বিশেষত স্বামীর অত্যাচারে এই অপ্রাপ্ত বয়সেই আহার-নিদ্রা সুখ-সম্ভোগ হইতে বিতাড়িত হইয়া চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই কুসুমসুকুমার মুখ তেজোহীন আভাবিরহিত। হাতীর মতই সবল শরীর এখন বাতাসের ভর সহে না। শরীরের সে লাবণ্য, সে পূর্ণতা হারা হইয়া লীলা মরু প্রদেশের শুষ্ক নীরস শাখামাত্রাবশিষ্ট মহীরুহের ন্যায় কোন মতে আপনাকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃহীন হইয়াও যে লীলা ললিত-মোহনেরই মত মহাত্মার আদর-যত্নের মধ্যে থাকিয়া এক দিনের জন্যও অভাব কেমন জানিতে পারে নাই, আজ তাহারই লজ্জা নিবারণের জন্য শতধাচ্ছিন্ন মলিন বসন; স্বামী তাহাকে এইমাত্র গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। লীলা আর ভাবিতে পারিল না, তাহার দুই চোক বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই সুখ, সেই অযাচিত অনুগ্রহ, আর এ নিগ্রহের মধ্যে কতটা যে ব্যবধান, তাহা ভাবিতে গিয়া লীলা যেন একটা সীমাই পাইল না। নিজের দুরদৃষ্ট চিন্তার মধ্যে লীলা যখন মনে করিল, দাদা একথা শুনিয়া কত ব্যাকুল হইবেন, হয়ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারই মত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিবেন, সে ছাড়া যে ললিতমোহনেরও আপনার বলিতে আর কেহ নাই, তখন লীলার হৃদয় আবারও বার দুয়ের জন্য শিহরিয়া উঠিল; আজ একে একে পিতার মৃত্যু, মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ, উদার মহান্ ললিতমোহনের প্রাণের দৃষ্টি; এমনই পুরাণ পুঞ্জীভূত সুখদুঃখের কাহিনীটা মনে হইয়া লীলা বাণবিদ্ধ হরিণীর মতই ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। লীলা যে ললিতমোহনের ঘরে থাকিয়া তাহারই হাতে মানুষ হইয়াছিল, মাতুলত উপলক্ষ্য মাত্র। শৈশবের সেই সুখ, সেই অবাধ শান্তি, সেই খেলা, একে একে মনে হইয়া লীলা আপনাকে একটা প্রদীপ্ত অনলশিখায় গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে বলিয়া যেমনই মনে করিতেছিল, অমনি উচ্ছৃঙ্খলবেশ, আরক্তচক্ষু, কম্পিত ওষ্ঠাধর ললিত-মোহন সেখানে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"লীলা!"

লীলা চমকিয়া উঠিল। সে স্বরের মধ্যে এমনই একটা গভীর হতাশা, এমনই একটা পূর্ণ বিষণ্ণতা, এমনই একটা প্রাণঘাতী কাতরতা, এমনই একটা দীনতা বিরাজ করিতেছিল, যাহার অনুভবমাত্র লীলা আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার অবশ শিথিল ক্ষীণ দেহ যষ্টি সহসা মাটির

মধ্যে পড়িয়া গেল। ললিতমোহন একটা বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই রহিল, নড়িল না, লীলাকে ধরিয়া উঠাইতে গেল না, একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই নিরাশ্রয়া অবলাকে সেইত হাতে ধরিয়া সমুদ্রের মাঝখানে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে। যদি ফেলিয়াছেই, তবে আর কেন, একেবারে অতল সলিলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া এক দিনেই ;—এক মুহূর্ত্তেই ভাবী জীবনের দুঃসহ দুঃখ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লউক। অনুতাপে ললিতমোহনের হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। সে নিজে কেন এ সম্বন্ধ করিল, লীলার মাতুলের উপর ভার অর্পণ করিলে হয়ত এমনটা হইত না। হয়ত লীলার স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিত না, বিবাহ করিলেও এমনই করিয়া হয়ত লীলাকে পোড়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিত না। ললিতমোহন আর ভাবিতে পারিল না, হতাশার গভীর দীর্ঘশ্বাসে বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়াই যেন বলিয়া উঠিল—"হায়, আমি কি করেছি।"

এতক্ষণে লীলা অনেকটা সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এলায়িত, স্রস্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, রূক্ষ, চুলের রাশটার উপর ছিন্ন মলিন বসনখানার একটা অঞ্চল টানিয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"দাদা।"

লীলার এই আকুল আহ্বানে ললিতমোহনের হৃদয়তন্ত্রীর তারগুলি যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সে বৃক্ষশাখাটা আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—"লীলা, শেষটা তোর ভাগ্যে এই হল !"

"কি কর্‌বে দাদা, বরাতের উপর ত কারু হাত নেই।"

"তাই কি ? না লীলা, আমি যে হাতে ধরে তোর সর্ব্বনাশ কল্লুম।"

এবার লীলাও আর সাম্‌লাইতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"ছিঃ দাদা, ও কথা মুখেও এন না, ওতে যে আমায় আরও পুড়ে মর্‌তে হয়।"

ললিতমোহন গাছের ডালটা ছাড়িয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উঃ এমনই অভাগা আমি যে, যে কেউ আমায় ভাল-বাস্‌বে, তারই এম্‌নি দগ্ধে মর্‌তে হবে।" বলিয়া উন্মাদ-দৃষ্টিতে চাহিতেই লীলা শিহরিয়া উঠিয়া স্থির স্বরে আবার বলিল—"দাদা, কি কচ্ছ, স্থির হও, ভেবে দেখ, এতে ত তোমার কোন হাত ছিল না।"

ললিতমোহন এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, তারপর কাপড়ের আঁচলে চোখটা মুছিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া লীলার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া

আনিয়া বলিল—"লীলা, তোর এমন চেহারা হয়েছে! কেন তোরে কি ওরা খেতেও দেয় না।"

লীলা মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল, তাহার দুই চোক্ বহিয়া অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"বাঃ—বেশ ত" বিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই লীলার সপত্নী ললিতা আবারও বলিয়া উঠিল—"দিদি ত চাঁদের আলোতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে—বাঃ বেশ!"

ললিতমোহন আর একবারের জন্য শিহরিয়া উঠিল। তাহার কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় সহসা জড় হইয়া গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে ঘৃণায় সে যেন তখনকার মত চেতনারহিত হইয়া পড়িল। আকাশের গা হইতে নক্ষত্রগুলি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়া আসিতেছিল, বসন্তের সেই স্নিগ্ধ বাতাস তাহারই হৃদয়ের জন্য যেন দগ্ধ প্রস্তরকণা বহিয়া আনিতেছিল।

লীলা বিস্মিতা হইল না, সে যখনই দেখিল, সপত্নী ললিতা হাসিয়া হাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যে যা-তা একটা কথা বলিবেই, তাহা সে আকার দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। যে ইতিমধ্যেই স্বামীর নিকট ললিতমোহন ও লীলার নামে কল্পনারচিত কতই না কুৎসা রটনা করিয়াছে; এমন কি চিঠি জাল করিয়া অবৈধ প্রেমের কথা ঘোষণা করিতেও ত্রুটি করে নাই, সেই ললিতাকে লীলার কিছু বলিবার ছিল না। বলিলে কোন কাজ হইবে না, তাহাও সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত, তথাপি আঘাতে আঘাতে ভঙ্গপ্রায় ললিতমোহনের হৃদয়ে আবারও একটা আঘাতের আশঙ্কা করিয়া সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বিনীত ভাবে বলিল—"ছিঃ দিদি, কি বলছ তুমি, ইনি যে আমার দাদা।"

"তা আর জানি না, এ যে পুরণো প্রেমিক" বলিয়া ললিতা আবারও হাসিয়া উঠিল। ললিতমোহনও আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তথাপি অপরিচিতা এমনই লজ্জা-রহিতা এই রমণীটির সহিত কোন কথা বলিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল, ইহার এমনই অধঃপতন প্রত্যক্ষ করিয়া একটা সহানুভূতিও যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন, ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। স্ত্রীহৃদয় এমনই কঠোর বিষময় হইতে পারে, পূর্ব্বে যে সে একথা একবারের

জন্যও ভাবিতেই পারে নাই। এবার ক্ষীণকণ্ঠে ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি !"

ললিতা পূর্ব্ব ভাবেই বলিল—"সতীন গো,—লীলার সতীন।"

"তাই বলে কি এমনই একটা জাত মারার কথা মুখে আন্‌তে আছে।"

"জাত যদি নাই রৈলত, মুখে আন্‌লেই হবে দোষ !"

ললিতমোহনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াগেল। তখনকার মত তাহার অবস্থা এতই সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে অসামাল হইয়া পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি দেখ্‌ছি, শিক্ষা বা সদ্ভাবের ধার দিয়েও জাননি, একটু সাম্‌লিয়ে কথা কইবেন।"

"দিদি কার সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌বে শীগ্‌গির এস" বলিয়া ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিতেই সুবোধ ধীরে ধীরে সেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষ করিয়া বলিল—"এদের কথা আগেত আমি বিশ্বাস করি নি, এখন দেখ্‌ছি, সেটা আমারই ভুল।"

পূর্ণ বিস্ময়ে সুবোধের মুখের দিকে চাহিয়া ললিতমোহন ডাকিল—"সুবোধ !"

সুবোধ সে দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া শ্লেষের মাত্রাটা একটু বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বলিল,—"ছিঃ ললিত, তুমি এমন, কেন ওকে ত আমি আর তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে যাইনি, নিজে রেখে দিলেই ত সব গোল চুকে যেত।"

ললিতমোহন বুঝিতে পারিল না, সে পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে, না পাতালের তলদেশে একটা পূতিগন্ধময় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে সুবোধের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুবোধ কি তাহাকে এমনই একটা কথা বলিতে পারে? না তাহার সম্বন্ধে এমনই একটা কদর্য্য ধারণা সুবোধের মনে উঠিতে পারে! সুবোধ হয়ত ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে মনে করিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া আবারও বলিল,—"কি বল্‌ছিস্ তুই, মাথা খারাপ হয়নি ত?"

সুবোধ এবার শ্লেষের মাত্রাটা একটু বাড়াইয়া ক্রোধের সহিত বলিল—"মাথা খারাপ না হলে, এমনই করে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে তোমার এ রহস্যালাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিই কি বরদাস্ত কত্তে পাত্তম !"

ললিতমোহনের মাথার উপর আকাশটা ঘুরিতেছিল; বোধ হয়

পায়ের তলায় পৃথিবীটাও স্থির ছিল না। এই কি সেই সুবোধ,—যে সুবোধ একদিন এক মুহূর্ত্ত তাহারই সাহাষ্য না পাইলে এতদিনে তাহার সত্তাটাই পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইত; এই কি সেই সুবোধ,—যে সুবোধ ললিতমোহনকে মাতৃস্নেহের ন্যায়ই বিশ্বাসের পাত্র মনে করিয়া একদিন গুরুরও অধিক আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল। এই কি সেই সুবোধ,—আজ সকালেও লীলার এই ভীষণ পরিণামের কথা জানিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা না জানিয়াও যাহার সম্বন্ধে ললিতমোহন নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইয়াছিল, এত ঘটনার মধ্যেও সুবোধ কিন্তু সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ। সে যে বাল্যকাল হইতেই এই সুবোধকে জানিত, এবং তাহারই ফলে সে একেবারেই ঠিক করিয়া লইয়াছিল, সুবোধ নিশ্চয়ই অন্যের পরামর্শে একাজ করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ললিতমোহনের যে একটা খট্‌কা ছিল যে, সুবোধ আর কিছু না করিতে পারিলেও বিবাহটা করিবার পূর্ব্বে ললিতমোহনকে একটা সংবাদও ত অন্ততঃ দিতে পারিত, সেই খট্‌কাটা এখন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিয়া দিল, "নাগো না, সুবোধ ত নির্দ্দোষ নয়, এর মধ্যে তারও বেশ ষড়যন্ত্র রয়েছে।" ভাবিতে ভাবিতে ললিতমোহন বসিয়া পড়িল।

গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া দূরে স্কুলের ঘড়িতে যখন দুইটা বাজিয়া গেল, সে শব্দে চমকিয়া উঠিয়া ললিতমোহন আলুলায়িতকুন্তলা রোরুদ্যমানা পদতলে ছিন্নবল্লীর ন্যায় পতিতা লীলার দিকে একবার চাহিয়াই বলিল,—"লীলা, আমি চল্লুম, তোর নিয়তি এই ভাবে মৃত্যু। তোকে রক্ষা কর্‌বার অধিকারও যে আমার নেই।" বলিয়াই ললিতমোহন সেই যে দীর্ঘ দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একবারমাত্র লীলার দিকে চাহিয়াই দুই হস্তে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া চলিয়া গিয়াছিল; এত কালের মধ্যে লীলার আর কোন সংবাদ না পাইয়া সেই ললিতমোহনই আজ আবার যেন প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়াই আসিয়া ইহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বামা পিসি

[শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী লিখিত]

১

উৎসবশেষে শূন্য বৈঠকখানায় সন্ধ্যার উজ্জ্বল বাতি যেমন অতীত সমারোহের স্মৃতি বহিয়া শেষ রাত্রিটুকু নিতান্তই মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বামারও রূপ যৌবন তেমনি ব্যর্থ জীবনের শূন্যতা বহিয়া সর্ব্বাঙ্গে একটা ম্লান আভা মাখাইয়া রাখিত,—সে বাল-বিধবা।

অতি শৈশবে, অজ্ঞানে বিবাহ হইয়াছিল—সে কথা তার মনেও পড়িত না, জ্ঞান হইয়া অবধি বিধবা মা ও ছোট ভাইটিকেই সংসারের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিত। সকালে উঠিয়া মাতা প্রতিবেশীদিগের বাড়ী দুঃখ-ধান্দা করিতে যাইত, বামা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া—প্রভাতের পদ্মের মত একগাল হাসিতে হাসিতে কুঞ্চিত অলকদাম দোলাইয়া তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিত। কোন বাড়ীতে কেউ দু'খানা বাসি রুটি—কেউ বা দু মুঠো মুড়ি দিত, তাই চাঁদপানা মুখ করিয়া খাইয়া সকালের ক্ষুধা নিবারণ করিত।

কিন্তু রূপ-যৌবন কারো মুখাপেক্ষী নয়। নির্জ্জন কাঁটা বনেও সুগন্ধি কুসুম ফোটে। দারিদ্র্যনিপীড়িত হইলেও, প্রকৃতি আপন কর্ত্তব্য করিতে ভুলিল না। পঙ্কে পদ্মের মত—গরীবের কুঁড়ে আলো করিয়া—নবীন যৌবন বামার সর্ব্বাঙ্গে আপনার সুষমা ফুটাইয়া তুলিল। তখন গ্রামের অনেক ভদ্রসন্তান সহসা বিনা কারণে তাহাদের অত্যন্ত আপনার হইয়া উঠিল।

বামার মা যে তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিল না, তা নয়। সাপ যেমন আপন মণিটিকে অত্যন্ত সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখে, সহায়হীনা দরিদ্র বিধবা তেমনি আপন হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও শক্তি ঢালিয়া নয়ন-মণিটিকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আগ্‌লাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু সে রকম আর ক'দিন চলে? মা ও মেয়েকে সংসারের তাড়নায় সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে এ-দোর সে-দোর ফিরিতে হয়, কাযেই বামাকে সহস্র লুব্ধ দৃষ্টির আড়ালে রাখা অসাধ্য হইল। তখন মা-মেয়েতে পরামর্শ করিয়া এক উপায় ঠাওরাইল।

গ্রামের একঘর বড়লোক—মিত্তির কর্ত্তা তাহাদর প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, বামার বাপ—কামার বুড়োকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। পাঁচ বছরের

বামার যখন বিয়ে হয়—তাঁর নিতান্ত মতবিরুদ্ধ হইলেও—মিত্তির কর্ত্তা অধিকাংশ খরচই নিজে বহন করিয়াছিলেন। তারপর কামার বুড়ো মরিয়া গেলে, এই অনাথ পরিবার দায়ে—অদায়ে যখনি গিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়াছে—কখনো রিক্ত হস্তে ফিরে নাই।

বামার মা একদিন চুপি চুপি মিত্তির বাড়ী গিয়া কর্ত্তা গিন্নীকে আপনার বর্ত্তমান বিপদের অবস্থা জানাইল। তার মনের ইচ্ছা—মেয়েকে তাঁহাদের আশ্রয়ে রাখিয়া, সে আপনার ভাইয়ের বাড়ীতে ছেলেটিকে লইয়া গিয়া মানুষ করিবে। কর্ত্তা গিন্নি রাজি হইলেন, অনাথা বিধবার মাথার উপর হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। সে বামাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, চুপি চুপি মিত্তির বাড়ীতে রাখিয়া গেল।

সকালে গ্রামের যুবকেরা হতাশ হইয়া দেখিল—পাখী উড়িয়াছে। বামার মার জীর্ণ কুটীরখানি শূন্য পড়িয়া আছে।

২

কর্ত্তার একমাত্র ছেলে সুরেশ কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত, শনিবারে বাড়ী আসিয়া আবার সোমবারেই চলিয়া যাইত। বৌয়ের একটিমাত্র দু'বছরের ছেলে—হরিপ্রসাদ, আর সন্তানাদি হয় নাই। মেয়ে শশীকলা—বামার সমবয়সী, বছর দুই বিবাহ হইয়াছিল, শ্বশুরঘর করিত না—পিত্রালয়েই থাকিত। জামাই পশ্চিমে চাকরি করিত এবং বছরে বারদুই শ্বশুর বাড়ী আসিত। একজন ঝি ও একটি চাকর ভিন্ন সংসারে আর বড় লোকজন ছিল না।

মিত্তিরবাড়ী আসিয়া বামার কোন কষ্ট হইল না বরং বৌ ও মেয়ে দুটি সমবয়সী পাইয়া সে সুখেই রহিল। মনের বিকাশ না হইলেও তার মিষ্ট স্বভাব এবং কাযকর্ম্মের পটুতা শীঘ্রই সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিল। ক্রমে নিত্য প্রয়োজনীয় ঘটী বাটীটার মত বামাও মিত্রগৃহে নিত্যদরকারী আপনার জন হইয়া উঠিল—তাকে ছাড়িয়া আর একদণ্ড চলে না। সেই সময়ে কর্ত্তা চক্ষু বুজিলেন, সুরেশ গ্রাম ছাড়িয়া বিধবা মাতা ও পরিবারবর্গকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিল। বামা—অপরিত্যাজ্যা, সুতরাং সেও সঙ্গে গেল। সর্ব্বদা একত্রে থাকিয়া তিনটি যুবতীর মধ্যে বন্ধুত্ব যখন গাঢ় হইয়া উঠিল, তখন ননদ ভাজ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে বামা নিতান্তই একটা সাজানো কাঠের পুতুল মাত্র। তার সর্ব্বাঙ্গে ভাদ্রের কুল-ভাঙ্গা গাঙ্গের ঢেউ ছুটিলেও, মন

চৈত্রের খানা ডোবার মত নিতান্তই শুষ্ক। কথাবার্ত্তা রসিকতা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে তারা সেই শুষ্ক ডোবায় জল সঞ্চার করিবার প্রয়াস পাইল। নহিলে তাহারা সখিত্বে সুখ পায় না—মনের ভিতর কেমন-যেন-একটা খুঁৎ থাকিয়া যায়। ননদ-ভাজের সমবেত চেষ্টা অচিরেই ফলবতী হইবার আশা দেখা দিল। কিন্তু তাদের আগোচরে একটা অনিষ্ট পাতের সূচনা হইল।

৩

ননদ-ভাজের এখন আর বড় একটা কাজ ছিল না, তারা দিনরাত বামাকে লইয়া পড়িল—সুতরাং তা'দের চেষ্টা নিষ্ফলে গেল না। সন্ধ্যার বাতাসে স্ফুটনোন্মুখ-কলির মৃদু কম্পনের মত সে প্রাণের ভিতরে একটা কম্পন অনুভব করিল। ক্রমে চাঁদের শোভা এবং দখিনা বাতাসের অস্ফুট ভাষা প্রভৃতি বুঝিতে তার বেশী দিন লাগিল না। এখন ননদ-ভাজও তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও রসিকতা করিয়া আরাম পাইল।

কিন্তু মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—বামার মনে যে টুকু শান্তি ছিল—তা নষ্ট হইল, সে সর্ব্বদাই প্রাণের মধ্যে যেন কিসের অভাব বোধ করিতে লাগিল। এতদিন সে নিশ্চিন্ত আরামে সব কায কর্ম্ম করিত, পান সাজিত, একলা দাদাবাবুর হাতে পান দিয়া আসিত, রাত্রে তাকে সদর খুলিয়া দিত--কিছুতেই সঙ্কোচ বোধ করে নাই, এখন প্রত্যেক কার্য্যেই একটা বাধ বাধ ভাব আসিল। বিশেষতঃ দাদাবাবুর কাছে যাইতে সে যেন কেমন কুণ্ঠা বোধ করিত। পারতপক্ষে সে আর একলা তাঁর কাছে যাইতে চাহে না—সুরেশের অজ্ঞাতে পানের ডিবাটা বিছানার উপর রাখিয়া ছুটিয়া পালায়। হঠাৎ সুরেশের সম্মুখে পড়িলে, জড়সড় হইয়া যেন আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। সেদিন অনেক দিনের পর শশীর স্বামী আসিয়াছিল। শশী বেশ বিন্যাসের বড়ই পক্ষপাতী—সর্ব্বদাই ফুলটির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। সেদিন আরো একটু রং চড়াইয়া সে যখন শুইতে গেল, বামা আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না, একটা অদম্য কৌতূহল তাকে সেই ঘরের জানালার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। সে ঈষন্মুক্ত গবাক্ষপথে চোখ রাখিয়া আড়ি পাতিয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিয়া বামা আর সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। কেমন যেন একটা অজ্ঞাত বেদনা তার নির্জ্জন শয্যায় কাঁটা বিছাইয়া দিয়াছিল--সে অনবরত ছটফট করিতে করিতে এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রি প্রভাত করিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া বামা আর কারো সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে বা মেলা-মেশা করিতে পারিল না—নিজের মনে দৈনিক কার্য্যগুলি সারিয়া হরিপ্রসাদকে লইয়া রহিল। ননদ-ভাজ বামার ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ভাবিল—বুঝি তার কোন রকম অসুখ করিয়া থাকিবে।

হরিপ্রসাদ বড় দুরন্ত ছেলে. সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিত, কেবল বামার কাছে গেলে তার স্বভাব একেবারে বদলাইয়া যাইত। সে যে তাহাকে কি গুণ করিয়াছিল—বামা পিসি যখন যা বলিত—অত্যন্ত সুবোধ শান্ত শিশুর মত—সে তাই করিত। ক্রমে বামা আপন অন্তরের দৈন্য ও শূন্যতা যতই অনুভব করিতে লাগিল—স্রোতে ভাসমান বিপন্নের মত—ততই সে এই ক্ষুদ্র কুটো গাছটাকে প্রাণের মধ্যে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিল। শেষে এমন হইল যে, এই নগ্নদেহ ক্ষুদ্র প্রাণীটি বামা পিসির সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিল। হরিপ্রসাদ আর মা, ঠাকুর মা, কি পিসিমার নাম গন্ধও করিত না—অষ্ট প্রহর বামা পিসির কোলে পীঠে থাকিত, এমন কি রাত্রেও বামা পিসির শয্যা ভিন্ন কেহ তাহাকে আর কোথাও শোয়াইতে পারিত না। মাতা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলেই এই বিদ্রোহী প্রাণীটির সমস্ত ভার বামার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

বামার মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং তার স্বভাবেরও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ননদ-ভাজের সঙ্গে সঙ্গে সে রোজ বিকালে গা ধুইত, সাবান মাখিত, কপালে টিপ পরিত এবং ভ্রমরকৃষ্ণ একরাশ চুলে নিত্য নানা রকমের খোপা বাঁধিত, তারপর একখানি পরিষ্কার কোঁচান মিহি শাড়ী পরিয়া ছবিখানির মত শোভা পাইত। তাহার রূপরাশি তখন সখিদ্বয়কেও ছাপাইয়া উঠিত।

একদিন ঠাট্টা করিয়া বৌ-দি বলিল—"দেখিস্ লো অমন ফুলটির মত সেজেগুজে রাত্রে একলা তোর দাদাবাবুকে দোর খুলে দিতে যাস নি যেন।" হঠাৎ বামার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল—"দূর মড়া।"

কিন্তু বৌদির ঠাট্টা ফলিতে বেশী দিন গেল না। হঠাৎ একদিন রাত্রে সদর খুলিবার সময় সুরেশ অবাক হইয়া দেখিল—বামা পরম রূপবতী? ঈষৎ হাসিয়া বামা ছুটিয়া পলাইল, সুরেশ সদর বন্ধ করিয়া আনমনে ভাবিতে ভাবিতে ঘরে গেল।

(৪)

আমরা ছেলে মানুষ করিতে জানি না, শুধু লেখপড়া শিখাইয়াই ভাবি কর্ত্তব্য শেষ হইল, ভাল ছেলে—আর তার মার নাই, স্বচ্ছন্দে আবর্ত্তময় সংসার-অর্ণবে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু খারাপ ছেলের অপেক্ষা ভাল ছেলের বিপদ যে পদে পদে তা আমরা চোক্ থাকিতেও দেখি না। তাই আমাদের সংসারে এত বিশৃঙ্খলা, এত অশান্তি, এত দুঃখ দৈন্য!

ফুঁকো শিশি যেমন টুস্‌কির ভর সয় না—ভাল ছেলেও তেমনি শীঘ্রই, অতি সহজে বিগ্‌ড়াইয়া যায়। সুরেশেরও তাই হইল। সে লেখা পড়াই শিখিয়াছিল—সংসারের শিক্ষা আদৌ হয় নাই, চিত্তদমনের শক্তি ছিল না। মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মত সে বামার রূপ-বহ্নিতে অচিরেই ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রাত্রে সদর খুলিয়া দিতে আসিলে, আর একদিন সুরেশ অত্যন্ত স্নেহ ও আবেগভরে বামার হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল, নিতান্ত করুণভাবে মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"বামা, তুমি আমাকে ভাল বাস না?"

বামার হৃদয়ে সপ্তসাগর মথিত করিয়া ঢেউ উঠিল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল, দেহের সমস্ত শোণিত মুখে উঠিয়া যেন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সে মুহূর্ত্তমাত্র নতমুখে থাকিয়া জড়িত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"ছাড় ছাড়, এখনি কে টের পাবে!" তারপর তাড়াতাড়ি হাত ছিনাইয়া লইয়া দৌড়িয়া পলাইল।

সুরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপনি সদর বন্ধ করিল, আনমনে ভাবিতে ভাবিতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল, স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না। স্ত্রী আহার করিবার জন্য সাধ্য সাধনা করিলে,—"বিরক্ত করো না" বলিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইল। সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—বামাও সে রাত্রে কিছুই খায় নাই, খাবার যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে।

সেই হইতে বামার চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে আপনা আপনি বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন দেখা দিল। সে নিজে না টের পাইলেও বাড়ীর আর সকলেই পাইল, বয়স দোষ ভাবিয়া সে বিষয়ে কেহ বড় লক্ষ্য করিল না, কিন্তু সেইদিনের পর হইতে সুরেশ যে হঠাৎ স্ত্রীর উপর অকারণে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—সেটা সকলেই বুঝিল।

যেখানে আঘাত—সেইখানেই ব্যথা। জননী তাঁহার বরাতের দোষ

ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকিলেও বৌ তা পারিল না—গোপনে গোপনে স্বামীর চিত্ত পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বামার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ননদ-ভাজ কারো অজ্ঞাত ছিল না, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে দুজনারই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে তাহাদের চক্ষু পড়িল। কিন্তু বামাকে ধরা বড় সহজ ছিল না।

যাহারা প্রবৃত্তির দাস, তাহারা মোহের ক্ষণে অসম্বৃত হইয়া ধরা পড়িয়া যায়, সুরেশের তাহাই হইল, কিন্তু বামার তা নয়। তাহার ভিতরে যে ওলট-পালট হইয়া গেছে, তা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের ন্যায় অত্যন্ত বৃহৎ, অত্যন্ত উদার—সার্ব্বজনীন। তাই সহজে কেউ বুঝিতে পারিল না।

৫

কবে, কোন পুতুল খেলার বয়সে, পুতুল খেলার মধ্যেই যে বামার আইবুড় নাম ঘুচিয়াছিল, তা তাহার মনেও পড়িত না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বয়োধর্ম্মে প্রকৃতি পালিতার মত, আপনিই তার হৃদয়কুসুম সহস্রদলে প্রস্ফুটিত হইয়া যখন দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য উন্মুখ হইল, তখন সুরেশই সর্ব্বপ্রথম তার চক্ষের সম্মুখে অমরার অনন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দেবতার বেশে আসিয়া দাঁড়াইল, বামা সকল ভুলিয়া সেই দেবতার চরণে আত্মোৎসর্গ করিল।

তাই সুরেশের পরিবর্ত্তন হইতে বামার পরিবর্ত্তন বিভিন্ন ধর্ম্মের—বিভিন্ন প্রকৃতির। সেই হইতে বামা রমণীর ষোলকলা সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া নারীর পূর্ণ মহত্ত্বে মহীয়সী হইয়া উঠিল। সে স্পৃহাশূন্য—কামনাশূন্য—দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়াই সুখী হইল, সুতরাং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মত তার অসংক্ষুব্ধ হৃদয়-সাগরের স্থির গম্ভীর অচঞ্চল তলদেশে যে কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

"আর কতদিন এ জ্বালা বুকে চেপে পুড়্‌বো বামা? তুমি বড় নিষ্ঠুর?"

"ছিঃ অমন কথা বলো না। তুমি আমার দেবতা—তোমাকে দেখ্‌ছি, সেবা কর্‌ছি, এই আমার পরম সুখ, তার বেশী চাই না।"

"কিন্তু তাতে আমার কি? দিনরাত বুকের ভিতর রাবণের চিতা চেপে বেড়াচ্ছি—আর পারি না। আমার কথায় রাজী হও, চল কালই ঘর ভাড়া করে তোমায় রাণীর হালে রাখ্‌বো—আর না বলো না।"

গভীর রাত্রে সদর খুলিয়া দিতে আসিলে সুরেশ বামাকে জিদ্ করিয়া

ধরিল। রূপের মোহে—কামনার পীড়নে সে আত্মহারা হইয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল—আজ একটা হেস্ত নেস্ত করিবে।

সুরেশের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বামা মনে মনে ভীতা হইলেও গম্ভীর প্রশান্ত, প্রেমপূর্ণ মিনতির স্বরে সুরেশকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু সে না-ছোড়—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেবল সেই একই কথা, একই অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন বামা দৃঢ় অথচ মিষ্টস্বরে কহিল—"না তা পারবো না, প্রাণ থাকতে বৌদির এ সর্ব্বনাশ আমি করতে পারবো না।" সুরেশ তার হাত ধরিয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিল, বামা সে কথায় কাণ দিল না, ধীরে ধীরে সুরেশের কবল হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া কহিল,—"তুমি আমার দেবতা—চিরকাল তোমার পূজা করবো, কিন্তু তোমার পাপ-পথের সঙ্গী হব না, তোমার কলঙ্ক হতে দেব না, বৌদির সর্ব্বনাশ করতে পারবো না—এ সংসারে আগুন জ্বালাতে পারবো না।"

(৬)

সে রাত্রে বামা আদৌ ঘুমাইতে পারিল না, কেবল চক্ষের জলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। ভোরের বেলা তাহার শ্রান্ত চক্ষুদ্বয় নিদ্রাভারে বুজিয়া আসিল। সকালে যখন হরিপ্রসাদের ঠেলাঠেলিতে তার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেকখানি বেলা হইয়াছিল।

মুহূর্ত্তের প্রবল ভূমিকম্পে প্রকৃতি যেমন হঠাৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, প্রাতে বামার চক্ষে সংসারও তেমনি বোধ হইল। রাত্রের মধ্যে কি যেন একটা প্রলয় ব্যাপার মিত্রসংসারকে ওলট-পালট করিয়া দিয়াছিল।

হরিপ্রসাদকে কোলে করিয়া ঘরের বাহির হইতেই তার মা হঠাৎ রায়-বাঘিনীর মত আসিয়া একটা চড় মারিয়া পুত্রকে বামার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল, বামার সঙ্গে কথা কহা দূরে থাকুক, রাগে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইল।

অন্যদিন শৈলবাবা ফষ্টি নষ্টি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সেদিন বামার দৈনন্দিন কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিল—বাসন লইয়া কলতলায় মাজিতে বসিয়াছিল। বামা তাড়াতাড়ি যেমন সে গুলি তার হাত হইতে লইতে যাইবে, শৈল একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া চুপি চুপি বলিল,—"না ভাই, এ সবে আর হাত দিস্‌নি,মা কি বৌ দেখতে পেলে মহামারি বাধ্‌বে।" তারপরে পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাসন মাজিতে লাগিল।

কম্পিত হৃদয়ে সেখান হইতে উঠিয়া বামা রান্নাঘরে গেল। গিন্নী আপনিই তখন সে ঘর পরিষ্কার করিতেছিলেন, বামাকে দেখিয়া বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আর কেন বাছা এ ঘরে, তোমার জিনিষ পত্তর দেখে শুনে গুছিয়ে নাওগে। সুরেশ তোমার ভাইকে ডাকৃতে পাঠিয়েছে—সে এলেই তোমাকে যেতে হবে।"

বামা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"সে কি মা, আমি কোথায় যাব ?"

গৃহিণী একটা বড় রকম ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—"কোথায় যাবে, তা আমি কি বলৃবো, তোমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করো। আমার বাছা সোমত্ত ঝি বউ নিয়ে সংসার—ও রকম নষ্ট দুষ্টু লোক পুষ্‌তে পারৃবো না।"

বামার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষের সম্মুখে চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সবেগে সেইখানে বসিয়া পড়িল—তাহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

গিন্নী এবার সপ্তমে চড়িলেন, কহিলেন—"যাও, যাও, বেরোও ও ডাইনীর মায়া আমরা ঢের জানি। সকাল বেলা আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না—ভালোয় ভালোয় আপনার কাপড় চোপড় দেখে শুনে নাওগে। ছোট লোকের মেয়ে কি না, বালামের ভাত খেয়ে তিলিয়ে উঠেছেন! আ মরণ—সুরেশের আমার পথে ঘাটে মুখ দেখাবার যো নেই, দেশময় ঢি—ঢি! গলায় দড়ি, অমন স্বভাব যার, তার গেরস্তর বাড়ী এসে থাকা কেন বাপু, বাজারে তো অলিতে গলিতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় ?"

বামা জড়পুত্তলিকাবৎ স্তব্ধ—অবাক! এতক্ষণে সে ব্যাপারখানা এক রকম বুঝিতে পারিল। তাহার মুখে বড় রকম একটা উত্তর আসিয়াছিল, কিন্তু সে সাম্‌লাইয়া লইল, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে আপনার ঘরের দিকে চলিল, প্রতি পদক্ষেপেই তাহার মনে হইতে লাগিল, হায় পৃথিবী যদি বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিত ?

দুপর বেলা বামার ভাই আসিয়া তাহাকে লইলা গেল। মেয়ে প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময়ে যেমন কাঁদে, অভুক্ত একবস্ত্রা বামা তেমনি করুণ চীৎকারে একটিবার হরিপ্রসাদকে কোলে লইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল,—কিন্তু বাড়ীর কেহই তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। সুরেশ তখন বাহিরের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া হরিপ্রসাদকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল! হায়—নরাধম !!

৭

ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। মিত্র-গৃহে প্রতিক্ষণে পদে পদে বামার অভাব অনুভূত হইলেও—কেহ আর তার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না। কেবল ক্ষুদ্র শিশু-হরিপ্রসাদ দিন রাত সকলের কাছে শতবার বামা-পিসির কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহার কোমল শৈশব-হৃদয়ে স্নেহের যে অঙ্কুরটি দেখা দিয়াছিল, ছয় মাসের অদর্শনে তাহা বরং পুষ্ট হইয়াই উঠিয়াছিল।

কলিকাতার উত্তরভাগে—কম্বুলেটোলায় একটা বস্তিতে একখানি ছোট খোলার বাড়ী ভাড়া লইয়া বামার ভাই আপনার জাতিব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। সংসারে তার আপনার বলিতে এক বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না,—মা ইতিপূর্ব্বেই গত হইয়াছিল, সুতরাং সে পরম যত্নে বামাকে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া সংসার গুছাইতেছিল। বামার ইচ্ছা ছিল, একটু গুছাইয়া উঠিতে পারিলেই ভাইয়ের বিবাহ দিবে।

এই ছয়মাসে বামার অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার উদ্দাম, প্রফুল্ল যৌবন-শ্রীতে নৈরাশ্যের অবসাদ একটা প্রগাঢ় কলিমা ও মলিনতা মাখাইয়া দিয়াছিল। এই ছয়মাসেই তাহার বয়স যেন দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। গম্ভীর মেঘখানির মত আপন হৃদয়ের গুরুভার বক্ষে চাপিয়া সে ভাইয়ের সংসারের কাজ কর্ম্মগুলি করিয়া যাইত, কিন্তু প্রাণের ভিতরে অহর্নিশি যে মহাপ্লাবনের ক্ষিপ্ত বারিরাশি গর্জ্জন করিতে ছিল, তার বিন্দুসির্গও বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। কেবল হরিপ্রসাদের কথা মনে পড়িলে অভাগিনী আর সাম্‌লাইতে পারিত না—পীড়ার ভাণ করিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত।

এইরূপে মনের ভিতর পুড়িয়া পুড়িয়া বামাকে কঠিন ক্ষয় রোগে ধরিয়াছিল, তাহাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাকুক বরং সন্তুষ্টই হইয়া বামা আশাপূর্ণ হৃদয়ে শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিল—ভাইকে কিছুই জানিতে দেয় নাই।

সে বৎসর দারুণ শীতে বামা শয্যা লইল—আর উঠিবার বা খাটিবার শক্তি রহিল না। ভাই চিকিৎসার চেষ্টা করিলে বামা আগ্রহের সহিত তাহাকে নিরস্ত করিল এবং শীতের দিন কয়টা কাটিয়া গেলে আপনিই সারিয়া যাইবে—জানাইল। কিন্তু হায়—সে শয্যা আর তাহাকে ছাড়িতে হইল না।

কয়দিনের ঠাণ্ডায় বামার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। সরা সরা রক্ত

উঠিতেছিল, বক্ষপঞ্জরে বিষম বেদনা অনুভূত হইতেছিল, মুখের চেহারা বদ্‌লাইতেছিল। বামা বুঝিল, দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। এতদিন সে অতিকষ্টে ভাইয়ের কাছে পীড়া গোপন করিয়া আসিতেছিল—কিন্তু আর পারিল না। তার যেটুকু শারীরিক বল অবশিষ্ট ছিল, তাও লুপ্ত হইয়াছিল—সেদিন শেষ রাত্রি হইতে বিষম শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইল।

দেখিয়া শুনিয়া ভাই একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, বুঝিল ভগিনীর অন্তিম দশা উপস্থিত। অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"দিদি ব্যায়রাম লুকিয়ে রেখে এমন বাড়িয়ে ফেল্লে, এখন যে আর উপায় নাই, একদিনের জন্যও কি আমাকে জানাতে নেই—এখন আমি কি কর্‌বো, আর আমার কে আছে ?"

বামা ধীরে ধীরে আপনার হাত দুখানি উর্দ্ধদিকে তুলিয়া দেখাইল, তারপর ভাইকে আরও কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ভাই সরিয়া আসিলে অতি নীম্ন মৃদুস্বরে কি বলিল। হঠাৎ ভায়ের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল—ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু মহাপথের যাত্রী ভগিনীর মুখপানে চাহিয়া সে তাহা সম্বরণ করিল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। বহুক্ষণ পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোলে হরিপ্রসাদ "বামা-পিসি" "বামা-পিসি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘরে ঢুকিয়াই হরিপ্রাসাদ হঠাৎ চুপ করিল, সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই বামার স্নেহার্দ্র চক্ষুদুটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে মহা উল্লাসে কোল হইতে নামিল এবং "বামা-পিসি" বলিয়া বেগে গিয়া বামার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বামার ভাই কহিল,—"হরি বাইরের দেউড়ীতে একলা বসে খেল্‌ছিল, তোমার নাম শুনেই ছুটে এসে আমার কোলে উঠ্‌লো—কাউকে বলে আস্‌তে পারিনি, বল্লে বোধ হয় আস্‌তে দিত না।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে হরিপ্রসাদকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার জন্য বামার ভাই লইতে গেল, কিন্তু শিশু আকুল হইয়া "বামা-পিসিকে" জড়াইয়া ধরিল—সে কিছুতেই যাইবে না। বামা অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু সে কোন কথাই কাণে তুলিল না, বরং অধিকতর আগ্রহে তাহাকে জড়াইয়া

রহিল। কাজেই বামা ভ্রাতাকে কহিল,—"তুমি গিয়ে বাড়ীতে বলে এস, হরি ঘুমুলে দিয়ে আস্‌বে।"

"আমি কখ্‌খনো ঘুমুব না যাব না—যাব না।" মধুর হাসিতে লহর তুলিয়া শিশু বামাকে একটি ক্ষুদ্র কিল মারিল। বামার মৃত্যুচ্ছায়ারঞ্জিত শুষ্ক মুখখানি ত্রিদিবের পূত, বিমল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর হইতেই বামার অবস্থা ক্রমে অধিকতর খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। সংসারে দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না, তার ভাই আকুল হইয়া বন্ধুবান্ধবের কাছে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। সেই বিপদের মধ্যে সে আর সুরেশের বাড়ী গিয়া খবর দিতে অথবা ঘুমন্ত শিশুকে দিয়া আসিতে অবসর পাইল না।

(৮)

এদিকে সুরেশের বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল—শিশু চুরী গিয়াছে, গায়ে এক গা গহনা—কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই! সুরেশ দুপুর রাত পর্য্যন্ত চারিদিকে খোঁজ করিয়া কোথাও সন্ধান না পাইয়া অবশেষে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় থানায় খবর দিয়া আসিল।

ভোর হইতে না হইতে আবার চারিদিকে লোকজন ছুটিল। সকাল বেলা একটী লোক ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—একজন লোক কাল বেলা দু'টার সময় কম্বুলেটোলার গোপাল কামারের কোলে হরিপ্রসাদকে দেখিয়াছে।

সুরেশের বুকের ভিতর হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল,—কি আশ্চর্য্য, তাহার মনে এ সন্দেহ একবারও জাগে নাই? এ তবে নিশ্চয়ই বামা আর তার ভাইয়ের কায! প্রলয়ের ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে সে থানায় ছুটিল।

ভোরের বেলা বামা বেশ সুস্থবোধ করিল। পাশে শুইয়া হরিপ্রসাদ "বামা-পিসিকে" জড়াইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল, বামা তার ঘুমন্ত মুখখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু দুই চক্ষে যে উষ্ণ প্রস্রবণ ছুটিতেছিল, তাহা কিছুতেই রোধ করিতে পারে নাই।

অবিলম্বেই তাহার অবস্থান্তর ঘটিল, সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভাই কাছেই ঝিমাইতেছিল—ভগিনীর চীৎকারে উঠিয়া পড়িল। বামা তাহাকে ইঙ্গিত করিল, সে তাড়াতাড়ি হরিপ্রসাদকে তুলিয়া লইতেই ঘুমন্ত শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বামার তখন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল—আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল সজল নয়নে শিশুর পানে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ বাহিরে কোলাহল শুনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বহির্দ্বারে ঘন ঘন ধাক্কা পড়িতে লাগিল। রোরুদ্যমান হরিপ্রসাদকে কোলে লইয়াই বামার ভাই তাড়াতাড়ি গিয়া সদর খুলিয়া দিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই "দিদি গো" বলিয়া সভয় চীৎকারে ঘরের ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

বামা অতিকষ্টে একবার অর্দ্ধনীমিলিত চক্ষু খুলিয়া দেখিল। কতকগুলি পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহার ভাইকে বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে কম্পিত কলেবরে রক্তনেত্রে দাঁড়াইয়া সুরেশচন্দ্র হুকুম দিতেছিল।

তখন বামার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল, নাভিশ্বাস উপস্থিত! একবার অন্তিম চেষ্টায় সুরেশচন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়াই—চক্ষু মুদ্রিত করিল। অন্তিম নিঃশ্বাসের সহিত কফ জড়িত কণ্ঠে একটি মাত্র অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল—"হ—রি।" কি জানি কেন সে সময় সুরেশের চক্ষেও জল আসিল, তিনি হরিপ্রসাদ ও পাহারাওয়ালাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ঘরের লক্ষ্মী

(লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল)

(১)

হরিচরণ প্রত্যূষে উঠিয়া তামাকটী সাজিয়া সবেমাত্র টানিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় পাঁড়েজী আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবুজি আপকো বোলাতা হায়।"

সহসা এই শুভ সংবাদটায় হরিচরণের হাতের হুকাটা হাতেই রহিল, তিনি তাঁহার ওয়াড় শূন্য মলিন তাকিয়াটায় ঠেস দিয়া বসিলেন। তাঁহার

মনে হইল উষারাণী যেন সহসা লজ্জায় নববধূর ন্যায় জড়সড় হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া এক বিরাট আঁধার আনিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিল। পাখীর প্রভাত-কাকলী তাঁহার কর্ণে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ পাঁড়েজীর মুখের দিকে চাহিয়া একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"পাঁড়েজী, কি বল্লে,— দুর্ল্লভ বাবু আমাকে ডাকছেন ?"

পাঁড়েজী তাহার মাথাটা বার দুই দুলাইয়া বলিল,—"হাঁ হুজুর; বাবুতো আপকো আভি বোলাতেহে।"

হরিচরণ সেই ভাবেই বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পাঁড়েজী চলিয়া গেল। হরিচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন,— হুকাটা টানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গুর্খা সেনার দুই পার্শ্বে খুকরী চালাইয়া দলিত পেষিত করিয়া আক্রান্তের কেল্লা জয়ের মত দুশ্চিন্তারাশি মার মার শব্দে এমনি ভাবে তাঁহার মগজ দখল করিয়া বসিল যে, তাঁহাকে আর হুকা টানিতে হইল না; তিনি হুকাটা দরজার এক পার্শ্বে রাখিয়া একেবারে চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

দুর্ল্লভ মিত্র তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধের পর সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এই এক বৎসর কাল বিদেশে বিদেশে ঘুরিতে ছিলেন, কেবল এক সপ্তাহমাত্র কলি-কাতায় ফিরিয়াছেন। সহসা প্রত্যুষে তাঁহার তলব পাইয়া হরিচরণের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। আজ ছয় বৎসর তাঁহার নিকট বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে,এ পর্য্যন্ত ছয় পয়সাও তিনি সুদ দিতে পারেন নাই। তিনি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, যেন ভীটাছাড়া হইয়া কন্যা দুইটীর হস্ত ধরিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। তাহার ভিতরের অন্তরাত্মাটা যেন একটা বিকট অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। তাঁহার এক পয়সাও নাই; তিনি কেমন করিয়া দুর্ল্লভ মিত্রের ঋণ পরিশোধ করিবেন,—আর সেই বা কত দিন এরূপ ভাবে তাহার টাকা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে! দুর্ল্লভ মিত্রের তলব পাইয়া অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতেও হরিচরণের সাহস হইল না, তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন; মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলে!"

স্পন্দিত হৃদয়ে হরিচরণ দুর্ল্লভ মিত্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুর্ল্লভ মিত্র তখন তাঁহার সরকারকে কেন চারি পয়সা সুদ ছাড়িয়া দেওয়া

হইল তাহারই জন্য মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ছিলেন ; আর সরকার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে জড়িত কণ্ঠে অতি মৃদুস্বরে বলিতেছিল,— "আজ্ঞে একেবারে সব টাকাটা চুকিয়ে দিলে—"

দুর্লভ মিত্র গর্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"দশহাত মাটী খুড়্‌লে জল পাওয়া যায়, টাকা পাওয়া যায় না—বুঝ্‌লে। চার পয়সা! চার পয়সা আসে কোথা থেকে ?"

সেই সময় হরিচরণকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুর্লভ মিত্র একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিতে বলিলেন, তাহার পর আবার তেজারতী কারবারের খাতা পত্র দেখিতে লাগিলেন। দুর্লভ মিত্রের গম্ভীর ভাব ও তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া হরিচরণের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল; সরকারের পরই তাঁহার পালা, এই কথা ভাবিয়া তিনি ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। প্রলয় সাগরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলে মানুষের অবস্থা যেরূপ হয়, মৃত্যুর দিন জানিতে পারিলে জীবিতের অবস্থা যেরূপ হয়, আজ হরিচরণের অবস্থাটা কতকটা সেইরূপ। তিনি ধীরে ধীরে যাইয়া ফরাসের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, সহসা খাতা পত্র বন্ধ করিয়া দুর্লভ মিত্র, হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দেখ বাপু, আমার স্ত্রীর শেষ ইচ্ছাটা আর অসম্পূর্ণ রাখবো না, তোমার মেয়ের সঙ্গেই আমার বড় ছেলের বিয়ে দেব। যদিও এতে আমার সম্পূর্ণই লোকসান; তুমি তোমার মেয়ের বিয়েতে যা লাখ পঞ্চাস খরজ কর্ব্বে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে, কিন্তু কি করবো, তার আর চারা নেই—কিছু লোকসান হবে তা বলে আর কচ্ছি কি! আসছে রোববার সন্ধ্যার পর আমি তোমার মেয়েকে দেখতে যাব। ছেলে বেলায় যদিও তাকে দুই একবার দেখেছি, কিন্তু সে দেখা তো আর দেখা নয়—রীতি যা তা কর্ত্তেই হবে; তারপর একটা ভাল দিন দেখে যত শীঘ্র হয় দুই হাত এক করে দেব।"

হরিচরণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দুর্লভ মিত্রের কথাগুলা যেন গিলিতে ছিলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন? কোথায় বাড়ী ক্রোকের পরওয়ানা, আর কোথায় ধনকুবের দুর্ল্লভ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ! তিনি কেবল মাত্র বলিলেন,—"আজ্ঞে

আপনারই দয়ায় বেঁচে আছি। শোভা আপনার পুত্রবধূ হবে এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হতে পারে ?"

দুর্লভ মিত্র অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"হুঁ! এখন তা হ'লে যেতে পারো, আমার ঢের কাজ। রবিবার সন্ধ্যার পরই যাবো।"

দুর্লভ মিত্র অধিক কথার লোক ছিলেন না, কাজের কথা ভিন্ন বাজে কথা বড় একটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। কেহ কখনও তাঁহার সম্মুখে বাজে কথা কহিতেও সাহস করিত না। হরিচরণ তাহা বিশেষ ভাবেই জানিতেন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে একটী নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে দুর্লভ মিত্রের বৈঠকখানা পরিত্যাগ করিলেন।

(২)

দুইখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া হরিচরণের ক্ষুদ্র বাড়ীখানা ঐশ্বর্য্যের ধমকে একেবারেই খাটো হইয়া গিয়াছিল। একদিকে দুর্লভ মিত্রের প্রকাণ্ড সাদা সৌধখানা ক্রমেই আশে পাশে উর্দ্ধে বেপেটান ভাবে বাড়িয়া আকাশ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছিল; অন্যদিকে অঘোর বোসের লাল পয়েন্টিং করা অট্টালিকাখানি নানা ভাবে সজ্জিত হইয়া ঠিক যেন একখানি ছবিতে পরিণত হইয়াছিল। এ অবস্থায় হরিচরণের জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীখানি যে এত দিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, ইহাতেই সে গর্ব্বে আপনা হইতেই ফাটিয়া উঠিয়াছিল। সুখে দুঃখে বড় লোকের ছায়ায় থাকিয়া হরিচরণের দিনগুলি একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সহসা বিধাতার বক্র দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। প্রায় এক বৎসর কাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া ডাক্তারী চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন, জল ভ্রমণ প্রভৃতিতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, দুইটী শিশু কন্যার ভার চাপাইয়া হরিচরণের পত্নী হরিচরণের কোলে মাথা রাখিয়া চির দিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, হরিচরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পত্নীর চিকিৎসায় যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাত গেলই, অধিকন্তু বাড়ীখানি পর্য্যন্ত দুর্লভ মিত্রের নিকট বন্ধক পড়িল। ভরসার মধ্যে চাকুরীর সম্বল মাসিক পঞ্চাশটী টাকা বেতন। তাহাতে কিরূপে কি হইবে, কি করিয়া সংসার চলিবে, কেমন করিয়া শিশু কন্যা দুইটীকে জীবিত রাখিবে, এইরূপ শত সহস্র চিন্তা আসিয়া এরূপ ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, যে, তিনি পত্নীর জন্য একটু শোক করিবারও অবসর পাইলেন না। মাতৃহারা কন্যা দুইটীর করুণ

ক্রন্দনে তাঁহার বক্ষপঞ্জর কে যেন সবলে নাড়িয়া দিল,—তিনি আগ্রহে তাহাদের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, হরিচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভা এক্ষণে বার বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই ছয় বৎসর কত বিপদাপদের ভিতর দিয়া হরিচরণ তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকুতে ঘিরিয়া বহু কষ্টে কন্যা দুইটীকে জীবিত রাখিয়াছেন। বার বৎসরের শোভা ও আট বৎসরের প্রভা এক্ষণে শোভা ও প্রভারূপে তাঁহার জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আলোকিত করিতেছে। তাঁহার সমস্ত দুঃখ যাতনায় এই কন্যা দুইটীই এক্ষণে শান্তির প্রলেপ হইয়াছে। এই মাতৃহারা কন্যা দুইটীর এমনি একটা আকর্ষণি শক্তি ছিল যে, যে তাহাদের দেখিত, সেই তাহাদের ভালবাসিত, যত্ন করিত, অপরিসীম স্নেহে ডুবাইয়া দিত। আনন্দে হরিচরণের চক্ষে জল আসিত।

সে দিন রবিবার, আফিস বন্ধ। আহারের পর হরিচরণ তাঁহার জরাজীর্ণ বাটীর ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় তক্তপোষখানির উপর আড় হইয়া পড়িয়া একটু তন্দ্রা দিতেছিলেন সহসা বিশ্বনাথের, "ভায়া ওঠো বেলা যে যায়" শব্দে তিনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন,—"বোস বিশ্বনাথ, হঠাৎ একটু তন্দ্রা এসেছিল।"

এই বিশ্বনাথটী হরিচরণের বাল্যবন্ধু। সংসারতরঙ্গে পড়িয়া অনেক বন্ধুই ভাসিয়া গিয়াছে,—অনেকে পৃথিবী হইতেই একেবারে অবসর গ্রহণ করিয়াছে;—যাহারা আছে তাহারা নিজের ঝঞ্জাট লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, কে কাহার সংবাদ লয়, কিন্তু বিশ্বনাথ প্রত্যহ অন্ততঃ একাবারও হরিচরণের বাড়ী আসিত,—দুই বন্ধুতে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা কহিয়া কতকটা যন্ত্রণার লাঘব করিত। বিশ্বনাথ সংসারসমুদ্রে অনেক হাবুডুবু খাইয়াছে,—অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছে। উপর্য্যুপরি তরঙ্গের পর তরঙ্গের ধাক্কা খাইয়া খাইয়া শেষে সে একেবারে চড়ায় আসিয়া উঠিয়াছে,—আর কোন চিন্তা নাই,—আর কোন দুর্ভাবনা নাই,—আর তাহার চিন্তাকাশে কালমেঘ ঘনাইয়া আসে না, এক্ষণে তাহা অরুণরাগ রেখার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বিরাট পৃথিবীতে থাকিবার মধ্যে ছিল তাহার এই বাল্যবন্ধু হরিচরণ, আর চির প্রিয় তামাক। এই দুইটী জিনিষের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও একটী না হইলে বিশ্বনাথের চলিত না। বলিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভায়া আজ না তোমার মেয়ে দেখ্‌তে আসবে? আর তুমি দিব্বি নিদ্রা দিচ্ছ?"

বহুদিন পরে হরিচরণ আজ মহা শান্তিতে বিভোর হইয়া নিদ্রায় শত সহস্র সুখ স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। বিশ্বনাথের কথায় তাঁহার খেয়াল হইল। সত্যই যে আজ সন্ধ্যার পর শোভাকে দেখিতে আসিবে। কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবেন, সেই চিন্তাই হরিচরণের প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,—বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই প্রজাপতির দুই পক্ষ নড়িয়া উঠিয়াছে। আজ দুর্লভ মিত্র তাঁহার ক্ষুদ্র বাড়ীতে পদার্পণ করিবে,—শোভা দুর্লভ মিত্রের পুত্রবধূ হইবে,—হীরা জহরতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যাইবে। ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে থাকিয়া মা আমার ঐশ্বর্য্যের রাণী হইবে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই হরিচরণের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—তন্দ্রায়ও তিনি তাহারই সুখ-স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন,—সহসা বিশ্বনাথের ডাকে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গৃহের এক কোণে বসিয়া কয়েকটী মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাঁড়ী কড়া লইয়া প্রভা একটী ক্ষুদ্র খেলা ঘর পাতিয়া আপন মনে কত কি রাঁধিতেছিল। হরিচরণ কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যাতো মা প্রভা তোর দিদিকে ডেকে আন্‌তো।"

অষ্টমবর্ষীয়া প্রভা গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি যে ভাত চাপিয়েছি বাবা,—উনুনে যে আঁচ, কেমন করে ফেলে যাবো,—এখনি সব পুড়ে যাবে।"

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বেটি বেজায় গিন্নী হয়েছে।"

হরিচরণ বলিলেন,—"যা মা ততক্ষণ তোর বিশ্বনাথ খুড়ো ভাত দেখ্‌বে এখন।"

"দেখ যেন পুড়ে যায় না,"—বলিয়া প্রভা ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল, বিশ্বনাথ বলিল,—"ভায়া এক ছিলেম তামাক চড়াও।"

তক্তপোষের নিম্নে কয়েকটী কলিকাতে তামাক সাজা ছিল,—হরিচরণ তাহারই একটী আনিয়া বিশ্বনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"ধরাও।"

বিশ্বনাথ কলিকায় হাওয়া দিতে দিতে বলিল,—"ভায়া ছেলেটী কি রকম বুঝ্‌ছ? মেয়ে সুখে থাক্‌বে তো?"

হরিচরণ একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ, তুমি আমাকে অবাক করেছ। দুর্লভ মিত্রের ঘরে পড়্‌ছে,—মেয়ে সুখে থাক্‌বে কি না তাই আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ! আর ছেলে কার্ত্তিক বল্‌লেই হয়,—সেতার, ইস্‌রাজ, হারমোনিয়াম এমন কি বাঁয়া তবলা পর্য্যন্ত বাজাতে পারে। তবে লেখা পড়ায় একটু খাটো,—তা বড় লোকের ছেলে মাত্রই একটু সে বিষয়ে কাঁচা হয়ে

থাকে। আর তার লেখা পড়ায় দরকারই বা কি,—টাকা গুণতে পারলেই হলো,—দুর্ল্লভ মিত্র একটী টাকার পর্ব্বত বল্লেই হয়।"

বিশ্বনাথ হুকায় কলিকা বসাইতে বসাইতে বলিল,—"ভায়া মনের সুখ তো আর টাকায় হয় না,—সে সুখে চাই প্রাণের মিল। শুন্‌তে পাই দুর্ল্লভ মিত্রের ছেলে দুটীতো একেবারে জাহজী গোরা, তেজচন্দ্রের নাতি। বিদ্যাবুদ্ধির নাম নেই, এদিকে বাহিরে চটক দেখে কে। ইয়া পাঞ্জাবি, ইয়া টেরী, ইয়া ফপ্‌চেন। তার উপর বিধবা কন্যা রত্নটীর যেরূপ মুখ মিষ্টি শুনতে পাই, তাতে আমার যেন কেমন মনে হয়।"

হরিচরণ বিশ্বনাথকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"সব কাজেই তোমার এই "কেমন মনে হয়" দেখি গোল বাঁধায়। এই কেমন মনে হয়টা ছাড়ো। বড় লোকের ছেলেরাই ফপ্‌চেন পরে,—টেরীও কাটে। সব জিনিষ তুমি তলিয়ে বোঝ না, এইটুকুই তোমার দোষ।"

তামাক তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথ একগাল ধুয়া ছাড়িয়া বলিল,— "কিন্তু তা ভায়া তুমি যাই বল,—আমার কেমন মনে—"

হরিচরণ স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন,—"আবার" কেমন মনে, "নাও রাখ তোমার কেমন মনে—"

সেই সময় প্রভা তাহার দিদির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বৈঠকখানা গৃহে আনিয়া হাজির করিল। কিশোর ও যৌবনের মধ্যে পড়িয়া শোভা শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর পুণ্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রূপের সমুদ্র যেন তাহার অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া তাহার সমস্ত অঙ্গে ছাপাইয়া পড়িতেছিল। এলোমেলো একরাশ কালচুল তাহার পৃষ্ঠের উপর গড়াইয়া পড়িয়া বায়ুভরে উড়িয় আসিয়া তাহার টুকটুকে ঢলঢলে মুখখানি ঢাকিয়া দিতেছিল। শোভা চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা,—ডাক্‌ছ কেন?"

কন্যাদ্বয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ কথা শেষ না করিয়াই নীরব হইয়া ছিলেন,—বলিলেন,—"যাতো মা, চট্ করে তোর নীহার দিদির কাছ থেকে চুলটা বেঁধে আয় তো। আজ যে তোকে দেখ্‌তে আসবে।"

প্রভা তাড়াতাড়ি বলিল,—"চ দিদি, তোকে সাজিয়ে নিয়ে আসি;—সেজে গুজে না থাক্‌লে শেষে আবার অপছন্দ কর্‌বে।"

শোভা ঠাস করিয়া তাহার ছোট বনের গণ্ডে একটী চপেটাঘাত করিয়া

ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রভা প্রথমে একবার,"দেখ না বাবা,দিদি আমায় মার্‌লে" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে দিদির অনুসরণ করিল। বিশ্বনাথ বলিল,—"ভায়া তোমার মেয়েকে আর সাজাবার দরকার হয় না। ভগবান্ নিজে হাতে ওকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। এ মেয়ে যার ঘরে পড়্‌বে তার ঘর আলো হয়ে যাবে।"

হরিচরণ গদগদকণ্ঠে কেবলমাত্র বলিলেন,—"বিশ্বনাথ, মা আমার ঘরের-লক্ষ্মী।"

(৩)

বৈকালে নীহার তাহার মাতার নিকট বসিয়া শ্বশুরালয়ের গল্প করিতেছিল ও চুল বাঁধিতেছিল। বামুন দিদি ও বাটীর ঝি নফ্‌রার মা হা করিয়া তাহাই শুনিতেছিল। নীহারের মাতা বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"জামাই বর্দ্ধমানে কবে গেল?"

নীহারের চুল বাঁধা শেষ হইয়া ছি[illegible] সে তখন একখানি ক্ষুদ্র চিরুণীর একধারে সিন্দূর লাগাইতে ছিল,সে সিন্দূর তাহার সীঁতায় অতি পরিপাটীরূপে সেই চিরুণীর সাহায্যে প্রদান করিয়া তাহার হস্তস্থিত স্বর্ণমণ্ডিত নোয়ায় একটু স্পর্শ করিল এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"এই শনিবারের আগের শনিবারে।"

মাতা পুনরায় বলিলেন,—"তোকে বর্দ্ধমানে নিয়ে যাবে না?"

নীহার মুখখানি একটু ভারি করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, আমার শাশুড়ী পাঠাবে কি না।"

নফরার মা জিজ্ঞাসা করিল,—"হাগো দিদিমণি, বর্দ্ধমান সে কোন্ দেশ, সেখানে খাবার জিনিস মেলেতো?"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সে কি এখানে—সে অনেক দূর। সেখানে খাবার জিনিষ কিছুই পাওয়া যায় না,—সেখানকার লোকেরা শুধু হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে।"

বিন্দুবাসিনী আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় শোভা তাহার চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম হস্তে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নীহার এক গাল হাসিয়া বলিল,—"এই যে শুবি, চুলের দড়িটড়ি নিয়ে হাজির, চুল বাঁধ্‌তে হবে বুঝি?"

প্রভাও তাহার দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, শোভা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,—"তুমি জান না বুঝি নীহার দিদি,—দিদির যে বে! আজ দেখ্‌তে আসবে, তাই বাবা তোমার কাছে দিদিকে চুল বাঁধ্‌তে পাঠিয়ে দিলে। খুব ভাল করে চুল বেঁধে দাও। বর যেন পছন্দ করে।"

শোভা রাগিয়া বলিল,—"তোকে আর জ্যাঠামি কর্‌তে হবে না, সব কথায় মেয়ের কথা।"

এত লোকের মধ্যে কথার সূচনাতেই ভগিনীর নিকট ধমক খাইয়া প্রভা বড়ই অপ্রস্তত হইল, তাহার চোক দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন,—তিনি এই মাতৃহারা কন্যা দুইটীকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই তাহাদের কাছে কাছে রাখিতেন। তিনি নিজে ইহাদের কখনও পর বলিয়া ভাবিতেন না বলিয়াই এই বালিকা দুইটীও তাঁহাকে মায়েরই মত দেখিত। সকলেই জানিত, ইহারা বিন্দুবাসিনীর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। ইহা ব্যতীত প্রফুল্লনাথ ইহাদের নিজের ভগিনী নীহারের অপেক্ষা কম ভাল বাসিতেন না, তাহাদের কোন আব্দারই কোন দিন তাঁহার নিকট হতাদরিত হয় নাই। মাতৃহারা হইবার পর এই বালিকা দুইটী এই বাড়ীতেই মানুষ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শোভা অপেক্ষা নীহার কেবল মাত্র দুই বৎসরের বড়, তাহাদের দুইজনের গলায় গলায় ভাব। এখন দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই নীহারের বিবাহ হইয়াছে। বিন্দুবাসিনী অতি কোমল স্বরে বলিলেন,—"প্রভা চ' আমরা এখান থেকে যাই,—চল তোর প্রফুল্ল দাদাকে খাবার দিয়ে আসি।"

বিন্দুবাসিনী প্রভাকে লইয়া পুত্রের গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন, বামুন দিদি ও নফরার মা গৃহের কাজ কর্ম্ম সারিবার জন্য নিম্নে নামিয়া গেল। মাতা প্রস্থান করিলে নীহার বলিল,—"ওমা আজ বুঝি রবিবার, মাইরি ভাই আমি একেবারেই ভুলে গেছিলুম। তা একটু সকাল সকাল আস্‌তে নেই বুঝি, মেয়ে যেন কেমন!"

নীহার তাড়াতাড়ী উঠিয়া তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স নামাইল ও শোভাকে টানিয়া সম্মুখে বসাইয়া তাহার চুল খুলিতে আরম্ভ করিল। চুল খোলা শেষ হইলে, সে তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স খুলিল। বাক্সটীতে যে কি নাই তাহা বলা কঠিন. পাউডার, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, চিরুণী, ফিতা, কাঁটা, জরি,

পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। চুল বাঁধিবার যাহা কিছু আবশ্যক তাহারই সরঞ্জামে বাক্সটী পরিপূর্ণ। এই বাক্সটী বিবাহের সময় তাহার দাদা তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। নীহার বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পুত্রবধূ হইয়াছে; বেশ ভূষা সাজ সজ্জার কোন সামগ্রীই তাহার অভাব ছিল না। সম্প্রতি তাহার স্বামী ডিপুটী হইয়া বর্দ্ধমানে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বস্তু ছিল, তাহার দেবতার ন্যায় সহোদর প্রফুল্লনাথ। সরল উদার দাদার এত অসীম স্নেহ নীহার পাইয়াছিল, যাহা সত্যই সংসারে বিরল,—হিংসার সামগ্রী।

সে আজ বহুদিনের কথা, বিন্দুবাসিনী একটী পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া বিধবা হইয়া ছিলেন। বিন্দুবাসিনীর স্বামী অঘোরবাবু কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে মুচ্ছদ্দীর কার্য্য করিয়া পিতৃধন ব্যতীত বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক প্রফুল্লনাথ। প্রফুল্লনাথ লোকটী বড় সৌখীন। নানাবিধ সৌখীন আসবাব ও গৃহ সজ্জাদির দ্বারা সে তাহার বাড়ীখানি ঠিক একখানি ছবিতে পরিণত করিয়াছিল। ঘর-গুলি মারবেল মণ্ডিত, প্রাচীর গাত্রে উচ্চদরের পেণ্টিং করা, প্রতি গৃহেই বড় বড় আয়না, বৈদ্যুতিক ঝাড়। প্রফুল্লনাথের বয়স এক্ষণে দ্বাবিংশতির অধিক নহে, সবেমাত্র গোপের অল্প অল্প রেখা দিয়াছে। ভগবান্ প্রফুল্লনাথকে অনেক বস্তুই দিয়াছিলেন,—যাহা অনেকের ভাগ্যেই কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে। রূপ, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ঐশ্বর্য্য তাহার কোনটারই অভাব ছিল না। বেশ ভূষার প্রতি প্রফুল্লনাথের আদৌ লক্ষ্য ছিল না, এক জোড়া চটি ও একটা ঢলঢলে পাঞ্জাবীই তাহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত।

একঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমে দুই জনেই ঘর্ম্মাক্ত হইবার পর চুল বাঁধা শেষ হইল। চুল বাঁধা শেষ করিয়া নীহার শোভাকে একবারে টানিয়া লইয়া নিম্নে চৌবাচ্চার নিকট হাজির করিল। শোভা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে তাহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তাহার পর, সে তাহাকে কলতলায় ফেলিয়া সাবান ও খসড়ায় মাজিয়া ঘসিয়া তাহার গোলাপী রং একেবারে লাল করিয়া দিল। গা ধোয়া শেষ হইলে শোভা সেই ভিজা কাপড়েই বাড়ী যাইতে ছিল, কিন্তু নীহার ছাড়িল না বলিল,—"তা বই কি, এখন ওপরে চল, একেবারে কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে দিই।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়বো।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ও দেখিস্, বরের নামে যে আর তর সইছে না।"

ইহার উপর আর কথা নাই, কাজেই নীরবে নীহারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবার শোভাকে উপরে উঠিতে হইল। নীহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার একখানি রেশমের বাসন্তী রংয়ের কাপড় বাহির করিল, সেই রংএর একটী জ্যাকেটও বাহির হইল। সেই কাপড় ও জ্যাকেটটী শোভাকে পরাইয়া দিয়া আচলটী কোঁচাইয়া স্কন্ধের নিম্নে একটী সেপ্‌টীপিন দিয়া আটিয়া দিল। তাহার পর তাহার গহনাগুলি একে একে খুলিয়া শোভাকে পরাইয়া দিতে গেল। মনে মনে বিশেষ আপত্তি থাকিলেও এতক্ষণ শোভা বহুকষ্টে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে বলিল,—"না ভাই আমি গয়না পর্‌বো না।"

নীহার কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিল,—"নিজের বিয়েতে নিজে আর কেউ গিন্নিপনা করে না, যা লোকে বলে তাই শুন্‌তে হয়।"

শোভা যদিও নানারূপ আপত্তি করিল, কিন্তু তাহার কোন আপত্তিই টিকিল না, নীহার জোর করিয়া তাহার গহনাগুলি তাহাকে পরাইয়া দিল। তখন জগৎ রক্তিম বসনে ভূষিত হইয়া গোধূলির আহ্বান সঙ্গীত গাহিতে ছিল, গবাক্ষের ভিতর দিয়া সেই রক্তিম বসনের প্রতিবিম্ব গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত গৃহ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অপরূপ আলোর সেই অপরূপ সজ্জায় শোভাকে ঠিক যেন একখানি জীবন্ত সরস্বতী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল। সাজ শেষ হইলে শোভা বলিল,—"হয়েছেতো ? আমি ভাই এখন তবে বাড়ী চল্লুম্।"

নীহার হাসিয়া বলিল,—"তা বই কি, আগে চল্, মাকে দাদাকে দেখাই, সাজিয়ে গুজিয়ে কেমন দেখাচ্ছে, তবে তো বাড়ী যাবি।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি এরকম ভাবে তাঁদের কাছে যেতে পার্‌বো না।"

নীহার বলিল,—"যাবে না বই কি ! মাকে প্রণাম না করে আজ বুঝি যেতে আছে ?"

এবারও শোভা পরাস্ত হইল, সত্য আজ মাকে প্রণাম না করিয়া সে কিছুতেই যাইতে পারে না। বিন্দুবাসিনী প্রফুল্লনাথের গৃহে প্রফুল্লনাথের সহিত গল্প করিতে ছিলেন,—প্রভা বিন্দুবাসিনীর কোলটীর নিকট বসিয়া

তাহাদের কথায় যোগ দিয়া অনর্গল বকিতে ছিল। সেই সময় নীহার একরূপ জোর করিয়া টানিয়া শোভাকে লইয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইল। শোভা লজ্জায় জড়সড় হইয়া দরজার এক পার্শ্বে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইল। প্রফুল্ল-নাথ একবার শোভার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যাপার কি! বিবি যে আজ একেবারে সরস্বতী প্রতীমা সেজেছে।"

প্রফুল্লনাথ শোভাকে বিবি বলিয়া ডাকিতেন। নীহার দাদার কথার উত্তরে বলিল,—"তুমি বুঝি জান না দাদা, শোভার যে বিয়ে,—আজ তাকে দেখ্‌তে আসবে।"

প্রফুল্লনাথ বলিল,—"ও হা হা শুন্‌ছিলুম বটে, আমাদের দুর্লভবাবুর সঙ্গে হবে না? তা মানাবে বেশ!"

সান্ধ্যসমীরণ-কম্পিতা বাসন্তীলতার ন্যায় শোভার সমস্ত অঙ্গ ঈষৎ টলিল, বঙ্কিম নেত্রে সে একবার প্রফুল্লনাথের দিকে তীব্রভাবে চাহিল, প্রফুল্ল নাথ সে চাহনীর অর্থ অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"বালাই ষাট্ এমন কথা বলিস্‌নি, দুর্লভ বাবুর সঙ্গে হ'তে যাবে কেন, তার বড় ছেলের সঙ্গে হবে।"

প্রভা বলিল,—"চল দিদি, তারা হয়তো এতক্ষণ এসে পড়্‌লো।"

শোভা বিন্দুবাসিনীর সম্মুখে ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিন্দুবাসিনী আদরে শোভার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন,—"বেঁচে থাক,—রাজরাণী হও।"

মাতার আশীর্ব্বাদবাণী শুনিয়া প্রফুল্লনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"মা বড় কৃপণ। বড় আশীর্ব্বাদ কল্লে।"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"এর চেয়ে আবার কি বড় আশীর্ব্বাদ আছে, তাতো বাছা জানিনে।"

প্রফুল্লনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ কি জান না মা,—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ হ'লো, মনের মত বর হক্।"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন,—"না হয় সেই আশীর্ব্বাদই করি,—"তাহার পর আবার শোভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"মনের মত বর হক, ভাগ্যিমানের বউ হও।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"মা তোমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে না, বিবির মনের মতন বরই হবে।"

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৪র্থ বর্ষ, | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পতিপ্রাণা

[লেখক—শ্রীপাঁচকড়ি দে]

(১)

জনার্দ্দন ঘোষ সদ্বংশজাত কায়স্থসন্তান, কিন্তু শৈশবে ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্ত বিরূপ হওয়ায় জনার্দ্দন মাতৃপিতৃহীন হয়েন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিল না। গ্রামের লোকে দয়া করিয়া জনার্দ্দনকে আশ্রয় দিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় বিনা মাহিনায় গুরু মহাশয় কথঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজের যত্নে জনার্দ্দন অন্ততঃ হিসাবপত্রে সুদক্ষ হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, বাল্যকালটা এইরূপে কাটাইয়া কোন রকমে দুই চারি টাকা সংগ্রহ করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় জনার্দ্দন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলেঘাটায় বাসা লইয়া ফেরি আরম্ভ করিলেন। রাত্রে বরফ, দিনে কমলানেবু, সময়ে আম ফেরি করিয়া ক্রমে দুই দশ টাকা জমাইতে সক্ষম হইলেন, অর্থ উপার্জ্জনই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই তিনি প্রত্যহ দুই এক আনায় প্রাণ ধারণ করিয়া সমস্তই জমাইতে লাগিলেন।

বাল্যকালে ভাগ্যলক্ষ্মী জনার্দ্দনের উপর যেরূপ বিমুখ ছিলেন, এখন তিনি তাহার উপর সেইরূপই সদয় হইলেন। জনার্দ্দন ফিরি পরিত্যাগ করিয়া বেলেঘাটার এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্র চামড়ার কারখানা খুলিলেন।

দিন দিন জনার্দ্দনের কারবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে জনার্দ্দনের কারখানা এক বিস্তৃত ব্যাপারে পরিণত হইল। শত শত লোক কারখানায় কাজ করিতে লাগিল। ক্রমে জনার্দ্দন লক্ষপতি হইয়া উঠিলেন। কারখানার নিকটেই এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কারখানার নিকটে তাঁহার লোকজনের বাসের জন্য আর একটা বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। যখন ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন, তখন এইরূপই সর্ব্বত্র ঘটে!

এইরূপে তাহার চল্লিশ বৎসরের উপর বয়স হইল। অর্থ বৃদ্ধি করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। দিবারাত্রিই তিনি কারখানায় থাকিতেন: যে চামড়ার দুর্গন্ধে লোকের হৃৎকারোদ্গম হইত, তাহার নিকটে সেই দুর্গন্ধ যেন তাঁহার পরিপাক শক্তির সহায়তা করিত।

তিনি এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাবতঃই ভদ্র সমাজে মিশিয়া তাঁহার মানসম্ভ্রম লাভের ইচ্ছা হইল। তিনি কায়স্থ ভদ্র সন্তান বটে, কিন্তু তিনি ফেরিওয়ালা ছিলেন, এক্ষণে তিনি চামড়ার ব্যবসায় করেন, লক্ষপতি হইলেও লোকে তাঁহাকে "মুচে জনার্দ্দন" ব্যতীত আর কিছুই বলে না।

এ পর্য্যন্ত বিবাহের কথা তাঁহার এক দিনও মনে হয় নাই। এখন বিবাহ করিয়া ভদ্র সমাজে মিশিয়া সুখসম্ভোগের ইচ্ছা হইল। স্বভাবতঃ যাহা সকলের হয়।

কিন্তু তিনি জানিতেন, টাকায় সব হয় সত্য,—তবে ভদ্র সমাজে মেশা সহজে হয় না। তাঁহার বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি একেবারে বৃদ্ধ হন নাই, এবং নিতান্ত কুরূপও নহেন। কোন দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। তবে তাঁহার সে ইচ্ছা নাই।

কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ঘরে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, মেয়ে সুন্দরীও কিছু বড় হওয়া চাই; তাহার পর যে যেরূপই হউক না, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। জনার্দ্দন ব্যবসায়ই বুঝিতেন, ভালবাসা ভাল বুঝিতেন না, সুতরাং নিজের বিবাহটাও ব্যবসায়ের হিসাবে বুঝিয়াছিলেন। দ্রব্য ভাল হইলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; ইহাতে অর্থব্যয়ে তিনি কুণ্ঠিত নহেন।

(২)

ক্রমে জনার্দ্দন নিজের বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তাঁহার কারখানার লোক ও তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যে দুই দশজন লোকের দেখা হইত, এতদ্ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না। তিনি মনে মনে জানিতেন যে, তাঁহার টাকা হইলে কি হইবে, চামড়ার ব্যবসায়ই তাঁহার ভদ্র-সমাজে মিশিবার নিদারুণ অন্তরায় হইয়াছে। সুতরাং সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিতে হইলে প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার কারখানা হইতে কিছু দূরে থাকিতে হইবে। এখন কারবারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার কারবার পূর্ব্বের ন্যায় না দেখিলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

এই সকল স্থির করিয়া জনার্দ্দন শ্যাম-বাজারে এক বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহাতে আসিয়া মহা সমারোহে বাস করিতে লাগিলেন। আহারাদির পর প্রত্যহ কারখানায় যাইতেন, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিতেন। সহসা মৎস্যকে জল হইতে তুলিয়া ডাঙ্গায় ছাড়িয়া দিলে, তাহার যে অবস্থা হয়, জনার্দ্দনেরও কারখানা ত্যাগ করিয়া সেইরূপ অবস্থা হইল। বড়লোকের মত থাকা তাঁহার কোন কালে অভ্যাস ছিল না, এইরূপে থাকিতে তাঁহার ঘোরতর কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি নীরবে এ কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন।

এত করিয়াও কিন্তু তাঁহার সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহেরও কোন সুবিধা হইল না।

ননীলাল নামে একটী বড়লোকের ছেলের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ননীলাল বাবুগিরিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সময়ে সময়ে জনার্দ্দনের শরণাপন্ন হইতেন। জনার্দ্দনও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ঋণ দিয়া উপকার করিতেন। জনার্দ্দন জানিতেন, কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত ইঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় আছে। এ অবস্থায় ননীলাল তাঁহার সহায় হইতে পারিবে স্থির করিয়া জনার্দ্দন তাঁহাকে একদা নিমন্ত্রণ করিলেন।

ননীলাল আসিলে আহারাদির পর জনার্দ্দন বলিলেন,—"ননীবাবু, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।"

ননীলাল নয়ন মুদিত করিয়া ধূম পান করিতে ছিলেন, চক্ষু অর্দ্ধ উন্মিলিত করিয়া বলিলেন,—"ভালই ত, সুখবর! কনে কে?"

জনার্দ্দন গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“এখনও তাহা জানি না।”

ননীলাল এবার চক্ষুর্দ্বয় সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত করিয়া বলিলেন,—“সে কি? কনে স্থির হয় নাই—বিবাহ! খুব নূতন রকম!”

জনার্দ্দন বলিলেন,—“না ননীবাবু, নূতন রকম নয়, কনে তোমায় স্থির করিতে হইবে।”

ননীলাল বিস্মিত স্বরে বলিলেন,—“আমাকে!”

“হাঁ—তোমাকে।”

“সুখের কথা, সর্ব্বদাই তোমার কাজ করিতে সুখ বোধ করি, তবে—তবে—”

“তবে কি!”

“তবে—তবে—তেমন কনে কই মনে পড়িতেছে না।”

“তোমার সঙ্গে কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের আলাপ-পরিচয় আছে।

“সেটা মিথ্যা নয়।”

“আমি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে চাই—খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের, বুঝেছ!”

“বুঝিতেছি।”

“খুব সুন্দরী ও বয়স্থা হওয়া চাই।”

“তাহাও বুঝিলাম।”

“ননীবাবু, আমি সময় সময় তোমার কিছু না কিছু উপকার করিয়াছি, বোধ হয়, তাহা ভুলিয়া যাও নাই। এবার তোমার পালা।”

“আমি অকৃতজ্ঞ নই।”

“একটা কথা তোমাকে আমার মনে করিয়া দেওয়া ভাল। তোমার খতগুলার আর সময় নাই, টাকাটা দিলে ভাল হয় না?”

“আর দিন কত সময় না দিলে—”

“আর সময় দিতে পারি না, তবে একটা বন্দোবস্ত হইতে পারে।”

ননীলাল সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—“কি—কি?”

“আমি যেরূপ ঘরের কথা বলিলাম, সেইরূপ ঘরের একটি পাত্রী আমাকে জোগাড় করিয়া দাও, তা'হলে আমার বিবাহের দিন তোমার সমস্ত খত তোমার সম্মুখে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব।”

ননীলাল মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,—“প্রাণপণে চেষ্টা করিব।”

(৩)

ননীবাবু যেরূপ আনন্দে ও সোৎসাহে জনার্দ্দনের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিয়াছিলেন, সেরূপ সোৎসাহে তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, এ কার্য্য না করিতে পারিলে জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি দয়া মায়া করিবে না, তাহার নামে নালিশ করিবে—তাহাকে মারা যাইতে হইবে। অথচ এ কাজ কেবল দুরূহ নহে, অসম্ভব। কোন্ সম্ভ্রান্ত লোক মুচে জনার্দ্দনের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে? তিনিই বা কোন্ সাহসে এ প্রস্তাব করিবেন?

দেড় মাস কাটিয়া গেল! ননীলালের কোন সন্ধান নাই! জনার্দ্দন নিজ বৃহৎ সিন্দুক হইতে ননীলালের খতগুলি বাহির করিয়া নিজের ক্যাস বাক্সে রাখিতেছেন—এই সময়ে সহাস্যবদনে ননীলাল তথায় আসিয়া মহা উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"জনার্দ্দনবাবু পেয়েছি।"

জনার্দ্দন মৃদুহাস্য করিয়া বন্ধুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ননীলাল বলিলেন,—"অনেক কষ্টে মিলেছে! এখন থেকে আমি ঘটকরাজ উপাধি পেতে পারি!"

"কার মেয়ে?"

"রাজকন্যা—রাজকন্যা!"

"ঠাট্টা।"

"না হে, ঠাট্টা নহে। কুমার বলেন্দ্রের নাম শুনেছ ত,—কে না শুনেছে?"

"শুনেছি।"

"তারই মেয়ে।"

"দেখ্‌তে কেমন?"

"পক্ষহীনা পরী!"

"বয়স?"

"ষোড়শী।"

"এত দিন বে হয়নি কেন?"

"সে অনেক কথা।"

"আমি জানি, কুমার বলেন্দ্রের এক পয়সাও নাই, আপদমস্তক ঋণ। তার কাছ থেকে আমার কাছে দালাল এসেছিল। তাতে আমার আপত্তি নেই।

"আমি সব ঠিক করেছি। তিনি রাজী হয়েছেন, মেয়েও রাজী।"

"কিসে জানিলে ?"

"মেয়ে বলেছে, সে বড়লোক—তাঁর মানে টাকার লোক ভিন্ন সে বে করবে না—সে যেই হউক। এ এক রকম সেই সুদূরাতীত ধনুক-ভাঙ্গা পণ আর কি।"

হিসাবী বলে বোধ হচ্ছে—ঠিক এই রকমই ত আমি চাই।"

"কবে দিন স্থির করছো ? কনে একবার দেখ্‌বে ?"

"তোমার কথায় বিশ্বাস করিলাম। যত শীঘ্র হয় দিন স্থির কর।"

তাহাই হইল। শুভ দিনে শুভক্ষণে জনার্দ্দনের সহিত কুমার বাহাদুরের কন্যা সুবালার বিবাহ হইল। মহা সমারোহে নববধূ জনার্দ্দনের গৃহে আসিলেন।

এই সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকায় আসিয়া জনার্দ্দনের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, সুবালাকে বিবাহ করিয়াও সেই অবস্থা ঘটিল। সুবালা পরম রূপবতী, সুশিক্ষিত', পিতা অর্থহীন হইলেও মহা সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, জনার্দ্দন তাহার সম্মুখে স্বামিরূপে দাঁড়াইতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর পরিচর্য্যা করিতেন। তাহার জন্য দুই হস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখে রাখাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইল।

সুবালাও তাঁহাকে যথাসাধ্য ভক্তি ও সম্মান করিত। যদিও জনার্দ্দন প্রায় তাঁহার পিত্রসুরূপ বয়স্ক, তথাপি সুবালা তাহাকে সে জন্য কখনও কোন কুণ্ঠা দেখাইত না, তবে এরূপ ভিন্নপ্রকৃতির ভিন্ন বয়সের দুই জনের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসা হওয়া একরূপ অসম্ভব।

সুবৃহৎ অট্টালিকামধ্যে, অতুল সুখৈশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসিয়া উভয়ে স্বামি-স্ত্রী হইয়াও যেন কেমন পর-পর ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কাহাকে যথার্থ চিনিতে পারিলেন না। এই সময়ে এক মহা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিল।

(৪)

সেই বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ উপস্থিত হইল। এক দিন কারখানায় জনার্দ্দন আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কারখানায় এক জন লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে, এবং অন্য সকলে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

জনার্দ্দন বহুক্ষণ এক স্থানে বসিয়া ভাবিলেন, তৎপরে উঠিয়া সত্বর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া সুবালা সত্বর উঠিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া তিনি ব্যগ্র ও ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কাছে এস না—কাছে এস না, আমার কারখানায় প্লেগ দেখা দিয়াছে, তুমি এখনই বাপের বাড়ী যাও, প্লেগ থাম্‌লে আমি নিজে গিয়ে তোমায় নিয়ে আস্‌বো।"

এই বলিয়া জনার্দ্দন তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইলেন।

সুবালা কিয়ৎক্ষণ অচল-প্রতিমার মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে জনার্দ্দনের খাস খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কিছু বলে গেছেন ?"

খানসামা সসম্ভ্রমে বলিল,—"হাঁ, তিনি দিন-কতক কারখানার বাড়ীতে থাক্‌বেন। আমায় তাঁহার কাপড়-চোপড় সেখানে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়া গিয়াছেন।"

সুবালা পালঙ্কের উপরে বহুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল।

এ দিকে জনার্দ্দন কারখানায় আসিয়া দেখিলেন, আরও তিন চারি জন প্লেগগ্রস্ত হইয়াছে। বেলেঘাটার চারিদিকে প্লেগ উগ্রমূর্ত্তিতে ক্ষিপ্ত রাক্ষসের মত মুখব্যাদন করিয়া ছুটিতেছে! সকলেই ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন ও ভীত।

জনার্দ্দন তাঁহার কারখানার সমস্ত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ—কেহ ভয় করিও না—ভয় করিলে রোগের বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইবে। কোন ভয় নাই! ভগবান্ যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে, তাহার উপর কোন কথা নাই। ভয়ে ব্যস্ত হইয়া কোন ফল নাই। দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে বাস করিতে আসিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে মরিতে হয়, মরিব—টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে মধুর স্বরে বলিল,—"আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকিব বলিয়া আসিয়াছি। আমি আমার স্বামীর পাশে থাকিব, তোমাদের সেবা শুশ্রূষা করিব। ভয় নাই—আমাদের সহায় ভগবান্!"

চমকিত ও ভীত হইয়া শুষ্কমুখে জনার্দ্দন ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সুবালা কোন্ এক মহীয়সী দেবী-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মানা।

আজ এই দম্পতীর চারি চক্ষু পরস্পর বড় পরিচিত এবং বড় স্পষ্টভাবে

মিলিত হইল, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আজই প্রথম উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিলেন।

সুবালা স্বামীর হাত ধরিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিল,—"স্ত্রীর কার্য্য স্বামীর পাশে জীবনে-মরণে থাকা। আমি এখানে আসিয়া আপনার লোক জনের শুশ্রূষা পরিচর্য্যা করিব। আমাদের সহায় ভগবান্।"

জনার্দ্দনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সময় নষ্ট করিবার অবসর ছিল না। তখন স্বামিস্ত্রীতে সেই কারখানার মধ্যে এক হাঁসপাতাল ঘর তুলিলেন। স্বামি-স্ত্রীতে দিবারাত্রি পীড়িতবর্গের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নে অনেকের প্রাণ রক্ষা পাইল, তবুও অনেকে রক্ষা পাইল না।

প্রকৃত পক্ষে সুবালাই কারখানার কর্ত্রীরূপে পরিণতা হইয়াছে। জনার্দ্দন নীরবে তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন। এই—তাহার আজ্ঞায় ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতেছেন, এই—আবার ফিরিতে না ফিরিতে তাহার আজ্ঞায় ঔষধ আনিতে যাইতেছেন।

এ দৃশ্য বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখেন নাই। পুরাণে পাঠ করিয়াছিলাম যে, সুভদ্রা দেবী কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে আহতগণকে প্রাণ দিয়া সেবা-শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা করিতেন। কিন্তু এদেশে—এই বেলেঘাটার দুর্গন্ধময় প্লেগ-উপদ্রুত চামড়ার কারখানায় বোধ হয়—এই প্রথম। সকলেই সুবালার নামে ধন্য ধন্য করিতেছিল, কিন্তু সুবালার সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে এই মহা সাধনায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে!

এক দিন রাত্রে সে নিতান্ত ক্লান্তা পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছিল। তখনও জনার্দ্দন গৃহে ফিরেন নাই! সহসা সে চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল। দেখিল নিকটে জনার্দ্দন দাঁড়াইয়া। সে তাঁহার এই মহা সাধনার ভিতরে স্বামীর পরিচর্য্যা কখনও ভুলিত না। স্বামীর তখনও আহার হয় নাই বলিয়া সে সত্বর উঠিয়া বলিল,—"খাবার আনি।"

জনার্দ্দন বলিলেন, "না—কিছু খাইবার ইচ্ছা নাই। কেবল একটু দুধ দাও।"

গৃহের এক পার্শ্বে দুগ্ধ ঢাকা ছিল। সুবালা দুগ্ধের বাটী হাতে তুলিয়া লইল। বলিল,—"গরম করিয়া আনি।"

জনার্দ্দন কোন কথা কহিলেন না। একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। সুবালা দুগ্ধের বাটী লইয়া রন্ধনগৃহের দিকে ছুটিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিল,—"তোমার কি অসুখ করেছে ?"

জনার্দ্দন বলিলেন—"না—দুধ দাও।" গরম দুধ খাইয়া জনার্দ্দন বলিলেন, "তুমি খেয়ে দেয়ে শোও—আমার একটু কাজ আছে, এখনই আসিতেছি।"

(৫)

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনার্দ্দন ফিরিলেন না। তখন সুবালা অধীরা হইয়া উঠিল। ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল,—"বাবু কোথায় ?"

ভৃত্য বলিল,—"বাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন ?"

"কোথায় গিয়াছেন ?

"কিছু বলেন নাই।"

সুবালা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিল,—"গাড়ী ডাক, আমি তাঁহার সন্ধানে যাইব।"

ভৃত্য বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। গাড়ী ডাকিতে গেল।

গাড়ী আসিলে সুবালা গাড়ীতে উঠিয়া শ্যমবাজারের বাড়ীতে আসিল দ্বারে তাঁহাদের ডাক্তারবাবু দণ্ডায়মান। তিনি বলিলেন,—"জনার্দ্দনবাবু আপনাকে কুমার বাহাদুরের বাড়ী যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।"

সুবালা বলিল,—"তিনি কোথায়?"

ডাক্তারবাবু ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—"তিনি—তিনি—"

"বুঝিয়াছি—পথ ছাড়ুন।"

"বিশেষ অনু——"

"আপনি কিরূপ লোক! আমার স্বামী পীড়িত, আর আমি বাপের বাড়ী যাইব ? পথ ছাড়ুন।"

"বিশেষ——"

"পথ ছাড়ুন,—জানি তিনি আমাকে রক্ষা করিতে চাহেন। সরুণ, আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।"

অগত্যা ডাক্তারবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সুবালা চঞ্চল চরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

পালঙ্কের উপরে জনার্দ্দন অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত রহিয়াছেন। সুবালা তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার ভয়ানক জ্বর। সে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্রমে সে বুঝিল যে, ধীরে ধীরে তাহারও দেহ অসুস্থ বোধ হইতেছে।

সে রাত্রি এবং পর দিনও অতীত হইল, তথাপি জনার্দ্দনের সংজ্ঞা হইল না। মুহুর্মুহু নানা নামজাদা ডাক্তার আসিতে লাগিল, কিন্তু নানা অনুনয়-বিনয়েও কেহ তাহাকে তাহার স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠাইতে পারিল না।

পর দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জনার্দ্দনের সংজ্ঞালাভ হইল। তিনি পার্শ্বে সুবালাকে দেখিয়া ভীত ও দুঃখিতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! তুমি—তুমি এখানে? আমি যাহা তোমায় বলিতে বলিয়াছিলাম, তাহা ইঁহারা কি তোমায় বলেন নাই!"

সুবালা স্বামীর মুখের নিকট মুখ আনিল; তাহার আলুলায়িত প্রচুর কেশদাম জনার্দ্দনের মুখের উপর বিলুণ্ঠিত হইল,—তাহার ওষ্ঠ তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, সে কাতরে মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"জীবনে মরণে আমরা কি এক নই!"

জনার্দ্দনের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য মধুর হাসি দেখা দিল। তাহার পর সুবালা কাঁদিল না! যুগল বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পার্শ্বে শয়ন করিল।

ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ পরে সকলকে আয়োজন করিতে বলিলেন। সংবাদ পাইয়া জনার্দ্দনের কারখানার সমস্ত লোক ছুটিয়া আসিল।

যখন সকলে ধরাধরি করিয়া জনার্দ্দনের দেহ লইয়া চলিল—তখন সুবালা সংজ্ঞাহীনা।

যখন শত শত লোক জনার্দ্দনের দেহ স্কন্ধে তুলিল, এই সময়ে ডাক্তারবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"নামাও, এক সঙ্গে লইয়া যাও।" তাঁহার উভয় চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ।

———

ঘরের-লক্ষ্মী

লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

দুলভবাবু শোভাকে দেখিয়া গিয়াছেন, আজ শোভার পাকা দেখা। দুই বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন খুব প্রবল ভাবেই চলিতেছে। হরিচরণ প্রভাতে উঠিয়াই প্রফুল্লনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্লনাথ তখন বাটী ছিলেন না। তিনি উঠান হইতেই, "বৌঠান—বৌঠান" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নফরার মা উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, হরিচরণের চীৎকারে সে ফিরিল—বলিল, "বাবু! মাঠাকুরুণ পূজোর ঘরে আছেন!"

হরিচরণ বিন্দুবাসিনীকে বৌঠান্ বলিয়া ডাকিতেন। অঘোরবাবু যখন জীবিত ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার এই বাটীতে সর্ব্বত্র অবাধ গতি। অঘোর বাবুর সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল, কেবল মাত্র একটী পুত্র, একটী কন্যা ও পত্নী। তাঁহার নিজের আত্মীয় স্বজন অপর বড় একটা আর কেহ ছিল না; সেই জন্যই তিনি হরিচরণকে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন;—প্রফুল্লনাথও হরিচরণকে আপনার খুল্লতাতের মত ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন। হরিচরণ উপরে উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নফরার মা বাধা দিল—সে তাহার বাসন মাজা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এক গাল হাসিয়া বলিল,—"বাবু! শোভা দিদির বিয়েতে আমার একগাছা তাগা চাই।"

হরিচরণের প্রাণ আজ আনন্দে নৃত্য করিতেছিল,—যে দুর্ভাবনার কাল মেঘ শোভার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশে ঘনাইয়া আসিতেছিল, আজ তাহা আনন্দ-ঝটিকায় একেবারে নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে,—সে আনন্দের তীব্র জ্যোতিঃ আজ তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া পড়িতেছিল। হরিচরণ বার দুই কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—"তা তুই বল্‌তে পারিস,—এ তোর নেয্য পাওনা। তা পাবি বই কি; নিশ্চয় পাবি।"

হরিচরণ আরো কি বলিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলেন বিন্দুবাসিনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পূজার

ঘরেই হরিচরণের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন। এত প্রত্যুষে হরিচরণ সহসা কেন তাঁহার খোঁজ করিতেছেন জানিবার জন্য, তিনি তাঁহার পূজা অর্দ্ধেক অবস্থায় স্থগিত রাখিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি হরিচরণকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি নিম্নে নামিয়া আসিলেন। বিন্দুবাসিনী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিচরণ বলিলেন,—"বৌঠান্! আজ শোভাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবে,—খাওয়া দাওয়ার পরই তোমার যাওয়া চাই। শোভার মা নেই,—মনে থাকে যেন তোমাকেই সব কর্ত্তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা ঠাকুরপো,—শোভা কি আমার পর? নিহীও যা, আমার শোভাও তা। আমাকে আর বলতে হবে কেন, আমি নিজেই যাব।"

নীহার আসিয়া মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল,—"কাকাবাবু কই আমাকে যেতে বল্লে না?"

হরিচরণ একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"তোকে আবার যেতে বলবো কিরে বেটী! তোরই তো বাড়ী। বিয়ে হয়ে বেটী আমার বড়লোক হয়েছে। তুই যাবিনি! তুই না গেলে শোভাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দেবে কে?"

নীহার আর কোন কথা কহিল না,—সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিতে থুতে কি রকম হবে?"

হরিচরণ বেশ একটু উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"এক পয়সাও নয়! দুর্ল্ভ বাবু—বুঝলে বৌঠান্ মহা সদাশয় লোক। লোকে যে কেন তাঁর নিন্দা করে তা ভগবানই জানেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে এক রকম বিনা পয়সায় তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। আজ কালকার দিনে এমন সদাশয়লোক কজন হয়? আমার কিছুই খরচ নেই বল্লেই হয়, কেবল বরযাত্র খাওয়ান ও ফুলশয্যার খরচা। মনে থাকে যেন, খাওয়ার পরই তোমার যাওয়া চাই।"

হরিচরণকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "একটু বসবে না?" হরিচরণ মহাব্যস্তভাবে বলিলেন,—"না,—এখন আর বসতে পারবো না। জানইতো আমাকে একলাই সব কর্ত্তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী আর কোন কথা কহিলেন না। হরিচরণ প্রফুল্লনাথের বাটী হইতে বাহির হইলেন। তথা হইতে বরাবর নিজের বাটীতে আসিয়া

প্রবেশ করিতেছিলেন,—দরজার সম্মুখে প্রফুল্লনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণকে দেখিয়া প্রফুল্লনাথ দাঁড়াইলেন। হরিচরণ বলিলেন, "শুনেছতো, আজ শোভাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবে,—সন্ধ্যার পর তোমায় আমার বাড়ীতে উপস্থিত থাকা চাই।"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি কাকাবাবু, শোভার পাকা দেখা—আর আমি উপস্থিত থাকবো না?"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাতো বটেই,—শোভাকে তুমিই হাতে ক'রে মানুষ করেছ, লেখা পড়া শিখিয়েছ, তোমারই যত্নে সে এত বড়টা হয়েছে। তা বাবা ভুল না যেন,—দশজন ভদ্রলোক আসবে, তোমার থাকা বিশেষ দরকার। দুর্লভবাবু আর তোমরাই হ'লে এ পাড়ার মাথা।"

"আমার জন্য ভাববেন না, আমি ঠিক হাজির থাক্‌বো," বলিয়া প্রফুল্ল-নাথ একটী নমস্কার করিয়া পাশ কটাইলেন,—হরিচরণও নিজের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া পর্য্যন্ত হরিচরণ এক মুহূর্ত্তও স্থির হইতে পারেন নাই। পাগলের মত এলোমেলো ভাবে কাজে ও বিনা কাজে আনন্দে দিশেহারা হইয়া কেবলই ঘুরিতেছিলেন। এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বৈটকখানায় প্রবেশ করিলেন। একটা তাকিয়া টানিয়া তক্তপোষের উপরে উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া একাকী মনে মনে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বোধ করি তাহাও তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি আবার উঠিলেন,—তক্তপোষের নিম্ন হইতে একটী কলিকা বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন,—তাহার পর তাহা হুকার উপরে বসাইয়া পাখার সাহার্য্যে তাহাতে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আগুণ ধরিয়া উঠিল,—বাতাস তাম্রকুটের মধুর সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। হরিচরণ পাখাটী পার্শ্বে রাখিয়া হুকা টানিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় নন্দলাল গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

নন্দলাল দুর্লভ বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেই হয়,— দুর্লভ বাবুর ভালমন্দ সমস্ত কাজেই নন্দলাল আছে। মোসাহেবী করিতে নন্দলাল অদ্বিতীয়। কেবল মোসাহেবীর দ্বারা এই কলিকাতার বাজারে সুখে তাহার সংসার চলিয়া থাকে। কাজেই তাহার যে অসীম ক্ষমতা একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সহসা নন্দলালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে

দেখিয়া হরিচণের আর হুকা টানা হইল না,—তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আরে এস এস,—নন্দলাল বাবু এস। তারপর এ অসময় খবর কি ? বস বস,—তামাক খাও।"

নন্দলাল তক্তপোষের একধারে বসিতে বসিতে বলিল,—"আজ্ঞে খবর খুব ভালো, যা কেউ কখন ভাবেনি তাই,—আপনার বরাত জোর, বৃহস্পতির দশা। হরিচরণ বাবু—কর্ত্তার মত ফিরেছে—"

হরিচরণ বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন,—"কপাল জোর,—মত ফিরেছে, এ সব বলছো কিহে ?"

নন্দলাল হাসিতে হাসিতে বলিল—"আজ্ঞে বলবার মত হ'লেই বলতে হয়। দুর্লভবাবুর শ্বশুর হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! একি যার-তার বরাতে হয়!"

নন্দলালের এ হেয়ালীরও বিন্দুবিসর্গ হরিচরণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথার আমি কোন অর্থই বুঝতে পারছিনি,—ব্যাপার কি ছাই ভেঙ্গেই বল ?"

নন্দলাল বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। কর্ত্তা আপনার মেয়েকে দেখে মত বদলেছেন।"

হরিচরণ নন্দলালের কথায় সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"বল কিহে! তিনি বিয়েতে অমত করেছেন ?"

নন্দলাল তাহার ঘাড় বাঁকাইয়া, তাহার খোচা খোচা গোপটা বার দুই নাড়িয়া বলিল,—"আহা আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! এতে আপনার ভালো ভিন্ন মন্দ নয়। একটু শান্ত হয়ে সব কথা শুনলেই বুঝবেন।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"হাঁ—হাঁ বল বল, শুনি।"

নন্দলাল বলিতে লাগিল,—"কর্ত্তা আপনার মেয়েটীকে দেখে একেবারে তর হয়ে গেছেন। তাই তিনি আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে আশীর্ব্বাদ যেমন হবার কথা আছে তেমনিই হবে, বিয়েরও যে দিন স্থির হয়েছে সেই দিনই স্থির রইলো—কেবল তাঁর পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি নিজেই আপনার মেয়েকে বিয়ে করবেন। আপনার মেয়ে দুর্লভ মিত্রের গৃহিণী হবেন একি কম সৌভাগ্যের কথা!"

নন্দলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণ উঠিতে উঠিতে একেবারে উঠিয়া

দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বল কি ?"

নন্দলাল একগাল হাসিয়া বলিল,—"যথার্থ কথা, সত্যই আপনার মত ভাগ্য খুব কম লোকের হয়। দুর্লভবাবুর ছায়ায় থেকে কত বেটা বড়লোক হয়ে গেল—আর এ একেবারে শ্বশুর। হরিচরণবাবু দু'দিনে শরীর ফিরে যাবে।"

হরিচরণের কণ্ঠতালু একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল,—তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ওঝার মন্ত্রের মত নন্দলালের কথার তীব্রতেজে সহসা যেন তাঁহার মুখখানা বদলাইয়া গেল,—তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—হাতের হুকা খসিয়া পড়িল,—কলিকা ভাঙ্গিয়া একটা অগ্নিকাণ্ড হইবার মত হইল। তিনি বিস্ফারিত নয়নে নন্দলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(৫)

বৈশাখ মাসের খর মধ্যাহ্ন,—প্রচণ্ড তাপে চারিদিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। রাস্তায় লোক সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। কেবল মাঝে মাঝে ঘর্ম্মাক্ত ফিরিওয়ালা 'ঠাণ্ডি বরফ' হাকিয়া পিপাসাতুরের পিপাসা বৃদ্ধি করিয়া দোরে দোরে ফিরিতেছে। রোজগারিগণ বহুক্ষণ হইল নিজ নিজ কর্ম্মে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মহীন বেকারগণের দিবা নিদ্রার পূর্ণ সুখ বেশ জমিয়া আসিয়াছে। সেই সময় শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রফুল্লনাথের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই গৃহ খানিতে প্রত্যহ সে একবার করিয়া আসিত, এই গৃহের প্রত্যেক সামগ্রীর সহিত কি যেন একটা কিসের মাদকতা তাহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল ; কিন্তু সে যে কিসের আকর্ষণ শোভা তাহা জানিত না,—কখনও জানিবার চেষ্টাও করে নাই। তবে এই গৃহ খানিতে একবার না প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণে শান্তি আসিত না—তৃপ্তি হইত না। আজ চারিদিন সে এই গৃহে প্রবেশ করে নাই,—চারিদিন সে মোটেই বাটী হইতে বাহির হয় নাই। আনন্দের হিমালয় শিখর হইতে দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইয়া তাহার জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র পিতা হৃদয়ে যে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছেন, সে বেদনা আর এরূপ ভাবে অধিক দূর অগ্রসর হইলে, বৃদ্ধের যে হৃদয় চিরদিনের মত চূর্ণ হইয়া যাইবে তাহা সে যত বুঝিয়াছিল এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। তাই সে পিতার বেদনার ভার একটু লঘু করিবার জন্য, সেই বেদনার অনেকটা নিজে তুলিয়া

লইয়াছিল। তাহারই জন্য আজ তাহার পিতার এই যন্ত্রণা, তাহারই জন্য তাহার সদানন্দ পিতার নয়নে অশ্রু প্রবাহ ছুটিয়াছে। আজ চারিদিন সে কেবল সেই চিন্তাই করিয়াছে। নীহারের বার বার আহ্বান সত্বেও এ বাটীতে একবারও প্রবেশ করে নাই,—কিন্তু আজ আর সে কিছুতেই একলাটি বসিয়া এই নিদারুণ চিন্তার বোঝা বহন করিতে পারিল না,—চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া প্রফুল্লনাথের বাটীতে প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিয়া সে প্রথম একবার নীহারের ঘরের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইতে উকি দিল, নীহার ঘুমাইতেছে। সে নীহারকে ডাকিতে সাহস করিল না। সে আর কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে বরাবর প্রফুল্লনাথের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য গৃহ,—জন-প্রাণী নাই। বিশেষ কাজে সে দিন প্রফুল্লনাথকে একবার বাহির হইতে হইয়াছিল। শোভা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া নীরবে একখানি শোফার উপর শুইয়া পড়িল। তাহাকে একলা পাইয়া আবার শত সহস্র চিন্তা চারিদিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিল না;—আবার উঠিয়া বসিল। টেবিলের উপর হইতে একখানি ছবির বই লইয়া তাহার ছবিগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল, ছবিতে একটু মনোসন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না;—সে আবার উঠিল। টেবিলের উপরিস্থিত এটা সেটা নানা দ্রব্য উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে নাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাই বা আর কতক্ষণ ভালো লাগিতে পারে! সে মনে মনে বিরক্ত হইয়া প্রাচীরস্থিত পাখার সুইস্‌টী টিপিয়া দিয়া আবার আসিয়া শোফার উপর শুইয়া পড়িল। পাখা শো শো শব্দে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে হাওয়ায় তাহার হৃদয়ের ধূয়া পরিষ্কার হইল না বরং তাহা আরোও ঘনিভূত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর একটা চাপা বেদনা কীটের মত, যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ বেদনা সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আর থাকিতে পারিল না, তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। শোভা সেই শোফার উপর পড়িয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইহার ভিতর কোন সময় প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, শোভা তাহা জানিতে পারে নাই। সহসা তাঁহার ডাকে সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। প্রফুল্লনাথ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, অতি

স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন,—"বিবি তুমি কাঁদছিলে? কি হয়েছে, ব্যাপার কি?"

শোভা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সঙ্কোচের প্রথম আক্রমণটা কাটাইয়া লইয়া বলিল,—"কই! না!"

প্রফুল্লনাথ শোভার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। একবার উত্তমরূপে তাহার আপদ মস্তক লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার দৃষ্টি শোভার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। শোভা সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, সে মস্তক অবনত করিল! একটু খানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা জানলার দিকে চাহিল; বাহিরের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। মাথায় কাপড় নাই, এলোমেলো চুলগুলি পৃষ্ঠের উপর লুটাইতেছে, শাড়ীখানি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আটিয়া বেষ্টন করিয়াছে। সৌন্দর্য্যের রাণী সহসা যেন আজ শোভার অঙ্গে নবভাবে বিকাশিত হইয়া প্রফুল্লনাথকে চমক লাগাইয়া দিল। প্রফুল্লনাথ একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া শোভার সম্মুখে বসিলেন, গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তারপর এমন অসময় আমার ঘরে একলাটী বসে কাঁন্না হচ্ছিলো কেন বলো তো? দুর্লভবাবুকে কি পছন্দ হয়নি?"

শোভা মুখখানি একটু ভারি করিয়া বলিল,—"যাও, সব সময় ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"ঠাট্টা! এর একটী বর্ণও ঠাট্টা নয়। তোমার বাবার সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হয়েছিলো। তিনি বললেন প্রফুল্লনাথ সবতো শুনেছ, দুর্লভবাবুর সঙ্গে শোভার বিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর তো আমি অন্য কোন উপায় দেখি না। ভাববার জন্য দুর্লভবাবুর কাছে তোমার বাবা সাতদিন সময় নিয়েছিলেন তারতো চারদিন কেটে গেছে। তিনদিন আর বাকি আছে, তারপরই যাহক্ একটা উত্তর দিতে হবে—বুঝেছ!"

শোভা বিরক্ত ভাবে বলিল,—"হাঁ বুঝেছি। তুমি কাপড় ছাড়গে যাও, ঘেমেতো ত্রিখণ্ডি হয়েছ, জামা খুলবে না?"

প্রফুল্লনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"সে জন্য মশাইকে ভাবতে হবে না। জামা খোলার আবশ্যক বোধ হলেই জামা খোলা হবে। এখন যা জিজ্ঞাসা কল্লুম তার জবাব দাও। প্রথম কাঁদা হচ্ছিলো কেন, দ্বিতীয় এ বিবাহে তোমার মত আছে কি না?"

শোভা যে কেন কাঁদিতেছিল, তাহার যথার্থ কারণ সে নিজেই অবগত ছিল না। আর দুর্লভবাবুকে পছন্দ? কে কবে একজন স্থবীর পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে পতিরূপে পছন্দ করিতে পারে? কাজেই সে প্রফুল্লনাথের প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। সুন্দর মুখ সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে সোনার কাটির মত জাগাইয়া তুলিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে তেমনি এই মেয়েটীর সমস্ত দেহ আকর্ষণ করিয়া আকাশ, বাতাস, আলোক গৃহের চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রফুল্লনাথ আর একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, —"হুঁ! কতকটা উত্তর পাওয়া গেল। নীরবে অবনত মস্তক—এর মানে হচ্ছে তুমি দুর্লভবাবুকে বিয়ে করতে নারাজ এবং সেই জন্যই এই কাঁন্না। তা যেন হ'লো, এখন কি কর্ব্বে স্থির কল্লে?"

শোভা মস্তক তুলিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"কি কর্ব্বো বলে দাও?"

প্রফুল্লনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"চিন্তার কথা!"

তাহার পর চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। শোভা নীরবে অবনত মস্তকে তাহার অঞ্চলের কালো পাড়টুকু কুঞ্চিত করিতে লাগিল। সহসা প্রফুল্লনাথ আবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, —"কিন্তু এ বিয়েতে তোমার অমত হবার কারণ আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিনে! দুর্লভবাবুর বয়স একটু বেশী হয়েছে, তাতে এমন বিশেষ কিছু যায় আসে না। ও বয়সে তোমার চেয়ে ছোট মেয়েকেও আমি ঢের লোককে বিয়ে কর্ত্তে দেখেছি। আর হিন্দু শাস্ত্র যখন এ বিয়েও বিয়ে বলে মঞ্জুর করেছেন, তখন তোমার আপত্তি টিক্‌তেই পারে না, একেবারেই অগ্রাহ্য—একদম বাতিল।"

শোভা কোন উত্তর দিল না, সে নীরবে সেইভাবেই বসিয়া রহিল। প্রফুল্লনাথ বলিতে লাগিলেন,—"দ্বিতীয়তো এ বিয়েতে যদি তুমি অমত কর, কাজেই বাধ্য হয়ে তোমার বাবাকেও অমত কর্ত্তে হবে—তাতে ফল দাঁড়াবে তোমার বাবার সঙ্গে দুর্লভবাবুর বিবাদ; তোমার বিয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত ইত্যাদি প্রভৃতি একটা বিদিকিচ্ছিরী ব্যাপার। অতএব আমার মতে এ বিয়েতে তোমার সম্মত হওয়া বিশেষ ভাবে উচিত ও কর্ত্তব্য।"

শোভা এতক্ষণ স্থির হইয়া প্রফুল্লনাথের কথাগুলি শুনিতে ছিল, কিন্তু আর পারিল না। বিষাক্ত তীরের মত প্রফুল্লনাথের কথাগুলি বালিকার

ক্ষুদ্র হৃদয়ে যাইয়া আঘাৎ করিল, তাহার নয়ন-পল্লব ছলছল করিয়া উঠিল, মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"ও মুখ ঢাক আর কাঁদো, ছাড়ান ছুড়েন নেই। হিন্দু সমাজ বোঝ? ছাই বোঝ। তার দয়ামায়া নেই,—একরত্তি মেয়ের মতামতের তারা ধার ধারে না। তবে আমার দুঃখ এই যে, ছ বছর কাছে কাছে রেখেও তোমায় মানুষ কর্ত্তে পাল্লুম না। নারীর কর্ত্তব্য কি জান? ছাই জান! আত্ম-বলিদান। পরের দুঃখ দুর করাই নারীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এখন উত্তর দাও—কি কর্ত্তে চাও?"

শোভা তথাপি কোন কথা কহিল না দেখিয়া প্রফুল্লনাথ বিরক্ত ভাবে, একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—"কি উত্তর দেবে না?"

শোভা বহু কষ্টে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"তুমি যা বল্‌বে তাই কর্ব্বো।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"আমি এতক্ষণ কি তবে বল্লুম!"

শোভা অতি ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তাই কর্ব্বো।"

বিন্দুবাসিনী নীচে নামিতে ছিলেন, প্রফুল্লনাথের স্বর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রফুল্ল কখন ফিরলি! একা বসে বসে কি বিড় বিড় বক্‌ছিস?"

জননীর স্বরে প্রফুল্লনাথ চেয়ার ছাড়িয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, বলিলেন,—"বলতো মা কার সঙ্গে কথা কইছিলুম?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"তা কি করে জানবো বাছা!"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না মা তোমায় বলতেই হবে!"

বিন্দুবাসিনী সে কথায় কান না দিয়া নামিয়া যাইতে ছিলেন, প্রফুল্লনাথ যাইয়া তাঁহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন, বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"পথ ছাড়্, আমি কি তোর ঘরে ঢুকিছি যে বল্‌বো কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলি?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"তবু—আন্দাজ?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"না বাছা আমার অত আন্দাজ টান্দাজ নেই।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"না মা তোমার দুটী পায়ে পড়ি, বলতেই হবে।"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার এই পুত্রটীর মাঝে মাঝে এক একটী অদ্ভুত আব্দারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন; বলিলেন,—"ভালো ফ্যাসাদ! তুই তোর বৌয়ের সঙ্গে কথা কচ্ছিলি।"

প্রফুল্লনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কেমন করে জান্‌লে মা? তুমি নিশ্চয়ই গুণতে পারো।"

(৬)

তখন কলিকাতা সহরের বহু বিস্তৃত আলিসা ও আলিসাশূন্য ছাদগুলির উপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিতেছিল। মধ্যাহ্নের দমকা বাতাস অনেকটা সুস্থির হইয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে থাকিয়া থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। হরিচরণ তাহার বৈঠকখানা গৃহে চিৎ হইয়া শুইয়া চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। অজানিত অবস্থায় এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নয়ন কোণে সঞ্চিত হইতেছিল। প্রভা তাহার পিতার শিয়রে বসিয়া তাহার কোমল অঙ্গুলিগুলি দিয়া পিতার চুলগুলি নাড়িতে ছিল ও মাঝে মাঝে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিতেছিল। হরিচরণ কেবল হুঁ হাঁ করিয়া শুনিয়া ও না শুনিয়া কন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। সহসা হরিচরণ চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভা তোর দিদি কি কচ্ছেরে?"

প্রভা তাহার পিতার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল,—"দিদিতো এই এলো, সেতো এতক্ষণ প্রফুল্লদাদাদের বাড়ী ছিল।"

হরিচরণ আর কোন কথা কহিলেন না,—"আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। প্রভা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা দিদির বিয়ে বুঝি হবে না?"

কন্যার কথায় একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন হরিচরণের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তিনি আর একবার কষ্টে চক্ষু মেলিলেন, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"যা মা একবার তোর দিদিকে ডেকে আনতো।"

প্রভা চলিয়া গেল,—হরিচরণ আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। আজ তাঁহার প্রাণে যে তরঙ্গ বহিতেছে তাহা তাঁহার এই ক্ষুদ্র কন্যাটী পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে। এ তরঙ্গাঘাতে হয়তো তাঁহাকে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। হরিচরণ প্রাণের ভিতর শিহরিয়া উঠিলেন। পিতার আহ্বান শুনিয়া শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একবার তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখের উপর কি স্নেহ! কি করুণা! কি বেদনা! এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংসারে শোভাকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার সমস্ত বেগ

নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া বেদনার তীব্র উচ্ছ্বাস দীর্ঘশ্বাসে বাহির হইয়া আসিতেছে। পিতার অনন্ত স্নেহ যেন গৃহের চারিদিকে এক স্বর্গীয় আলোকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই মধুর স্নেহের সরস পরশে শোভা মুহূর্ত্তে তাহার আপন শোকের পরিবেষ্টন হইতে বাহির হইয়া আসিল। যে পৃথিবী তাহার নিকট ছায়ার মত বিলীন হইয়া আসিতেছিল তাহা আবার সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল ;—সে কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা তুমি কি আমায় ডাক্‌ছিলে ?"

হরিচরণ কন্যার স্বরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন,—অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আয় মা, আমার কাছে একটু বোস।"

শোভা অতি জড়সড় ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পার্শ্বে বসিল। হরিচরণ কন্যার চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"মা আজ তোর মায়ের কথা মনে পড়্‌ছে। সে থাকলে হয়তো—"

হরিচরণ আর বলিতে পারিলেন না—রুদ্ধ অশ্রু অতীতের আঘাতে ঝরিয়া পড়িল। শোভা পিতার বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। সে অবনত মস্তকে বলিল,—"বাবা! মা কি আমায় তোমার চেয়েও বেশী ভালো বাস্‌তো ?"

হরিচরণ নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"মা,—মায়ের স্নেহ বোঝবার আগেই তুই মাতৃহারা হইছিস্‌। তোর মা তোকে কত ভালবাসতো তা তুই জানিস্‌নি। মর্‌বার সময় সে আমার হাতে ধরে বলে গেছে, শোভা মায়ের স্নেহ পেলে না, তার এমন জায়গায় বিয়ে দিও সে যেন শাশুড়ীর স্নেহে বুঝতে পারে মা কি! কিন্তু—"

হরিচরণের কণ্ঠরোধ হইল তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। এক ফোঁটা অশ্রু পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ স্বরূপ শোভার স্কন্ধের উপর পড়িল। শোভা ধীরে ধীরে বলিল,—"বাবা বিয়েতো ভগবানের হাত,—তাঁর যখন ইচ্ছে—তখন তুমি কি কর্ব্বে!"

হরিচরণ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"তুই মা আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোকে কেমন করে এমন স্থবীর বৃদ্ধের হাতে সমার্পণ কর্ব্বো। সে আঘাত এ অনেক দিনের বুড়োহাড়ে সহ্য হ'লেও তোর ওই সেদিনকার কচি হাড়ে সহ্য হবে কেন ?"

শোভা তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—কেন বাবা! উমা তো আনন্দে বুড়ো শিবের গলায় মালা দিছিলো।"

হরিচরণ কোন উত্তর করিলেন না। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহল, তাহারই মাঝখানে একটী গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটীর বৈঠকখানায় পিতা ও কন্যার চিরন্তর স্নিগ্ধ সম্বন্ধটীকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মান ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

সেই সময় বিশ্বনাথ সসব্যস্তে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সম্মুখে শোভা ও হরিচরণকে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল,—"এ হ'তেই পারে না—হবে না—হওয়া উচিত নয়——"

তাহার পর তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিয়া শোভার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"কোন ভয় নেই মা,—তোর বিশ্বনাথ খুড়ো বেঁচে থাকতে এ হবে না—হবে না—হবে না———"

বিশ্বনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাও গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সে বলিল,—"কি হবে না কাকাবাবু?"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে বলিল,—"দুর্ল্লভ মিত্রের সঙ্গে তোর দিদির বে! তোর বাপের কপালে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখ, হবে না—হবে না—হবে না।"

প্রভা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বিয়ে হবে না কাকাবাবু! দিদিকে বুঝি দুর্ল্লভবাবু পছন্দ করেনি?"

বিশ্বনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল,—"পছন্দ করেনি! বেটা সাতপুরুষে কখন এমন মেয়ে দেখেছে?"

তারপর হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"সে যাক, এখন বলোতো ভায়া ব্যাপারটা কি ভেঙ্গেচুরে—তারপর বুঝি।"

হরিচরণ বিশ্বনাথের ভাবে ও ভাষায় একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। আজ চারিদিন বিশ্বনাথ তাঁহার বাটীতে আসে নাই; তিনিও এই গোলযোগে তাহার কোন সংবাদ লইতে পারেন নাই। সে কেমন করিয়া ইহারি মধ্যে এসব সংবাদ পাইল। হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ এ ক'দিন তুমি ছিলে কোথায়?"

বিশ্বনাথ বলিল,—"আর বল কেন ভায়া, শরীরটা এ ক'দিন এমনি অপটু হয়েছিলো যে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত বেরুতে পারিনি। আজ আমি এইমাত্র

প্রফুল্লনাথের কাছে খবর পেলুম—খবর পেয়েই ছুটে আস্‌ছি। এমন সোনার প্রতিমা কখন কি ভাগাড়ে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়! আমার তখনই কেমন মনে হয়েছিলো। এখন তুমি কি কর্ব্বে স্থির করেছ তাই আমি শুন্‌তে চাই?"

হরিচরণ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"স্থির আর কি কর্ব্বো আমার মাথা আর মুণ্ড। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনই ভগবানের হাত—তাই ভাবছি।"

বিশ্বনাথ হরিচরণের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"তা হবে না,—হতে পারে না,—আমি হতে দেব না। বিয়ে না-হয় অবিবাহিত রেখে দাও আর তাও যদি না পারো আমায় দাও আমি ভিক্ষে করে পারি, যেমন করে পারি——"

বিশ্বনাথ আরোও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তার আর বলা হইল না,—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল এক তরুণ যুবক। যুবকের অঙ্গুলীতে দুই তিনটা অঙ্গুরীয়, অঙ্গে সুচিক্কণ গিলেদার পাঞ্জাবী, মাথায় প্রকাণ্ড টেরী, পায়ে ডিসিনের বার্নিস্ চটি। যুবকের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহ হাসনাহানার মধুর গন্ধে সৌগন্ধময় হইয়া গেল। বিশ্বনাথ যুবকের গৃহ প্রবেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। শোভা ছুটিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিচরণ যুবকের অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক একবার বিশ্বনাথ ও হরিচণের দিকে চাহিয়া সুউচ্চস্বরে বলিলেন,—"দেখুন হরিচরণবাবু, আপনার মেয়ের সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছে তখন কিছুতেই আপনি বাবার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। এ মেয়ে আমিই বিয়ে কর্ব্বো। দেখি কি করে বাবা আপনার মেয়েকে বিয়ে করেন।"

ক্রমশঃ

মৃত্যুর-পর

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লেখক—৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল

(৭)

তিনি তাহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া প্রথমে যত শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন তাহার সে শান্তি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে ;—প্রথমে তাহার কিছুই অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল না,—এখন দেখিলেন তিনি আবার সমস্তই অনুভব করিতে পারিতেছেন,—প্রেতাত্মা হইয়া প্রথম তাহার আনন্দ জন্মিয়াছিল, সমস্তই বড় মজা বলিয়া বোধ হইতেছিল,—কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন ভূত হইয়া থাকা বড় মজা নহে ;—ইহাতে বিশেষ কষ্টও আছে, রাম সিং মোণ্ডা দেখিয়া যাইতে পারিতেছে না, ইহাতে তাহার প্রেতাত্মার যে অসহনীয় যন্ত্রণা হইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনিও দেখিতেছেন তাঁহার প্রতিপদে রাগ হইতেছে, প্রথমে ভৃত্যের হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া মজা করিয়াছিলেন,—কিন্তু এখন যে ডাল ভাঙ্গিয়া বন্ধুদিগের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা মজার জন্য নহে,—রাগে। স্ত্রীর উপরও রাগ হইতেছিল,—তবে কি তিনি বলবন্ত সিংহের উপর অনর্থক সন্দেহ করিয়াছিলেন।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি তাহার বাড়ী আবার প্রবেশ করিলেন, —আবার তাহার কুকুরটা ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—তিনি দেখিলেন,—কুকুর ছাড়া আর কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, তবে কি পশু পক্ষী প্রেতাত্মা দেখিতে পায়—কেবল মানুষে পায় না।

তিনি তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বৈঠকখানায়, তাঁহারই ফরাসে তাঁহার খানসামা বসিয়া তাঁহারই ফুরসীতে তামাক টানিতেছে। তাহার সম্মুখে আরও তিন চারি জন লোক বসিয়া আছে। পার্শ্বে মদের বোতল ও পেয়ালা। সকলই খুব ফুর্ত্তি করিতেছে। তাহারা বাহিরে দরজা বন্ধ করিয়া ছিল বটে ; কিন্তু তাহাদের মনিবের ভূত দরজা প্রাচিরের ভিতর দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এ দৃশ্যে অজয় সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। তিনি মরিতে না

মরিতে তাহার ভৃত্যগণের এতদূর আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছে! তাহারা তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া মদ খাইয়া আমোদ করিতেছে!

তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময়ে শুনিলেন যে খানসামা বলিল—"শালা ভারি কৃপণ ছিল—শালা বেঁচে থাক্‌তে একদিন আমোদ কর্ত্তে পাই নি!"

তাহার বন্ধুগণ সকলে বলিয়া উঠিল,—"শালা ভারি পাজি ছিল,—শালা মরেছে বেশ হয়েছে?"

খানসামা বলিল,—"শালার যে অপঘাত মৃত্যু হবে তা আমি জানতেম।—গিন্নিঠাকরুণ এখন মজা লুটবেন,—আমরা ফাঁকি যাই কেন।"

একজন বলিল,—"শালা কৃপণের বাক্সে যাহা ছিল, এই সময়ে হাতিয়ে ফেল?"

খানসামা বলিল,—"তাকি এতক্ষণ দেরি আছে!"

অজয় সিংহ আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—মদের বোতল লইয়া সবলে আছাড় মারিলেন,—বোতল ভাঙ্গিয়া শতচূর্ণ হইয়া গেল।

প্রথমে চমকিত ও ভীত হইয়া চারিদিকে চাহিল,—তাহাদের মধ্যে কেহ মাতাল হইয়া বোতল ভাঙ্গিয়াছে, পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সকলই বিস্মিত ও ভীত।

ইহাতেও শিক্ষা হয় নাই দেখিয়া অজয় সিংহ তাহারা যে খাটে বসিয়া ছিল তাহা সবলে নাড়া দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই দুর্বৃত্তগণ—"বাপরে—প্রাণ যায়" বলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দরজার দিকে ছুটিল। কে কাহার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নাই,—তাহারা দরজা খুলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিল। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুকুরটা বিকট চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হইল?

(৮)

অজয় সিংহ প্রথমে এই দুরাত্মাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া চারিদিকে উর্দ্ধশ্বাসে পালাইল দেখিয়া তিনি ফিরিলেন,—দেখিলেন তাহার প্রাণের বন্ধু বীর সিংহ দ্বারে দাঁড়াইয়া বিস্মিত ভাবে চারিদিকে চাহিতেছেন।

জগতে যদি কেহ অজয় সিংহের বন্ধু ছিল তবে সে বীর সিংহ,—তিনি তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।—প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন।

এমন কি তাহার স্ত্রী স্বাধীন ভাবে বীর সিংহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন,—বীর সিংহের উপর অজয় সিংহের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না।—স্ত্রী-কেন, তিনি সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিতেন। এতক্ষণ বীর সিংহ তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার নিকট কেন ছুটিয়া আইসেন নাই,—সে জন্য অজয় সিংহ একটু বিস্মিত হইতেছিলেন, কিন্তু এখন তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"বীর সিংহ নিশ্চয়ই কোথায় গিয়াছিল, এখন আমার হঠাৎ মৃত্যুর কথা শুনিয়া আসিয়াছে? আমি মরিয়াছি, এ অবস্থায় সে ভিন্ন আর কে আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবে,—বিশেষতঃ আমার স্ত্রী কিছুই জানে না।—নিশ্চয়ই বীর সিংহ আমার সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ ভার লইবে! বীর সিংহের মত আমার এমন বন্ধু মেলে না।"

বীরসিংহ বাহিরের চারিদিকে চাহিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিলেন; খানসামাটা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া অজয়সিংহ একটু দাঁড়াইলেন, তাহাকে আরও একটু শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাহার প্রাণের বন্ধু কি করে, দেখিবার জন্য তিনি একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন আমার স্ত্রী এতক্ষণ কাঁদে নাই,—সে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় নহে;—এখন বীরসিংহকে পাইয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইবে, বীরসিংহ আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, সেও আমার হঠাৎ মৃত্যুতে একেবারে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িবে! হায়! আমার তাহাদের সান্ত্বনা করিবার উপায় নাই।"

তিনি তাহার স্ত্রীর শয়ন গৃহের নিকট আসিয়া দেখিলেন,—ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। এখন আর তাহার নিকট রুদ্ধ দ্বার ও খোলা দ্বারে প্রভেদ নাই; তিনি হাওয়ার উপর ভাসিতে ভাসিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বিশেষ বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী বীরসিংহের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়াছে, বীরসিংহ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইয়াছে!

প্রথমে তিনি ভাবিলেন তাহার স্ত্রী শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বীরসিংহের বুকে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই তাহার সকল ভ্রম দূর হইল,—তিনি তখন বুঝিলেন যে তিনি এতদিন ঘোর অন্ধ ছিলেন। তাঁহার বলবন্ত সিংহের সহিত যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে,—তাহার উপর অন্যায় সন্দেহ করিয়া তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন।—আর এই দুর্বৃত্ত

বিশ্বাসঘাতক—যাহাকে তিনি প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন। সে কালসর্প হইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতেছিল। সংসারে সকলই কি এই দুর্বৃত্তের ন্যায় দুরাত্মা!

তিনি পৃথিবীতে নরদেহে নিশ্চয়ই একটী প্রকাণ্ড গাধা ছিলেন। নতুবা তিনি এতকাল কিছুই দেখিতে পান নাই কেন! তিনি ঘোর মুর্খ না হইলে বলবন্ত সিংহের উপর অন্যায় সন্দেহ করিয়া, তাহার সহস্র শপথ না শুনিয়া,—তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইবেন কেন! তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছে। কিন্তু কেবল দুঃখ এই বিশ্বাসঘাতক কপট বন্ধুর হৃদপিণ্ডের রক্ত পান করিতে পারিতেছেন না।"

অজয়সিং ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তিনি এই দুই দুরাত্মার হৃদপিণ্ড শতছিন্ন করিবার জন্য তাহাদের উপর পতিত হইলেন,—কিন্তু দেখিলেন—তিনি হাওয়া মাত্র।

(৯)

অজয়সিংহ তাহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহার হাত তাহার গলার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল,—তিনি এই দুরাত্মার গলা ধরিতে পারিলেন না।—তিনি তাহার কুলটা বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর মুখে সবলে পদাঘাত করিলেন,—কিন্তু তাহার পদাঘাত তাহার মুখে লাগিল না;—তখন তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন!

তিনি পূর্ব্বে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়াছেন,—ভৃত্যদের মদের বোতল ভাঙ্গিয়াছেন, তাহাদের খাট ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন,—ভৃত্যের হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি এই দুরাত্মাকে হত্যা করিতে পারিতেছেন না কেন! তিনি গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া এই সকল বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন প্রেতাত্মা জড় পদার্থ ধরিতে পারে;—কিন্তু চেতন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ তাহার নিকট যেন হাওয়ায় গঠিত,—মানুষ ধরিতে গেলে তাহা ঠিক হাওয়া ধরিবার ন্যায় হয়, তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারা যায় না, তবে কি রূপে তিনি দুরাত্মা দুর্বৃত্ত কপট বন্ধুকে দণ্ড দিবেন! কি রূপে তিনি এই বিশ্বাস ঘাতিনী কলঙ্কিনী কুলটার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন! রাগে ফুলিতে ফুলিতে অজয়সিংহ সেই গৃহ মধ্যে বসিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক একবার

রোষ-কসাইত লোচনে দুরাত্মাদের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—তখন বুঝিলেন নরলোক হইতে প্রেত লোকে অধিক কষ্ট। নরলোক হইলে ইহাদের এখনই উপযুক্ত দণ্ড দিয়া রাগের শান্তি করিতে পারিতেন। কিন্তু এই প্রেত লোকে তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। নিজের ক্রোধানলে নিজেই পুড়িয়া মরিতেছেন!

তিনি দেখিলেন এই নরকের কীটসম প্রেমিক দ্বয় পর্য্যঙ্ক উপরে বসিয়াছে। তাহার স্ত্রী বলিতেছে।—"আপদটা গিয়াছে,—আর আমাদের সুখের পথের কেহ কণ্টক হইবে না।"

বীরসিংহ হাসিতে হাসিতে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল।" আপনি এমন করে না মরিলে, আমিই তাহাকে মারিতাম। আমাদের এ সুখের পথে কণ্টক হয় কে!"

অজয়সিংহ উন্মত্ত হইলেন। লম্ফদিয়া উঠিলেন,—উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া উপর্য্যুপরি উভয়কে পদাঘাত করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিল না।—তিনি যে সেখানে উপস্থিত আছেন,—তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না!

আর এখানে থাকা অজয়সিংহের অসহ্য হইল, আর এ নারকীয় দৃশ্য দেখিলে এই প্রেতাত্মাবস্থায়ই উন্মাদ হইবেন! তখন তিনি ভাবিলেন তাহার মৃত্যু হইয়া ভালই হইয়াছে,—আগে বলবন্ত সিংহের উপর একটু একটু রাগ হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন।—তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলেন,—ভাবিলেন যদি তাহার সহিত কখনও তাহার সাক্ষাৎ হয়,—তাহা হইলে তিনি তাহাকে শতবার ধন্যবাদ দিবেন।

এই দুর্ব্বৃত্তদিগের শিক্ষা দিবার উপায় কি! তিনি যদি কোনরূপে এক ভয়ানক প্রেতমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই ভয়ে মূর্চ্ছিত হইবে, হয়তো ভয়ে তাহাদের মৃত্যু হইতেও পারে,—তখন প্রেতপুরে আসিলে ইহাদের সহিত একবার বোঝাপড়া করা যাইবে। তিনি ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিবার জন্য শত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু বীরসিংহ বা তাঁহার স্ত্রী তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না।

সহসা পর্য্যঙ্কের নিম্নে তাহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি দেখিলেন তাহার স্ত্রীর আদরের বিড়ালটী নিদ্রা যাইতেছে। তিনি তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই বিড়ালটা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার দেহের সমস্ত কেশ এক একটী

উঠিয়া উচু হইয়া উঠিল, সে তাহার চারি পা ঘুরাইয়া লাঙ্গুল উত্তোলিত করিয়া বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া ভয়ে এক বিকট অস্ফুট চীৎকার করিতে লাগিল, অজয় সিংহের স্ত্রী ও বীরসিংহ বিড়ালের এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বিড়াল তাহাদের স্বর শুনিতে পাইল না, সে ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

(১০)

ক্রোধান্ধ অজয়সিংহের প্রেতাত্মা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না,—তিনি ইহাদিগকে আরও কিছু দেখাইতে ইচ্ছুক হইলেন।—তখন তিনি বিড়ালটাকে তাড়া করিলেন, তখন সে বিকট শব্দ করিতে করিতে উন্মাদের ন্যায় গৃহমধ্যে ছুটিতে লাগিল,—ঝাপাইয়া তাহার স্ত্রীর ক্রোড়ে পড়িয়া নখাঘাতে তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল, বীরসিংহ তাহাকে ধরিতে গেলেন,—কিন্তু ভয়ে উন্মত্ত বিড়াল তাহার মুখ হাত ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিল, ফিন্‌কি দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত ছুটিল, বীরসিংহ বিড়ালটা দূরে নিক্ষেপ করিলেন,—তখন বিড়াল বিকট চীৎকার করিতে করিতে জানালা দিয়া পালাইল!

তখন বীরসিংহ ও অজয়সিংহের স্ত্রী ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে ভীত ও বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন,—তাহারা এই ক্ষুদ্র বিড়ালকে কখনও এরূপ উন্মত্ত হইতে দেখেন নাই। কি দেখিয়া সে এরূপ ভয় পাইয়াছে,—তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বীরসিংহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিলেন, বস্ত্রে মুখের রক্ত মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু অজয়-সিংহের প্রেতাত্মা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, তাহার গৃহের মধ্যস্থলে একটা বত্রিশ ডালি সুন্দর ঝাড় ঝুলিতেছিল,—অজয়সিংহ একটা মুগুর তুলিয়া লইয়া সেই ঝাড়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন,—ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গৃহ মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, তখন অজয়সিংহের স্ত্রী বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, বীরসিংহ বিকট চীৎকার করিতে করিতে বাহিরের দিকে ধাবিত হইল;—তাহার বোধ হইল লক্ষ লক্ষ পিশাচ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে!

সে কিরূপে বাটীর বাহির পর্য্যন্ত আসিল, তাহা সে জানে না,—বাহিরে আসিয়া সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—রাস্তার উপর মুখ মুচড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাঁতকপাটী লাগিল।

এতক্ষণে অজয়সিংহ কতক শান্ত হইলেন, তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া

উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন। যাহা হউক, একেবারে উপায় নাই, তাহা নয়,—আমি এই দুই মহাপাপীকে হত্যা করিতে পারি না সত্য, কিন্তু এই রকমে ইহাদের জীবন নরকে পরিণত করিতে পারিব। আর যদি আমি এক দিন ইহাদের নিকট আসিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদের উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারিব।”

বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে চারিদিকে একটা মহা গোল উঠিল। মৃত অজয়সিংহের গৃহে যে একটা ভয়ানক কিছু হইয়াছে, তাহা শীঘ্র আগ্রা সহর ময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ; যাহা সর্ব্বদাই হয়, এখানেও তাহাই ঘটিল। যাহা যথার্থ ঘটিয়াছে,—লোকের মুখে মুখে তাহা শত রঙে রঞ্জিত হইয়া চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সকলেই শুনিল অজয়সিংহের গৃহে ভয়ানক ভূতের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। অজয়সিংহের অপঘাত মৃত্যু হওয়ায় সে দানো পাইয়া যাহার তাহার ঘাড় মটকাইতেছে।

প্রথমে কুকুরের চীৎকার, তাহার ভৃত্যের ঝাটার ব্যাপার, তাহার বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গা, খানসামার উপর অত্যাচার,—অবশেষে বীরসিংহের এই অবস্থা। এই সকল ব্যাপারে সমগ্র সহর তোলপাড় হইয়া উঠিল,—সকলেরই মুখে এই কথা, সকলেই অজয়সিংহের বাড়ীর চারিদিকে সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া অতি মৃদুস্বরে সভয়ে এই ভয়ানক ব্যাপারের আলোচনা করিতেছে। অজয়সিংহের প্রেতাত্মা সকলের নিকট ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া তাহারা কি বলাবলি করিতেছে শুনিতে লাগিলেন। তিনি যে এই জাল কপট বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাহার আনন্দ !

(১১)

এই পাপ সংসার হইতে যত শীঘ্র হয় চলিয়া যাইবার জন্য অজয়সিংহের প্রাণ ব্যাকুল হইতেছিল, তবুও তাহার প্রাণ যে কিসে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তিনি কিছুতেই এই পাপ নরলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছেন না কেন, তাহা তিনি অনেক চেষ্টায়ও বুঝিতে পারিলেন না ! তিনি যথার্থই প্রেতাত্মার ন্যায় তাহার বিস্তৃত অট্টালিকার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তাহার গৃহে সর্ব্বদাই আনন্দের রোল উঠিত, কিন্তু আজ তাঁহার গৃহ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই, যেন কি এক ভয়ানক

নিস্তব্ধতায় তাহার সমস্ত অট্টালিকায় বিরাজ করিতেছে! ভৃত্যগণ অতি মৃদু স্বরে ভয়ে ভয়ে কথা কহিতেছে, অনেকে পলাইয়াছে, অনেকে পোটলা পুটলি বাঁধিতেছে! তাহার বিস্তৃত অট্টালিকা দেখিবার লোক নাই,—তিনি যাহাদের অতি বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া জানিতেন, দেখিলেন মালিক শূন্য গৃহ পাইয়া তাহারাই যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই লইয়া পলাইতেছে!

জগতের উপর তাহার বিষদৃশ ঘৃণা জন্মিতেছে,—সেই ঘৃণা প্রতি মুহূর্ত্তে বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ কদাকার পাপময় ভয়ানক সংসারে তিনি যে কিরূপে এত দিন ছিলেন, তাহাই ভাবিয়া তিনি আশ্চার্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। বলবন্তসিংহ তাহাকে হত্যা করিয়া ভালই করিয়াছে! এখন কোন গতিকে তিনি এই পাপ পুরী হইতে পলাইতে পারিলেই হয়!

তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন জন কতক লোক বীরসিংহকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার জ্ঞান হইয়াছে;—কাপুরুষ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! তিনি সবেগে দুরাত্মার মুখে পদাঘাত করিলেন। কিন্তু তাহার পদাঘাত তাহার মুখে লাগিল না, কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল,—দুই হাত সভয়ে মুখে দিল, তাহার পর ব্যকুল ভাবে চাহিতে লাগিল!

কাহারই আর অজয় সিংহের বাড়ী প্রবেশের সাহস নাই। দাসদাসীগণ যে যাহা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, তাহাই লইয়া পশ্চাৎদিককার দরজা দিয়া পলাইতেছে! যাহারা অজয়সিংহের মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা এখনও ফিরে নাই;—ইহার মধ্যেই তাহার গৃহের অসংখ্য দাসদাসী আত্মীয় স্বজন যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইতেছে!

তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার স্ত্রীর গৃহে আসিলেন। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুল ভাবে বিস্ফারিত নয়নে চারিদিকে চাহিতেছে, রুদ্ধকণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে কাতরে দাসীদিগকে ডাকিতেছে, কিন্তু কে তাহাকে উত্তর দিবে, তাহারা সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া পালাইয়াছে?

অজয়সিংহের স্ত্রীর উপর বিন্দুমাত্র দয়া হইল না,—তাহার ক্ষমতা থাকিলে জীবন্তে এই পাপিয়সীকে দগ্ধ করিতেন, কিন্তু ভাবিলেন "মরিলে হয়তো এই রাক্ষসীর সমুচিত দণ্ড হইবে না। এই পাপ সংসারে জীবিত থাকিলেই তাহার যথোচিত দণ্ড হইবে! এই নরলোক হইতে নরক আর কোথায় আছে?

এই সময়ে বাহিরে একটা গোল উঠিল, অজয়সিংহ ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেই দিকে ছুটিলেন।

(১২)

অজয়সিংহ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যাহারা তাহাকে দাহ করিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্মশানেই তাহারা বাড়ীতে যে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছিল, এক্ষণে কেহই সহসা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। কি করা উচিত, কি করা অনুচিত বাহিরে বসিয়া সকলে তাহার আলোচনা করিতে লাগিল। অনেকে ভূতের কথা বিশ্বাস করিল না, বলিল,—"দিনের বেলা ভূত আসিবে, একথা হইতেই পারে না। এ সব বাজে কথা।"

অজয়সিংহের অতি বৃদ্ধ বিচক্ষণ আত্মীয় বলিলেন। "কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়, তাহা ঠিক, একটা কিছু হইয়াছে, যাহা হউক একজন রোজা ডাকিলে ক্ষতি কি!"

একজন বলিলেন—"আপনি ঠিক বলিয়াছেন, উদয়মলকে এখনই ডাকিয়া পাঠান, যদি কিছু সত্য থাকে সে বলিয়া দিতে পারিবে।"

আর একজন বলিলেন,—"রোজা ডাকিতে যাচ্ছেন,—ডাকুন ক্ষতি নাই, তবে আমার মতে শীঘ্রই একটা স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"যত শীঘ্র হয় স্বস্ত্যয়ন করা হইবে, এখন একজন শীঘ্র উদয়মলকে ডাকিয়া আন।"

দুই তিন জন উদয়মলকে ডাকিতে ছুটিল,—অজয় সিংহের আর এখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না;—তাহার প্রাণ এ পাপ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না,—কে যেন তাহাকে টানিয়া রাখিতেছে? রোজার কথা শুনিয়া তাহার একটু কৌতূহলও জন্মিল,—তিনি রোজার অপেক্ষায় রহিলেন। উদয়মলের নাম যোজনা ছিল,—কিন্তু তিনি পূর্ব্বে আর কখনও তাহাকে দেখেন নাই! সে কি করে দেখিবার জন্য তিনি সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন।

বাহিরে গোল শুনিয়া তাহার স্ত্রীও পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াছিল,—বৃদ্ধ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ভিতরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাপীয়সী বাড়ীর ভিতর যাইতে সাহস করিল না,—সে ছুটিয়া বীরসিংহের

নিকট আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুলা হইল—লজ্জা সরম সকলই বিসর্জ্জন দিল,—কিন্তু বীরসিংহ,—কাপুরুষ দুর্বৃত্ত দুরাশয় বীরসিংহ তাহাকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল,—তখন কলঙ্কিনী সর্ব্বসমক্ষে চীৎকার করিয়া বলিল,—"তোর জন্য সর্ব্বস্ব খোওয়াইলাম,—আর তুই আমায় ত্যাগ করিয়া পালাইতেছিস্।"

কেবল অজয় সিংহই অন্ধ ছিলেন, তাহার স্ত্রীর কুচরিত্রের বিষয় অন্য আর কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না ;—আজ প্রকাশ্যভাবে এ কথা প্রকাশ হওয়ায় সকলে কর্ণে অঙ্গুলী দিলেন,—বলবন্ত সিংহ এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি নিমিষে অসি নিষ্কাষিত করিয়া বলিলেন,—"অনর্থক আমি অজয়সিংহের হত্যা অপরাধে অপরাধী হইয়াছি,—দুরাত্মা বীরসিংহ, আজ তোর রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

তিনি উন্মাদের ন্যায় বীরসিংহকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন,—কিন্তু কাপুরুষ কুলাঙ্গার ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলাইল,—চারিদিকের লোক টিট্‌কারা দিয়া উঠিল। বলবন্ত সিংহ দুরাত্মাকে ধরিতে পারিলেন না, রাগে ফুলিতে ফুলিতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাপীয়সী আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিল না,—কোন দিকে কোথায় নিরুদ্দেশ হইল ? এই সময়ে অতি স্থুলদেহ প্রায় গোলাকার উদয়মল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(১৩)

অজয় সিংহ নিকটে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছিলেন, বলিলেন,—"দেখিতেছি পাপের দণ্ড দিবার জন্য কাহাকেই ব্যস্ত হইতে হয় না ;—এই সকল জগতের নরকীয় কীট নিজের নিজের দণ্ড নিজেই পাইয়া থাকে, আর এ পাপ পুরে তিলার্দ্ধ থাকা উচিৎ নহে।—"

তিনি এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কে তাহাকে এরূপ ভাবে টানিতেছে! অজয় সিংহ সেইখানে দাঁড়াইয়া অনেক চিন্তা করিলেন,—কিন্তু তিনি কেন যে এখান হইতে যাইতে পারিতেছেন না, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন একরূপ হতাশ হইয়া উঠিলেন। "দেখা যাক এই রোজা কি করে! সে কি তাঁহার মন্ত্রবলে আমায় দেখিতে পাইবে ?"

তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন,—তাহার ন্যায় আর কয়েকটা প্রেতাত্মা

সেইখানে আসিয়াছে,—কিন্তু তিনি তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না,—তাহারা কেহ তাহার সহিত কথা কহিল না,—তবে কি তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

উদয়মল ভূতের কাণ্ডসকল শুনিল,—তাহার পর অতি গম্ভীর হইয়া বলিল,—"এ অতি সামান্য কথা,—এ ভূত এখনই তাড়াইতেছি।

এ কথা শুনিয়া অজয় সিংহের কিছুমাত্র ভয় হইল না,—হাসি পাইল,—তিনি দেখিলেন যে অন্যান্য ভূতেরাও—তাঁহার কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

উদয়মল মহা আড়ম্বরে একটা কলসি লইয়া বসিল,—নানা মন্ত্র পড়িয়া তাহাতে জল ঢালিতে লাগিল,—তাহার পর সগর্ব্বে বলিল,—"আর ভূত কোথায় যায় ?"

অজয় সিংহ আর নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না,—সবলে তাহার হাত হইতে কলসিটা কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন,—কলসি গড়াইতে গড়াইতে থামিল। বোধ হয় উদয়মলের জীবনে এরূপ ব্যাপার আর এখনও ঘটে নাই,—সে হা করিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ? অজয় সিংহ দেখিলেন অন্যান্য ভূতেরা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, ইহাতে তাহার উৎসাহ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল, তিনি এই ভূতের রোজাকে আরও একটু লাঞ্ছিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রোজা তাহার বিস্ময় হইতে কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিতেছিল।—আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে অজয়সিংহ সেই গৃহমধ্যে একটা মুদ্গর লইয়া প্রকৃত ভূতের নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সম্মুখে যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহারই উপর মুগুর চালাইতে লাগিলেন। চারিদিকে আসবাব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল,—কোথায়ও কেহ নাই,অর্থশূন্য দিক্‌বিদিক্‌শূন্য হইয়া মুগুর ছুটিল,—রোজা বাপ বাপ শব্দে ছুটিল,—যে যেখানে ছিল বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলাইল, তখন অজয়সিংহ নিস্তব্ধ হইলেন।

এই সময়ে সেই নির্জ্জন জনশূন্য বাড়ীর ভিতরে কে কাতরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ওগো, তোমরা শীঘ্র এস—খুকী—কি রকম কচ্ছে।"

(১৪)

তখন অজয়সিংহের খুকীর কথা মনে পড়িল। তাহার প্রাণের কন্যা যে তাহার বাড়ীতে পীড়িতা হইয়া পড়িয়া আছে, তখন তাহার মনে পড়িল,

তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি তাহারই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এতক্ষণ এই বাড়ী হইতে কিছুতেই যাইতে পারিতে ছিলেন না,—তাহারই স্নেহ-ডোরে বদ্ধ হইয়া তিনি এই পাপ পুরিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন? তবে তাহার কথা এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই কেন? তিনি প্রেতপুরে আজ নূতন আসিয়াছেন। এ রাজ্যের রহস্য তিনি এখনও কিছুই বুঝিতে পারেন নাই!

ভূতের ভয়ে সকলে পলাইয়াছে, কিন্তু তাহার বৃদ্ধা দাসী তাহার প্রাণের ফুলকে ছাড়িয়া এক পাও নড়িতে পারে নাই! বাড়ীতে কি হইতেছে,—তাহা তাহার জ্ঞান নাই;—সে ক্ষুদ্র বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে?

তবে সংসারে সকলেই খারাপ নহে, সংসার সম্পূর্ণ নরক নহে;—ইহাতে পিশাচও আছে—দেবতাও আছে! সকলে গিয়াছে, কিন্তু দাসী, বৃদ্ধা দাসী যায় নাই, সে তাহার ক্ষুদ্র কন্যাকে ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই? তাহার পাপীয়সী স্ত্রী তাহার নিজ গর্ভজাত কন্যার কথা একবারও ভাবে নাই;—একবারও তাহাকে দেখিতে যায় নাই,—আহা ক্ষুদ্র ফুল জ্বরের জ্বালায় ছট ফট করিতে করিতে কতবার মা মা করিতেছে।—একবারটী মাকে দেখিতে চাহিয়াছে।—বৃদ্ধা কতবার আসিয়া কাতরে মাকে বলিয়াছে। "একবারটী এস!" রাক্ষসী গালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে! নিজের কন্যা দেখে নাই;—আর এই বৃদ্ধা প্রাচীনা দাসী তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে! তবে সংসার একেবারে নরক নয়,—এখানে দুই একজন দেবতাও আছে।

এ পর্য্যন্ত অজয়সিংহ যাহা দেখিয়া ছিলেন, তাহাতে জগতের প্রতি তাহার অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল,—তিনি হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধাকে দেখিয়া সহসা যেন তাহার দগ্ধ প্রাণে অমৃত সিঞ্চিত হইল। তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময়ে বৃদ্ধা আবার কাতরে বলিল, "ওগো তোমরা কে আছ—শীঘ্র—এস—খুকী কেমন কচ্ছে!"

কিন্তু কে তাহার ব্যস্ততায় উত্তর দিবে? বাড়ী জন-শূন্য,—বৃদ্ধা ব্যতীত এই বৃহৎ অট্টালিকায় আর কেহ নাই;—সেই কেবল তাহার পীড়িতা কন্যাকে বুকে লইয়া কাতরে লোক ডাকিতেছে?

অজয়সিংহের হৃদয়ে বড়ই বেদনা অনুভূত হইল,—তিনি বলিলেন, "কেন

এতক্ষণ আমার ফুলের কথা আমার মনে হয় নাই? তাহা হইলে আমি তাহার পার্শ্বেই বসিয়া থাকিতাম। তাহার সহস্র বিপদাপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতাম! তাহার নিকট হইতে এক দণ্ড নড়িতাম না। যাহা করিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া, তাহা করিয়া এখন এত কষ্ট পাইতাম না! তাহা হইলে ভূতের ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া কেহ পলাইত না। এখন তাহারা সকলে ছুটিয়া আমার কন্যার নিকট যাইত,—বুকের রক্ত দিয়া তাহার রোগের চিকিৎসা করিত, হায়,—হায়, কি করিলাম,—এখন কি করি! অজয়সিংহ কাতরে বৃদ্ধার দিকে ছুটিলেন,—তাহার প্রাণের ফুল কোথায়।

(১৫)

বৃদ্ধা ছল, ছল, কাতরে ডাকিয়া কাহারও সাড়া শব্দ না পাইয়া ব্যাকুল ভাবে নীচের দিকে ছুটিল,—তিনি শুনিলেন, সে কাতরে ডাকিতেছে,—"গিন্নি মা,—গিন্নি মা—শীঘ্র এস—খুকী কেমন কচ্ছে!"

হায় গিন্নি মা কোথায়? সে পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী কোথায়! সে নিজের কন্যা ফেলিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া সংসারসমুদ্রে ভাসিয়াছে? আর কখনও কি কূল পাইবে? এক দিনে তাহার সাজান বাড়ী পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল! যে সংসারে একবার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, সে সংসার হু হু করিয়া জ্বলিয়া যায়, কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারে না।

সুসজ্জিত গৃহ,—কত সখ করিয়া কত জিনিস,—কত সুন্দর সুন্দর দ্রব্যে তিনি তাহার প্রাণের কন্যার ঘর সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। কত বহুমূল্য মনোমুগ্ধকর অলঙ্কারে তিনি তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গ সুশোভিত করিয়াছিলেন,—সে সকলই রহিয়াছে,—তবে ঘর এরূপ ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে কেন?

ফুল তাহার ক্ষুদ্র দুগ্ধ-ফেণনীভ শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছে,—সে নীরব নিস্পন্দ! তাহার সুন্দর কেশরাশি তাহার বালিসের উপর গড়াইতেছে,—তাহার হাত পা অবসন্ন,—নিশ্চল—নিস্পন্দ। তাহার চক্ষু মুদিত,—তাহার নিশ্বাস প্রবল বেগে বহিতেছে,—সময় সময় নিশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া আসিতেছে! সুন্দর একটী কুসুম যেন কে এই সুন্দর শয্যার উপর রাখিয়াছে,—ফুলটী ধীরে ধীরে যেন বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে!

অজয়সিংহ তীর বেগে তাহার শয্যার পার্শ্বে আসিলেন,—অমনই ফুল

একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্বাস চির জীবনের জন্য রোধ হইয়া গেল ?

মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অজয়সিংহ তাহার মৃত কন্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন,—তিনি নীরব,—নিস্তব্ধ,—নিশ্চল, তিনি এক দৃষ্টে বিস্ফারিত নয়নে তাহার প্রাণের কন্যার দিকে চাহিয়া আছেন !

তাহার পর কি হইল ? তিনি দেখিলেন বাষ্পের ন্যায় তাহার ক্ষুদ্র ফুলের প্রেতাত্মা তাহার দেহ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল, সেই অস্পষ্ট বাষ্পীয় মূর্ত্তি ক্রমে ক্ষুদ্র ফুল মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার প্রেতাত্মা তাহাকে দেখিল। আনন্দে হাসিল,—তাহার ক্রোড়ে যাইবার জন্য হাত বাড়াইল।

অজয় সিংহের হৃদয় অতুলনীয় স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি জীবনে যে বিমল আনন্দ অনুভব করেন নাই,—আজ তাহা হৃদয়ে অনুভব করিলেন, তিনি এ মর লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল নিমিষমধ্যে সমস্তই বিস্মৃত হইলেন, তাহার বোধ হইল, তিনি আর এক দিব্য ধামে নীত হইয়াছেন,—তিনি সকল ভুলিয়া দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া তাহার প্রাণের ফুলকে প্রাণে লইলেন।

উপসংহার।

এই সময়ে অজয় সিংহ বাহিরে বহুলোকের পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। বুঝিলেন বৃদ্ধা বাড়ীতে কাহাকে দেখিতে না পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে গিয়াছিল, সে কাঁদিয়া কাটিয়া কাকুতি মিনতি করিয়া লোক লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে !

অজয় সিংহ তাহাদের অপেক্ষা করিলেন না। কে আসিতেছে তিনি তাহা দেখিলেন না। তিনি তাহার প্রাণের ফুলকে বুকের ভিতর লইয়া ভাসিতে ভাসিতে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন,—ভাসিতে ভাসিতে আগ্রা সহরের উপরে উঠিলেন।

তিনি তখন ফুলকে অতি স্নেহে অতি যত্নে, অতি আদরে হৃদয়ে লইয়া আকাশে উঠিতে লাগিলেন,—নিম্ন হইতে উচ্চে—উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উঠিতে লাগিলেন,—তিনি একবার নিম্নদিকে চাহিলেন,—দেখিলেন, আগ্রা সহর একটী ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় বহু নিম্নে শোভা পাইতেছে।

তিনি আরও উচ্চে উঠিলেন, প্রাণের কন্যাকে বুকে লইয়া আরও উচ্চে উঠিলেন,—তাহার পর সেই অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন। তাহার

প্রাণের কন্যাকে পাপময় পৃথিবী হইতে দূরে—দূরে—বহু দূরে! অতি দূরে স্বর্গ-ধামে লইয়া জগৎ হইতে বিলীন হইয়া গেলেন।

সংসার তেমনই পড়িয়া রহিল,—তেমনই পড়িয়া থাকিবে,—অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই রূপেই চলিবে।

ভুল-সংশোধন

[শ্রীমতী পুরুবালা রায় লিখিত]

আমাদের প্রতিবেশী শ্যামলালদাসের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ভূমিষ্ঠা হইবার তিন দিন পূর্ব্বে শ্যামলাল কলেরায় মরণাপন্ন হয়। এমন কি গ্রাম্য ডাক্তার ও কবিরাজ পর্য্যন্ত জবাব দিয়াছিলেন। স্বজনগণ যখন হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া নিরুপায়ের উপায় শঙ্কটে মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছিল, সেই সময় বোধ হয় চিত্রগুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মী ভূমিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলালের অবস্থার আশাতীত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। দশ পনেরো দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া শ্যামলাল কন্যার নাম রাখিয়াছিল "লক্ষ্মী"। বস্তুতঃই লক্ষ্মীর দিকে চাহিলেই বোঝা যায়, তাহার "লক্ষ্মী" নাম রাখিয়া নামের অপমান বা অপ-ব্যবহার করা হয় নাই। শ্যামলালের আরও তিনটি কন্যা আছে, কিন্তু তাহাদের কাহারও সহিত লক্ষ্মীর চেহারা কিম্বা স্বভাব খাপ্ খায় না। চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি, মালক্ষ্মী চঞ্চলা—মানুষে কিন্তু শান্ত মেয়েটি দেখিলেই বলে "বেশ লক্ষ্মী মেয়ে।" আমাদের লক্ষ্মীও রূপেগুণে "লক্ষ্মী মেয়ে।" আমাদের চক্ষের সম্মুখে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মানুষটি হইয়া উঠিয়াছে। যথাসময়ে যথা-যোগ্য ঘরে-বরে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রূপে-গুণে তাহার ভগিনী-

ত্রয়ের সহিত যেমন তাহার পার্থক্য লক্ষিত হইত, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। তাহার ভগিনীত্রয়ের শ্বশুরবাড়ী সুনাম ছিল না। নবম বর্ষের বালিকা বধূ লক্ষ্মীর সুখ্যাতি কিন্তু সে গ্রামের লোকের মুখে ধরিত না। আমি চিরদিন তাহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি; কেন তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না, হয় তো তাহার ছোট্ট রাঙ্গা মুখখানির মহিমায়। বয়স্থা হইয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্মী অধিকাংশ সময় স্বামিগৃহে থাকিত। তাহার সংসারে এক বিধবা ননদিনী ছাড়া আর কেহ ছিল না; কাজেই পিত্রালয়ে আসা লক্ষ্মীর বড় ঘটিত না।

সে আজ তেরো বৎসরের কথা। লক্ষ্মী অনেক দিন পিত্রালয়ে আসে নাই। একদিন দ্বিপ্রহরে আমি আমার মামাত বোন্ ইন্দুবালার সঙ্গে পুকুর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি। অনেক দিন পরে ইন্দু স্বামিগৃহ হইতে আসিয়াছে। ঘাটে বসিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে তাহার সুখ সৌভাগ্য অভাব অভিযোগের নানা কথা শুনিতেছি, এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহার ক্ষুদ্র দেহখানি সৌন্দর্য্য-সম্পদে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম "কিরে লক্ষ্মী, কবে এলি?" মাথা নীচু করিয়া ধীর শান্ত স্বরে লক্ষ্মী বলিল—"কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি।" ইন্দু বলিল "ওমা, লক্ষ্মী নাকি? ওকে কত দিন দেখিনি। তা শ্বশুরবাড়ী কেমন? কোন কষ্ট নেই তো?" লক্ষ্মীকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই আমি বলিলাম—"তা বেশ। লক্ষ্মী আমাদের "লক্ষ্মী নামের কলঙ্ক করে নি। ওর দিদিদের মত শ্বশুরবাড়ী ওর কোন দুর্নাম নেই, বরং সুখ্যাতিই শুন্‌তে পাই। লক্ষ্মী সত্যই রূপে গুণে লক্ষ্মী, ভগবান্ ওকে সুখে রাখুন। অতটুকু মেয়ে বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত স্বামীকে প্রাণ-পণে সেবা যত্ন ক'চ্ছে। স্বামীটিও খুব ভাল লোক, ওকে খুব ভালবাসে—যত্ন করে। ভগবান্ যোগ্য বর মিলিয়ে দিয়েছেন, এখন তাঁর আশীর্ব্বাদে সুখ স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করুক, আমরা শুনে খুসী হই।" ইন্দু বলিল "ওর টুক্‌টুকে মুখ দেখেই বর শ্রীচরণের আল্‌তা হ'য়ে আছে; রাঙ্গা মুখের সর্ব্বত্র জয় নিশ্চয়।" আমি বলিলাম—"না ভাই, এ কথা তোর মেনে নিতে পারিনে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ মূর্খের নয়ন। না হয় ধরে নিলেম রাঙ্গা মুখের জোরে মূর্খ স্বামীর মনকে জয় করা সম্ভব, কিন্তু সর্ব্বত্র জয় অসম্ভব। তাকেই রূপসী বলি, মনোচিত্তে পতিপদে মতি যার!" রাঙ্গামুখ রাস্তা ঘাটে কত দেখা যায়, সত্যি

বল্ তার দিকে কি ফিরে চাইতে ইচ্ছে হয়? মুখ হৃদয়ের দর্পণ; যে মুখে হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে, সেই মুখ সুন্দর। তার দিকে চাইলে আনন্দে, স্নেহে মন ভরে ওঠে। সে যেন চন্দনমাখা দেবপূজার ফুলটি। কেমন নয়?" ইন্দু বলিল "তা বটে।" স্নান শেষ করিয়া সকলেই গৃহে ফিরিলাম। পরদিন লক্ষ্মীর মাতার নিকট শুনিলাম, লক্ষ্মী সেই দিনই স্বামি-গৃহে চলিয়া গিয়াছে। তার পর ইতি মধ্যে সে একবারও পিত্রালয়ে আসে নাই। মাঝে মাঝে তাহার মাতার নিকট তাহার পুত্র কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ারও সুখ সৌভাগ্যের সংবাদ পাইতাম।

তের বৎসর পরে আজ বৈকালে লক্ষ্মী তিনটি পুত্র, দুইটি কন্যা পরি-বেষ্টিতা হইয়া আমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। এতদিন পরে সে আজ পিতৃগৃহে আসিয়াছে। কি আশ্চর্য্য সে ঠিক্ তেম্নিটিই আছে। শান্ত মধুর সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা লক্ষ্মীপ্রতিমার মত! সে গলবস্ত্রা হইয়া আমার পায়ের কাছে ভক্তিভরে প্রণত হইল, তার পর সযত্নে পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত খুসী হইয়া ছিলাম, বলিলাম,—"কিরে লক্ষ্মী, কেমন আছিস্? এইগুলি বুঝি তোর ছেলে মেয়ে?" লক্ষ্মী বলিল,—"হ্যাঁ দিদি, এগুলি আপনার চরণ-ধূলির আশীর্ব্বাদ।" তার পর পুত্র কন্যাগণকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে আদেশ করিল। আমি বলিলাম "থাক্ থাক্, ওরা শিশু, ওদের আবার প্রণাম করা কেন? অম্নিই আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ ওদিকে বাঁচিয়ে রাখুন।" শঙ্কিতভাবে লক্ষ্মী বলিল,—"আপনার চরণধূলির আশীর্ব্বাদেই ওদের পেয়েছি। আপনার আশীর্ব্বাদেই ওরা বাঁচ্‌বে, মানুষ হবে। সংসার ফেলে রেখে এসেছি ঐ ধূলোটুকু নেবার জন্যে। ও ধূলোর যে কত দাম, তা বল্‌বার নয়।" ছেলেমেয়ে সকলেই আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি? আমি কি দেবতা?" দৃঢ়স্বরে লক্ষ্মী বলিল,—"আমার কাছে তাই। আপনার আশীর্ব্বাদ আর পায়ের ধূলোর কল্যাণেই আজ আমার ছেলে, মেয়ে, জামাই, স্বামী, সংসার, সুখ, সৌভাগ্য। নইলে আজ কোথায় ভেসে যেতেম জানিনে। ও কি ধূলো দিদি? ওযে আমার রক্ষাকবচ।" আমি তাহার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বোধহয় লক্ষ্মী তাহা বুঝিল। বলিল,—"বুঝ্‌তে পারেন্ নি দিদি? আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ছি।" তার পর ছেলে মেয়ে

গুলিকে বলিল—"তোমরা তোমাদের দিদিমার কাছে যাও। আমি দিদির সঙ্গে দু'টো কথা বলে আসি।" আদেশমাত্র তাহারা চলিয়া গেল। মাতার সঙ্গে এখানে অনর্থক অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকিবার আগ্রহ তাহাদের বোধহয় কিছুমাত্র ছিল না। নিশ্চিন্তে চাপিয়া বসিয়া লক্ষ্মী বলিল—"আপনাকে কি বিরক্ত ক'ল্লেম দিদি? এখন একটু বস্‌লে কি কোন কাজের ক্ষতি হবে?" আমি বলিলাম—"না না, এখন কোন কাজ নেই আমার, তুই স্বচ্ছন্দে বস্‌তে পারিস্।"

চিরদিনের স্বল্পভাষিণী, লজ্জা সঙ্কোচে জড় সড় লক্ষ্মীকে আজ এত কথা বলিতে শুনিয়া আমার কেমন বিস্ময় বোধ হইতে ছিল। লক্ষ্মী বলিল—"দিদি শুনেছি কোন্ দেশের লোক পাপ ক'রে অনুতপ্ত হ'লে সকল কথা গুরুর কাছে অকপটে বলে, তাতেই নাকি তার পাপ ক্ষয় হয়, মনে শান্তি পায়। আমার কিন্তু কথাটা বেশ মনে লাগে, বিশ্বাস হয়। আপনি আমার গুরু, আজ তাই সব ফেলে ছুটে এসেছি—সকল পাপ-তাপের কথা আপনার চরণে জানাতে। আমার ননদ অল্প বয়সে বিধবা হয়। বাপ্ মা বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত সে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ী যেত'। তার শ্বশুর শাশুড়ী লোক ভালো, ছেলে মারা গিয়েছে ব'লে বৌকে অযত্ন করে নাই। মা বাপ মারা গেলে আর তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হ'তো না, কারণ আমাদের সংসারে আর কেউ ছিল না, আমিও তখন ছেলে মানুষ। ননদ আমাকে ভালোই বাস্‌তো। সর্ব্বদা কাজ কর্ম্মের ভার দিয়ে আবদ্ধ রাখ্‌তো। আমিও সকল গৃহস্থালী কাজে পটু হ'য়ে উঠ্‌ছিলেম। পাড়ার বৌ ঝিএদের সঙ্গে মেলা মেসা গল্প কর্ব্বার সুবিধে আমার বড় ছিল না। ওপাড়ার মাণিকগয়লার ভাগ্নি চিন্তার বাপের বাড়ী আমাদের পাড়াতেই। বিয়ের এক বছর পরেই চিন্তা বিধবা হ'য়ে বাপের বাড়ী এসে ছিল। তার সঙ্গে এখানেই আমার আলাপ হ'য়েছিল। সে আমার চাইতে চার পাঁচ বছরের বড় হবে। অবসর পেলেই চিন্তা আমাদের বাড়ী আস্‌তো। পাঁচটা গল্প গুজব ক'ত্তো, আমার চুল বেঁধে দিত, আর নির্জ্জন পেলেই আমার রূপের অনেক সুখ্যাতি ক'রে শেষে বল্‌তো- "এ হ'য়েছে বানরের গলায় মুক্তার হার। এ রূপের দাম চাষা লোকে কি বুঝ্‌বে? যে রূপ দেখে কত শত রাজা, জমীদার, বাবু ভেয়ে পাগল হ'য়ে পায়ের গোড়ায় প'ড়ে থাক্‌বার কথা, তাই কিনা একটা চাষা কৈবর্ত্তের জন্যে? এমন রূপ বামুন কায়েতের ঘরেই শোভা পায়। কি রূপই তুই পেয়েছিস্

ভাই।" কখনো বল্‌তো "এমন রূপ যদি আমার থাক্‌তো!" আমি তার কথার মর্ম্ম ভাল বুঝ্‌তেম না। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌তে বুঝ্‌তেও চেষ্টা ক'ত্তেম না, তবে তার কথা গুলো শুন্‌তে ভালোই লাগ্‌তো।

আমার ননদ চিন্তার আসা যাওয়া বড় পছন্দ কর্‌তো না। তার সকল কথা সকল ব্যবহার দেখে শুনে সেটা বেশ বোঝা যেত। তবু চিন্তা রোজই আস্‌তো। "তোকে না দেখে থাক্‌তে পারিনে ব'লেই ছুটে আসি। আমি তোকে বড্ড ভালবাসি।" সে এলেই ঠাকুরঝি আমাকে কষ্টসাধ্য নানা কাজের ভার দিয়ে বেশী ক'রে আবদ্ধ কর্‌তো, যাতে তার সঙ্গে বেশী গল্প গুজব ক'ত্তে ফুর্‌সুৎ না পাই। চিন্তা চলে গেলে নিরিবিলি আমায় বল্‌তো। "বৌ, ওর সঙ্গে বড় মিশো না, ও মেয়ে ভাল নয়।" আমি কিন্তু একথা আদৌ বিশ্বাস ক'ত্তে পাত্তেম না। এম্নি ক'রে ক্রমে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লেম। চিন্তার অজস্র খ্যাতি স্তুতি-বাক্যের ফলে ক্রমে মনে আত্মগরীমা এলো। আমি যে নেহাৎ 'কেও কেটা' নই এ কথা সকল সময় মনে জাগ্‌তে লাগ্‌লো। স্বামীর আদর যত্ন যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমার যোগ্য ব'লে মনে হ'তো না, কাজেই মনে অতৃপ্তি অসন্তোষের সীমা ছিল না। পাড়ায় চিন্তার নানা দুর্নাম রট্‌লো, আমার কিন্তু তবু অগাধ বিশ্বাস তার ওপর। সেও একদিন সবিষাদে করুণ সুরে ব'ল্লে "অনাথা বিধবাকে বলা কঠিন নয়, তাই যার যা খুসী বলে। কি বল্‌বো, অদৃষ্ট মন্দ।" 'ছলনা মিথ্যা কথা' যে তাতে থাক্‌তে পারে, এমন কথা কোন দিন আমার মনের কোণেও আসে নাই। তার কথা শুনে ব্যথা বুঝে সমবেদনায় আমার মন ভ'রে উঠ্‌লো। তার পর একদিন ঠাকুঝি শক্ত হ'য়ে তাকে স্পষ্ট ব'ল্লে "তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না।" বাক্য ব্যয় না ক'রে সে চ'লে গেল। না এলে তার হয় তো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমার? সে আমার একমাত্র সখী বা দু'টো মনের কথা বল্‌বার লোক, সে না এলে আমার উপায় কি? সেই দিন থেকে চিন্তা আমাদের বাড়ী আস্‌তো না বটে, কিন্তু সুযোগ মত ঘাটে পথে দেখা কর্‌তো! আমার সে দেখার বা কথায় তৃষ্ণা মিট্‌তো না, বরং বৃদ্ধি পেত।

আমাদের যে দেখা হয়, সে সংবাদ দু'চার দিনের মধ্যেই কেমন ক'রে জানিনে ঠাকুঝির কানে উঠ্‌লো। সে আমাকে ব'ল্লে "হ্যাঁলা বৌ, তোর কি লজ্জা ভয় নেই? যতই বারণ করি, ততই আমায় লুকিয়ে ওর সঙ্গে কথা

বলিস্। তোর জ্ঞান হবে কবে? ওকি গেরস্তর বৌ ঝিএর সঙ্গে মেশ্‌বার যুগ্‌গ্যি আছে? ফের ওর সঙ্গে কথা কইলে ভালো হবে না ব'লে রাখ্‌ছি।" আমি নীরব রহিলাম। রাগে দুঃখে সারা চিত্ত জ্ব'লে গেলেও ঠাকুর্ঝির কথার উত্তর দেওয়ার সাহস আমার ছিল না। ঠাকুর্ঝি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাক্‌লো না, নিজে রীতিমত চৌকি দিতে লাগ্‌লো। বলা বাহুল্য যে ঘাটে যাবার সময় তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় না,হওয়ার আশাও নাই। একা একা ভেবে ভেবে প্রাণটা বুকের মধ্যে হাঁপিয়ে গুম্‌রে উঠতে লাগ্‌লো, তবু মুখ ফুটে কিছু বল্‌বার নাই। চিন্তা এতদিন ধ'রে নানা মিষ্টি কথা, স্তব, স্তুতি ক'রে আমার মনের যে অনেকখানি দখল ক'রে নিয়ে ছিল, এখন তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছিলেম। ঠাকুর্ঝি আমার দেহকে নজরবন্দী রাখ্‌লেও মন বাঁধ্‌তে পাল্লো না। মন তার অদর্শনে কাতর হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। আবার সময় সময় সারাচিত্ত বিদ্রোহী হ'য়ে সকল শাসন বন্ধন ছিঁড়ে তার কাছে ছুটে যেতে চাইত। মনে হ'তো কেন? এমন কি পাপ ক'রেছি আমি, যে একজন লোকের সঙ্গেও কথা কইতে পাবো না? না হয় সে মন্দ লোক, তাই ব'লে তার সঙ্গে দু'টো কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পাবো না কেন? এ কিরূপ অত্যাচার? কেন আমি এত সইব?" ঠাকুর্ঝির উপদেশে মন শান্ত হওয়া দূরে থাক্, আরও আগুণ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বড় অস্বস্তিতে সাত আট দিন কেটে গেল। চিন্তা আর আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমনায় আসে না। ঘাটে পথেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। আমি মনে মনে যতই অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ছিলেম, ঠাকুর্ঝি ততই নিশ্চিন্ত হ'চ্ছিল বোধ হয়, কারণ তার পাহারার কড়াক্কড়ী ক'মে আস্‌ছিল।

একদিন দুপুরবেলা আমি রান্না চড়িয়েছি। স্বামী মাঠে গিয়েছেন। ঠাকুর্ঝি এসে ব'ল্লো "বৌ, তুই রান্না কর্, ওপাড়ার শিবুমাসী কেন ডেকেছে আমি চট্ ক'রে শুনে আসি।" সে চ'লে গেলে আমার কেবলি মনে হ'চ্ছিল এই তো উত্তম সুযোগ! যদি চিন্তা একবার আস্‌তো!" ভাব্‌তে ভাব্‌তে কেবল মাছের ঝোল্‌টা উনুন থেকে নামাতে যাচ্ছি, এমন সময় বাড়ীর বেড়ার বাইরে থেকে চিন্তা ডাক্‌লো "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আমার!" আনন্দে সব ভুলে ছুটে গেলেম। চিন্তা অন্তঃর্যামিনী নাকি? সে যে আমায় ভালোবাসে তাতে আর সন্দেহ নাই, নইলে আমার ব্যাথা বুঝে সুযোগ খুঁজে আস্‌বে কেন? সে দুই হাত দিয়ে বেড়ার বাঁখারী সরিয়ে যে ফাক টুকু করে ছিল, তার ভিতর দিয়ে

(৪)

উভয়ে উভয়কে দেখ্‌তে পেলেম। আনন্দের আতিশয্যে আমি বল্‌বার মত কথা খুঁজে পেলেম না। আমাকে না দেখে এতদিন তার কি হালে কেটেছে, করুণ স্বরে সে আমায় সবিস্তারে জানালো। আমি সাগ্রহে তাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে অনুরোধ ক'ল্লেম। সে ব'ল্লো "না ভাই, হঠাৎ তোর ননদ এসে পড়্‌লে তোর লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌বে না। আমি চিরদুঃখী মানুষ, দুঃখে কাতর নই, সে জন্যে ভাবিস্ না। কেবল তোর জন্যেই ভাবনা, তাই তো এবাড়ী আসিনে, তোর দুঃখ আমার বড় বাজে।" আমি ব'ল্লেম "এখন তো ঠাকুর্ঝি বাড়ী নেই, ওপাড়া বেড়াতে গিয়েছে, সকালে আস্‌বেও না।" বাধা দিয়ে চিন্তা ব'ল্লো "তা কি আমি জানিনে? তুই কি ভাবিস্ আমি এ ক'দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোকে ভুলে ছিলুম? তুই কি ভোল্‌বার জিনিস্ ভাই? একবার যে ওমুখ দেখেছে, তার আর ভোল্‌বার যো কি! এ ক'দিন ধ'রে কেবল এম্নি একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছিলেম। সকল সময় আমার চোক্, মন্, প্রাণ এই বাড়ীর দরজাতেই প'ড়ে ছিল।"

চিন্তার কথা গুলোতে কি মাখান ছিল, আমার মন গ'লে গেল। আমি ব'ল্লেম "মাথা খাও, একবার এসো। কেউ নেই, কেউ আস্‌বে না।" চিন্তা কি বল্‌তে যাচ্ছিল, আর বলা হ'লো না। ঠাকুর্ঝি আমার পিছন থেকে বজ্র কঠোর স্বরে ব'লে উঠ্‌লো "বটে!" মুহূর্ত্তমধ্যে বেড়ার অন্তরাল থেকে চিন্তা যেন কোথায় অন্তঃর্দ্ধান হ'লো। আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে সেইখায়েই দাঁড়িয়ে রইলেম। ঠাকুর্ঝি আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল। দেখ্‌লেম তার চোক দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। দুর্দ্দিন বা দুঃখ একা আসে না। ঠিক্ সেই সময় রোদে পুড়ে, এক গা ঘেমে স্বামী এসে দাঁড়ালেন। অম্নি ঠাকুর্ঝি ঝঙ্কার দিয়ে ব'ল্লো, "এখনি আমায় শ্বশুরবাড়ী রেখে আয়। আমি থাক্‌তে তোর বৌ বেরিয়ে গেলে লোকে আমায় বল্‌বে কি? এত দিন তোকে বৌএর হাল্ চালের কথা বলিনি, ভেবে ছিলেম, আমিই শুধ্‌রে নিতে পার্‌বো, থামাকা গোল কর্‌বো না। এখন দেখ্‌ছি এ বৌকে আঁটা আমার অসাধ্য। আমি মানে মানে স'রে পড়ি। আমায় রেখে এসে তোর যা ইচ্ছে হয় কর্।" তারপর আমার চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা, তার নিষেধ ঠেলে লুকিয়ে দেখা করার কথা, সমস্তই ব'ল্লে।

বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত স্বামীকে কখনও রাগ্‌তে দেখিনি, এই প্রথম। আগুনে

তাতা কড়ায় তেল দিলে যেমন আগুণ জ্বলে ওঠে, আমার রৌদ্রতপ্ত ও পরিশ্রান্ত স্বামী তেম্নি জ্বলে উঠে বল্লেন "কোথায় সে? তুমি কেন যাবে, যার বেরিয়ে যাওয়ার সাধ, তাকেই বের করে দিই, দেখুক্‌গে কত সুখ।" খুঁজ্‌তে হ'লো না, ফিরে দাঁড়াতেই আমায় দেখ্‌তে পেলেন। আর ছুটে এসে আমার ঘাড় ধরে বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে ব'ল্লেন "দূর হ। রূপের গুমোর? রূপ বেচে খাগে, অমন বৌ আমার দরকার নেই।" তারপর দরজা বন্ধ করলেন।

ঘেন্নায় অপমানে আমি যেন কি হ'য়ে গেলেম। কতক্ষণ কিছু ভাব্‌বার শক্তি ছিল না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেম। যখন সব ভাব্‌বার শক্তি ফিরে পেলেম, তখন মনে হ'লো "মরণ ভাল" আস্তে আস্তে পুকুরঘাটে যেয়ে বস্‌লেম। ইচ্ছে ডুবে মর্‌বো। বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত শক্ত কথা ননদের কাছেও শুনি নাই। স্বামীর কাছে আদর যত্ন মিষ্টি কথা আমার এক চেটিয়া পাওনা ব'ল্লেই হয়। আজ কোন্ মন্ত্রবলে সব উল্টে গেল। ছি ছি কি অপমান! আর বেঁচে থাকা হবে না। মরণের একমাত্র পথ সম্মুখে পুকুর; কিন্তু সাঁতার জানি, কেমন করে ডুব্‌বো? একটা কল্‌সী নেই, কি করি? নিরুপায়ের সম্বল কান্না। কতক্ষণ ব'সে কেঁদে ছিলেম বল্‌তে পারিনে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হ'চ্ছিল। তখন বেলা দুপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, বিকেলও নয়, কাজেই ঘাট নির্জ্জন ছিল। পিছন দিক্ থেকে চিন্তা এসে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধল্লে। আমি দ্বিগুণ বেগে কাঁদ্‌লেম, সেও কাঁদ্‌লো। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হ'য়ে চিন্তা আমাকে অনেক বোঝাল। সে সব কথা এখন ঠিক্ মনে নাই, তবে মর্ম্মটা এই, "সে আমার সকল দুরাবস্থার কথা জানে। সে সমস্তই স্বকর্ণে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেছে। অমন স্বামীকে আক্কেল দেওয়াই ঠিক্। আমার রূপের দামটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি ম'লে তার কি? মর্‌বো কেন? তার চেয়ে বেঁচে থেকে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। আমার কোন ভাব্‌না নেই, চিন্তার সঙ্গে গেলে, তার কথা মত চল্‌লে, সে সব ঠিক্ ক'রে দেবে।" তার কথায় আমি যেন কূল দেখ্‌লেম। তার মত বন্ধু বা আপনার জন যেন দুনিয়ায় আর কেহ নেই। তার যুক্তি গুলো খুব ন্যায় বলেই মনে হ'লো। অগ্র পশ্চাৎ ন্যায় অন্যায় ভেবে দেখার শক্তিও ছিল না আমার। তৎক্ষণাৎ তার কথায় স্বীকার হ'য়ে মন্ত্র মুগ্ধের মত তার সঙ্গে চল্‌লেম।

প্রকাশ্য রাস্তায় না যেয়ে, চিন্তা আমাকে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে

গাঁয়ের বাহিরে নিয়ে এলো। সারা পথ সে আমার রূপের অজস্র মহিমা কীর্ত্তন, ভবিষ্যৎ সুখ সৌভাগ্যের কথা বল্‌তে বল্‌তে এলো। আমি কিছুই বলি নাই, বল্‌বার বোঝ্‌বার মত শক্তি আমার ছিল না। খিদে তৃষ্ণায় শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ছিল। পা আর চলে না। চিন্তা আমায় কোন মতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। গাঁয়ের বাহিরে খোলা মাঠে এসেই দেখি দাদা। আমায় দেখে দাদা বল্লো "কিরে, তুই কোথা যাচ্ছিস্‌?" আমি কিছুই বল্‌তে পাল্লেম না, কেঁদে ফেল্লেম। চতুরা চিন্তা বল্লো "ওর ননদ মিছি মিছি ওর বরের কাছে কি সব লাগিয়ে দিয়েছিল, সে ওকে মেরে বাড়ী থেকে বার্‌ ক'রে দিয়েছে। ঘেন্নায় ও ডুবে মর্‌তে যাচ্ছিল, আমি ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমাদের বাড়ী রাখতে যাচ্ছিলেম।" চিরদিন দাদা আমায় অন্ধভাবে স্নেহ করে, কখনোও কোন দোষ খুঁজে বুঝে দেখে নাই। আজও আর কোন তল্লাস না নিয়েই রেগে আগুণ হ'য়ে বল্লো "বটে! আচ্ছা, দেখা যাবে কত পয়সা হ'য়েছে তার। কাঁদিস্‌নে তুই, চল, বাড়ী নিয়ে যাই।" পথে আমার অচল অবস্থা দেখে দাদা একখানা গোরুরগাড়ী পেয়ে ভাড়া ক'রে আমায় তাতেই তুলে নিয়ে এলো। চিন্তা বাড়ী ফিরে গেল। চুপি চুপি আমাকে ব'লে গেল "আজ এখানেই রইলুম, একটু কাজ আছে। ওখান থেকে পালানই সুবিধে হবে। তুই ঠিক্‌ হ'য়ে থাকিস্‌। কাল সন্ধ্যা বেলা আমি যাবো, মনে যেন থাকে। প্রতিশোধ নিতেই হবে।"

আমি দাদার সঙ্গে বাড়ী এলেম। পরদিন দুপুরে পুকুর ঘাটে আপনাদের সঙ্গে দেখা। সেই দিন সন্ধ্যায় চিন্তার সঙ্গে কুলত্যাগ ক'রে যাবো কথা ছিল। আপ্‌নি সতীলক্ষ্মী, আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে আমার সকল পাপ কেটে গেল। সে পর্য্যন্ত চিন্তার উপদেশ গুলোই মাথার ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে জাগ্‌ছিল প্রতিহিংসার তৃষ্ণা, আর কিছু ভাবি নাই, ভাবা দরকার বলেও মনে হয় নাই। হঠাৎ আপনার কথাগুলো যেন মনের ভেতর আলো জ্বেলে দিল, সকল চিন্তাশক্তি, হিতাহিত জ্ঞান ফিরে পেলেম। পথ খুঁজে বুঝে চিনে নিলেম। স্বামীর অপরাধ কি? তিনি তো এক দিনও অনাদর অযত্ন করেন নাই। ঠাকুর্ঝি কেবল সুশিক্ষা দিতেই চেষ্টা ক'রেছে। আর আমি? কাঞ্চন ফেলে কাঁচের আদর ক'রেছি। যাঁর গৌরবে আমি গরবিনী, তাঁকেই অশ্রদ্ধা অনাদর ক'রে ফেলে এসেছি তিনি কি আমায় বার্‌ ক'রে দিয়েছেন? কখনো না, এম্নি বার্‌ ক'রে

দেওয়াই আমি চাচ্ছিলেম। তাঁর দোষ কি? খতিয়ে দেখ্‌লে আমার ত্রুটি ক্ষমাতীত, তাঁদের ত্রুটি কোথায়? কার উপর কিসের প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি? এখনো সময় আছে, এখনো ফির্‌তে পারি। ক্ষমাশীল স্নেহপ্রবণ হৃদয় তাঁর, এখনো তাঁর ক্ষমা পেতে পারি। আর এখানে থাকা নয়, হয় তো চিন্তার কুহকে প'ড়ে আবার কি হ'য়ে যাবো। পাপ ছেড়ে পুণ্যের আশ্রয় নিইগে, তাহ'লে নিশ্চয় বাঁচতে পার্‌বো। তাঁর কাছে আমার কিসের অভিমান? অপরাধ ক'রেছি, ক্ষমা চাইতেই বা লজ্জা কি? কিসের দুঃখ আমার? পাপিনী চিন্তা মরণকাঠী, তার পাপস্পর্শে আমি ম'রে গিয়ে ছিলেম। দিদি! তুমি আমার সোনার জীয়ন কাঠি, তোমার চরণ ছুঁয়েই আমি বাঁচলেম।

সেই দিনই মাকে বল্লেম "আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ভেবে দেখ্‌লেম, রাগ ক'রে চ'লে এসে ভালো করি নাই। বেশী দিন থাক্‌লেই অপরাধ বেশী হবে, তাঁরাও রাগ কর্ব্বেন। আজই যাবো" আর কারুর কোন যুক্তি তর্কে কাণ দিলেম না। দাদা বল্লো "দু'চার দিন থেকে যা, শালার আক্কেল হোক্‌। নিতে এলে তখন যাস্‌।" আমি তাতে সম্মত হ'লেম না। অগত্যা দাদা আবার গারুরগাড়ী ক'রে আমায় নিয়ে চ'ল্লো। অর্দ্ধেক পথ যেতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা, তিনি আমায় নিতেই আস্‌ছিলেন। ঐ যে গাড়োয়ান আমায় রেখে গিয়েছিল, স্বামী তার মুখেই আমার দাদার সঙ্গে এখানে আসার খবর পেয়ে ছিলেন। দাদা স্বামীকে ব'ল্লে "তুমি তো বেশ লোক, এমন অপরাধ ও কি ক'রেছিল যে বাড়ী থেকে বার ক'রে দাও? ঘরে পরে সবাই ওর স্বভাবের সুখ্যাতি করে, আর তোমাদের কাছেই ভালো হ'লো না? আমি তোমায় এত সহজে ছাড়্‌তেম না, বেশ ক'রে আক্কেল দিতেম, কেবল ওর পেড়াপিড়ীতেই এবার ছাড়্‌তে হ'লো। সেদিন যদি আমি গোরু কেনার জন্যে হাটে না আস্‌তেম, তা হ'লে কি হ'তো বলতো? কথায় কথায় বাড়ী থেকে বার ক'রে দাও, গেরস্তর মেয়ে, কোথায় যাবে? সেদিন যদি মনের দুঃখে জলেই ডুবে মর্‌তো! মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তবু আপনি তোমার বাড়ী এলো, কারু মানা শুন্‌লো না, এমন স্ত্রী ক'জনের হয়? নেহাত হতভাগা, গোঁয়ার তুমি, তাই লক্ষ্মীকে চিন্‌লে না। এমন লক্ষ্মী সোনা দিয়ে গড়ালেও হয় না!" স্বামী লজ্জিত অনুতপ্ত হ'য়ে ব'ল্লেন—"আর বলবেন না, আর কখনো

এমন হবে না : সত্যিই সেদিন আমায় যেন ভূতে পেয়েছিল, নইলে এমন অন্যায় করি ? এবার আমায় মাফ করুন।"

শান্ত হ'য়ে দাদা ব'ল্লো "তবে তুমিই গাড়ী নিয়ে যাও। আমি বাড়ী ফিরে যাই, কাজ আছে, ফিরতে আবার রাত্ হ'য়ে যাবে।" দাদা ফিরে গেলে স্বামী গাড়ীর ভিতর এসে ব'ল্লেন "লক্ষ্মী, রাগ ক'রেছ ?" কি বল্‌বো ? রাগ করবো কোন্ লজ্জায় ? অপরাধ কার ? কিছু বল্‌তে পাল্লেম না, কেঁদে ফেল্লেম। তিনি সস্নেহে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আঃ বাঁচলেম স্বর্গ আর কোথায় ? এই স্বর্গ স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে কিসের মোহে নরকে যাচ্ছিলেম ? কি মহাভ্রম। এমন ভ্রম যেন শত্রুরও না হয়। তিনি অনেক মিনতি ক'রে ক্ষমা চাইলেন। কে কাকে ক্ষমা কর্ব্বে ? অপরাধ কার ? চেষ্টা ক'রে ব'ল্লেম "আমারি অপরাধ হয়েছে, তুমি আমায় ক্ষমা করো।" তিনি আমায় আর বল্‌তে দিলেন না,—মুখ বন্ধ ক'রে রাখ্‌লেন। তাঁর বুকে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে মনের কালি ধুয়ে গেল। দেবতা তিনি, তাঁর স্পর্শে দেহ মন পবিত্র হ'লো।

ঘরে ফিরে এবার সত্যি নতুন মানুষ হ'লেম। ননদ ও স্বামীর স্নেহের আর ত্রুটি দেখিনে, বরং অনেকের চেয়ে বেশী ব'লেই মনে হয়। আর কোন দুঃখ নেই, তবে অনুতাপ বড়। এই তেরো বৎসর তাঁর প্রত্যেক আদর যত্নের সঙ্গে সমানে অনুতাপ ভোগ ক'চ্ছি, আমার কি প্রায়শ্চিত্তের শেষ হবে না দিদি ? কত দিন ভেবেছি তাঁকে সব খুলে ব'লে ক্ষমা চাইব ; বল্‌তেও গিয়েছি, কিন্তু তিনি ওকথা তুল্‌তেই দেন না। যদিও তিনি না চাইতেই ক্ষমা ক'রেছেন, কিন্তু তাতে কি সান্ত্বনা ? আমার মনের পাপ বা অপরাধ তো তিনি দেখ্‌তে বা জান্‌তে পারেননি। কিছুতেই মনে শান্তি না পেয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। গুরু, ভগবান্, দেবতা কাউকে জানিনে ; জানি আপনাকে। ছেলেবেলা আপনার যত্নে চলন সই একটু লেখা পড়া শিখেছিলেম। যৌবনে আপনার উপদেশেই মেয়ে মানুষের কর্ত্তব্য শিখেছি। আপনার পায়ের ধূলো, আপনার আশীর্ব্বাদ আপনার কথা আমায় বিপথ থেকে ফিরিয়ে আমার হারাণো সর্ব্বস্ব আমায় ফিরিয়ে দিয়েছে। এই বলিয়া লক্ষ্মী ভক্তিভরে আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

উচ্ছৃঙ্খল নষ্টচরিত্র সন্তানের মাতা যেমন শঙ্কাকুল হইয়া সন্তানেরই মঙ্গলকামনায় তাহার চরিত্র সংশোধনের জন্য তিরস্কার করে, পুত্রের কোন একটা কার্য্যের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে না পারিয়া দিন দিন তাহার ভক্তি ও ভালবাসা হারাইয়া বিরক্তির কারণ হয়, তাহার ভাবী জীবনের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্যথিত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইয়াও সর্ব্বদা এটা সেটা লইয়া পুত্রের বিরুদ্ধে চলিতে গিয়া তাহারও যেমন তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়ে, প্রিয়ম্বদারও ঠিক সে অবস্থাই ঘটিয়াছিল। স্বামী ললিতমোহন নিজের কথা না ভাবিয়া এই যে জীবনে মরণে বীতশ্রদ্ধ সন্ন্যাসীর মতই এর ওর তার বিপদ ঘাড় পাতিয়া লইতেছিল ; অনাথ, দুস্থ, বিপন্নের রক্ষার্থ একবারের জন্যও নিজের অবস্থার বিষয় বা ভবিষ্যৎ ভাবিত না ; বিধবার কন্যাদায়, রুগ্নের চিকিৎসার সাহায্য, বন্ধুর বিপৎপ্রতিকার এমনই কতগুলি কাজে প্রাণপাত করা ললিতমোহনের পক্ষে যে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা ভাবিতে গিয়া স্বামীর শারীরিক ও আর্থিক এই উভয়বিধ অমঙ্গল চিন্তায় প্রিয়ম্বদার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িত। ক্রুদ্ধ বেদনাকাতর হৃদয়ে স্বামীকে বাধা দিতে গিয়া সে তাহার ব্যবহারে অব্যক্ত কুণ্ঠায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াও বাধা না দিয়া যেন কোন প্রকারেই তিষ্ঠিতে পারিত না। এই ললিতমোহনই যখন আত্মপর ভুলিয়া সময়-অসময়, সুবিধা-অসুবিধা না ভাবিয়া যেখানে অভাব, সেখানেই দুই হাতে অর্থব্যয় করিত, নিজের সামর্থ্য বা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া রোগীর শুশ্রূষা, মুমূর্ষুর অন্তিম ক্রিয়া, মৃতের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দান করিত, তখন প্রিয়ম্বদা স্বামীর তাচ্ছিল্য,ঘৃণা, বীতরাগ প্রভৃতির কথা মনে করিয়াও আপনার মুখ সংযত রাখিতে পারিত না ; সাধ্বী স্বামীর একান্তই শুভাকাঙ্ক্ষিণীর মন উদ্বেগে আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড়িত। এ সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, জেদ করিয়াও যখন কোন ফল হইত না, বরং স্বামীর বিরক্তিই অনুভব করিত, তখন সে স্বামীর গৌরব পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া অনেক সময় এমনই কড়াকড়া কতগুলি কথা বলিয়া ফেলিত, যাহার ফলে ললিতমোহন দিন দিনই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। প্রিয়ম্বদার সযত্ন পরিচর্য্যা ও প্রাণভরা ভালবাসাটাকে এই অসহনীয় মুখরতাটা এমনই কদর্য্য করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল যে, কোন সময়ের জন্যই ললিতমোহন তাহার এই কঠোরতাটা যে কত বেদনা, কত ভালবাসার ফল, তাহা বুঝিতে পারিত না, বরং নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়া সে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। প্রিয়ম্বদাকে সে তাহার সুখশান্তি ও কর্ত্তব্যের অন্তরায় বলিয়াই ঠিক করিয়া লইত। এমনই ভাবে এই দম্পতী বিভিন্নমুখ নদীস্রোতের ন্যায় ঘাতে-প্রতিঘাতে

ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। তাই আজও যখন ললিতমোহন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—"প্রিয়ম্বদা, দাওত চাবির গোছাটা।" তখন প্রিয়ম্বদা কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"চাবির গোছা! কেন, কি হবে চাবি দিয়ে ?"

ধীর গম্ভীরস্বভাব ললিতমোহন অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়াও বাহ্যিক আচরণে সহসা প্রিয়ম্বদার প্রতি সে ভাবটা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত। প্রিয়ম্বদাকে কোন রূঢ় কথা বলিতে হইলে সমবেদনায় তাহারও হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া পড়িত। তাহারই মত প্রিয়ম্বদারও যে জগতে আপনার বলিতে আর কেহ নাই, ভাবিয়া সেও বিষণ্ণ হইত এবং যতটা পারিত সংযত হইয়াই সে প্রিয়ম্বদার কথার উত্তর করিত। তাই আজও সে গম্ভীরস্বরেই বলিল—"কিছু টাকা বের ক'রে নিতে হ'বে। রমার মা আজ ক'দিন থেকে হাটা-হাটি ক'চ্ছে, রমার বের ঠিক হয়েছে, হাতে কিছুই নেই। তাই সে কোন যোগাড়ই কত্তে পারে নি। এখনকার মত তাকে গোটাকত টাকা দেব ভেবেছি।"

সহসা মাথা উচু করিয়া অস্পষ্টস্বরে প্রিয়ম্বদা উত্তর করিল,—"যে এসে হাত পাত্‌বে, তাকেই টাকা দেবে; এত টাকাই বা তুমি পাবে কোত্থেকে ?"

ললিতমোহন কি বলিতে যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা বাধা দিয়া এবার একটু উত্তেজিতভাবে বলিল—"এই যে দু'হাত ভরে টাকা বিলুচ্ছ, এর পরিণামটা কি একবারও ভাব্‌বে না ?"

ললিতমোহন মনে মনে বিরক্ত হইয়াও তাহা চাপিয়া রাখিয়া উত্তর করিল—"ভেবেই বা কি কর্‌ব ? যদ্দিন আছি, আমারও ত একটা কিছু নিয়ে থাকৃতে হবে ?"

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে আঘাতটুকু ছিল, এমন আঘাত প্রিয়ম্বদা নিজের দোষ মনে করিয়া নতমস্তকে অনেকবারই সহ্য করিয়া লইয়াছে; আজ যেন সে আর পারিয়া উঠিল না। সে যে ললিতমোহনেরই সর্ব্বাঙ্গীন হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া বাদপ্রতিবাদ করিয়া থাকে, ললিতমোহন ত কোন প্রকারেই তাহা বুঝিবে না, বরং বৃথা দোষ চাপাইয়া তাহাকে অপদস্থ তিরস্কৃতই করিবে, ভাবিয়া সেও উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল—"একটা কিছু কেন, অনেক নিয়েই তোমায় থাকৃতে হচ্ছে, তা আমিও জানি, কিন্তু তা বলে দিন দিন এই যে ব'য়ে যাচ্ছ, সেটাত আর তোমার মত সবাই না ভেবে পারে না।"

কথার খোঁচাটা ললিতমোহনকে তীব্র বেদনায় বিদ্ধ করিল। এবার সেও কর্কশকণ্ঠেই বলিল—"সে ভাবনা তোমার না ভাব্‌লেও চল্‌বে, একথা তোমায় অনেক দিন বলেছি। যদি ভুলেই যেয়ে থাকত, আজও আবার মনে করে দিচ্ছি প্রিয়ম্বদা, এসব কথার মধ্যে তুমি যেন আর থাকৃতে এস না।"

একমুহূর্ত্ত ঘাড় নীচু করিয়া বসনাঞ্চলে চোক মুছিয়া এবারও প্রিয়ম্বদা

রুষ্টস্বরেই উত্তর করিল,—"থাকা না থাকা নিয়েত কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে এই নিয়ে যে, এমনই যে দিন দিন নিজের মাথা বিকিয়ে ঋণ ক'রে পরের উপকার কচ্ছ, আমি ত তা সহ্য কত্তে পারব না।"

ললিতমোহন ক্রমেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পড়িতেছিল। প্রিয়ম্বদাকে সে যে একেবারেই ভাল বাসিত না, তাহা নহে, বিস্ময়ের বিষয়—এ ভালবাসাটা যেন তাহাকে শোয়াস্তি দিতে পারিত না, বরং সর্ব্বপ্রকারে পীড়নই করিত। তাই সে এবার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কথার বেলায় ত তুমি কখনও কম নও প্রিয়ম্বদা! কিন্তু কৈ, আজ পর্য্যন্ত আমি যাতে সুখী হই, এমন একটা কাজও ত তোমায় কত্তে দেখ্‌লাম না। ভেবেছ, শাসিয়ে স্বামীকে মুঠার ভিতর রাখ্‌বে, না?"

দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে প্রিয়ম্বদার চোখ জলপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে মাথা নীচু করিয়া কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল; তাইত, সত্যইত এসকল বিষয়ে সে স্বামীর মনোমত হইয়া কোন একটি কাজও করিতে পারে না। সত্যইত তাহার ব্যবহারে স্বামী একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখশান্তির মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। বরং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মতের জ্বালায় তিনি দগ্ধই হইতেছেন। তাহাই যদি হইল, স্বামীকে সুখী করিবার শক্তিই যদি তাহার না থাকিল ত, এমন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবার শক্তিই বা আসে কোথা হইতে, অনেক চিন্তা করিয়া প্রাণে প্রাণে অনেক যুদ্ধ করিয়া কোন প্রকারেই যে সে তাহা ঠিক করিয়া লইতে পারিত না! সে জানে না, স্বামীর কোন অনিষ্টের কথা মনে হইলে তাহার বুক কেন সজোরে কাঁপিয়া ওঠে, মুখ কালী হইয়া যায়, শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। হায়! এটা যে তাহার কত ভালবাসার পরিণাম, কত ভবিষ্যচ্চিন্তার ফল, তাহাত তাহার স্বামী বোঝে না, বরং বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়। কি যে প্রহেলিকা! কেন যে সে যন্ত্রচালিতের মতই এ সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রতিকারে অসমর্থ সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইষ্ট করিতে গিয়া নিজেরই মহা অনিষ্ট করিয়া বসিত, তাহা তাহার নিকট নিতান্তই দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইত।

ললিতমোহন প্রিয়ম্বদাকে একবারেই ভুল বুঝিত। প্রিয়ম্বদা নিজেরই আকৃতিসদৃশ নীচ পরশ্রীকাতর, প্রলুব্ধ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পরিপোষণের জন্য এই সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার প্রাণের উচ্চ প্রবৃত্তির প্রেরণাটাকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত চাহে, সে একেবারেই ইহা ঠিক করিয়া লইত। প্রিয়ম্বদার বেদনাটা যে কোন্ খানে, তাহা যে কত বড়, ভাবিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন ভাবিত, সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘরের অর্থ পরকে দিতে দেখিলেই প্রিয়ম্বদা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাই সে এবার প্রিয়ম্বদাকে শ্লেষ করিয়া বলিল—"যারা নিজেরই নিয়ে ব্যস্ত, তারা কারু উপকার ত কত্তে পারেই না, কাউকে কত্তে দেখ্‌লেও তাদের প্রাণ জ্বলে ওঠে, না!"

প্রিয়ম্বদা আবারও কি বলিতে যাইতেছিল। বামীর মা ঝি ঘরে ঢুকিয়া ললিতমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বাবু, বাইরে কে আপনাকে শিগ্‌গির ডাক্‌ছেন।"

ঝি ঘরে প্রবেশ করিতে নিতান্তই সেকালের লোকের মত পরিহিত বসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া প্রিয়ম্বদা জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। ললিতমোহন এবার আরও বিরক্ত হইয়া বলিল—"না, আমি ত আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি না। চাবিটা দেবে কি না বল?"

অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা বালিশের নীচু হইতে চাবির গোছাটা টানিয়া আনিয়া মেঝের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

* * * * *

দুপুরে খাইতে যাইবার পথে ঝিকে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গিয়া তাহার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা গা ঝি, দুপুর-রোদে ছুটে কোথা যাচ্ছিস।"

ঝি ব্যস্ততার সহিত উত্তর করিল—"ওমা, এখনও শোন নি, বাবু যে এইমাত্র একটা রোগী ঘাড়ে করে বাড়ী এয়েছেন, আমায় বল্লেন, একটা বিছানা নে যেতে।"

প্রিয়ম্বদা আড়ষ্ট হইয়া গেল! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই ললিতমোহন খাওয়া দাওয়া করিয়া জামা কাপড় পড়িয়া কোথায় যাইবেন বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে আবার কোথা হইতে কাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছেন, ভাবিতে গিয়া সে যেন স্বামীর জন্য প্রাণে প্রাণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। ঝি—"তাড়াতাড়ি নে যাই, তাকে যে শোয়াতে হবে।" বলিয়া এক পা বাড়াইতেই প্রিয়ম্বদা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জানিস ঝি, কি রোগ হয়েছে তার।"

ঝি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল—"আহা ছোড়াটার উপর মায়ের কৃপা হয়েছে। সকল গায়ে যেন কালির দাগ বসিয়ে দিয়েছে। কেউ নেই কি না, তাই বাবু তাকে নিয়ে এলেন।"

প্রিয়ম্বদা শিহরিয়া উঠিল। অনাথ, দুস্থ, আশ্রয়হীন রোগী ঘাড়ে বহিয়া বাড়ীতে আনিয়া চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করাটা ললিতমোহনের পক্ষে নূতন না হইলেও আজ যে সে একটা বসন্তের রোগী লইয়া এমনি নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহা ভাবিয়া এবং এই রোগের সংক্রামকতাটার কথা মনে করিয়া সে সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল। ভাবী আশঙ্কায় তাহার ক্ষুব্ধ ব্যথিত প্রাণটা যেন দম বন্ধ হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। হায়, সে যে কত নিরুপায়, ইহার বিরুদ্ধে কথাটি বলিতে গেলে, ফলে যে তাহার সঙ্গী দুর্ভাগ্যটাই বৃদ্ধি পাইবে। ললিতমোহন আরও জোরে তাহাকে হৃদয় হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবে! ঝি অতি দ্রুত চলিয়া গিয়া তখনি আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"ওষুধের গেলাসটা দাও ত মা, বাবু চাইলেন।"

প্রিয়ম্বদা প্রথমে কোন কথাই বলিতে পারিল না, তাহার যেন বাক্-

রোধ হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তে নিজেকে যথাসম্ভব সাম্‌লাইয়া লইয়া বুক কাঁপাইয়া একটা চাপা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলিয়া উঠিয়া সে বলিল—"দুর হয়ে যা আমার কাছ থেকে। বল্ গিয়ে তোর বাবুকে. সেই নেবে'খন।"

ঝি কিন্তু বাবুকে কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল—"দাও না মা, বাবু যে শীগ্‌গির করে নে যেতে বল্লেন।"

প্রিয়ম্বদা আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন সেখানে উপস্থিত হইয়া ঝিকে লক্ষ্য করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিল—"তোকে না গেলাসটা নিয়ে যেতে বল্লুম, দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছিস্ না!"

সকালের সে আঘাতটা প্রিয়ম্বদার বুকের ভিতরে যে বিষাক্ত হুলটা ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা এখনও একটা তীব্র জ্বালার ভাব লইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, তথাপি সাধ্বীর হৃদয় স্বামীর জন্য এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, সে অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—"এমনি করে এসব সংক্রামক রোগ নিয়ে তুমিই না হয় খেলা কত্তে পার, তোমার কেউ নেই, কাজে কাজে প্রাণের মায়াও নেই, কিন্তু বাড়ীতে ঝি চাকর যারা আছে, তাদের ত প্রাণের মায়া না কল্লে চলে না।" বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা যাতনার প্রবল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

কথাটা যে কত বড় সত্য, তাহা ললিতমোহন একবারের জন্যও ভাবিল না। প্রিয়ম্বদা যে কাঁদিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার অবকাশও যেন তাহার ছিল না। প্রায় প্রতিকার্য্যেই সে প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে যেরূপ বাধা পাইয়া আসিতেছিল, ইহাও তাহারই অন্যতম মনে করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"কৈ তারা ত কেউ কোন কথা বলেনি, বৃথাই তাদের নাম কচ্ছ প্রিয়ম্বদা! মর্‌বার ভয়ই তোমার এত বেশী হয়ে থাকে ত, না হয় তোমারই জন্য আমি আলাদা করে আর একটা জায়গা ক'রে দিচ্ছি।" বলিয়াই ললিতমোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

* * * * * *

নিস্তব্ধতার মধ্যে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া প্রিয়ম্বদা এপাশ ওপাশ করিতেছিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল, কেন আমি মরি না, আমার জন্যই ত প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী এত কষ্ট পাইতেছেন; আমি মরিলে তিনি আবার বিবাহ করিবেন, বিবাহ করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু বাঁচিয়া ত তাঁহাকে একদিনের জন্যেও সুখী করিতে পারিব না। একত আমার এ কুরূপ, শিক্ষাহীনতা, তারপর তাঁহার মতের বিরুদ্ধে চলিয়া কেবলই তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছি। যাহা করিলে তিনি সুখী হন, তাহাত আমি এক দিনের জন্যও করিতে পারি নাই; প্রাণ ধরিয়া পারিবও না। দিন দিন এই যে তিনি অপ্রতিকার্য্য বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, তাঁহারই অনুমোদন করিয়া এই বিপদের পরিণামটা বাড়াইয়া দিয়া আমি তাঁহার মনোমত হইব, তাহা যে কখনই হইতে পারে না। আমি কে,—তিনিই ত সব, এখন না হ'ক, ভবিষ্যতেও যাহাতে এই বিপদের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তাহা যে আমাকে করিতেই হইবে। নীচ,

পরশ্রীকাতর বলিয়া, তিনি আমায় ঘৃণা করেন করিবেন, আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইব।

অদ্যকার ব্যবহারের জন্য ললিতমোহনও মনে মনে বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া পড়িতেছিল। এভাবের কথা লইয়া অনেক সময়েই তাহাদের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু এমনই কতকগুলি কঠোর উক্তি সে ত কোন দিন করে নাই। ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত অবসন্নদেহ ললিত-মোহন ধীর পাদক্ষেপে শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া স্নেহজড়িত স্বরে ডাকিল—"প্রিয়ম্বদা !"

প্রিয়ম্বদা মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল; তেমনই রহিল। ললিতমোহন শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া অনুতপ্তস্বরে বলিল—"বড্ড অন্যায় করেছি, তুমি তাই ভাব্‌ছ, না প্রিয়ম্বদা ?"

প্রিয়ম্বদা কথা বলিল না! ললিতমোহন আবারও বলিল—"বল ত প্রিয়ম্বদা এমনটাই বা কেন হয়? তুমিই কেন আমার মনোমত হয়ে চল্‌তে পার না ?"

প্রিয়ম্বদা কাঁদিয়া ফেলিল। অস্ফুট ক্রন্দনের শব্দে ললিতমোহন চমকিয়া উঠিয়া প্রিয়ম্বদাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"সুখ কাকে বলে জান্‌ব না বলেই বুঝি, বিধাতা তোমায় আমায় বিভিন্ন মত দিয়ে গড়েছেন !"

অতিকষ্টে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রিয়ম্বদা কি বলিতে যাইতে-ছিল, সহসা প্রলয়ের শব্দের মতই একটা ভীষণ শব্দে উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিতেই বাহির হইতে ঝি চীৎকার করিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ হলো গো বাবু, সর্ব্বনাশ হলো, ও পাড়ায় আগুন লেগেছে।"

আগুনের কথা শুনিয়া ললিতমোহন মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা কম্পিতহস্তে তাহার হাত চাপিয়া ধরিতেই সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

(৭)

ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"কি করি সে টাকাটার বল্‌ত নিখিল ?"

নিখিলেশ একমনে কি লিখিতেছিল, বিস্মিত দৃষ্টিতে ক্ষণেক ললিতমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—"তোকে ত অনেক দিন বলেছি, ওতে গিয়ে কাজ নেই।"

"কিন্তু আমি না গেলে বিধবার টাকাগুলো আদায়ের কোন উপায়ও ত হয় না !"

নিখিলেশ হাসিয়া বলিল—"ভাবিস্‌ বুঝি, তুই ছাড়া আর লোকই এ পৃথিবীতে নেই, না? কেন আর যে কেউত ঐটের জন্যে চেষ্টা কত্তে পারে।"

ললিতমোহন বিস্মিত হইয়া নিখিলেশের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়-

বিমিশ্র স্বরেই বলিল—"বলিস্ কি তুই, আর যদি কেউ পারৃত ত আমি যাই ওতে? আমিত জানি, তাঁরা আমায় স্নেহ করেন, তা জেনে শুনে দায়ে পড়েই যে তাঁদের সঙ্গে আমায় এ শত্রুতা কত্তে হচ্ছে।"

নিখিলেশ হাতের কলমটা রাখিয়া দিয়া হাত ধরিয়া ললিতমোহনকে বসাইয়া লইয়া বলিল—"এমনই যদি কেউ নাই থাকেত, নাই থাকৃল, ঘরের খেয়ে পরের জন্য নিজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা সে কখনও হতে পারে না।"

"কিন্তু কাজটা ত তাদেরও ভারি অন্যায় হচ্ছে, সামান্য কটা টাকা বৈত নয়, দিয়ে দিলেই চুকে যেত।"

নিখিলেশ মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—"ন্যায় অন্যায়ের বিচার, সে ত সব সময়ে চলে না রে ললিত! আর তাইবা কি, তাঁরা ত বল্‌ছেন, ন্যায্যভাবে ও টাকাটা অপর সরিকেরই দেয়। কোথাকার কে তার জন্য তোরই বা এত বাড়াবাড়ি কেন ?"

ললিতমোহনের স্বভাবের এমনই একটা বিশেষত্ব ছিল যে, যে কাজটা সে একবারের জন্যও ধর্ম্ম এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করিত, তাহা হইতে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হইতে চাহিত না। নানা লোকের নানা প্রকারের কাজের মধ্যে গিয়া গিয়া বয়সের এই অপরিণত অবস্থায়ই এটা সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল, কাহারও বিধিনিষেধে বাধ্য হইতে গেলে কোন ভাল কাজ করিয়া ওঠা একপ্রকার অসম্ভবই হইয়া পড়ে। তাহার কারণ সংসারের অধিকাংশ লোকই ভয়ানক স্বার্থপর এবং তাহাদের হৃদয় ভয়ানকভাবে নীচতায় পরিপূর্ণ। যাহার যেখানে কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ পর্য্যন্ত বিজড়িত রহিয়াছে, একটা মহৎ কাজকেও একটুমাত্র স্বার্থহানির আশঙ্কায় সে মুক্তকণ্ঠে নিতান্তই গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ ত করিবেই না, অধিকন্তু তাহার ঐ স্বার্থের কণিকাটুকু রক্ষা করিতে গিয়া সে পরের একটা মহা অনিষ্ট করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এতদিনের মধ্যে এক দিনের জন্যও নিখিলেশের মধ্যে ললিতমোহন এ ভাবটা অনুভব করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই ললিতমোহনের উদার মহৎ প্রাণ ইহাকে যেরূপ জড়াইয়া ধরিয়াছিল, পৃথিবীতে এমনটা আর তাহার কোথাও হয় নাই। আজ নিখিলেশও ধরা পড়িল, সেও যে প্রাকৃত জনের ন্যায় আপনার উন্নত হৃদয়কে এতটুকু একটা স্বার্থের কাছে মাথা নোয়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিল, ললিতমোহন প্রত্যক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা সহ্য করিতে পারিল না। এমন কি নিখিলেশের কথার মধ্যে তাহার প্রচ্ছন্ন স্বার্থহানির আশঙ্কা মনে মনে অনুভব করিয়া সে আরও জোরে ঘাড় উচু করিয়া দাঁড়াইয়া যে ভাবে হউক, এ কাজটা তাহাকে করিতেই হইবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তবু কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার যেন কেমন একটা খট্‌কা বোধ হইতেছিল। নিখিলেশ তাহার আবাল্য বন্ধু, কেবল বন্ধু নহে, আপনার বলিতে যত কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে সমস্তই যেন নিখিলেশের একই হৃদয়ের মধ্যে সে দেখিতে পাইত, তাহারই জোরে

ললিতমোহন নিখিলেশ ও তাহার স্ত্রীকে প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভাল বাসিত। আপনার বন্ধনহীন বিশৃঙ্খল জীবন পরেরই হাতে সঁপিয়া দিতে গিয়া সে একা অনেকের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ডুবিয়া রহিয়াছিল বটে, তথাপি বাল্য-সহচরী সহোদরা অপেক্ষাও স্নেহের পাত্রা লীলা, প্রাণের বন্ধু নিখিলেশ ও তাহার পত্নী সরসী এই তিনটিই ছিল উন্মুক্ত আকাশের গায়ে ধ্রুবতারা। ইহাদের প্রাণভরা ভালবাসার শীতল ছায়াই তাহাকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে দূরে রাখিত। লীলার পরিণাম দেখিয়া তাহাতে ললিতমোহনের দুঃখ ভিন্ন সুখ ছিল না, কিন্তু এই বন্ধুদম্পতীর সুখময় জীবনের মধুর স্মৃতি তাহারও প্রাণের মধ্যে এমনই সুধাধারা ঢালিয়া দিত যে, এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সে মাঝে মাঝে আপনাকে অমর বলিয়া ভ্রম করিয়া বসিত। ইহাদের জন্য হাসিমুখে সে অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করিত, ইহাদেরই হাসিমুখ দেখিয়া আবার সংসারের প্রবল ঝড়ঝাপ্টার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া লইত। আজ একটি অনাথা বিধবাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি ইহাদের কোন অসন্তোষজনক কার্য্যই হইয়া পড়ে ত, শেষটা নিখিলেশ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধও হইয়া পড়িতে পারে, ভাবিতেই ললিতমোহন আপন মনে একবার শিহরিয়া উঠিল। তাহা হইলে বস্তুতই সে তাহার জীবনে একটা মহা অভাব অনুভব করিবে, সে এমনই অভাব, যাহার পরিবর্ত্তে সমস্ত সংসার ছাড়িয়া দিলেও তাহার পূরণ হইবে না। কিছু সময় ধরিয়া এইরূপ মৌন চিন্তার পর সহসা যেন কর্ত্তব্যের কঠোর কষাঘাতে ললিতমোহনের লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে স্নেহ, মায়া বন্ধুপ্রীতিহানির আশঙ্কাগুলি একমাত্র কর্ত্তব্যের হাতেই তুলিয়া দিয়া এবার আরও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"তুইও কিন্তু ওদের দিক্ ঘেসেই কথাগুলো বল্‌ছিস্, তোর শ্বশুরইত টাকাগুলো নিয়েছিলেন। এখন ভাগের ভাগ এই বিধবার টাকাটাই পর্‌ল কি না, যারা দিতেই পার্‌বে না, তাদের হাতে?"

নিখিলেশ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজ শান্তভাবে একটুখানি হাসিয়া ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"না বলেই বা কি করি? এর মধ্যে তুই থাকিস্ত, তাঁরা তোর উপরত অসন্তুষ্ট হবেনই, আমার ওপরও খাপ্পা হয়ে দাঁড়াবেন। এটা তাঁরা ঠিকই বুঝ্‌বেন, আমায় না জানিয়ে কিছু তুই একাজ কখনও করিস্‌নি। আর দেখ্‌তেই পাচ্ছি, টাকাটা দেবার ইচ্ছে তাঁদের আদপেই নেই! মতলব খারাপ, এ'র মধ্যে গেলেই যে একটা ঝগড়া কলহ অবশ্যম্ভাবী।"

নিখিলেশের কথাটায় সহসা যেন ললিতমোহনের চোকের উপর হইতে একটা কাল পর্দ্দা সরিয়া গেল। এই আশঙ্কাটা যে তাহার ললিতমোহনকে কতটা ভালবাসার পরিণাম, তাহা বুঝিতে পারিয়া ললিত-মোহনের প্রাণটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য নাচিয়া উঠিল, কিন্তু কাজের কথাটা সে ভুলিল না। বলিল—"ওতেইত আরও রাগ হচ্ছে, এত টাকা থাকৃতে তাঁরা দেবেন ফাঁকি, আর তাদের কাছে টাকা ফেলে রেখে অনাথা বিধবাটা

মর্‌বে না খেয়ে! না ভাই, এতটা অন্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইতে পার্‌ব না।"

নিখিলেশ এবার গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—"বল্‌তে কইতে ত কম করিস্ নি! এখন আবার কি কত্তে চাস্ শুনি?"

"শেষ পর্য্যন্ত লড়ে দেখ্‌ব। প্রথম ত এদ্দিন যা করে আস্‌ছি, আর কটা দিনও তাই কর্‌ব। বল্‌ব, কইব, অনুনয় বিনয় কত্তেও ছাড়্‌ব না, তাতে যদি নাই হয় ত শেষটা আমায় নালিশ পর্য্যন্তও কত্তে হবে।"

ভবিষ্যতের একটা দুর্ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া নিখিলেশের মুখ কাল হইয়া গেল। ললিতমোহন যখন নিজের কিছুমাত্র স্বার্থসম্পর্কশূন্য এই ন্যায্য কাজটার মধ্যে এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য নাই, এটা সেও বেশ ভালরূপই জানিত। তাই এবার সে শঙ্কিতস্বরে বলিল—"নালিশ করবি! বল্‌ছিস্ কিরে?"

"বলাবলি এর ভিতর ত কিছু নেই।"

নিখিলেশ ললিতমোহনের হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল—"নারে না, এ সব মতলব কিন্তু তুই করিস্‌নি। কতই বা টাকা, শ-চারেক হবে ত, তুই না হয় দিয়ে দে এখন।"

ললিতমোহন নিখিলেশের ভিতরটা এবার আরও পরিষ্কারভাবে দেখিয়া লইয়া আর একবারের জন্যও আনন্দে হর্ষে পুলকিত হইয়া উঠিল। টাকাটা নিজে দিয়া দিলেই চলিতে পারে, তাহা সেও জানিত, কিন্তু ওদিকটা দিয়া তাহার মন যে মোটেই যাইতে চাহিতেছে না। আসল কথাটা এই যে, দুচারশ টাকা সে দিতে না পারে এমনও নহে, দুচার-জন অনাথা বিধবার প্রতিপালনের ভার তাহার উপর না আছে, তাহাও নহে; কিন্তু এর ভিতর গলদই এই যে, নিখিলেশের শ্বশুর তাহাদের ন্যায্য অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া যে টাকাটা নিজ হাতে বিধবার কাছ হইতে লইয়াছেন, তাহার কোন দলিলপত্র না থাকায় এখন তাহা না দিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের পরিপন্থী এমনই একটা কাজ করিবেন, সেটা সে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। সে যতই ভাবিতেছিল, ততই যেন তাহার মনে হইতেছিল, মানুষ স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া এ ভাবের এমনই একটা দুর্ব্বলতা দ্বারা সংক্রামকরূপে সমাজকে আকড়াইয়া ধরিতেছে যে, তাহার ফলে দিন দিনই সমাজশরীর একেবারে রুগ্ন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। প্রতিকারের চেষ্টা দূরের কথা, বরং স্বার্থপর, কুটিল ও কূটচক্রী সামাজিক লোকগুলি কি করিলে ইহার প্রতিকার হইবে, তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া প্রতিদিন ইহার প্রশ্রয়ই দিয়া আসিতেছে। আবার এ সকল নানা প্রকারের নিন্দিত, ঘৃণিত, হেয় কাজগুলি করিয়া তাহারা মনে মনেই যে গর্ব্ব অনুভব করে, তাহা নহে, পাঁচজনের কাছে মুক্তকণ্ঠে কৃতিত্ব ঘোষণা করিতে লজ্জিত বা ভীত হয় না। তাহার ফলে ক্রমশঃ এ ভাবটা এমনই ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে যে, একজনের একটা অন্যায় কাজের

বিরুদ্ধে তুমি আপন ভাবিয়া কোন কথা বলিলেও, সেত তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেই চেষ্টা করিবে। তাহার পিতা, মাতা, ভাই প্রভৃতি অভিভাবকবর্গও তাহার সেই অন্যায়ের পোষণ করিয়া তুমি যাহাতে জব্দ হও, তাহারই জন্য সঙ্গে সঙ্গে দুশ, পাঁচশ মিথ্যা কথা বলিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না! অকার্য্যকারী সবল অর্থাৎ অর্থশালী হইলে ত আর কথাই নাই, তুমি বলিবা-মাত্রই সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়া একেবারে তোমার ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাহিরে লোকলজ্জার ভয়ে না হ'ক নিজের সম্মানরক্ষার জন্য মিথ্যাকে সত্য বলিয়া তৃপ্তিলাভ করুক, কিন্তু ভিতরে পিতামাতার কাছেও পুত্রের বা পুত্রের কাছে পিতামাতার প্রবঞ্চনা না করা বা অবনতি-স্বীকারপ্রথাটা এ সমাজ হইতে একপ্রকার যেন উঠিয়া গিয়াছে। যতই এ ভাবের দোষগুলি সহ্য করিয়া লওয়া হইবে, সমাজের ভবিষ্যৎ ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। পরের শরীর হইতে রোগ টানিয়া আনিয়া মানুষ যেমন দিন দিন বিপন্ন হইয়া পড়ে, সমাজও একটার পর একটা দোষ এই ভাবে মাথা পাতিয়া লইয়া ক্রমশঃ তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলোপ করিয়া বসিবে। তাই নিজেদেরই মধ্যে এই আচরণটার বিরুদ্ধে ললিতমোহনের মন একেবারেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। যে ভাবে হউক ধরিয়া বাঁধিয়াও শেষপর্য্যন্ত যতটা সম্ভব প্রতিকারের চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে, স্থিরসঙ্কল্প করিয়া লইয়া ললিতমোহন বলিল, —"প্রথমটা ত তাই ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, ওতে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, কাজেই সেদিক্ দিয়ে আমি আর যাচ্ছি না; ভালবাসার খাতিরে এমন একটা অন্যায়ের পোষণ আমি কত্তে পার্‌ব না।"

নিখিলেশ এবার একটু ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"যা ইচ্ছে করগে।" বলিয়া একটু থামিয়া সেদিকে ললিতমোহনের ভ্রূক্ষেপও না দেখিতে পাইয়া সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"আমাকেই বা ওর ভেতর জড়াতে আসিস্ কেন? কথা শুন্‌বি না ত ঘাটিয়ে কাজ কি? শেষটা দেখ্‌ছি, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কত্তেও তুই বাকি রাখ্‌বি না।"

ললিতমোহন চমকিয়া উঠিল। সরসী এতক্ষণ ধরিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল,—"এতে ত শত্রুতার কোন কথা নেই ললিতবাবু। আপনি ত ঠিক বল্‌ছেন চেষ্টা করুন, যে ক'রে হ'ক্, টাকাটা আদায় ক'রে দিতে হ'বে।"

নিখিলেশ বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ সরসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"ভেবে কথা কয়ো সরসী, এখন একটা মস্ত বাহাদুরি দেখাচ্ছ, শেষটা কিন্তু পস্তাবে।"

সরসী গম্ভীরভাবে বলিল,—"এতে পস্তাবার আবার কি হ'ল? বাবার যথেষ্ট টাকা রয়েছে, অথচ চক্রান্ত ক'রে তিনি টাকাটা মার্‌বার চেষ্টা কচ্ছেন! এতে যদি কেউ কিছু না বলে ত, তাঁর পাপের পরিমাণই বেড়ে যাবে।"

নিখিলেশ এতক্ষণ ধরিয়া সরসীর কথাই ভাবিতেছিল, হয়ত তাহার

কষ্ট হইবে, পিতার অপমানে সেও হয়ত অপমান বোধ করিবে, তাই নিজের মনের মধ্যে যে সামান্য দ্বিধাটুকু ছিল, তদপেক্ষাও দ্বিগুণ উৎসাহে একেবারে দৃঢ় হইয়া ললিতমোহনের কথার প্রতিবাদ করিয়া যাইতেছিল। এখন সরসীর কথায় মাঝখানে বাধা পাইয়া সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু রমণীহৃদয়ের এ কঠোরতায় তাহার মনে যেন একটা আশঙ্কার আকুলতাও জাগিয়া উঠিল। সে যতই চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল, ততই যেন তাহার হৃদয়ের উপর বিস্ময়বিমিশ্র একটা অভাবের চাপা ভাব সাড়া দিয়া উঠিতেছিল। তাহার ফলে তাহার সে সদাপ্রসন্ন মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিষণ্ণ হইল, হৃদয় ঈষৎ ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আর কথাটি না বলিয়া নিখিলেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সরসীও সহসা স্বামীর এই অবস্থাবিপর্য্যয়ে একটা ব্যাকুলতার মধ্যে ডুবিতে গিয়া ললিতমোহনের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহা সাম্‌লাইয়া লইল। হাসিয়া বলিল,—"যাক্, ও আর ভেবে কি হবে, এবার কিন্তু আপনি বাড়ী থেকে একটা মস্ত কীর্ত্তি রেখে ফিরেছেন।"

(৮)

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া ললিতমোহন মৌন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত্ত সরসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, —"নিখিল ?"

নিখিলেশ প্রবেশ করিয়া অবনতমস্তকে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সরসী নিখিলেশের আর একটু নিকটে গিয়া মৃদুস্পর্শে তাহাকে চমকিত করিয়া দিয়া বলিল,—"শুনেছ, ললিতবাবুর কাণ্ডটা।"

টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজান পুথিগুলির মধ্য হইতে একটা পুথি লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে অন্যমনস্ক নিখিলেশ অতি অনিচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল—"কি এমন কাজ রে ললিত ?"

ললিতমোহন জবাব দিল না। সরসী হাসিয়া বলিল—"যেমন অদ্ভুত মানুষ, কাজটাও ঠিক্ তারই মত।"

হাসিটা যেন নিখিলেশের গায়ে মৃদু ভাবে বিধিল, সেও একটা আঘাত দিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"এমনই কি কাজ সরসী, যেটা ললিতকে ছাপিয়ে উঠে তোমারও গৌরবের বিষয় হয়েছে।"

কথার ভঙ্গী ও স্বরসংযোগে ললিতমোহন থমকিয়া দাঁড়াইল। সরসীও স্বামীর নিকট হইতে আজই নূতন এই প্রকারের আঘাত পাইয়া ব্যথিত ও ভীত হইতেছিল। তথাপি সে ললিতমোহনের মুখ চাহিয়া জোর করিয়াই যেন আঘাতটা নিজ-হৃদয়ের মধ্যে পরিপাক করিয়া লইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"কাগজে দেখ্‌লুম, ললিতবাবুদের গ্রামে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে প্রায় দশপনর ঘর গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। ললিতবাবু আগুনের সময় সেখানে উপস্থিত থেকে তারি মধ্য হ'তে এমন অদ্ভুত সাহসে অপোগণ্ড ছেলে-মেয়েগুলি উদ্ধার করেছেন যে, বাহিরের লোক যারা সে আগুনের কাছ

দিয়ে ঘেস্‌তেও পারেনি, তারা এবং যাদের ছেলে মেয়ে তারা পর্য্যন্তও বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। তার পর যতগুলি গৃহস্থের ঘর দোর পুড়েছে, উনি তাদের সবারই একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বেরিয়েছেন।"

নিখিলেশ বিস্ময়ে মাথাটা ঘুরাইয়া তীব্র অভিমানপূর্ণ নয়নে সরসীর প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া আবারও পুস্তকমধ্যেই আপনাকে নিযোজিত করিয়া অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি রে ললিত।"

সেই অভিমান-কঠোর দৃষ্টিতে সরসী যেন এতটুকু হইয়া পড়িল। তথাপি পরোপকারক সহোদরপ্রতিম ললিতমোহনের এ গৌরবটা সরসীকে এমন একটা প্রকাণ্ড আনন্দের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে তাহার জোরে আর কোন কিছু চিন্তা না করিয়া অদম্য উৎসাহভরে আবারও বলিয়া উঠিল—"সত্যি নাত মিথ্যে করে আর কাগজে লিখেছে!"

"তা তারা অমন তিলকে তাল করে লিখে থাকে!" বলিয়া ললিতমোহন খোলা জানালার বাহিরে দৃষ্টি করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মাঠের সেই শ্যাম সৌন্দর্য্যে মনোনিবেশ করিল। নিদাঘের সন্ধ্যা মস্ত একটা জড়তা লইয়া আস্তে আস্তে নামিয়া আসিতেছিল। আগতপ্রায় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া ক্ষীণ অস্তগমনোন্মুখ রবিকর সেই শ্যামসৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা ঈষদ্রক্ত কিরণ মাখাইয়া শেষবারের মত যেন ম্লান হাসি হাসিয়া লইতেছিল।

সরসী একবারের জন্য বাহির হইয়া গিয়া সান্ধ্য প্রদীপহস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল—"বাইরে ত যাহ'ক একটা মস্ত কীর্ত্তি রেখে এলেন, ঘরের খবর কি? দিদি কেমন আছে?"

একটা ক্ষীণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন কি বলিতে যাইতেছিল, নিখিলেশ মাঝখানে বাধা জন্মাইয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হারে দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছিলি কেন?"

ললিতমোহন এবার উদাসভাবে ভাঙ্গা গলায় বলিল,—"কি জানি?" তারপর একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া আবারও বলিল,—"আগেত জানতুম, তুই যাবি, গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ত সে আশাতেই গেলুম, গিয়ে কিন্তু তোকে না পেয়ে একবার ভাব্‌লুম, সেখান থেকেই ফিরে পড়ি, আবার কি মনে হ'ল, একেবারে বাড়ী গিয়ে হাজির।"

কথাটা সরসীর প্রাণে বাজিল. সে ললিতমোহনকে সহোদরের অধিক স্নেহ করিত, তাহার কার্য্যে দেবতার অধিক ভক্তি করিত। কেবল প্রিয়ম্বদাকে এতটা তুচ্ছ করিয়া ললিতমোহন যে তাহাকে প্রাণে প্রাণে দারুণ যাতনা দিতেছে, এটাকে সে কোন প্রকারেই ভাল বলিয়া মনে করিতে পারিত না। এবং ইহার জন্য সে ললিতমোহনকে যথেষ্ট অনুযোগ করিত, কটুকথা বলিতেও ছাড়িত না। ললিতমোহনের মুখ হইতে আজও আবার সেই ভাবের কথা শুনিয়া সে উত্তেজিতভাবে বলিল,—"তারপর বন্ধুবিচ্ছেদের মধ্যেই সময়টা কেটে গেল না?"

অতিপুরাণ এমনই বিশৃঙ্খল অমায়িকতাটা আজ যেন নিখিলেশের কাছে কেমন খাপ খাইতেছিল না। সে এ অবাধ কথোপকথন হইতে মনকে তুলিয়া লইবার জন্য আর একবারের জন্য পুথির পাতার উপর একেবারেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ললিতমোহন হাসিয়া বলিল,—"না সরসী, তাও হ'য়ে ওঠেনি, দু'দণ্ড পড়ে পড়ে যে, তোমাদের চিন্তা কর্‌ব, এসব নানা ঝঞ্ঝাটে তাও পারি নি।"

নিখিলেশের বুকের ভিতরটা বারেকের জন্য একটু কাঁপিয়া উঠিল। সরসী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গাঢ় বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল,—"ঝঞ্ঝাট ত কম নয় আপনার ; আর সেত সঙ্গেরই সঙ্গী। দিদির সঙ্গে দেখা কর্‌বার সময়টাত হয়েছিল ?"

ললিতমোহন সরসীর ন্যায্য বিরক্তির ভাবটা লক্ষ্য করিল। সে জানিত, প্রিয়ম্বদার জন্য ইহাদের কাছে এ অনুযোগ তাহার জীবন ভরিয়াই সহ্য করিতে হইবে। ইহারাত তাহার প্রাণের বেদনা, ভীষণ দাহ তাহাকে কি ভাবে দগ্ধ করিতেছে, তাহা বুঝিবে না। তাহা যে ভাষায়ও প্রকাশ করা চলে না। সরসী মনে করে, সবাই বুঝি তাহারই মত। সে কার্য্যে উৎসাহ, উৎসাহে আনন্দ, আনন্দে সুখ, সুখে শান্তি, বিপদে বন্ধু, রোগশয্যায় জননী, পরিচর্য্যায় দাসী। আর প্রিয়ম্বদা আনন্দে অশান্তি, কার্য্যে উৎপাত, সুখে অন্তরায়, কণ্টক, উৎসাহে বিঘ্ন এমনই একটা কিম্ভূত-কিমাকার ! ললিতমোহনের চোকের দুই কোণ আর্দ্র হইয়া উঠিল। সহজ গলায়ই সে বলিল,—"অবকাশ ত না হবারই মত, একে এই ঝঞ্ঝাট, তার ও'পর আমার নভেল পড়্‌বার ঝোক্‌টাওত জান, যা সময়টা পেয়েছি, তাতেই কেটে গেছে।"

যে সরসী মুহূর্ত্তপূর্ব্বে ললিতমোহনের কার্য্যগৌরবে আপনাকে পর্য্যন্ত গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"ও'র তা'র দুটা পাঁচটা কাজ করে, আপনি কিন্তু মনে করেন, আপনি একজন বিশ্বপ্রেমিক, না ? একটা মানুষ যে, আপনারই মুখ চেয়ে পড়ে আছে, তাকে এভাবে উপেক্ষা ক'র্ত্তে আপনার কি একটু লজ্জা বা ভয়ও করে না ?"

ললিতমোহন ধীরপদে নিখিলেশের আরও নিকট ঘেষিয়া আসিতেই নিখিলেশ উঠিয়া আবারও বাহির হইয়া গেল। হতাশ ললিতমোহন অবশের মত চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া চাপা গলায় বলিল,—"বুঝে অনুযোগ কর, সরসী।"

স্বামীর অবস্থাবিপর্যায়ে সরসীও ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল। সহসা তাহার মনটাও যেন কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিল। তাই সে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও প্রিয়ম্বদার প্রতি ললিতমোহনের এ ব্যবহারটা আজ নূতন ভাবে একটা নিতান্তই গর্হিত বলিয়া মনে করিয়া লইল। অথচ নিতান্ত নিরুপায় ললিতমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা সে কোন কথা

বলিতে পারিল না। সরসীর জবাব না পাইয়া ললিতমোহন আবারও বলিল,—"উপেক্ষা ত আমি কাউকেও করি না সরসী, সবাইকে যেমন দেখি, তোমার দিদিকেও ঠিক তেমনি দেখি, তবে আলাদা করে যা তোমাদের দাবি, তা তাকে দিয়ে উঠতে পারি না।"

গম্ভীর অথচ বিষণ্ণ চাহনিতে চাহিয়া সরসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কারণ ?"

স্ত্রীকে ভালবাসা না বাসার কারণটা যে সকল সময়ে সকলের কাছে খুলিয়া বলা চলে না, তাহা চিন্তা না করিয়া সরসীর এই যুক্তিহীন প্রশ্নে ললিতমোহন মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। বিবাহে ললিতমোহন চিরদিনই বীতস্পৃহ ছিল। নিতান্তই একলাটি থাকা চলে না, তাই পাঁচজনের অনুরোধে সে বিবাহ করিল বটে, কিন্তু পাত্রীর রূপগুণের দিকে একবার দৃষ্টিও করিল না। সে মনে করিতেছিল, ভিতরে একজনের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে গেলে বাহিরে অনেকের অনেক অভাব অপূরণ থাকিয়া যাইবে। সংসার-নির্ব্বাহের জন্য যা তা একটা বিবাহ করিলেই হইল। যখন ললিতমোহনের মনের ঠিক এই অবস্থা, তখনই অনাথা প্রিয়ম্বদার মাতা আসিয়া তাহার হাত দু'খানা ধরিয়া সজলনেত্রে বলিলেন,—"বাবা, আমার মেয়েটাকে বে ক'রে জাত রাখলে, ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন।" ললিতমোহন একবাক্যে স্বীকার করিয়া পনর দিনের মধ্যেই বিবাহ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে ঘরে লইয়া আসিল। নববিবাহিতা পত্নীর কোন প্রকার অসুখ অসুবিধা না হয়, সেজন্যও সে বিশেষ ভাবেই বন্দোবস্ত করিয়া দিল। নিজে কিন্তু বাহিরে বাহিরেই রহিয়া গেল। তারপরে লীলার নিগ্রহ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে প্রিয়ম্বদার প্রতি একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল। ললিতমোহন স্বতঃই ভাবিল, তাহার অনাদরে প্রিয়ম্বদাও হয়ত প্রাণে প্রাণে দারুণ ক্লেশ পাইতেছে। ইহার উপর আবার এখানে সেখানে একাজে সেকাজে সে এমনই ধাক্কা খাইতে আরম্ভ করিল যে, তাহারও যেন একটা আশ্রয় না হইলে নহে। তাপিত শ্রান্ত হৃদয়ে বড় আশায় আশ্বাসিত হইয়া সে বাড়ীতে ফিরিল, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে প্রিয়ম্বদার আকৃতি দর্শনে সে এক পা পিছাইয়া গিয়া হৃদয়ের আশায় আবার যেমনি দুই পা অগ্রবর্ত্তী হইতে গেল অমনি অজ্ঞাত কোন একটা দারুণ আঘাতে তাহার পা দু'খানা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। বাহিরের মৃদু আঘাতে ব্যথিত হৃদয় লইয়া ললিতমোহন ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল, প্রিয়ম্বদার হৃদয়মধ্যে তাহার জন্য আসন পাতা থাকিলেও তাহার মুক্ত হৃদয়টাকে টানিয়া আনিয়া বসাইবার মত শক্তি তাহাতে নাই। বিশেষ করিয়া তাহার পথ এতই দুর্গম যে, সেখানে নিজেকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া কণ্টকের তীব্র আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে তাহাকে আবারও ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে সদ্গুণ, উদারতা ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু ললিতমোহনের পক্ষে তাহা শান্তি বা সান্ত্বনার জন্য না হইয়া যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাপপ্রদ বলিয়াই মনে হইত। যাহা ছিল,

তাহাই যেন বিকাশবিমুখ, আপনার মধ্যেই আপনি আবদ্ধ, নিজের ভারেই নিজে ব্যস্ত। অবিকশিত কুসুমে বসিয়া লুব্ধ ভ্রমর যেমন শোয়াস্তি পায় না, রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া গিয়া উদ্যানকে উদ্যান ঘুরিয়া বেড়ায়, চারিদিকে রেলিং দিয়া ঘেরা বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আশ্রয়ান্বেষী পথিক যেমন ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বিমুখ হইয়া আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে, ললিতমোহনও তেমনই বাহিরের আঘাতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহের মধ্যেও স্থান না পাইয়া আশ্রয়ের জন্য বাহিরে এই জনকোলাহল-মুখরিত কার্য্য-জগতেই গিয়া আর একবারের জন্য দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। প্রিয়ম্বদাও মনে মনে সকলই বুঝিতে পারিত, চারিদিক্ হাতড়াইয়া অন্ধের ন্যায় প্রশস্ত কোন উপায় কিন্তু সে সমস্ত বুঝিয়াও খুজিয়া পাইতেছিল না। দরিদ্রের কন্যা, রূপহীনা প্রিয়ম্বদা, নিজ হাতে অনাবশ্যক গৃহের কাজগুলি সারিয়া লইতে পারিত, স্বামীর যত্নপরিচর্য্যা করিতে পারিত; তাহার অগোচরে তাহার জন্য কাঁদিতে পারিত, স্বামীর সুখের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না, কিন্তু তাহার ব্যবহারের কথা, কাজের কথা ভাবিতে গেলেই যেন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিত, মন কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সে কোন প্রকারেই তাহাতে যোগ দিতে পারিত না, স্বামীর কার্য্যের সহায়তা করা পরের কথা, বরং প্রতিকার্য্যেই তাহাকে প্রতিবাদ করিতে হইত। এমনই অবস্থার মধ্যে পতিত ললিতমোহন খররৌদ্রের তাপে বিলের জল শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিলে মাছগুলি যেমন ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া আরও যা দুই পাঁচদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, তাহার পথও হারাইয়া বসে, ক্রমশঃ আপন হইতে শুকাইয়া যায়, অশান্ত ব্যথিতচিত্ত ললিতমোহনও তেমনই একবার ঘরে, একবার বাহিরে এমনই করিয়া দিন দিন নিদারুণ তাপে শুকাইয়া আসিতেছিল। তাহার প্রশস্ত বদনের উপর দিয়া এত অল্পকালমধ্যেই নিরাশার এমন একটা কালরেখাপাত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া প্রতিকারে অসমর্থ প্রিয়ম্বদার হৃদয়ও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিত। সে একেবারেই পরার্থে উৎসৃষ্ট ললিতমোহনের জীবনের কথা যেমনই মনে করিত, অমনি তাহাকে এমন ব্যাকুলতা আসিয়া চাপিয়া ধরিত যে, নিতান্তই উপায়হীনার মত সাশ্রুনেত্রে করযোড়ে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিত,—"ভগবান্ যদি দিয়াছ ত কাড়িয়া লইও না। আমার স্বামীর মত পরিবর্ত্তন করে দাও।" বলিতে বলিতে সত্যই প্রিয়ম্বদা অনেকদিন একাকিনী পড়িয়া পড়িয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিয়াছে। পরক্ষণেই ললিতমোহন গৃহে ঢুকিয়া সিক্ত উপাধানস্পর্শে চমকিত হইয়া আপন বাহুমধ্যে প্রিয়ম্বদার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কত আদরে, কত যত্নে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কত কথাই বলিয়াছে। প্রিয়ম্বদা স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাবিয়া তাহারই অনিষ্টের আশঙ্কায় একটা কথারও উত্তর দিতে পারে নাই, আনতমুখে মাটির দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছে। স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেও যেন তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রিয়ম্বদাকে নিজেরই

মনোমত করিয়া গঠিত করিতে গিয়াও ললিতমোহন বিফলপ্রয়াশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে প্রিয়ম্বদাকে নিজ স্বভাবানুরূপ কার্য্যে উৎসাহ দেখাইবার সাহায্য করিবার জন্য যে উপদেশ দিত, যাহা করিতে বলিত, প্রিয়ম্বদা ত তাহা মোটেই পছন্দ করিত না। সে এক একবার স্বামীর শুষ্ক মুখের দিকে নীরস দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়কে আরও ব্যথিত ভারাক্রান্ত করিয়া দিত, আবার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ক্রুদ্ধ তিরস্কারে তাহাকে বিরক্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত। এই শঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে থাকিয়া প্রিয়ম্বদাকে লইয়া ললিতমোহন যে কি যাতনাটা পাইতেছিল, সরসী তাহা ভালরূপ না বুঝিয়া না জানিয়াও বারবারই এ ভাবের অনুযোগ করিত বলিয়া ললিতমোহন আজ আর সরসীর এ কথার কোন জবাব না দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভারি গলায় সরসী বলিল,—"ধরে নিলুম, উপেক্ষা আপনি করেনই না, কিন্তু ভিক্ষুকের মত একমুঠা চালেইবা সে তুষ্ট হ'বে কি করে?"

"ঐটে তুমি বোঝ না সরসী, কিছুই না দিয়ে মুঠা ভরে তুলে নেওয়ার যুগ এটা নয়।" তারপরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ললিতমোহন আবারও বলিল,—"সে যে আমার মনের মত হয়ে একটা কাজও ক'ত্তে পারে না, এ আমি তোমায় নিশ্চিতই বলে রাখছি। এবারেও যখন আমি বলে এলাম, 'যেমনটি এসেছিলাম, প্রিয়ম্বদা, তেমনটিই ফিরে যাচ্ছি, তুমি কিন্তু আমায় একটুও বদলে দিতে পারলে না।' তখনও সে আমার হয়ে একটা কথা বল্লে না, উল্টে আমায় কতগুলি কথাই শুনিয়ে দিলে।"

নিখিলেশ বারাণ্ডায় পাইচারি করিয়া সমস্তই শুনিতেছিল, এবার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া ললিতমোহনের হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"সুধুই মানুষকে দোষ দিস্ নি। যা তুই বলেছিস, শুনেইত তার প্রাণ চমকে গেছে, জবাব আর কি দেবে?"

একটু হাসিয়া ললিতমোহন বলিল,—"মিথ্যাত বলি নি। আর তাইত শূন্য প্রাণ নিয়ে পথ থেকে এখানে এলুম, দেখি যদি কিছু নে যেতে পারি।"
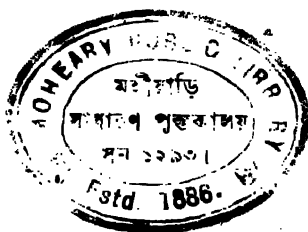
চতুর্থ বর্ষ, | আষাঢ়, ১৩২৩ | তৃতীয় সংখ্যা

শেফালী

(গল্প)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১

স্বামীর ক্রোধকম্পিত হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া শেফালী ব্যাকুলস্বরে বলিল,—"তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, এর ভিতর তুমি আর যেয়ো না।"

পরিপূর্ণবিস্ময়ে একবারমাত্র পত্নীর স্নেহকোমল ঊর্দ্ধোন্নত মুখের দিকে চাহিয়া লইতেই ভবেশের প্রচণ্ড রাগটা পড়িয়া আসিল। উত্তেজনার ভাবটা কমাইয়া লইয়া বিস্ময়বিমিশ্রস্বরে বলিল,—"কি যে বল্‌ছ শেফালী, আমি কিন্তু বুঝ্‌তেই পাচ্ছি না! দাদা এই যে সর্ব্বস্ব থেকে বঞ্চিত কচ্ছেন, এতে আমি যদি কিছু নাই বলিত, শেষটা তোমার হাত ধ'রে আমায় পথে দাঁড়াতে হ'বে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ?"

শেফালী কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেখ, সবই ভগবানের হাত। তিনি পথে দাঁড় করে দেন ত কেউ রাখ্‌তে পার্‌বে না। তা বলে এই যে ভাই ভাই ঝগড়া কর্‌বে, সেটা ত তিনি সহ্য কর্‌বেন না।"

"দাদাই কি কাজটা ভাল কচ্ছেন? তাঁরও ত ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব নেবার মত্‌লব।"

"শত হ'ক্ তিনি বড় ভাই,—গুরুজন। ছোটকাল থেকে তোমায় মানুষ করেছেন। টাকা পয়সা কিছু আছে কি নেই, তাই বা কি করে জান্‌বে? নেই বল্‌ছেন, তাই স্বীকার করে নাও, যদি কিছু থাকেও

তিনি যদি না রাখ্‌তেন, তবে কি থাকৃত? তিনিই রেখেছেন, এখন নিতে যাচ্ছেন, নিন।"

ভবেশ মনে মনে পত্নীর কথাটারই আলোচনা করিতেছিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া শেফালী অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া বলিল,—"দেখ, ওজন্যে তুমি মোটেও ভেবনা, আর তোমার দাদাকেও কোন কথা বল না। তিনি নিজে থেকে যা দিচ্ছেন, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হও।"

কাজেও তাহাই হইল। পত্নীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া ভবেশ জ্যেষ্ঠকে আর কথাটিও বলিল না। জ্যেষ্ঠ দীনেশ পূর্ব্ব হইতেই ভবেশের বাসের জন্য একখানা ক্ষুদ্র বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে খানকত ধেনোজমি, আর সেই বাড়ীখানা ভবেশকে দিয়া সকল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া বসিলেন!

(২)

বছর তিনেক পরে যখন পথে দাঁড়াইবার মতই অবস্থা হইয়া পড়িল, তখন শেফালীর একনিষ্ঠ মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া শেফালী উনানে কাঠ গুঁজিতেছিল, আর সীমাহীন অবাধ চিন্তার ভারে থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল। চৈত্রের খর রবিকরে একেবারেই অসহায়ের মত নগ্ন পৃথিবীর বক্ষটা পুড়িয়া যাইতেছিল, পরিপূর্ণ গ্রীষ্মের সেই অলস মধ্যাহ্নে সেফালীর প্রাণটাও যেন কেমন এক রকমের উদাস, উৎকণ্ঠিত, আশঙ্কাপীড়িত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তপ্ত বায়ুর আঘাতে আকাশবিলম্বী ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের পাতাগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া এ ওর গায়ে পড়িয়া চকিত মর্ম্মর শব্দের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তিনটা দিক্ একেবারেই খোলা রান্না-ঘরের চালাটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দম্‌কা বাতাস এক একবার উনানের আগুনটাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছিল, আবার নির্ব্বাণোন্মুখ করিয়া দিয়া সুতপ্ত আঘাতে শেফালীর বুকের মধ্যটায় প্রকাণ্ড একটা জ্বালার ভাব টানিয়া আনিতেছিল। বাহিরের অসহনীয় উত্তাপ ভিতরের উনানের উত্তাপের সহিত মিশিয়া একটা প্রচণ্ড-জ্বালায় শেফালীর নিটোল দেহখানাকে গলদঘর্ম্মে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

শেফালীর চিন্তার অবধি ছিল না, কাল তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই, সর্ব্বগ্রাসী কালের মত পদ্মার প্রচণ্ড গ্রাস তাহাদের বসত বাড়ীখানার অর্দ্ধ কবলিত করিয়া অপরার্দ্ধের জন্য হা করিয়া মুখ

বাড়াইয়াছিল। আজকাল করিয়া অতিকষ্টেই এখনও তাহারা অর্দ্ধগ্রস্ত বাড়ীর ভাঙ্গাঘরে কোনমতে মাথা গুজিয়া রহিয়াছে। ছ'মাসের শিশুপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে গিয়া উন্মত্ত বারিরাশি কোন্ মুহূর্ত্তে তাহার কোল হইতে প্রাণের বাছাকে কাড়িয়া লইবে, এই উৎকণ্ঠিত চিন্তায় শেফালী বার বার কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিত। এমনই অবস্থার মধ্যে অর্থাভাবের প্রবল পীড়নে এই দম্পতী আরও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। জমিতে ধান যাহা হইত, তাহা ছাড়া সংসারব্যয়ের উপায় ছিল, শেফালীর কয়খানা অলঙ্কার, এই দীর্ঘ তিন বৎসরে তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে, এখন যে ইহারা একেবারেই নিঃস্ব, কপর্দ্দকহীন। ভাবিতে ভাবিতে শেফালীর চোক বাহিয়া দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, ক্লান্ত, অবসন্ন, দুঃখদুর্দ্দশার প্রতিমূর্ত্তি ভবেশ পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। শেফালী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই সে আর্ত্তস্বরে ডাকিল,—"শেফালী ?"

শেফালী মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া সস্নেহে স্বামীর হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া পাখার বাতাস করিতে আরম্ভ করিতেই ভবেশ মলিন, শতচ্ছিন্ন জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"না, কোনই সুবিধে কত্তে পাল্লাম না শেফালী, গ্রামেত আর থাকা যাচ্ছেই না, তোমায় যে দুদিনের জন্য রেখে যাব, তারও সুবিধে হল না। দাদাকে বৌদিকে কত ক'রে বল্লুম, কেউ ত স্বীকার কল্লেই না, উল্‌টে আর যা মুখে এল, তাই শুনিয়ে দিলে।"

শেফালীর চোক আবারও আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি তাহা গোপন করিয়া লইয়া স্বামীর পা ধোয়াইয়া আঁচলে মুছিয়া এক গ্লাস সরবৎ আনিয়া দিতেই ভবেশ তাহা এক চুমুকে উদরস্থ করিয়া আবারও বলিল,—"তোমার আমার জন্যেত ভাব্‌ছি না, কেবলই ভয় হচ্ছে এই দুধের ছেলেটার জন্যে। ওকে নিয়ে কি করে যে কোথায় যাই, ভেবেই ঠিক কত্তে পাচ্ছি না।"

শেফালীও ঠিক এই কথাটাই ভাবিতেছিল। স্বামি স্ত্রী গাছতলায় ভূমিশয্যায়ও কাটাইয়া দিতে পারে। তাহাতে শেফালীর কোন দুঃখ বা ক্লেশও বোধ হইত না, বরং স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে না হইলে সে তাহাতে শান্তি ও সুখই অনুভব করিত। কিন্তু এ বালক, ইহার ত সে কঠোরতা

সহ্য হইবে না। এই কোমল শরীর ত সে অনিয়মে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। শেফালী মনে মনে বলিল,—"ভগবান্ তুমি দিয়েছ, তুমিই রক্ষা ক'র, অভাগিনীকে বঞ্চিত করে কেড়ে নিয়ো না যেন।" বলিতে বলিতে শেফালীর শরীর কাটাদিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে আঁচলে চোক মুছিয়া বড় রকমের একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল,—"তা ভেবে আর কি কর্‌বে, এম্নি এখানে আর ত থাকাও চলে না, ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়, তিনি যা করেন তাই হবে।"

ভবেশ অন্যমনস্ক ভাবে বলিয়া উঠিল,—"দুধের ছেলেটা, তার দিকে চেয়েও একটু দয়া হল না! ওঃ কি পাপিষ্ঠ—"

শেফালী বাধা দিয়া বলিল,—"আবার ঐকথা! যাই করুন, তিনি গুরুজন, নিন্দা কল্লে পাপ হবে।"

স্ত্রীর কথায় ভবেশ মস্তক নত করিয়া রহিল। শেফালী বলিল, —"তা ভালই হয়েছে? এ সময় তোমায় এমনই একা পাঠিয়ে আমিও যে স্থির থাক্‌তে পার্‌তুম না। দেখ, আর দেরী করে কাজ নেই, চল কালই কল্‌কাতায় যাই।"

দীর্ঘশ্বাসে বক্ষঃ কাঁপাইয়া ভবেশ কহিল,—"তুমিত বল্‌ছ, আমি কিন্তু ভেবেই পাচ্ছি না, তোমাদের নেগে দাঁড়াই কোথায়?"

শেফালী সে কথায় মনোযোগ না দিয়া যায়গা করিয়া ভাত আনিয়া দিয়া বলিল,—"খাবে বস।" তারপর গলার আওয়াজটা একটু খাট করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"কল্‌কাতায় গিয়ে দুদিনের জন্যে না হয় আমরা মামার বাড়ীতেই উঠ্‌ব, তার পর একটা কাজকর্ম্ম ঠিক হলে সেখান থেকে উঠে গেলেই চল্‌বে।"

ভাতের মুঠা মুখে গুজিতে গুজিতে ভবেশ কহিল,—"তুমি ভাব্‌ছ, চাকরী মেলাটা কিছুই নয়, না? আজকালের বাজারে তার মত শক্ত জিনিষ ত দুটি নেই শেফালী?"

"আমি বল্‌ছি, সে ঠিক হবে।" কথাটা সেফালী এমনই জোর দিয়া বলিল যে, তাহার নির্ব্বন্ধে ভবেশও মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ভোজনান্তে যাত্রার উদ্যোগেই চলিয়া গেল।

(৩)

শেয়ালদয় গাড়ী হইতে নামিয়াই শেফালীর বুদ্ধি ঘুরিয়া গেল। সে

তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল,—"কালীঘাটে ত যখন তখন বাসা পাওয়া যায় শুনেছি, চল আমরা সেখানেই নেবে পড়ি।"

ভবেশ কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেফালী আবার বলিল,—"এ অবস্থায় আপনার কারু বাড়ী যেতে আমার কেমন ভয় হয়, কেউ যদি কোন কথায় তোমায় কিছু বলে ফেলেত আমি ত তা সহ্য কত্তে পারব না।"

ভবেশের প্রাণটা পুলককণ্টকিত হইয়া উঠিল। পত্নীর এই স্বামি-পরায়ণতার মধ্যে ডুবিতে গিয়া সে হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দুঃখসঙ্গিনী শেফালীকে তাহার মানমর্য্যাদা সুখদুঃখের প্রতি এমনই সজাগ দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও একবারের জন্য সে অপনাকে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরাধিরূঢ় বলিয়া মনে করিল। পত্নীর মুখখানা সাদরে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বনে তাহা আরক্ত ব্যস্ত করিয়া দিয়া বলিল,—"এখনও মানমর্য্যাদার কথা ভাবছ! আজ নেইবা গেলুম, কিন্তু দু'দিন পরে যদি খেতে না পাইত সেখানে যে যেতেই হবে।"

"সে তখন দেখা যাবে।" বলিয়া শেফালী একটা গভীর শোয়াস্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া লইল।

*　*　*　*　*　*　*

ছ'মাস অতীত হইয়া গেল, ভবেশ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সুবিধাই করিতে পারিল না। সে সারা দিন হাটিয়া হাটিয়া এর আফিস তার আফিস এমনই কত যায়গায় কত খোসামুদ করিয়া শ্রান্ত হতাশচিত্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যখন ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত শ্লথ গতিতে একপা একপা করিয়া বাসার দিকে চলিত, তখন দুই পাশের সজ্জিত তাড়িতালোকে উজ্জ্বল সৌধশ্রেণী যেন মাথা উচু করিয়া তাহাকে উপহাস করিত। শূন্যগর্ভ গ্যাসগুলি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া তাহার লজ্জা ও দুঃখের আবরণ ভেদ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দাঁড় করাইয়া দিত। সে যতই দেখিত, অগণ্য অসংখ্য লোক কাজ করিয়া আশার পুলকে হাসিমুখে যে যার ঘরে ফিরিতেছে, ততই যেন তাহার মনে একটা প্রবল ধিক্কার আসিত। অতি-দ্রুত পথ চলিয়া কোন মতে সেই খোলার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া সে হাপ ছাড়িয়া বাচিত। এত অশান্তি, এত দুশ্চিন্তা শেফালীর হাসিমুখ দেখিয়া

ভবেশ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইত ; শেফালী যখন শিশু পুত্রটিকে দোলাইতে দোলাইতে তাহার ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া ভরসা দিত ; তখন ভবেশের নিরাশ নির্জ্জীব হৃদয়ও আশার আশ্বাসে সজীব হইয়া উঠিত।

এমনই একদিন সন্ধ্যার পরে ভবেশ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সমস্ত অন্ধকার। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়াও তাহার মনে হইল না, সমস্ত শরীরটা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কে যেন জোর করিয়া তাহার মাংসপেশীগুলি সবলে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া শূন্য ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"শেফালী।"

পাশের বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া শেফালী বলিল—"এই যে আমি, তুমি কতক্ষণ এলে ?"

ভবেশের মস্তক হইতে একটা গুরু ভার নামিয়া গেল, সংসারের অবলম্বন, পৃথিবীর সাররত্ন এই সাধ্বী পত্নীর কোন বিপদের আশঙ্কায় থাকিয়া থাকিয়াই সে ব্যাকুল হইয়া পড়িত ; তাই আজ শেফালীর এই অনুপস্থিতিটা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সে এবার ধীরে ধীরে বলিল—"আমি ত এই আস্‌ছি, তুমি কোথায় গেছিলে শেফালী, ঘরে আলোটি পর্য্যন্ত যে নেই।"

চন্দ্রের অস্পষ্টালোকে ভবেশ দেখিল, তাহার প্রশ্নে শেফালীর মুখ খানা একেবারে ছায়ের মত সাদা হইয়া উঠিয়াছে, সে আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইতেই ভবেশ দীপের আলোকে দেখিতে পাইল, শেফালীর হাতের মধ্যে চক্ চক্ করিয়া কি জ্বলিতেছে ! কিসের একটা প্রবল ধাক্কায় ভবেশ শেফালীর নিকটে আসিয়া হাত ধরিতে যাইতেই অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া শেফালী হাত সরাইয়া লইল। ভবেশ উন্মাদের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখি না তোমার হাতে ওকি ?"

শেফালী ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"কি আর দেখ্‌বে ?"

আঘাতটা যে ভবেশকে কি ভাবে বিঁধিল, তাহা তখনকার মত যেন সে বুঝিতেই পারিতেছিল না। সে শেফালীর কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া হাত টানিয়া বেশ ভাল করিয়া দেখিতেই পাগলের মত উদ্দাম আবেগে শেফালীকে জড়াইয়া ধরিল। শেফালীর যত্ন ও চেষ্টার ফলেই যে তাহার দেহ এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত, কিন্তু তাহার প্রাণপাত পরিশ্রম যে তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহা যে সে নিজের

বুদ্ধিতে এক দিনের জন্যও বুঝিতে পারে নাই। সে ভাবিত, হয় ত শেফালীর হাতে আগেকার কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা দ্বারাই সে কোন মতে চালাইয়া লইতেছে। নিরুপায় বলিয়া সেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, শেফালীও কোন দিন কিছু বলে নাই, আজ পর্য্যন্ত অভাব কেমন এটা কেন সে জানিতেও পারে নাই, তাহার অস্পষ্ট কারণটা এখন তাহার নিকট এমনই স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইল যে, সে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। সাম্‌লাইতে গিয়া সে শেফালীকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"তুমি ছিলে তাইত এদ্দিন বেচে আছি। আমি রোজ ভাব্‌ছি, এই যে খাচ্ছি দাচ্ছি, জামাকাপড় পর্‌ছি, এ ভূতের বোঝা যোগাচ্চে কে? ভেবে কিছু কত্তে পারিনি বলে তোমায়ও কোন দিন জিজ্ঞেস কত্তে সাহস করিনি। কিন্তু আমার ত বেচে না থাকাই ভাল।"

শেফালী দুই হাতে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিল—"অমন কথা আর মুখেও এনো না। অমনিই যদি কর্‌বে ত আমি থাকি কি করে বল?" শেফালী আর কোন কথা বলিতে পারিল না, দরদরধারে অশ্রু ঝড়িয়া পড়িয়া তাহার মুখ, চোক ও বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া তুলিল।"

ভবেশ আচ্ছন্নের মত উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত পাদচারণা করিতে করিতে বলিল,—"কৈ, তুমি ত আমায় একটি দিনও কিছু বলনি?"

এখানে আসিয়া অবধি পাশের বাড়ীর এক বর্ষীয়সী বিধবার সহিত যোগ দিয়া শেফালী ডাকের (রঙ্গের) কাজ করিয়া এমনই ভাবে যে এই সংসারের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল, তাহা অতি সতর্কতার সহিতই সে স্বামীর অগোচরে রাখিয়াছিল। স্বামী বাহিরে গেলে সারাদিন সে একাজ করিত, আবার স্বামীকে নিদ্রিত দেখিয়া সাধ্বী ধীরে ধীরে তাহার কপোলদেশে কবোষ্ণ চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া অতিবাঞ্ছিত স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া সারারাত্রি এই কাজই করিত। জানিতে পারিলে তাহার স্বামী যে প্রাণে প্রাণে অসহনীয় ক্লেশ অনুভব করিবেন, তাহা সে ভাল করিয়া জানিত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের একটি কথাও তাহাকে ঘুণাক্ষরে জানিতে দেয় নাই। অসতর্কতাবশতঃ আজ এমনই অসহায়ভাবে ধরা পড়িয়া শেফালীও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এখন অনেকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল,—"তোমায় আবার কি বল্‌তে যাব, চল হাতমুখ ধোবে।" বলিয়াই সে ভবেশের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৪)

প্রায় পনর দিন শেফালীর শরীরটা তত ভাল ছিল না, প্রতিদিন জ্বর হইত, তাহার উপর অবিশ্রান্ত খাটুনি। এই জ্বর লইয়া অনাহারে অনিদ্রায় জলতোলা বাসনমাজা প্রভৃতি সংসারের সমস্ত কাজ তাহাকে করিতে হইত, দিনরাত্রি ডাকের কাজ করিয়া কোনও মতে স্বামী ও শিশুসন্তানের দুমুঠা ভাতের যোগাড় করিত, কিন্তু আর ত সে পারিয়া ওঠে না, প্রবল দুশ্চিন্তার ভারে তাহার শরীর ক্রমেই যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। তিন চারিদিন জ্বরও বেশী হইতেছে, সে প্রায় সময়টা শুইয়াই কাটাইত, কেবল স্বামীর নিকট গোপন করিবার জন্য তাহার উপস্থিতিকালে উঠিয়া বসিত, অতিকষ্টে পাক করিয়া তাহাকে ভাত দিত; রাত্রিতে শুইতে গিয়াও জ্বরের উত্তাপ গায়ে লাগিবার ভয়ে খোকাকে মাঝখানে রাখিয়া জড়সড় হইয়া কোন মতে চোক বুজিয়া পড়িয়া থাকিত। যেদিন হইতে ভবেশ নিশ্চিতভাবে জানিয়াছিল, শেফালী নিজের শরীর খাটাইয়া তাহাদের আহার সংগ্রহ করিতেছে, সেদিন হইতে সেও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বিষাদমলিন ব্যথিত মুখের উপর ধিক্কারের একটা কাল দাগ যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শেফালীকে ক্রমশঃ এরূপ ক্ষীণাঙ্গী হইতে দেখিয়াও সে যেন সেদিকে লক্ষ্যও করিত না, কেবল সে যাহা বলিত, যন্ত্রগালিতের মত তাহাই করিয়া যাইত। কয়দিন ডাকের কাজ করিতে না পারায় সংসারের অভাবও জ্বলন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেফালী নিরুপায়, এভাবের অভাবের কথা বিশেষ করিয়া তাহার অসুস্থতার কথা জানিতে পারিলে ভবেশ যে একেবারে পাগল হইয়া যাইবে, ভাবিয়া সে জোর করিয়া এই তীব্র দাহটা আপন বুকের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আর ত চলে না, আজ যে ঘরে একমুঠা চাল্‌ও নাই, শেফালীর উদ্দাম চিন্তা অবাধগতি নদীস্রোতের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া, দুলিয়া তাহার মনের উপর যত আবিল ভাবনারাশি আনিয়া জড় করিয়া দিতে লাগিল। ছেলের পিপাসাক্ষামকণ্ঠে একবিন্দু ফেণ দিবে, এমন সংস্থানও তাহার ছিল না, এমনই অবস্থায় ভবেশ স্নান করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে আকুলস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভবেশের বুঝিতে বাকি রহিল না, যে কোন অভাবের তাড়নায় সদাপ্রফুল্ল শেফালীও আজ এমনই ভাবে কাঁদিতেছে। কয়েক দিন যাবৎ শেফালীকে সে যতই অন্যমনস্ক চিন্তানত দেখিতেছিল,

ততই সে অনুমান করিয়া লইতেছিল যে, শেফালীর স্বাধীন উপার্জ্জনের পথে কি যেন বিঘ্ন হইয়াছে, আর কোন কারণে যে শেফালী স্বামীর কাছে মুখ কাল করিতে পারে না, তাহা সে এই কয়বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া নিঃসন্দেহেই বুঝিয়া লইয়াছিল। ভবেশ উন্মাদস্বরে বলিল—"কি শেফালী, আজ বুঝি তোমার উপার্জ্জনও আমায় আর বাচাতে পারল না।"

স্বামীর কথাটার মধ্যে কত গাঢ় বেদনা যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা শেফালী বুঝিল এবং তাহার সেই স্বর ও উন্মাদ-দৃষ্টিতে শেফালীর ক্ষীণ শরীর আরও ক্ষীণ আরও অবশ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অতি কষ্টে আপনাকে স্থির করিয়া লইয়া সে ভবেশের হাত ধরিতেই ভবেশ তাহার ক্ষীণ রোগা শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রচণ্ড আঘাতে দূরে সরিয়া গিয়া আবারও শেফালীর বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল—"এবার ঠিক হয়েছে, ভগবান্ এবার ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন। তুমিই বা আর কদ্দিন এই দু গ্যের বোঝা বৈবে শেফালী, যাও, তুমিও তোমার পথ দেখ।"

অতিকষ্টেও শেফালী আর চোকের জল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। কাপড়ের আচলে চোখ মুছিয়া লইয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিল,—"দেখ, আজ আর একবার মামার বাড়ী যাও, হয়ত এদ্দিন তিনি এয়েছেন। যদি দেখা হয়ত, আমার এ অবস্থার কথা বলবে, আর যাতে তোমার একটা চাকরী করে দিতে পারেন, তারই জন্য একটু অনুরোধ কর।"

ভবেশ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—"না, সে আর কাজ নেই, যদি দিন থাকতেই না হ'ল ত, কার জন্যেই বা খোষামুদ কত্তে যাব।"

শেফালী অতিকষ্টে উঠিয়া আবারও ভবেশের হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—"এমন করে আমায় আর পাগল কর না। দুঃসময়ে মানুষকে অনেক সইতে হয়। মামা এখানে নেই বলেই আমাদের যত কষ্ট হচ্ছে, আমি ঠিক জানি, তিনি এসে পড়লে যা হ'ক একটা করে দেবেন।"

ভবেশ মূকের মত শেফালীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাত দিয়া বারবার তাহার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছিল, আর সেই তীব্র উত্তাপের পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহার জ্বালায় শেফালীর অপেক্ষাও যেন তাঁহার শরীরটা অধিক জ্বলিয়া যাইতেছিল। শেফালী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"ভয় হচ্ছে, ভাবছ, আমি মরব, সে ভেবনা, ওগো তোমায় ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না।"

ভবেশ আর কথাটি না বলিয়া একটা উড়ানি কাধে ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শেফালী ব্যস্তভাবে বলিল,—"দাঁড়াও, দেখি ঘরে কিছু আছে কি না, চান করে যে একবিন্দু জলও তুমি মুখে তোল নি।" বলিয়া শেফালী আস্তে আস্তে মুড়িমুড়কির হাড়ীটার ভিতর হাত দিয়াই ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এই রিক্তহাড়ীর শূন্যতাটা যেন তাহার নিকট সমস্ত পৃথিবীটাকে একটা মহাশূন্যের মত দাঁড় করিয়া দিল।

(৫)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভবেশ যখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখচোক একেবারেই বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরে এক মুঠা চাল নাই, সে বড় আশা করিয়াই শেফালীর মামার বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া যেই শুনিল যে, তাহার মামা আজও পশ্চিম হইতে ফিরেন নাই, অমনি তাহার মাথায় যেন সশব্দে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তার পরেও ভবেশ চেষ্টার ক্রটী করে নাই, ইতি মধ্যেই যে দুপাঁচজন লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল, যাহারা তাহাকে প্রতিদিনই নানা প্রকারের আশায় উৎসাহিত করিত, অন্নাভাবে বিশেষ করিয়া বালক পুত্রের সেই ক্ষুধাখিন্ন মুখ মনে করিয়া সে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়াও যখন একটি পয়সা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন একবার আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেই একা—এমনই রোগা শরীর শেফালীর কথা মনে হইল। তাই সে অতিকষ্টে দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল। কিন্তু দোরের গোড়ায় আসিয়া তাহার পা আর সরিতেছিল না। সহসা পুত্রের ক্রন্দনশব্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া পড়িল। শেফালী অশ্রুতে উপাধান সিক্ত করিতেছিল, আর বালক থাকিয়া থাকিয়া ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করিয়া একবার এপাশ একবার ওপাশ এমনই করিয়া ছট্‌ফট করিতেছিল। ভবেশ আর সহ্য করিতে পারিল না। জোরে ছেলেটিকে শেফালির বক্ষঃ হইতে কাড়িয়া আনিয়া ধম্‌কাইয়া বলিল,—"না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বিনি ত, এ হতভাগার ঘরে জন্মেছিলে কেন!"

শিশু আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। শেফালী স্বামীর হাত ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল,—"ওগো, বাছা যে আমার সারাদিন না খেয়ে মরে যাচ্ছে।"

ভবেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"সেই ভাল শেফালী, সেই ভাল, মরে যদি যায় ত একদিনেই শেষ হবে। আচ্ছা বল্‌তে পার শেফালী, কি কল্লে খুব শিগ্‌গীর মরা যায়।"

শেফালী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই আর্ত্তনাদে অতিষ্ঠ ভবেশ খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

(৬)

এক বৎসর পরে ভবানীপুরে ছোট একটি একতলা বাড়ীর প্রকোষ্ঠমধ্যে শুইয়া পড়িয়া শেফালী তাহার অতীত জীবনের দুঃখস্মৃতিগুলির আলোচনা করিতেছিল। তাড়াতাড়ি একখানা খামের চিঠী হাতে করিয়া ভবেশ ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—"শেফালী।"

স্বামীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া শেফালীর পূর্ব্বস্মৃতিগুলি যেন আরও জোরে গাঝাড়া দিয়া সজাগ হইয়া দাঁড়াইল। সে শঙ্কাকুলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেছে কেন? ও কিসের চিঠী?"

"বৌঠান লিখেছেন" বলিয়া ভবেশ চিঠীখানা শেফালীর পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া দাঁড়াইতেই শেফালী তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া লইয়া দু'ছত্র পড়িয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"অগো আমার অদৃষ্টে বুঝি মোটেই সুখ নেই। সে যে আমার বড় আদরের ছিল। এক দণ্ড কাছ ছাড়া হয়ে থাকৃত না। যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি, সেদিনও বাছা আমার আচল ধ'রে কত কাঁদ্‌লে, দিদি মেরে ধরে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওঃ সে আমায় এমনি ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে তাত একদিনও ভাবিনি।"

ভবেশ নীরবে পত্নীর এই আকুল ক্রন্দন শুনিতেছিল, অতি আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে তাহার মনটাও উতলা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে শেফালী স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"তুমি আজকেই যাও, তোমার দাদাকে নিয়ে এখানে এসে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর। আহা একেত তাঁরা খোকার শোকে পাগল হয়ে আছেন, তার ও'পর আবার এই মরণাপন্ন ব্যামো। কি যে হবে, ভগবান্‌ই জানেন।"

ভবেশের ঘুমের ঘোরটা যেন কাটিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে বলিল—"না আমিত যেতে পারব না, তারা আমায় কি করে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল, তা আমার বেশ মনে আছে।"

শেফালী কাঁদিয়া ফেলিল—"ওগো, তাঁরা যে বড় বিপদে পড়েছেন, তুমি না দেখ্‌লে তাঁদের যে দেখ্‌বার আর কেউ নেই।"

"আমার কে ছিল শেফালী! পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত কল্লেন, তোমার কথায় কথাটি কইনি। তার পরে এই ছেলেটার হাত ধরে অনাশ্রয়ে কোথায় ভাসিয়ে দিলেন, কতকরে বল্লুম, একটিবার ফিরেও চাইলেন না। কত কষ্টে দিন গেছে, তাওকি তোমার মনে নেই।" বলিয়া ভবেশ একটু থামিল, তার পর করুণ স্বরে আবার বলিল—"তিন দিন এই বালকটাকে নিয়ে অনাহারে থেকে দাদাকে কত লিখ্‌লুম, কৈ তিনিত একটা জবাবও দিলেন না। ভাগ্যি তখন তোমার মামা পশ্চিম থেকে এসে পৌঁছেছিলেন, নৈলে আজ আর আমাদের বেচে থাকৃতে হত না। তা যাক্, সব ত আমি তাঁকেই দিয়ে এসেছি, এখন যদিও একটু করেকর্ম্মে নিয়েছি, তা ফেলে আমি ত আর সেখানে যেতে পাচ্ছি না।"

* * * * * *

অনেক কান্নাকাটা অনুরোধ-উপরোধে স্বামীকে বাধ্য করিয়া শেফালী তাহার ভাশুর ও জাকে কলিকাতায় আনাইয়া ভাশুরের চিকিৎসা আরম্ভ করাইয়া দিল। দীনেশের পুত্রহারা পত্নী পূর্ব্বের সমস্ত কথা ভুলিয়া ভবেশের ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। পত্নীর প্ররোচনায় দীনেশ একদিন এই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে যে ভাবে হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, সে চিন্তায় তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া আরও দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেফালীর যেন সে কথা মনেও ছিল না, ইঁহারা আসিতেই সে জার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল। এদিকে কিন্তু বহুচেষ্টা, রাতদিন অবিশ্রান্ত শুশ্রূষা করিয়াও শেফালী ভাশুরের রোগপ্রতিকারের কোন সম্ভাবনাই দেখিতে না পাইয়া দিন দিনই বিমর্ষ বিমনা হইয়া পড়িতেছিল। ভবেশ সরলমনে এদিক দিয়া বড় ঘেষিতে পারিত না। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর আচরণটা এখনও যেন তাহাদের প্রতি তাহাকে বিমুখ করিয়াই রাখিতেছিল। শেফালীর অনুরোধে সে বাহিরে থাকিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছিল মাত্র। কয়দিন যাবৎ দীনেশের অবস্থা ক্রমশঃই আশা ও আশ্বাসের বাহিরে যাইতেছিল। শেফালীর এ কয়দিন আহার নিদ্রা ছিল না, সে ঠিক দেবী-প্রতিমার মত ভাশুরের পায়ের নীচে বসিয়া কোন্ মুহুর্ত্তে তাহার কি প্রয়োজন হইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ চিকিৎসক হতাশ হইয়া

বলিয়া গিয়াছেন,—"আর দেরী নেই, দুএকদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

রাত্রি নয়টা বাজিতে দীনেশ একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভবেশ নীচে বসিয়াছিল, শেফালী ইঙ্গিত করিতেই ভ্রাতার মুখের গোড়ায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল।

দীনেশ কয়েক মুহূর্ত্ত চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া একটু স্থির হইয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে ভবেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেই তাঁহার চোক সজল হইয়া উঠিল। তার পর আস্তে আস্তে ক্ষীণ পাণ্ডুর হাতের মধ্যে ভবেশের হাতখানা টানিয়া আনিয়া অতিকষ্টে বলিলেন,—"ভাই, না বুঝে যা করেছি, এই শেষ সময়ে তার জন্য তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি ত চল্লুম, আমার শেষ অনুরোধ, আমায় ক্ষমা করে আবার গিয়ে তুই পৈত্রিক ভিটায় সম্পত্তির মালিক হয়ে বোস্‌। এখানে আর এমনই কষ্ট পাস্‌ না।" বলিতে বলিতে দীনেশ কাঁদিয়া ফেলিল। ভবেশের অন্তরও আজ যেন বাল্যের সেই ভ্রাতৃস্নেহের কথা মনে করিয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। সে কোন কথা বলিতে না পারিয়া ভ্রাতার সেই মৃত্যু-বিবর্ণ রক্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া অজস্র অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

অতিকষ্টে দীনেশ এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও ক্লিষ্ট অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"আর কোন কথা বল্‌তে আজ আমার লজ্জা হচ্ছে। যার কথায় যার কপট পরামর্শে বাধ্য হয়ে এমন প্রাণের ভাই, লক্ষ্মী বৌকে ত্যাগ করে ছিলাম, তোরা কি তাকে ক্ষমা কত্তে পার্‌বি?—"

বলিতে বলিতে দীনেশের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। বক্ষ কাপাইয়া হিক্কা হইতেছিল। সে আবারও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কণ্ঠনালীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আসিতেই তাহা ফিরিয়া গেল, কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দের সহিত শোনা যাইতেছিল, "ক্ষমা—তোর বৌদিকে।"

ভবেশ কাঠের মত দাঁড়াইয়া ছিল। বৌদির উপর তাহার বীতস্পৃহাটা এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই অন্তিম সময়েও জ্যেষ্ঠের আদেশ প্রতিপালন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। শেফালী ভবেশকে নীরব দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না, ভাসুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তিনি ত আমার বোন, তাঁর জন্যে আপনি মোটেও

ভাব্‌বেন না, আমরা থাক্‌তে তাঁর আবার ভাবনা কি? নিশ্চিন্ত হয়ে ভগবানের নাম করুন।”

অনেকদিন পরে আজ অন্তিমে পুত্রশোককাতর দীনেশের মুখ নিবিবার পূর্ব্বে দীপশলাকার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে শেষ শ্বাসের সহিত তাঁহার জীবনপ্রদীপের শেষ রশ্মিটুকু যখন শূন্যে মিলাইয়া গেল, তখন শেফালী উচ্চক্রন্দনে গৃহখানা মুখরিত করিয়া তুলিতেই ভবেশও পূর্ব্বের সমস্ত কথা ভুলিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ভ্রাতার পা জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষুজলে তাহা সিক্ত করিয়া দিল।

ঘরের লক্ষ্মী

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৭

প্রজ্বলিত গুল বিনাটানে সটকায় স্থাপিত প্রকাণ্ড কলিকার তামাকু পোড়াইতেছিল। ভৃত্য বহুক্ষণ হইল সটকার উপর কলিকা বসাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও পর্য্যন্ত হতাদরিত অবস্থায়ই পড়িয়া আছে। মূল্যবান তামাকু বৃথা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহাতেও আজ দুর্ল্লভ মিত্রের খেয়াল নাই। তীব্র চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত। রাগে ঘৃণায় তাঁহার চক্ষুর তারা দুইটা বাহিরে আসিবার চেষ্ট করিতেছিল। পুত্রের এতদূর স্পর্দ্ধা! পিতার বিন্দুমাত্র স্নেহ ব্যতীত যে পুত্র একদিনও জীবিত থাকিতে পারে না,—যে পিতার করুণায় সে জগতের প্রথম আলোক দেখিতে পাইয়াছে, সে কোন্ সাহসে, কিসের স্পর্দ্ধায় পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পিতা পুত্রের যে অটুট স্নেহবন্ধন তাহা কেমন করিয়া এমন ভাবে শিথিল হইয়া যায়। ঐ আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চিন্তার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ—শান্ত। বিশ্ব প্রকৃতি চির-নিয়তই ঐ অগণ্য নক্ষত্রমালার চির-কর্ম্মের মধ্যে চির-বিশ্রামে বিলীন, তথাপি মানুষের শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। বাধায় বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। একদিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর একদিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম, এই দুই এক কালে

এক সঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে! এই দুশ্চিন্তার মধ্যে দুর্লভ মিত্রের সেই প্রশ্নই বার বার মনে উদয় হইতেছিল। তিনি সংসারের এই জ্বালাময় সংঘর্ষে জীবনকে পদে পদে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ দেখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা;—কি করা কর্ত্তব্য, কি করা কর্ত্তব্য নহে! যে সর্প তাঁহারই আশ্রয়ে, তাঁহারই অন্নে, তাঁহারই কৃপায় আজও জীবিত রহিয়াছে, সে যদি তাঁহারই বক্ষ দংশন করিবার জন্য তাহার বিষধর ফণা বিস্তার করিতে পারে, তখন কেন তিনি তাহার বিষদন্ত চিরদিনের মত ভঙ্গ করিয়া না দিবেন। আর যাহাতে সে কখনও ফণা না তুলিতে পারে, তাহাই করা কি কর্ত্তব্য নয়?

দুর্লভবাবু যে গৃহে বসিয়া এই জটিল চিন্তার সমস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, সেখানি তাঁহার শয়নকক্ষ। গৃহে আসবাব পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল একখানি খাট, দুই তিনটা আলমারী, একটা প্রস্তরের সুগোল টেবিল ও একটা বিলাতী লোহার সিন্দুক। গৃহের দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীরে তাঁহার পরোলোকগতা পত্নীর একখানা প্রকাণ্ড তৈল চিত্র। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আলমারীতে যে সমস্ত দ্রব্য যে ভাবে সজ্জিত ছিল, তাহা আজও সেই ভাবেই সজ্জিত রহিয়াছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহা যে কোন দিন খোলা হইয়াছে, এমন বলিয়া বোধ হয় না। একবার তিনি গৃহের চারি-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর তৈলচিত্রের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্ত্তির ছায়া তিনি পুত্রের উপর দেখিতে পাইলেন। যে দুর্লভ মিত্র অসহায় বিধবার গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না, নাবালকের বিষয় কৌশলে বাজেয়াপ্ত করিতে যাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই, সহসা যেন আজ কিসের ভারে তাহা একেবারে নত হইয়া পড়িল। কে যেন তাঁহার অন্তরাত্মার ভিতর প্রবেশ করিয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সহস্র অপরাধ করিলেও সে তোমারই পুত্র, তোমারই রক্তে তাহার দেহ পুষ্ট, পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত যে তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল এক সূত্রে গ্রথিত। তিনি আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। পার্শ্বস্থিত সটকার নল উঠাইয়া লইলেন। সেই সময় অতি ক্ষীণ, অথচ অতি মধুর তাঁহার কন্যার স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"বাবা!"

তিনি ফিরিলেন,—দ্বারের দিকে চাহিলেন। দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান

তাঁহার কন্যা উমা। নিরাভরণা শুভ্রবসনা কন্যার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার বুকের রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। দুর্লভবাবু অনেক সাধ করিয়া তাঁহার এই একমাত্র বড় আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বহুপাত্র দেখিবার পর সত্যই এক সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার ভাগ্য মন্দ ; বিবাহের দুই বৎসর যাইতে না যাইতে নারীজীবনের সব হারাইয়া চিরদিনের মত দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া সে আবার আসিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বজ্র অপেক্ষা কঠোর দুর্লভ মিত্রও এই বিষাদ প্রতিমার সম্মুখে বিগলিত হইয়া পড়িতেন। কন্যাকে দেখিবামাত্র তাঁহার সব আশা, উদ্যম যেন একটা ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিত। তাই তিনি পারতপক্ষে কন্যার সম্মুখীন হইতেন না।

আজ সহসা কন্যাকে অসময়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। তিনি বিহ্বলের ন্যায় সেই বিষাদ মূর্ত্তির দিকে চাহিলেন। কি বিষাদে সেই মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। নিরাভরণ, শুভ্রবসন কি পবিত্র বিষাদস্মৃতি তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। সে স্মৃতি কি গম্ভীর! কি পবিত্র! কি বেদনাপূর্ণ! মূর্ত্তির গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহ একটা নিবিড় বিষাদ ছায়ায় ভরিয়া গেল! পিতাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া কন্যা অতি করুণ স্বরে বলিল,—“বাবা! বিনোদকে কি তুমি তাড়িয়ে দিতে বলেছ ?”

দুর্লভ মিত্র নীরব! সত্যই তো তিনি এই মাত্র তাঁহার পুত্রকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য সরকারকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেকে কঠিন করিয়া বলিলেন,—“হ্যাঁ মা, সত্যই আমি তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিতে বলেছি। যে পুত্র পিতার মর্য্যাদা রাখে না, পিতা কেন সে পুত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌বে। আবর্জ্জনার স্থান বাড়ীতে নয়, বাহিরে—আস্তাকুড়ে।”

উমা একটুখানি নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—“তবু বাবা সে তোমারই ছেলে। পুত্রের অপরাধ যদি পিতা মাপ না করেন, তবে তার অপরাধ মাপ কর্‌বে কে ? বাবা! বিনোদকে এবারকার মত মাপ কর।”

দুর্লভ মিত্র কোন কথা কহিলেন না, তিনি অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। উমা পিতার উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায়

বলিল,—"বাবা হরিচরণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ের সম্বন্ধ তুমিই স্থির করেছিলে। তোমার বল্‌বার পূর্ব্বে সে তো কখনও তাকে বিয়ে কর্ত্তে চায়নি। বিনোদকে মাপ কর, তারই সঙ্গে হরিচরণবাবুর মেয়ের বে দাও। এতে তোমার মর্য্যাদা বাড়্‌বে, শত্রুর মুখে কালি পড়্‌বে। আর মারও শেষ সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না।"

কন্যার কথায় পিতার প্রাণ গলিয়া গেল। পিতা ও কন্যা উভয়েই নীরব, বহুক্ষণ আর তাহাদের মুখে কোন কথা নাই। কেবল কলিকাতা নগরীর বিরাট কোলাহল, গাড়ীর ঘড় ঘড় অবিরাম গতিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। সহসা দুর্ল্ভ মিত্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, —"গোবর্দ্ধন!"

পরক্ষণেই হৃষ্টপুষ্ট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গোবর্দ্ধন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গোবর্দ্ধন দুর্ল্ভবাবুর খাস খানসামা। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র দুর্ল্ভবাবু বলিলেন,—"বড়বাবু।"

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল, দুর্ল্ভবাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,— "উমা, তোমার কথাই ঠিক! আমি হরিচরণের মেয়ের সঙ্গেই বিনোদের বিয়ে দেব স্থির কর্‌লেম। কাল আমি কাশী যাচ্ছি, একমাস বাদে ফিরে এসেই বিয়ের বন্দোবস্ত কর্‌বো।"

কন্যা বিষাদহাসি হাসিয়া বলিল,—"বাবা! একমাস বাদে! যাকে তুমি পুত্রবধূ কর্‌বে, সে দিনরাত তোমার চিরশত্রু অঘোর বোসের বাড়ী থাকে, এতে এরি মধ্যে নানা জনে নানা কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে।"

অঘোর বোসের নামে দুর্ল্ভবাবুর চক্ষু আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে বহুদিনের কথা, এক বিধবার কয়েকখানি অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়া দুর্ল্ভ মিত্র তাহাকে হাঁকাইয়া দেন। বিধবা উপায়হীন হইয়া অঘোরবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে। অঘোরবাবু বিধবার মর্ম্ম-বেদনা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন,—তাই তিনি নিজের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিস্তর মামলা মোকর্দ্দমার পর দুর্ল্ভ মিত্রের নিকট হইতে সেই অলঙ্কার কয়খানি আদায় করিয়া বিধবাকে প্রদান করিতে সক্ষম হন। সেই হইতে পাড়ার মিত্র ও বসুপরিবারের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্ল্ভবাবু কন্যার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কি! সে বাড়ীতে থাকে না?"

উমা বলিল,—"শুনলুম সে অধিকাংশ সময় অঘোর বোসের বাড়ীতে থাকে। প্রফুল্লবাবু নাকি তাকে খুব ভালবাসেন।"

দুর্লভবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় বিনোদবিহারী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া অবনতমস্তকে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্লভবাবু পুত্রের মুখের দিকে অতি তীব্রভাবে চাহিয়া কহিলেন,—"আমি তোমার আস্পর্দ্ধার কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সে কথা যাক, আমি হরিচরণের মেয়ের সঙ্গে তোমারই বিয়ে দেব স্থির করেছি, কাল আমি কাশী যাচ্ছি, আমার ফিরতে এক মাসের বেশী হবে না। আমি দেখতে চাই, তোমার এত তেজ কিসের। এই এক মাসের মধ্যে তোমায় প্রমাণ কর্ত্তে হবে, অন্ততঃ তুমি তোমার নিজের স্ত্রীকেও প্রতিপালন কর্ত্তে সক্ষম।"

বিনোদবিহারী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দুর্লভবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনি। তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে, একমাসবাদে এসে ব'লো।"

বিনোদবিহারী যেভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আবার ঠিক সেই ভাবেই বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দুর্লভবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"গোবর্দ্ধন।"

গোবর্দ্ধন কলিকায় ফু দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, দুর্লভবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"সরকার মশাই।"

গোবর্দ্ধন শটকায় কলিকা বসাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল, দুর্লভবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,--"যাও মা, এই কথাই পাকা রইলো। একমাস পরে হরিচরণের মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বে।"

উমা চলিয়া গেল। দুর্লভবাবু সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সরকার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, সে কর্ত্তার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল। বহুদিন হইল এক স্থবীর বৃদ্ধকে ভিটাছাড়া করিবার সঙ্কল্প যেদিন প্রথম দুর্লভমিত্রের মস্তিস্কে প্রবেশ করে, সেই দিন সে কর্ত্তার চক্ষে এই তীব্র চাউনি দেখিয়াছিল, তাহার পর দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তবু সে আজও সে চাউনি ভুলিতে পারে নাই। আজ প্রভাত হইতে বাবুর মেজাজ কোন পর্দ্দায় বাঁধা রহিয়াছে, তাহা সে বিলক্ষণ অবগত ছিল, কিন্তু তাহা যে এত চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সে

বুঝিতে পারে নাই। আজ আবার কাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে অতি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কি আমায় ডেকেছেন ?"

দুর্ল্লভ মিত্র ফিরিলেন,—সটকার নলটা পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন,—"হাঁ! আমি কালই কাশী যাব, সেখানে আমার একমাস দেরী হ'তে পারে, তার যা যা বন্দোবস্ত দরকার তা যেন ঠিক হয়।"

দুই হস্ত কচলাইতে কচলাইতে সরকার মহাশয় কহিল,—"সেখানে কি কোন জরুরী কাজ আছে ?"

দুর্ল্লভবাবু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হুঁ।" তারপর একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"হরিচরণবাবুকে খবর দাও, আমি এখনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।"

(৮)

দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সহসা দুর্ল্লভমিত্রের জরুরী তলব পাইয়া, "বিশ্বনাথ বোস,—আমি আসছি," বলিয়া হরিচরণ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাহার পর বিশ্বনাথ একাকী প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছে,—পাঁচ কলিকা তামাকু নিঃশেষ হইয়াছে, তথাপি হরিচরণের দেখা নাই। দুর্ল্লভ মিত্রের উপর বহুকাল হইতেই বিশ্বনাথের কেমন একটা বীতশ্রদ্ধা ছিল। সে তাহার কোন কার্য্যই কোন দিন ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আজ সহসা এত রাত্রে এরূপভাবে দুর্ল্লভ মিত্র কেন হরিচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইল, সে একাকী বসিয়া মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল, আর যত প্রকার কুভাবনা থাকিতে পারে, তাহার সমস্তগুলাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। গৃহে কেহ নাই,—কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। হুকার জল যেমন সেবনকারীর প্রতিটানে খোলের ভিতর গুলাইতে থাকে, এই দুর্ভাবনাগুলাও তাঁহার পেটের ভিতর ভয়াবহ ভাবে গুলাইতে আরম্ভ করিল। পার্শ্বের বাটীর ঘড়ীতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, তাহার আর এরূপ ভাবে একাকী বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একটু খানি কি চিন্তা করিল, তাহার পর একেবারে অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, "প্রভা প্রভা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বিশ্বনাথের ডাকে প্রভা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে বাহিরে উপস্থিত

হইবামাত্র, বিশ্বনাথ বলিল,— শীগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক ;—তোর বাবাকে ব্যাটা নিশ্চয়ই গুমি করেছে ।”

প্রভা বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—“সে কি কাকাবাবু! বাবাকে কে কি করেছে ?”

বিশ্বনাথ বলিল,—“সে অনেক কথা,—তুই বেটী বুঝ্‌বি নি। শীগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক,—আমায় এখনি থানায় যেতে হবে।”

বিশ্বনাথের গম্ভীর ভাব ও থানার নামে প্রভা সত্যই ভীত হইল, সে অতি মৃদুস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—“থানায় খবর দেবে কেন কাকাবাবু ?”

বিশ্বনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল,—“বেটী ফের কথা কয়, যা শীগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক।”

প্রভা গম্ভীরভাবে বলিল,—“দিদি কি ক'রে আসবে,—বামুন ঠাকুরুণ আসে নাই, সে যে আজ রাধ্‌ছে।”

বিশ্বনাথ মহা গরম হইয়া বলিল,—“তোর দিদি রাঁধ্‌ছে! না এ মেয়ে দুটোকে না মেরে আর হরিচরণ ছাড়্‌ছে না।”

প্রভা বিশ্বনাথের কথায় এক গাল হাসিয়া বলিল,—“বা দিদি না রাঁধ্‌লে রাঁধ্‌বে কে ? আমরা খাব কি ?”

বিশ্বনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—“রাঁধ্‌বে তোর বাবা।”

প্রভা মুখখানি একটু ভারি করিয়া বলিল,—“হুঁ! বাবা বুঝি রাঁধ্‌তে জানে ?”

বিশ্বনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল,—“কেন বাজারে কি দোকান সব উঠে গেছে ?”

প্রভা আবার হাসিয়া বলিল,—“বাজারে বুঝি ভাত পাওয়া যায় ?”

একেই হরিচরণের বিলম্বে বিশ্বনাথের প্রাণটা একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রভার কথায় সে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া একেবারে রন্ধনগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। রন্ধনগৃহে শোভা কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া মহা উৎসাহ সহকারে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। প্রজ্বলিত উনানের প্রখর উত্তাপে তাহার মুখের সমস্ত রক্ত জমাট বাধিয়া মুখখানিতে যেন সিন্দুর মাখাইয়া দিয়া ছিল,—তাহার উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মুক্তার মত ভাসিয়া উঠিয়া তাহাতে শতশ্রী উদ্ভাসিত

করিতেছিল। বিশ্বনাথ রন্ধনগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উনানের সম্মুখে হাতা হস্তে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে থমকাইয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণার স্বরূপ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল, সে নীরবে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল:

বিশ্বনাথের পদশব্দে শোভা দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কাকাবাবু বুঝি প্রভার কাছে শুনে আমার রান্না দেখ্‌তে এলে? তা শুধু দেখ্‌লে চল্‌বে না, আজ তোমায় এখানে খেয়ে যেতে হবে।"

শোভার কথায় বিশ্বনাথের চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"সে যা হয় পরে হবে, এখন আমি থানায় চল্লুম। তোর বাপকে নিশ্চয়ই দুর্ল্লভ মিত্র গুমি করেছে।"

থানার নামে শোভার প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী আরও বড় করিয়া অতি ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"গুমি! সে কি কাকাবাবু।"

বিশ্বনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল,—"গুমি কি জানিস্‌নি? আস্ত মানুষকে মানুষই পাপ। নিশ্চয়ই কোন একটা খুব ছোট গুপ্ত ঘরে হরিচরণকে আটকে রেখেছে। দুর্ল্লভ মিত্তির সব পারে। সে এই আস্‌ছি বলে গেল, নইলে এত দেরী হয়। না আর দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়, শেষ তাকে বের করা বিপদ হবে। কোন ভয় নেই মা, আমি এখনি পুলিস নিয়ে হাজির হচ্ছি।"

বিশ্বনাথের এই অদ্ভুত কথায় শোভা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কাকাবাবুর যেমন কথা! শুধু শুধু বাবাকে আট্‌কে রাখ্‌বে কেন? তুমি একটু বস বাবা এখনি এলো বলে?"

শোভার হাসিতে বিশ্বনাথ বেজায় বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মেয়েগুলোর কোনই বুদ্ধি হয় না। না আর দেরী করা কিছু নয়—

শোভা হাসিয়া বলিল,—"ওইতো বাবা এসেছে, বাহিরের ঘরে প্রভার সঙ্গে কথা কইছে।"

"তাইতো, তা হ'লে ব্যাপারটা কি হ'লো। নিশ্চয়ই কোনক্রমে পালিয়ে এসেছে," বলিয়া বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ী আবার বৈটকখানার দিকে চলিয়া গেল।

হরিচরণ বাহিরের ঘরে প্রভার সহিত কথা কহিতেছিল,—বিশ্বনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ তামাক খাও—তামাক খাও। সংবাদ মহাশুভ। টাকায় মানুষের প্রাণ যথার্থই উদার করে দেয়। দুর্লভবাবু সত্যই একটা মহৎ লোক। তুমি তামাক খাও—তামাক খাও—"

হরিচরণের অকস্মাৎ এত আনন্দ দেখিয়া বিশ্বনাথ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে ব্যাপারটা কি ভাল করিয়া জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। হরিচরণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"ওঃ কি দুর্ভাবনায়ই এ কটা দিন কাটান গেছে। কেমন করে বুঝব বল না ভাই, এর ভেতর এতখানি মারপ্যাচ রয়েছে। আমরা কি ভুলই করে ছিলেম। নাও তুমি এখন তামাক ধরাও।"

প্রভা হাসিয়া বলিল,—"বাবা, কাকাবাবু থানায় যাচ্ছিল। কি সব বলছিলো, দুর্লভ বাবু তোমায় গুমি করেছে না কি করেছে!"

হরিচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"তোর কাকাবাবু একটা আস্ত পাগল।"

বিশ্বনাথ এইবার কথা কহিল, বলিল,—"পাগলতো বটেই! বলি তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এই আস্‌ছি বলে যে গেলে, তারপর আর কোন খবর নেই। দুর্লভ মিত্তির তো আর লোকটী সোজা নয়, কাজেই আমায় থানায় যেতে হচ্ছিলো।"

হরিচরণ সেই ভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ তুমি আস্ত পাগল। তুমি যে সব তলিয়ে বোঝ'না ওইটাই তোমার দোষ, দুর্লভবাবু যথার্থই একটা মহৎ লোক হে। যাবামাত্র সে খাতির দেখে কে। তারপর এ কথা সে কথার পর আসল কথা পাড়লেন, বল্লেন হরিচরণ আমি আর বুড়ো বয়সে যে বিয়ে করবো না, এটুকু তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন নিশ্চয়ই তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবই।"

বিশ্বনাথ একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তা হ'লে বল বিয়ে স্থির?"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তাতে আর সন্দেহ আছে। তবে দিনটা একটু পিছিয়ে গেল। কাল দুর্লভবাবুকে একটা কি জরুরী কাজে কাশী যেতে হচ্ছে, সেখানে খুব বেশী তাঁর একমাস বিলম্ব হতে পারে।

তিনি ফির্‌লেই বিয়ের একটা ভাল দিন স্থির হবে। বিয়েটা আস্‌ছে মাসের শেষাশেষী হওয়াই সম্ভব।"

বিশ্বনাথ মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল,—"কিন্তু এ বিয়েতে আমার একেবারেই মত নেই। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে।"

হরিচরণ নিজেকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ, ঐটাই তোমার প্রধান রোগ। সব কথাই ঐ কেমন মনে হচ্ছে এ তো লেগেই আছে।"

সেই সময় শোভা তাহার রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিচরণ কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"হঁ্যা মা রান্না হয়ে গেল।"

শোভা সলজ্জ্যহাসে পিতার নিকট আসিয়া বসিয়া ঘাড় নাড়িল, হরিচরণ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"দেখ মা, কাল থেকে তুমি আর ও বাড়ীতে যখন তখন যেওনা। দুদিন বাদে তুমি দুর্ল্লভবাবুর পুত্র-বধূ হবে। এখন আর তোমার যার তার বাড়ী যাওয়া ভাল দেখায় না। প্রফুল্লনাথদের সঙ্গে দুর্ল্লভ বাবুর জানইতো মা বরাবরই মনোমালিন্য।"

বিশ্বনাথ কলিকা ধরাইতেছিল, কহিল,—"তার সঙ্গে এর কি! যাদের বাড়ীতে সে মানুষ বল্‌লেই হয়, সেখানে আর যাবে না! এ সব যে তোমার অনাসৃষ্টি কথা।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আরে যখন তাদের আপত্তি, তখন নাই বা গেল।"

বিশ্বনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল,—"আপত্তি! এ আপত্তি হতেই পারে না। এ সব গোলমেলে কথা আমার মোটেই ভাল ঠেক্‌ছে না।"

হরিচরণ মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ, তোমার বুদ্ধি জিনিষটা কোন দিনই হ'লো না। তাদের আপত্তি আর ও বল্‌বে আপত্তি হতেই পারে না।"

বিশ্বনাথ চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি তোমার ও কোন কথাই শুন্‌তে চাইনি। আমি একবার মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো তার এ' বিয়েতে মত আছে কিনা, তারপর আমার বুদ্ধিতে যা হবে আমি তাই কর্‌বো দেখি তুমি কি কর!"

প্রভা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কাকবাবু দিদির খুব মত আছে।"

বিশ্বনাথের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছিল, কহিল,—"থাম বেটী, ।" তারপর সে শোভার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"বলতো মা, কোন লজ্জা নেই, এ বিয়েতে তোমার মত আছে কিনা।"

শোভাকে অবিচলিত ভাবে হেটমুণ্ডে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে দেখিয়া বিশ্বনাথ একেবারে হতবম্ব হইয়া গেল।

(৯)

প্রভাতে হরিচরণ বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন আর পরিচিত যাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাকেই রাত্রের আনন্দসংবাদটা দিতে ছাড়িতে ছিলেন না। দুর্ভাবনায় এ কয়দিন তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন বলিলেই হয়। আজ একটু নিশ্চিন্ত হইয়া মহা আরামে এক এক চুমুক গরম চা পান করিতেছিলেন,—আর মনে মনে কন্যার বিবাহে কি করিবেন, না করিবেন তাহারই একটা ফর্দ্দ আওড়াইতে ছিলেন। ঘরটী রাস্তার উপরেই, নানা জনে নানা কাজে চলিয়াছে, হরিচরণের দৃষ্টি সে দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই, তিনি নিজের আনন্দ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় হরিচরণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, —প্রফুল্ল নাকি ! আরে শোন—শোন।"

প্রফুল্লনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"বোস, এমন সকালে কোথায় যাচ্ছ ?"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"একবার উকিলের বাড়ী যেতে হবে।"

হরিচরণ সেকথায় কোন জবাব না দিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, "দুর্লভ মিত্তিরের কাণ্ডটা শুনেছ বোধ হয় ?"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কাণ্ড আবার কি। বিবিকে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছেন।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আরে না না কাল রাত্রে এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে।"

প্রফুল্লনাথ হরিচরণের, কথার ভাব বুঝিতে পারিলেন না, তিনি নীরবে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিচরণ মহা উৎফুল্ল ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"কাল রাত্রে দুর্লভ বাবু আমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিনোদবিহারীর সঙ্গেই শোভার বিয়ে পাকা হ'লো। এ কটা দিন কি দুর্ভাবনায় কাটিয়েছি তা তোমায় কি বল্‌বো প্রফুল্লনাথ। আমি

গরীব, এই বাড়ীটুকু তাও দেখনা দুর্লভ বাবুর কাছে বাঁধা পড়েছে। তা পড়ুক সে জন্য দুঃখ নেই, কিন্তু আমার মা-মরা সোণার পুতুল, তাকে কেমন করে একটী সুপাত্রের হাতে দেব সেই ভাবনাই আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে-ছিলেম। তোমার যত্নে মা আমার কহিনুরের চেয়েও অমূল্য হয়েছে, পয়সার অভাবে হয়তো এমন রত্নটীকে যার তার হাতে তুলে দিতে হ'তো। কিন্তু বাবা ভগবান্ মুখ রেখেছেন—"

বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, অজ্ঞাতসারে দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, বড় বড় জলের ফোঁটা তাঁহার দুই কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথ এই বৃদ্ধের শীর্ণ কৃশ মুখের উপর স্নেহের যে স্নিগ্ধ মধুর ছায়াপাত অবোলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তিতে মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। সেই সময় শোভা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল,—সে মুখ তুলিয়া একবার প্রফুল্ল-নাথের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই অতি সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"বাবা বেলা হ'লো, বাজারে যাবে না ?"

কন্যার কথায় হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "যাই মা ?" তারপর প্রফুল্লনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"বোস বাবা। আমি বাজারটা ততক্ষণ করে আসি।"

হরিচরণ একখানি গামছা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রফুল্লনাথও উঠিতেছিলেন,—কিন্তু শোভা তাঁহার নিকটে আসিয়া হেটমুণ্ডে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।"

শোভার সুরের গাঢ়তা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ একটু বিচলিত হইলেন, কিন্তু মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অতি সরল ভাবেই বলিলেন, "তাই নাকি! তা তোমার আর তো কিছু বল্‌বার নেই ; দুর্লভ বাবুর বয়স একটু বেশী ছিল সেটা একটা বল্‌বার কথা বটে, কিন্তু তাঁর ছেলের বিষয়ে কোন কথাই বলা চলে না।"

শোভা মুখখানি আরও ম্লান করিয়া সেই ভাবেই বলিল, "আমার সব কথায়ই তুমি ঠাট্টা কর, সে যাক্ আর কোন দিন্ আমি তোমায় কোন কথা বলবো না। না জেনে হয়তো তোমার পায়ে অনেক দোষ অপরাধ করেছি, সে সব তুমি ভুলে যেয়ো। আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।"

সুতীক্ষ্ণ বর্ষার খোঁচার মত কথটা প্রফুল্লনাথের হৃৎপিণ্ডে আঘাৎ করিয়া তাঁহাকে একবারে গম্ভীর করিয়া দিল। অল্পবুদ্ধি নারী সামান্য একটু আঘাতেই

আত্মহত্যা করিয়া বসে এ ধারণাটা বহুকাল হইতেই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সেই ভাবটাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়া অতি গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কেন! অপরাধ?"

প্রফুল্লনাথের প্রাণের মধ্যে বার বার উদয় হইতে লাগিল,—এত কম বয়সে মেয়েরা কেমন করিয়া এমন সাবালক হইয়া বসে। শোভা একটুখানি নীরব থাকিয়া, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—"তা জানি না। দুর্ল্লভবাবুর আপত্তি, বিশেষ তোমার—"

প্রফুল্ল নাথ যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শোভার কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কথা! আমি ভেবেছিলাম বুঝি অন্য কিছু। এ আর এমন কি বিশেষ কথা,—একথা তিনি একশো বার বল্‌তে পারেন। আর তাঁর যাতে আপত্তি, তা তোমার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।"

শোভা রাত্রে অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, প্রফুল্লনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সে এই কথাটা বলিয়া বেশ একটু জমাইয়া তুলিবে। তাই আরম্ভটা সে বেশ ভাল ভাবেই সুরু করিয়াছিল, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কথাটায় প্রফুল্লনাথ নিশ্চয়ই একটু বিচলিত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু প্রফুল্লনাথের কথায় তাহার সমস্ত ধারণাটাই একেবারে এলোমেলো হইয়া গেল। আজ ছয় বৎসর ঘনিষ্ঠ মিলনেও কেন সে এই লোকটীর অন্ত পাইল না, তাই ভাবিয়া তাহার দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নীরবে হেট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রফুল্লনাথ শোভার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি মনে মনে হাসিলেন। অভিমানজড়িত অশ্রুসিক্ত শোভার স্তব্ধ মূর্ত্তিটি প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার বড়ই মধুর ঠেকিল। তাহা যেন ধীরে ধীরে তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের মাঝখানে একটা চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। শোভাকে নীরব দেখিয়া প্রফুল্লনাথ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া আবার বলিলেন, "শ্বশুরের মর্য্যাদা রাখ্‌তে এই সামান্য ত্যাগটুকু স্বীকার কর্‌তে তুমি দুঃখিত! স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে যে সীতাদেবী বনবাসের দারুণ ক্লেশও আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নিয়েছিলেন! বিবি মনে থাকে যেন, তুমিও সেই নারী। যেদিন শুনবো তুমি তোমার কুলবধূর ন্যায্য আসন গ্রহণ কর্ত্তে পেরেছ, সে দিন আমি যত সুখী হব, তত সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ হবে না। আমারই শিক্ষায় তুমি তোমার ন্যায্য আসন লাভ কর্ত্তে পেরেছ, এ কথা যখন আমার মনে হবে, তখন গর্ব্বের প্রকাণ্ড সান্ত্বনা আমায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।"

শোভা তথাপি কথা কহিল না,—প্রফুল্লনাথের কথাগুলা তাহার কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, প্রফুল্লনাথ কত বড়—আর সে কত ছোট। সাগর অনন্ত উচ্ছ্বাস লইয়া নীরবে অনন্তের সহিত মিশিতে ছুটিয়াছে, আর ক্ষুদ্র তটিনী একটী মাত্র সামান্য উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রফুল্লনাথ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—"তুমি আর আমার বাড়ী যাবে না,—তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, ভেবনা এ আমার কম দুঃখ! কিন্তু এমন কি দুঃখ আছে যা কর্ত্তব্যের কাছে মাথা হেট না করে?"

জল ভরা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, যেমনি আর একটী বেদনা ভরা বাতাস স্পর্শ করিল অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথের একটি মাত্র বেদনার কথা শুনিবামাত্র শোভা তার বুক ভরা অশ্রুভার আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না,—বড় বড় ফোঁটা কিছুতেই বাগ্ মানিল না কেবলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রফুল্লনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"বিবি, প্রাণ খুলে আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, দুঃখ করোনা, পৃথিবীর মত সহ্যশালিনী হও—তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।"

শোভা কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে যাইয়া প্রফুল্লনাথকে প্রণাম করিল। পায়ের ধূলা লইয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন একটা বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার নিজস্বকে অকুণ্ঠিত উদার নির্ম্মল আলোকের সহিত ব্যাপ্ত করিয়া দিল। একটা গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণ্য গন্ধে পবিত্র করিল। প্রফুল্লনাথ আর একটীও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(১০)

কথাটা চাপা রহিল না। বিন্দুবাসিনী আহারের পর তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত চশমাখানি চক্ষে দিয়া মহাভক্তিভরে রামায়ণখানি খুলিয়া বালিবধের পালাটা শেষ করিতেছিলেন। স্থানটী বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তবাণে বালির মৃত্যু হইয়াছে সেই সংবাদ পাইয়া পাগলিনীর মত তাহার পত্নী তারা ছুটিয়া আসিয়াছে। সে স্বামীর এই অন্যায় মৃত্যুতে বিলাপ করিতেছে, আর শ্রীরামচন্দ্রকে নানাবিধ কটূক্তি করিতেছে। ভগবান্ ব্যথিতাকে

সান্ত্বনা দিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাই মহা অপ্রস্তুত হইয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া আছেন।

সেই সময় বাটীর বাউন দিদি আসিয়া বেশ একটু রং দিয়া কথাটা লাগসই করিয়া বলিল, "শুনেছ মা,—ও বাড়ীর দুর্লভ মিত্তিরের আস্পর্দ্ধার কথা। তিনি তার ছেলের সঙ্গে শুবির বিয়ে দেবেন, তাই শুবি আর এ বাড়ীতে আসতে পারবে না। কি স্পর্দ্ধার কথা মা,—শুনে অবধি আমার গাটা জ্বলে যাচ্ছে।"

নীহার মায়ের পার্শ্বে বসিয়া রামায়ণ শুনিতেছিল, সে তাহার শোনা বন্ধ করিয়া বলিল,—"ওমা! তাই বুঝি শুবি আজ দুদিন আমাদের বাড়ী আসেনি। ওমা, তা কি করে জানবো আমি; এদিকে আমি তার ওপর রেগেই মরছিলুম।"

বাউন দিদি বলিল,—"তা সে ভদ্রলোকের বাছা, কি করে আসে বল দিদিমণি। তার বাপ তাকে বারণ করে দিয়েছে, কাজেই সে আসতে পারেনি। তার বাপেরই বা তাতে অপরাধ কি। দুর্লভ মিত্তিরের ভয়ে সে বেচারী আড়ষ্ট, কিন্তু দিদিমণি আমি তোমায় হক কথা বলে দিচ্ছি, এ দুর্লভ মিত্তির ঘুরিয়ে আমাদেরই অপমান করেছে।"

নীহার গম্ভীরভাবে বলিল,—"কেন এতে আমাদের অপমান কিসে হ'লো?"

বাউন দিদি তাহার গালে হাত দিয়া বলিল,—"ওমা দিদিমণি বলে কি! অপমান নয়? এত লোক থাকতে সে আমাদের নাম করে কেন? কোথাও যেতে বাধা নেই, যত বাধা আমাদের বাড়ীতে আসতে। ও কি কখনও আমাদের ভাল দেখ্‌তে পেরেছে দিদিমণি? বাবু বেঁচে থাকতেই—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে তাহার চক্ষে অঞ্চল দিল। বাবুর জন্য শোক আবার তাহার উথলিয়া উঠিল। চক্ষে জল বাহির হইয়াছিল কি না সে কথা হলপ করিয়া বলা যায় না, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরটা যে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল, তাহা না বলিবার কোনই উপায় নাই। তাহা বেশ একটু সুরে বাহির হইল,—"জিজ্ঞাসা করনা দিদিমণি, মা তো সব জানেন, কত ক্ষতি করবারই না চেষ্টা করেছে। বাবু বেঁচে থাকলে ওর সাধ্যি কি যে আমাদের এ অপমান করে।"

সরল প্রাণ নীহার অবাক হইয়া বাউন দিদির কথাগুলা শুনিতেছিল;

সে তাহার মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"সত্যি মা, দুর্লভ বাবুর এ বড় অন্যায়। বিয়ে দিবি তো বিয়ে দিবি, এত কিসের। নিশ্চয়ই আমাদের অপমান করবার জন্যই শুবিকে আমাদের বাড়ী আসতে বারণ করেছে।"

রামায়ণখানি কোলে করিয়া বিন্দুবাসিনী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া কন্যা ও বাউন ঠাকুরুণের কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। এক্ষণে রামায়ণ বন্ধ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষের চসমা নামাইলেন। কথাটা শুনিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখখানি একেবারে অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি বাউন ঠাকুরুণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্লে বাউন ঠাকুরুণ ?"

বাউন দিদি বিন্দুবাসিনীর মুখের অপ্রসন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই সে একটু সঙ্কোচিত হইয়া বলিল,—"না মা এমন কিছু নয়। এই বলছিলুম কি, শুবির এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করাটা দুর্লভ বাবুর ভাল কাজ হয়নি। আমরা বাপু তোর কি ক্ষতি করেছি, আমাদের ওপর এত আক্রোশ কেন ? বলতো মা, আজ যদি বাবু বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে কি ও আমাদের এত বড় অপমান করবার সাহস কর্ত্ত।"

বিন্দুবাসিনী শোভাকে নিজের কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সে তাঁহার বাড়ীতে আর আসিতে পাইবে না, এ কথা শুনিয়াও তিনি তত আঘাত পাইলেন না, যত আঘাত পাইলেন দুর্লভ মিত্রের আচরণের কথাটায়। তাঁহার স্বামীর সহিত পূর্ব্ব শক্রতার কথা মনে করিয়াই যে দুর্লভ মিত্র শোভাকে এ বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এ যে—ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের অপমান করিবার জন্যই দুর্লভ মিত্র শোভার এবাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন। বাউন ঠাকুরুণের সেই কথাটা তখন বিন্দুবাসিনীর কর্ণে বাজিতেছিল, "বাবু থাকলে তার সাধ্যি কি যে আমাদের এ অপমান করে ?"

তাঁহার মনে হইল, স্বামীতো তাঁহার পুত্র কন্যা, ঐশ্বর্য্য সমস্তই তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিয়াছেন। তাঁহাকেই যে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন সমস্ত মান অপমানের জন্য তিনিই যে সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেছেন, আর বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না। স্বামীর বংশগৌরবে আঘাত লাগায় বিন্দুবাসিনীর ভিতরটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সহসা একটা কথা সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

যাহা তাঁহার এক দিনের জন্যও মনে হয় নাই, যাহা মনে হইবারও কোন কারণ ছিল না, সেই কথাটাই যেন উদয় হইয়া তাঁহার স্বামীর গৌরবকে আরো উজ্জ্বল করিয়া দুর্লভ মিত্রের এ তেজের কথাটার মুখে একেবারে প্রস্তর প্রাচীর আঁটিয়া দিল। তিনি নীরবে রামায়ণখানি নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কন্যা ও বাউন দিদি বিন্দুবাসিনীর অপ্রসন্ন গম্ভীরমুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না।

একখানা গদি-আটা ইজি চেয়ারের উপর পড়িয়া প্রফুল্লনাথ একখানি কি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আজ দুই দিন হইতে তাঁহার মনের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে আজ দুই দিন হইতে যেন একটা চিন্তার "কালোঝোরা" হু হু শব্দে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল। তিনি সেই স্রোতটাকে নানারূপ কাজের গোলযোগের মাঝে ফেলিয়া চাপা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চিন্তাটাকে ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। তিনি বহুক্ষণ হইতে পাঠে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিছুতেই মন বসিতে ছিল না। তাঁহার দুর্ব্বল মনের উপর সেই জন্য তাহার নিজের ঘৃণা হইতেছিল।

"প্রফুল্ল।"

সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে প্রফুল্লনাথ দ্বারের দিকে চাহিলেন,—দ্বারের সম্মুখে বিন্দুবাসিনী। জননীর মুখখানি যে আজ বড়ই অপ্রসন্ন প্রফুল্লনাথের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। তিনি একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"বাবা, ঘরে কি বউ আনবিনি ?"

এরূপ কথা জননীর নিকট শুনিবার জন্য প্রফুল্লনাথ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। জননীর সহিত ইতি পূর্ব্বে কই তাহার বিবাহের কথাতো কখনও হয় নাই। সহসা আজ তবে এ কথা কোথা হইতে আসিল। জননী উত্তরের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, প্রফুল্লনাথ ভাবিবারও সময় পাইলেন না,—মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"মা! তুমি তো আমায় একথা কোন দিন বলনি ?"

বিন্দুবাসিনীর কণ্ঠ অতি স্থির,—বলিলেন, "মানুষ কবে আছে কবে নেই। আমি এখন তোর একটা বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তে কাশীবাসী হতে পারি। আমি একটী কনে ঠিক করেছি, এখন তোর পছন্দ হ'লেই হয়।"

প্রফুল্লনাথ জননীর কথার বাধা দিয়া বলিলেন,—"মা, আমায় পছন্দ!

তুমি যেমনটী চাও আমি তেমনি একটী বউ এনে তোমার দাসী করে দেব। তোমার কোন বিষয়ে অমিল হবে,—তুমি দুঃখ পাবে,—এমন মেয়ে আমি কখনও ঘরে আনবো না।"

পুত্রের কথায় জননীর প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এমন পুত্রের তিনি জননী, এই ভাবিয়া গর্ব্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হইল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা আমি শোভার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব স্থির করেছি। শুনলুম দুর্লভবাবু তাকে এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করেছেন। তাতে নিশ্চয়ই তার প্রাণ ভেঙ্গে গেছে। তুই জানিসনে প্রফুল্ল, মা আমায় কত ভালবাসে। তাকে আরতো আমি অমনি ডাকতে পারিনে। বাবা! আমার বড় ইচ্ছে এবার তাকে বরণ করে ঘরে তুলবো।"

বিন্দুবাসিনীর স্বর ভঙ্গ হইল। জননীর মুখখানি ম্লান দেখিলে প্রফুল্লনাথ সমস্ত বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিতেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"মা! তুমি কি জান না, তোমার ইচ্ছেই আমার সকল আদেশের বড়।

[ক্রমশঃ।

গোড়ায় গলদ

(লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায়)

(১)

গল্প লেখায় প্রমথেশ বাবু সিদ্ধ-হস্ত। গল্প-প্রিয় পাঠকগণের বাহবায় প্রমথেশ বাবু যশের হিমালয় শিখরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাসিক পত্রিকার যে সংখ্যায় তাঁহার গল্প বাহির হইত, তাহার বিক্রয় এমনি অসম্ভব ভাবে বাড়িয়া উঠিত যে সম্পাদকের পকেট পরিপূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বেশ আনন্দের হাসি মুখে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিত। কাজেই সম্পাদকগণ স্ব স্ব পত্রিকায় প্রমথেশ বাবুর একটী গল্প বাহির করিতে পারিলে নিজেকে শুধু ধন্য বোধ করিতেন না,—একটা মস্ত মাতব্বর স্থির করিতেন। সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিয়া প্রমথেশ বাবু লক্ষ্মীদেবীর যেরূপ অনুকম্পা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকাংশ লেখকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না।

প্রমথেশ বাবু যে নির্জ্জন গৃহখানিতে বসিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়

দেবীরই আরাধনা করিতেন, তাহাতে সরঞ্জমাদি বিশেষ কিছুই ছিল না। ঘরের একধারে একটা ফরাশ পাতা,—সেই ফরাশের উপর তাকিয়া বক্ষে তাঁহার দিন রাত কাটিয়া যাইত। সম্মুখে কাগজের ক্ষুদ্র একটী শ্লিপের স্তূপ,—মস্যাধার ও গোটাকয়েক কলম। তাঁহার বাড়ীতেও বিশেষ কোন গোলযোগ ছিল না,—দম দেওয়া ঘড়ির মত তাহাও বেশ সুস্থ শান্তভাবে চলিয়া যাইত। তাঁহার সেই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া বাধা বিঘ্ন উৎপাতশূন্য হইয়া বেশ একটা আনন্দের মধ্য দিয়া তিনি সর্ব্বদাই কল্পনাসাগরে ভাসিয়া যাইতেন।

সেদিনও নিয়মিতরূপে প্রমথেশ বাবু কল্পনা বিস্তারে বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজকে কিছু দিতে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, দিবসের উজ্জ্বল আলো ক্রমেই গৃহ হইতে সরিয়া গবাক্ষের নিকট জড় হইতেছিল, প্রমথেশ বাবুর লেখনী আরবীয় অশ্বকে পরাস্ত করিয়া ছুটিয়াছে,—এখনি এই পরিচ্ছেদ শেষ না করিলেই নয়। কাল প্রত্যুষে প্রভাতী পত্রিকায় ইহা না পৌঁছিলে প্রভাতী যথাসময়ে কিছুতেই বাহির হইতে পারে না। সেই সময় তাঁহার বর্ষিয়সী পত্নী সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সহসা তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার নথ নাড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আজ যেন আর ভুলো না,—বড় বৌমার বাবাকে পত্রখানা যেন লেখা হয়।"

প্রমথেশ বাবু মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন,—"না আজ আর ভুল হবে না,—এই কটা শ্লিপ শেষ করেই পত্রখানা লিখে দিচ্ছি।"

পাছে স্বামী অন্যমনস্ক হন, এই আশঙ্কায় তিনি আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন,—প্রমথেশ বাবু সেই ভাবেই আবার বলিলেন,—"আজ নিশ্চয়ই লিখবো।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। প্রমথেশ বাবুর কলম আবার চলিতে লাগিল। প্রায় লেখা শেষ হইয়াছে, সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা গৃহে প্রবেশ করিল,—হাসিতে হাসিতে পিতার পার্শ্বে আসিয়া বলিল,—"বাবা তুমি এখনও লিখ্‌ছ, এদিকে যে সব এসে পড়েছেন। মেসো মশাই তোমায় ডাক্‌ছেন। ছোট দাদার জন্য আজ যে মেয়ে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে যেতে হবে।"

প্রমথেশ বাবু হাসিলেন, বলিলেন,—"তাইতো মা ভুলে গেছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি একখানা বড় খামের ভিতর কতকগুলি লেখা শ্লিপ

পুরিয়া শিরোনামা লিখিলেন, দ্বিতীয় খামের মধ্যে আর একখানি স্লিপ দিয়া শিরোনামা লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহা তখনি ডাকে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তিনি সত্বর নিম্নে নামিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত গৃহের ভিতর বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল।

(২)

কয়েকদিন অপেক্ষার পর চন্দ্রপুরের জমিদার সারদাবাবু ঈপ্সিত পত্রখানা পাইবামাত্র চশমাখানি চক্ষে সংলগ্ন করিলেন। খামখানি যদিও সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল না, তথাপি পত্রখানা অঙ্গুলীসংযোগে টানিয়া বাহির করিলেন। পত্রের দুই তিন ছত্র পাঠ সমাপ্ত না হইতেই বৃদ্ধের মুখশ্রী অন্যরূপ ধারণ করিল। প্রাণ আর বাকি অংশটুকু পাঠ করিতে চাহিল না, কিন্তু উপায়হীন অবস্থায় ব্যাধিগ্রস্তের ঔষধ সেবনের মত গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন।

কি ভয়ানক সংবাদ! বৃদ্ধের হৃদয় একটা অজানিত আশঙ্কায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। শত সহস্র চিন্তা হু হু শব্দে তাঁহার সমস্ত হৃদয় দখল করিয়া বসিল। কাছারীর কর্ম্মচারিগণ সহসা তাঁহার এই ভাব দর্শনে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল, কিন্তু কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। ভট্টাচার্য্য খুড়ো বেশী করিয়া এক টিপ নস্য নাকে গুজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাকার পত্র হে। কারুর কি কোন পীড়ার সংবাদ?"

সারদাবাবু উত্তরে কেবলমাত্র "কলিকাতার" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্যাকুল প্রাণে গৃহিণীকে খাইয়া সকল বলিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট অশ্রু ভিন্ন দ্বিতীয় যুক্তি পাইলেন না। অদম্য হৃদয় সারদা চৌধুরীও নির্জ্জনে বসিয়া দু' এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিলেন। হিন্দু-গৃহে কন্যা যদি স্বামী পরিত্যক্তা হয়, তাহার কি ভীষণ পরিণাম, তাহা তিনি বুঝিতেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যার অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি যেন একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কি করা কর্ত্তব্য, কি করা কর্ত্তব্য নয়—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

আজ কয়েকদিন ধরিয়া তিনি পত্রখানা বার বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাঠ করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার শান্ত সুশীলা কন্যা মেনকার অবস্থা কি পত্রের বর্ণনায় পরিণত হইবে? আশঙ্কার আবেগে তিনি আবার পড়িলেন,—

"আপনার ন্যায় ধনীর কন্যা আমার মত দুঃস্থের গৃহোপযোগিনী নহেন। জমিদারকন্যা, জমিদারবধূ হওয়াই উচিত ছিল! কি করিব বিধিনির্ব্বন্ধে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে,—আর ফিরিবার উপায় নাই। আশা করি আপনি সত্বর আপনার কন্যাকে লইয়া যাইয়া দুঃখী শান্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দিবেন। এতদিন বহু কষ্টে সহিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে অত্যন্ত অসহ্য বোধে লিখিতে বাধ্য হইলাম। আমার পুত্রের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার আবার বিবাহ দিব। তাহাও যত সত্বর সম্ভবপর হয় সম্পন্ন করিব। সময় থাকিতে সংবাদ দিলাম, অন্যথায় আপনার কন্যা এখানে থাকিলে বালিকার প্রতি অত্যাচার বলিয়া মনে করিবেন না—"

বৃদ্ধ সারদাবাবু কয়েকদিন ক্রমাগত পড়িয়া পড়িয়া পত্রের অংশটুকু প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তথাপি আশঙ্কার আতিশয্যে বার বার পড়িতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন প্রিয়তমা কন্যার পরিণাম,—হিন্দু গৃহের স্বামিপরিত্যক্তার শোচনীয় ভবিষ্যৎ! বৃদ্ধ অশান্ত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় যাইয়া বৈবাহিক ও জামাতার নিকট করযোড়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া কন্যার একটা উপায় করিবেন স্থির করিলেন। সেইদিনই কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন কিন্তু "শুভ বিবাহ" মুদ্রিত লালবর্ণ খামে বৈবাহিক প্রমথেশ বাবুর পত্র আসিয়া পৌঁছিল,—বৃদ্ধের সব আশা একেবারে বিলীন হইয়া গেল, তিনি বালকের মত আছড়াইয়া পড়িলেন।

(৩)

আত্মীয় কুটুম্বদিগের বাটী নিমন্ত্রণ সারিয়া প্রমথেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ষোড়শী পত্নী মেনকা কি একখানা পত্র পড়িতেছে। স্বামীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি সেখানা লুকাইয়া ফেলিল। সে তাহার স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"দেখ আমি একটা অন্যায় কাজ করেছি।"

"কি অন্যায়?" বলিয়া প্রবোধ নিজের গিলেকরা উড়ানীখানি পত্নীর গলদেশে জড়াইয়া দিল। স্বামীর এই প্রেম-পূর্ণ প্রীতি ব্যবহারে মেনকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তোমার একখানা চিঠি খুলে পড়েছি।"

প্রবোধ গম্ভীরভাবে বলিল,—"জান আমি উকীল হয়েছি। আইন জানি। একজনের চিঠি বিনা অনুমতিতে খুললে তার শাস্তি কি জান?"

মেনকা মুখখানি একটু ভারি করিয়া বলিল,—তামাসা রাখ। সত্যি বাবার পত্র পেয়ে আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে। বাবা যে কি লিখেছেন, তার আমি একবর্ণও বুঝতে পারলাম না।"

প্রবোধ বলিল,—"কই দেখি কি পত্র—?"

মেনকা নিজের ও স্বামীর পত্র দুইখানি স্বামীর হস্তে দিল। প্রবোধ প্রথম নিজের ও পরে পত্নীর পত্রখানি দুই তিনবার পাঠ করিল, কিন্তু পত্রের কোন অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে পত্র দুইখানি তাহার পত্নীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"তাইতো, এ ব্যাপার কি? তুমি কি তোমার বাবাকে কিছু লিখেছিলে নাকি—?"

মেনকা বলিল,—"কই না, আমিতো অনেকদিন বাবাকে মোটে চিঠিই লিখিনি?"

প্রবোধ আর কিছু বলিল না,—উভয়েই নির্ব্বাক! তবে কি পিতা কোন পত্র লিখিলেন? প্রবোধ তাহার পিতার স্বভাব জানিত, তবে হঠাৎ একি হইল। আজ ছয় বৎসরের উপর তাহার বিবাহ হইয়াছে, কই কখন ত এরূপ পত্র আসে নাই। সে তাহার পত্নীকে কি বলিতে যাইতেছিল,—সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবু তাঁহাকে ডাকিতেছেন?"

প্রবোধ ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট উপস্থিত হইল।

প্রমথেশ বাবু তাহার নির্জ্জন গৃহে একখানি পত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলেন,—পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন,—"পড়।"

প্রবোধ যত সত্বর পারিল পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রখানি তাহার শ্বশুর তাহার পিতাকে লিখিয়াছেন। বুঝিল এত তাহার পত্রের প্রতিবিম্ব! সে কিছু না বলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল। প্রমথেশ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এ সব ব্যাপার কি? বলা নেই, কওয়া নেই বুড়ো মানুষের মনে এমন করে কষ্ট দিতে হয়। বড় হয়েছ,—লেখা পড়া শিখেছ এখনও ছেলে মানুষী গেল না।"

প্রবোধ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিল,—"কই আমিতো কোন পত্র লিখিনি!"

প্রমথেশ বাবু একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—"তবে কোথা থেকে বৌমাকে ত্যাগ করবার কথা এলো?"

প্রবোধ সেই ভাবেই বলিল,—"তাতো আমি বল্‌তে পারিনে, তিনি আমাকেও ঐরকম একখানা পত্র লিখেছেন।"

প্রবোধ তাহার এবং তাহার পত্নীর পত্র দুইখানা পিতার হস্তে দিল। প্রমথেশ বাবু তাহা দুই চারিবার উল্টাইয়া দেখিলেন, কিন্তু কোনই ভাব পাইলেন না। সেই সময় প্রভাতী পত্রিকার সম্পাদক তাহার শেষ সংখ্যা প্রভাতী লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রমথেশ বাবু পত্র দুইখানা পুত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,—"আসুন রজনীবাবু,—তারপর এ সময় কি মনে করে?"

রজনীবাবু সেই ফরাশের এক পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিলেন,—"আপনার গল্পটা তাড়াতাড়িতে আর আপনাকে দেখাবার সুবিধে হয়নি, কিন্তু শেষটা যেন কেমন খাপছাড়া হ'য়েছে বলে বোধ হচ্ছে।"

এই বলিয়া রজনীবাবু পত্রিকার যে অংশে প্রমথেশ বাবুর গল্পটা বাহির হইয়াছে, সেই স্থানটা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিলেন। প্রমথেশ বাবু পত্রিকাখানা তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম—দুস্থ উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকের সহিত ধনি-কন্যার বিবাহ, তাহার পর স্বামীর প্রতি কন্যার ব্যবহার, পর্য্যায়ক্রমে ঠিক চলিয়াছে। যখন ধনিকন্যা শ্বশুর এবং স্বামীর উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহার পিতার 'অনুগ্রহ ভিক্ষু' জানাইয়া সদর্পে সংসারের মস্তোকোপরি পদাঘাত করিয়া চলিতে চাহে, তখন পিতৃ-পরায়ণ জ্ঞানী পুত্র অধৈর্য্য হইয়া পিতার দ্বারা পত্নী ত্যাগের লিপি শ্বশুরের নিকট পাঠাইতেছেন,—তাহার শেষ অংশ অসম্পূর্ণ! অসামঞ্জস্য!

"আপনার কন্যা আমার গৃহ-লক্ষ্মী কিন্তু আর সহ্য হয় না। তাঁহার ব্যবহার ক্রমশঃ চরমে উঠিয়াছে,—নিজে আমি অক্ষম বলিয়া আপনার সাহায্যে পুত্রকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পুত্র আমার শিক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু মালক্ষ্মী এত দয়াহীনা,—আমার করজোড়ের প্রার্থনা, আমার পুত্রের কাতর অনুনয় সকল উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের পরিচয় দেওয়ার নিবৃত্তি নাই। তিনি—"

তাহার পর বড়ই অসংলগ্ন ভাষা ও ভাব!

"বৈবাহিক মহাশয়! নমস্কার! আপনার কন্যা আজ চারি দিবস অন্ন পথ্য করিয়াছেন,—তিনি এক্ষণে বেশ সুস্থই আছেন। চিন্তার কারণ নাই! মা আমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী ইত্যাদি—"

বলা বাহুল্য প্রমথেশবাবুর হঠাৎ পত্রিকা পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিলেন, কাহার ভুলে তাহার সদানন্দ বৈবাহিক মর্ম্ম পীড়িত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের আনন্দের ভাগ গ্রহণ করিতে আসেন নাই। তিনি পত্রিকা-খানি রজনীবাবুর হস্তে দিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সম্পাদক! পত্রিকায় কি বাহির হইল তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই !!

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৮)

নিষ্পন্দ স্তব্ধ নিশীথিনীর যামের পর যাম আপন মনে চলিয়া যাইতেছে। শেলবিদ্ধ মুমূর্ষুর মত সংজ্ঞাহীন সুপ্ত নিশীথিনীর সুগভীর দীর্ঘ যামগুলি বিনিদ্র ললিতমোহনের চোখের উপর বাত্যা-বিক্ষুব্ধা ব্রততীর মত অকারণ-পরিত্যক্তা লীলার ব্যাধি-বিক্ষুব্ধ রোগ-পাণ্ডুর শীর্ণ মুখচ্ছবির মৃত্যুবিবর্ণতা টানিয়া আনিয়া তাহার উদ্দাম কর্ত্তব্যকঠোর চিত্তকে একেবারে মুষড়িয়া ধরিয়াছিল। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় রোগের প্রবল আক্রমণে আক্রান্তা ক্ষীণাঙ্গী লীলার যন্ত্রণাসূচক অব্যক্ত অস্পষ্ট অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যগুলি ললিতমোহনের দান্ত একান্তই স্নেহপ্রবণ হৃদয় লক্ষ্য করিয়া অলক্ষ্যে শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া হৃদয়ের স্তরকে স্তর বিদ্ধ বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল। খোলা আকাশের গায়ে দীপ্ত চন্দ্রকর তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত গৃহে প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মির ন্যায় হীনপ্রভ ম্লানিমাজড়িত নক্ষত্র-গুলিকে সমবেদনাকাতররূপে প্রতীয়মান করিয়া অবজ্ঞাভরে যেন লহর তুলিয়া হাসিতেছিল। পক্ষীর পাখার চকিত শব্দ ও শুষ্ক পত্রের দোলানী-

জনিত মর্ম্মরতা একত্রে মিশিয়া লীলার বেদনায় ব্যথিত হইয়া করুণ ক্রন্দনের স্বরে সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে ললিতমোহনকে ত্রস্ত, ভীত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিল।

সন্তানের মৃত্যুর পর শোকস্তব্ধ মাতার মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গৃহে গৃহে সুখসুপ্ত মানুষের অসতর্ক শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে প্রকৃতির জাগরণ আশা করিয়া অতিষ্ঠ, অতিমাত্র চঞ্চল ললিতমোহন দুইহাতে সময়গুলি ঠেলিয়া দিয়া অতিবড় শত্রুর মত রজনীর অবসান আকাঙ্ক্ষায় একবার বাহিরে আর একবার রোগশয্যায় লীলার অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে সস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আপন মনে আপনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে গৃহে মানুষ, বৃক্ষের কোটরে, শাখায় বা তলদেশে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতি যেমনই নিদ্রার ভারে হতচেতন, মৃত্যুশয্যায় লীলা যেন তদপেক্ষাও চেতনাহীনা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই জড়তার সহিত অবসাদগ্রস্তা লীলার সংজ্ঞাহীনতা মিশিয়া পড়িয়া ললিতমোহনকে স্তব্ধ, চেতনা-বিরহিত অবসন্নপ্রায় করিয়া দিতেছিল। আবার থাকিয়া থাকিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত আশার ক্ষীণ রশ্মিপাতে প্রহরিহস্তের দীপালোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগৃহের ন্যায় তাহার হৃদয় একটু উজ্জ্বল, একটু শান্তি ও সান্ত্বনাময় হইয়া পড়িয়া পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতেছিল।

সহসা পার্শ্বপরিবর্ত্তনের বিফল প্রয়াশ পাইয়া লীলা একেবারেই অস্ফুট-স্বরে কি বলিল, যদিও ললিতমোহন তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না, তথাপি বেলাভূমে মরিচিকাভ্রান্ত পিপাসা-ক্ষামকণ্ঠ পথিকের মত সে শব্দেও তাহার হৃদয় বাতাসের আঘাতে উত্তাল জলরাশির ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তাপদগ্ধ উৎকর্ণশ্রোত্র ললিতমোহন রৌদ্রতপ্ত কুসুমের মত লাবণ্যমাত্রাবশিষ্ট লীলার মুখের গোড়ায় মুখ আনিয়া তাহার চেতনার প্রতীক্ষায় নিমেষহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে লীলা এবার পূর্ণ জড়িত স্বরে বলিল,—"ওঃ বড্ড জ্বালা, জল ?"

ললিতমোহন অতিসন্তর্পণে ঝিনুকে করিয়া আস্তে আস্তে লীলার মুখে বিন্দু বিন্দু জল ঢালিয়া দিতেছিল, কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া লীলা চোক মেলিয়া চাহিল, তাহার হীনপ্রভ, শ্রান্ত, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি কক্ষটার মধ্যে বারেকের জন্য যেন কাহার খোঁজ করিয়া তখনই আবার নিমীলিত

হইল। সে একটা চাপা শ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যাধিবিকম্পিত বক্ষটাকে আরও কাঁপাইয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—"দাদা ?"

লীলার সেই লক্ষ্যহীন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির যাথার্থ্য অনুভব করিতে গিয়া ললিতমোহনের হৃদয় দুঃখস্মৃতির পূর্ণাভিব্যক্তিতে একেবারেই উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রবল স্রোতের টানে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে আটকাইয়া রাখা যেমন অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত গাঢ় আবেগও তেমনই অনবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। বাষ্পাকুলিত চক্ষে ললিতমোহন লীলার কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া অতিকষ্টে বলিল,—"লীলা ডাক্‌ছিলে বোন, এখন কেমন বোধ হচ্ছে ?"

লীলা এবার এমনই কাতর হতাশাজড়িত দৃষ্টিতে তাকাইল যে, স্বেচ্ছায় দীপ্যমান বহ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিতে গিয়া উত্তাপ-ভীত পতঙ্গের ন্যায় ললিতমোহনের পক্ষে সে দৃষ্টি অসহনীয় বলিয়া মনে হইল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিয়া কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়া বাহির হইতেছিল, জ্বালা করিয়া চোকের পাতা আর্দ্র হইয়া আসিল, মত্ত হস্তীর বেগের ন্যায় সে অপ্রতিহত বেগ অবরোধে অসমর্থ ললিতমোহন দ্রুতপদে বাহির হইয়া অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জনে আপনাকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইল।

অবসানপ্রায় রজনীর হিমশীতল বাতাস রজনীগন্ধা যুই প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিয়া স্নিগ্ধ শীতলতায় ললিতমোহনের উত্তপ্ত বিকৃতপ্রায় মস্তিষ্কটাকে অনেকটা শীতল করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্ত সেই গাঢ় রজনীর নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া লইয়া ললিতমোহন বারেকের জন্য উন্মুক্ত সুপ্ত আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তখনই তাহা নামাইয়া লইল; প্রকৃতির বিশাল বিশ্বভাণ্ডারে সর্ব্বব্যাপ্ত ভগবানের অপার অনন্ত, অফুরন্ত করুণার ছবি, স্বচ্ছ কাচের গায়ে প্রতিকৃতির মত তাহাকে একটা সীমাহীন শাশ্বত শান্তির পথ দেখাইয়া দিল। অননুভূতপূর্ব্ব আশার আশ্বাসে আনন্দে ও তৃপ্তিতে অমানিশার মতই গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে কে যেন একটা দীপ্ত আলো জ্বালিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিল। অন্নাভাবে জ্বলিতজঠর, শীর্ণ,কঙ্কালসার মানুষ সপরিতোষ ভোজ্যের সম্ভাবনায়, মুমূর্ষু প্রাণলাভের প্রত্যাশায়, নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের মাতা পুত্রের অচির প্রত্যাগমনের সম্ভাবনায়, বন্ধ্যা পুত্রজননোৎসব-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়,প্রিয়বিরহবিধুরা পত্নী স্বামিসঙ্গের আশায়,আনন্দে আত্মহারা হইয়া কম্পিত বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়া যেমন পূর্ণ ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করিয়া

থাকে, ললিতমোহনও বিশ্বাসের প্রাবল্যে ভগবানের দয়া প্রার্থনা করিয়া ক্ষণেকের জন্য তেমনই অপেক্ষা করিতে লাগিল। আকাশবিলম্বী বৃক্ষগুলির, পত্রপল্লবের, লতাগুল্মের, পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিমাত্রের এমনই একটা নীরব নিদ্রিত অভিনয়—তাহার চোকের উপর আজ যেন একটা নূতন বিবেকের বিচিত্র চিত্রপট দাঁড় করাইয়া দিয়া তাহাকে বলিয়া দিল, যে শক্তি ইহাদিগকে জড়, নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর পার্থিব বস্তুগুলির প্রতি অঙ্গুলীসঙ্কেতে একাধিপত্য করিয়া যাইতেছে, সে শক্তি ভিন্ন সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন মানুষও অঙ্গহীন বিকলেরই মত একপা অগ্রসর বা পশ্চাদপসৃত হইবার সামর্থ্য রাখে না। সর্ব্বনিয়ন্তা পাতা জগদীশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, তাঁহার আজ্ঞা বা ইচ্ছা সমস্ত মানুষের ভালমন্দ ও শুভাশুভের জন্য জাগ্রত রহিয়াছ। পূর্ণ বিশ্বাসে ভক্তি-উদ্বেল-হৃদয় ললিতমোহন তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া লীলার মাথায় হাত দিতেই তাহার মনে হইল, ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ এ স্পর্শেই লীলা রোগমুক্ত হইবে।

(৯)

ললিতমোহনের স্পর্শে চকিতা লীলা নিমীলিতচক্ষে কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"ওঃ আর ত পারি না, হা ঈশ্বর, এ সময়েও কি একটিবার দেখ্‌তে পাই না।"

ভগবান্ লীলার সেই কাতরতাপূর্ণ ডাক শুনিতে পাইলেন কি না ললিতমোহন বারেকের জন্যও সে তথ্যের চিন্তা করিল না। তাহার সজাগ বৃত্তিগুলি তখন বিশ্বাসে একেবারে অন্ধ, নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বিশ্বাসের আতিশয্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"লীলা? সেরে ওঠ বোন্, ভগবান্ অবশ্য তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন।"

লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—"দাদা, আবারও আমায় ঐ আশীর্ব্বাদ কচ্ছ। তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, ও কথা আর মুখেও এন না, এক দিনের জন্যও যদি ছোট বোন্ বলে আমায় ভালবেসে থাকত, ভগবান্‌কে ডেকে দাও, তিনি আমায় সংসার থেকে দূর করে দিন।"

সেই দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরের বিকৃতশব্দে ললিতমোহনের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুপ্ত মানুষ কোন দুর্ঘটনার আকুল আহ্বানে সহসা জাগিয়া উঠিয়া ক্ষণেকের জন্য যেমন আপন কর্ত্তব্য ঠিক করিতে না পারিয়া কেমন

একটা কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার মধ্যে গিয়া পড়িয়া দমিয়া যায়, অন্ধ একান্ত বিশ্বস্ত ললিতমোহনের হৃদয়ও মুহূর্ত্তের জন্য তেমনি একটা গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া দমিয়া গেল। লীলা আবারও বলিয়া উঠিল,—"না মরে এই যে আমি দিন দিন জ্বল্‌ছি, সে ত মরার চেয়েও আমার বেশী হচ্ছে দাদা!" একটু থামিয়া শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে একটু বিশ্রান্তির মধ্যে টানিয়া আনিয়া এবার আরও উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল,—"দাদা, বল ত কোন্ সুখের আশায় তুমি আমায় বাঁচাতে চেষ্টা কচ্ছ! যে কষ্ট আমি পাচ্ছি, যদি নাই জান্তে ত এক কথা ছিল, কিন্তু জেনে শুনে আমায় তুমি আর এ কষ্ট পেতে অনুরোধ কর না। বরং পায়ের ধূলা দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর, মরে আরবারেও যেন তোমার বোন হয়েই জন্মাতে পারি।"

জড়প্রকৃতির মত স্থির অচঞ্চল ললিতমোহন কথাটি বলিতে পারিল না। লীলার রোগশীর্ণ শরীর উত্তেজনায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঊষার প্রথম আলোকপাতে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহখানা জনকোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই পুনর্ব্বারও লীলা চেতনা হারাইয়া তাহাকে দ্বিগুণ স্তব্ধতার মধ্যে টানিয়া আনিল।

* * * * *

কয়েক দিন পরে লীলা আজ সকালে বেশ একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইতেছিল। ললিতমোহনও ঘরের একপাশে একটা পাটীর উপর পড়িয়া অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরণ এমনই অবস্থার মধ্যে অলস শরীরটা ঢালিয়া দিয়া শোয়াস্তির আশায় অবশের মত পড়িয়াছিল। সহসা একটা চীৎকারের শব্দে তাহার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া সে দেখিতে পাইল, লীলার দেহটা খরস্রোতে কম্পমান বেতসলতার ন্যায় ঠক্ ঠক্ করিয়া মুহুর্মুহু কাঁপিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত রক্তটা মস্তিষ্কে উঠিয়া শরীর একবারে ফেকাসে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটি কপোলদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়া একেবারেই ঘোলা হইয়া গিয়াছে। ললিতমোহন তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া লীলার মাথায় হাত দিয়া উদ্বিগ্ন ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিল—"লীলা—লীলা?"

লীলা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া ত্রস্ত চক্ষু ইতস্ততঃ ঘুরাইয়া প্রলাপের মতই বলিল—"যাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, তাঁকে রক্ষা কর।"

আবারও লীলা ব্যাধির ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছে মনে করিয়া ললিত-

মোহন যে আশাটুকু পাইয়াছিল, তাহাও ত্যাগ করিতে গিয়া অৰ্দ্ধনিমজ্জিত ব্যক্তি সহসা একবারে ডুবিয়া গেলে, যেমন চুবানী খাইয়া ওঠে, তেমনি অবস্থার মধ্যে পতিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে লীলা অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইল, তাহার বিকৃত মুখ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। উর্দ্ধে উত্থিত চোখের তারা নামিয়া আসিল। কম্পটা কমিয়া গেলে ধীরে ধীরে বলিল—"দাদা বলত, কি হলে শীগ্‌গির মরা যায়—"

ললিতমোহন বাধা দিয়া বলিল,—"আবার ও কথা কেন বোন? সেরে ওঠ, মরণের আকাঙ্ক্ষা কল্লেও যে পাপ হয়।"

ক্রোধপরিপূর্ণ অথচ কারুণ্যবিজড়িত, তৃষ্ণামুখরিত, অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতে ললিতমোহনের দিকে চাহিয়া লইয়া লীলা বলিল—"পাপপুণ্য বলেত কিছু নেই দাদা, যদি থাকৃত, এই যে জীবনভরে মরারও বেশী কষ্ট পাচ্ছি, তেমন কোন পাপ করেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।"

ললিতমোহন তৃষ্ণার্ত্তের মত হা করিয়া লীলার কথাগুলি গিলিতেছিল। লীলা বড় রকমের একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল—"সেত পরের কথা, মরণ সেত হল না, যদিও জানৃছি, বেঁচে থেকে তোমাদের কষ্টের কারণই হচ্ছি, তা বলে ইচ্ছা কল্লেইত আর মরা যায় না।"—বলিয়া লীলা মধ্যপথেই থামিয়া গেল। সহসা কোন্ দুঃস্মৃতির কথা মনে করিতে গিয়া আবারও তাহার চুলের আগা হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তখনকার মত আপন বক্তব্যটা ভুলিয়া গিয়া লীলা কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"দাদা, বলত কি করি।"

"কেন বোন কি হয়েছে?" বলিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে ললিতমোহন লীলার দিকে চাহিয়া রহিল।

মেঘস্তিমিত ম্লান রৌদ্রের আভাটা লীলার শুষ্ক মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। লীলার অবসাদে সে যেন এবার আরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া নিরুপায়ের মত মেঘের মধ্যেই ডুবিয়া যাইতে চাহিল। লীলা অতিকষ্টে তুল্যাবস্থ সেই রৌদ্র হইতে মুখখানা টানিয়া লইয়া বলিল—"বড্ড দুঃস্বপ্ন দেখেছি দাদা; ওঃ, সে যে মনে কত্তেও ভয় হচ্ছে। দেখ্‌ছিলুম্, সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে আর ঘরে থাকৃতে না পেরে বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়েছেন। দিনরাত পথে পথে মাত্‌লামি করে কাটৃছে। আর পথের লোক পাগল বলে তাঁকে তাড়া করে ইটখোলা ছুড়্‌ছে—"

লীলা আবার থামিল। সমস্ত কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ললিতমোহন বুঝিল, কথাটা লীলার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের দুশ্চিন্তাপ্রসূত। সে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"বাজে স্বপ্ন লীলা, তুই সুবোধের জন্যে কোনও ভয় করিস্‌নি ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে লীলা বলিয়া উঠিল—"না দাদা, সে কথা নয়, তুমি ত আমায় কোনদিন বিমুখ করনি, তাই আজ তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, আমার কষ্টের কথা মনে করে, বৃথাই তাকে তুমি ত্যাগ কত্তে পাবে না। আপন ভুলে চিরদিন সুখে দুঃখে যেমনই দেখে আস্‌ছ, তেমনই দেখ্‌বে। পাপী বলে তুমি যদি তাকে ত্যাগ কর ত, তার আর উপায় নেই। তাঁর কি দোষ বল ত ? আমি আমার অদৃষ্টের ফল ভোগ কচ্ছি বৈত নয়! তিনি যাই বলুন, যাই করুন, তুমি ভিন্ন তাঁকে বিপদে রক্ষা কত্তে আরত কেউ নেই।" বলিতে বলিতে শ্রান্ত লীলা বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ললিতমোহন লীলাকে প্রবোধ দিয়া আস্তে আস্তে ওষুধের গ্লাসটা মুখের কাছে ধরিয়া বলিল—"লীলা, অষুধটা খাও বোন ?"

এত কষ্টের মধ্যেও মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হইয়াও এতদিন লীলার যেন মরিতে কেমন ভয় হইত, আজ কিন্তু স্বামিসম্বন্ধে এমনই একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া বিপরীতভাবে বাচিবার কথা ভাবিতেই তাহার শরীর কাটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। লীলা যেন কেমন একরকমের হইয়া পড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"না আরত আমি অষুধ খাব না।"

বিস্মিত ললিতমোহন লীলার চোকমুখের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া বলিল,—"সে কি ? ওষুধ খাবে না লীলা ?"

লীলা গাঢ়স্বরে বলিল—"আমার মরণ নেই, ওষুধ না খেয়েও আমি ঠিক সেরে উঠ্‌ব, তুমি তা দেখ। তা বলে সাধ করে বাঁচ্‌বার জন্য ওষুধ খাব, সে কোন্‌ আশায় দাদা ?"

সহসা একটা বিকট শব্দ করিয়া মেঘটা নামিয়া আসিল। ঝুপঝাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গৃহপ্রবিষ্ট সেই প্রভাত-রৌদ্রটুকু লীলার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পাইয়া ক্রোধবশেই যেন মুহূর্ত্তমধ্যে মেঘের কোণে অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়া পূর্ণ আড়ম্বরে গৃহখানা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। ললিতমোহন স্নেহস্পর্শে লীলার হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"তোর এ কষ্ট দেখে, আমার মনে কি হচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস ত লীলা ?"

"সব বুঝ্‌ছি দাদা, কিন্তু কি কর্‌ব, উপায় ত নেই।" বলিয়া লীলা আবারও বালিশের মধ্যে মুখ লুকাইল।

"আমার কথা রাখ, ওষুধটা খা, এবারটা সেরে ওঠ, আমি বল্‌ছি, মানুষের চিরদিন সমান যায় না, তোরও যাবে না।"

লীলা আবার বলিল—"আজ যে আমার প্রাণটা কেবলই কেমন করে উঠ্‌ছে দাদা, বেচে থেকে যদি তাঁর তেমন কোন অবস্থায়ই দেখ্‌তে হয়ত, আমিত তা সহ্য কত্তে পারব না।"

"সে জন্যে তুই মোটেও ভাবিস নি, আমি থাক্‌তে সুবোধের কোন অনিষ্ট হবে, এমন কথা তুই কেন মনে কচ্ছিস ?"

কথা কয়টা ললিতমোহন এমনই জোর দিয়া বলিল যে, ললিত-মোহনের কার্য্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসযুক্তা লীলার মনে সন্দেহের বা ভীতির কণামাত্র রহিল না, বিশেষ করিয়া আর তর্ক করিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না। সে এই গাঢ় মেঘের পরিমাণ দুঢ়দৃষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত হইয়া গ্লাসের ওষুধটা এক চুমুকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

(১০)

চৈত্রের পরিণত রবিকর দিগন্তব্যাপী পৃথিবীর পরিধিটাকে গ্রাস করিয়া ধরিয়া একটা বিরাট জ্বালার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। স্নিগ্ধ মধুর কোকিলশব্দও যেমন বিরহতাপদগ্ধা যুবতীকে তীব্র জ্বালা প্রদান করে, চিরশীতল বাতাসটাও আজ এই জ্বলন্ত রৌদ্রের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়া তেমনই মানুষ-মাত্রের জ্বলন্ত দাহের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অশান্ত অতিষ্ঠ প্রাণিগণ বিরহজ্বালার মতই এই অসহনীয় তাপ হইতে আত্মরক্ষার্থ ছায়াবহুল আশ্রয়ে মাথা গুজিয়া নিদাঘের দীর্ঘ সময়গুলি কোনমতে কাটাইয়া দিতেছিল। সরসী ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া একটা শীতল পাটীর উপর পড়িয়া পড়িয়া অন্যমনস্কভাবে কি একখানা পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিল। আর নিখিলেশের অনুপস্থিতিতে কেমন একরকমের উদাসভাবে তাহার প্রাণটা শূন্য শূন্য বোধ হইতেছিল।

বাহির হইতে ললিতমোহন ডাকিল—"নিখিল।"

ললিতমোহনের স্বর শুনিয়া সরসী সত্বরপদে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দৃষ্টি করিতেই তাহার হর্ষপ্রফুল্ল মুখখানা অবসাদগ্রস্তের মত ঈষৎ

মলিন হইয়া উঠিল সদ্যঃস্নাত ব্যক্তির মত ললিতমোহনের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদার্দ্র, এই অসহনীয় রৌদ্রের মধ্যেও মাথায় ছাতা নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ হইতে অচিরপ্রত্যাগত মানুষের মত তাহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট; অন্নাভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখাইবার জন্য গলার হাড় কয়খানা চামড়ার আচ্ছাদনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে অবাধ্য হইয়াই যেন উচু হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে রক্তাভ মুখখানা একবারে লাল হইয়া গিয়াছে। কপোলদেশে সঞ্চিত অজস্র ঘাম ফোটার আকারে পরিণত হইয়া টস্ টস্ করিয়া ঝড়িয়া পড়িতেছিল। সরসী বিস্ময়ব্যাকুল ভাবে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"এ অসময়ে আপনি কোত্থেকে ?'

ললিতমোহন সে কথার জবাব না দিয়া ধীর গতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধপাস্ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নিখিল কৈ সরসী ?"

"কি কাজে বাইরে গেছেন।" বলিয়া সরসী ললিতমোহনের গায়ে হাত-পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। ললিতমোহন আপনাকে অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়া অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এই রোদ, মানুষ ঘর থেকে বেরুতে পারে না, আর নিখিলের এমন কি কাজ জুটল যে, সে এর ভিতর বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেছে ?"

নিজের কার্য্যের প্রতি একবারেই দৃষ্টি না করিয়া ললিতমোহনের কথাটায় সরসীর মুখের গোড়ায় একটা চাপা হাসি আপনা হইতে সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—"রোদের ভয়ে আপনি কিন্তু ভালমানুষটির মত ঘর ছেড়ে এক পাও নড়েন নি !"

ললিতমোহন অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। তাহার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলের শরীরের পক্ষে এ রৌদ্রটা যে কোন কাজের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, এমন কথাত তাহার একবারের জন্যও মনে হয় নাই ! নিখিলেশের সুখের শরীর, আবার তাহার কোন ক্লেশের চিন্তা মনে হইলেই ললিতমোহন আকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িত, তাই কেমন একটা আশঙ্কা হইতেছিল বলিয়াই সে এ প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল। এখন সরসীর কথার জবাব দিতে গিয়া সেও একটু হাসিলমাত্র। সরসী সে চাপা হাসির অর্থ মনে মনে বুঝিয়া লইয়া বলিল—"তা যাক, কিন্তু দিন দিন যে শরীরটাকে এমনই শেষ কচ্ছেন, এতে কি লাভ হচ্ছে বলুনত ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া ললিতমোহন উত্তর করিল—"বেচে থেকেও সংসারে যাদের কোনই প্রয়োজন নেই, তাদের শরীরের জন্যে তোমার মত আর কেউ ভাবে কি না, তাওত জানি না ?"

সরসী গম্ভীর হইয়া বলিল—"ভাবে কি না, সে আপনি জানেন না,—আমি জানি। যে বুঝ্বেই না, তাকে বোঝানও যে বড় শক্ত, কথায়ই বলে 'ঘুমুলে মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু জেগে থেকে যে ঘুমের ভাণ করে, তাকেত জাগান যায় না!' সে কথা যাক, উঠুন, হাতমুখ ধোবেন চলুন। এখনও হয়ত জলটুকু মুখে দেন নি !"

ললিতমোহন একটা হাইম ত্যাগ করিয়া শরীরের গ্লানি অনেকটা যেন লাঘব করিয়া লইয়া বলিল—"শরীর ভাল নেই, তাইত এখানে এয়েছি। এবেলা কিছু খাবও না। তারি জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, এখন যা কচ্ছিলে তাই কর, এই ঠাণ্ডা বাতাসে পড়ে পড়ে একটু ঘুমোই। নিখিল এলে আমায় ডেকে দিও।"

কথাটার সবখানি শেষ না হইতেই নিখিল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তদবস্থ ললিতমোহনকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে কখন এলি, এদ্দিন যে কোন খবরও পাইনি, ছিলি কোথায় ?"

সরসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্বামীর পায়ের জুতা ও গায়ের জামাটা খুলিয়া রাখিয়া হাতের পাখাটা জোরে চালাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল। ললিত-মোহন উঠিয়া নিখিলকে টানিয়া বসাইয়া বলিল—"খবর পাস নি, একথা বলিস না, আমি যে সময় পেলেই তোদের চিঠী লিখেছি।"

"কৈ আমিত তোর কাছ থেকে দুমাসের মধ্যে কোন চিঠী পাইনি, কেমন সরসী পেয়েছ কোন চিঠী ?"

সরসী হাসিয়া বলিল—"কৈ না, আর চিঠী যে পাবেই উনিত তাও বলেন নি! সময় পেলেই লিখেছেন, তার মানে ওর হয়ত এ দুমাস সময়ই হয়নি!"

বেলা পড়িয়া আসিলে খর রবিকরটা যখন শান্ত হইয়া আসিল, কার্য্যক্ষম জনগণ যখন চিন্তাসহচর বিশ্রান্তির আশা ত্যাগ করিয়া পরের পর যে যার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ধাবিত হইতেছিল। নিখিলেশও তখন জামাজুতা পড়িয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সরসী বাধা জন্মাইয়া বলিল—"আজ নাই বা গেলে, বন্ধুদা ত কদ্দিন এখানে এয়েছেন। এর মধ্যে একটি দিনও আমাদের এখানে আস্তে পারেনি। ললিতবাবু যেতে

বারণ কচ্ছেন, আজকার বিকেল বেলাটা না হয় ওর কৃষ্ণগঞ্জের কাহিনীই শুন্‌বে।”

ক্যাশ হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহা ধরাইবার উপক্রম করিয়া নিখিলেশ ব্যস্তভাবে বলিল—“না না, সে কি হয়, বিভূতিবাবু না হয় নানা কাজে আস্‌তে পারেন নি, তা বলে আমায় রোজ যাবার জন্যে কত অনুরোধ করেছেন। না গেলে তিনি মহা অসন্তুষ্ট হবেন।”

ললিতমোহন গম্ভীরমুখে হাসিয়া বলিল—“ওকথা ওকে বল না সরসী? তোমাদের জোড় কপাল, শ্বশুরবাড়ীর নামটি শুন্‌লে নিখিল কিন্তু আর স্থির থাক্‌তে পারে না!”

সরসীও হাসিয়া বলিল—“সে আপনার সত্যি কথা। তা বলে এতটা কিছু নয়। বড়দা এয়েছেন জমিদারীর তত্ত্বতল্লাস কত্তে; তাবলে আর কি এমুখ হতে নেই। উনি এমনইবা কি দায়ে পড়েছেন যে, রোজ রোজ হাজিরা দিতে যাবেন।”

নিখিলেশ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এটা স্বীকার করিতে সেও নারাজ নহে যে, সে শ্বশুর বাড়ীর প্রতি একটু বেশী বাধ্যবাধকতা রক্ষা করিতে চাহে। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহার স্বতঃই মনে হইত যে, শ্বশুর শাশুড়ী বা তাহাদের বাড়ীর অপর যে কেহ তাহাদের মত আপনার লোক পৃথিবীতে কমই আছে। বিশেষ করিয়া ধনী শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মানমর্য্যাদা প্রভৃতির বিচার বা বিবেচনা করিতে গিয়া যদি শেষটা কোন প্রকারের মনোমালিন্যই ঘটে, এ ভয়ে সে সে দিক্ দিয়া যাওয়া কখনও সঙ্গতই মনে করিত না। বিবাহের পর হইতেই বিলাসপুষ্ট নিখিলেশ বিলাসের অনুকূল শ্বশুরবাড়ীর প্রতি একটা একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। সরসী এতটা পসন্দ করিত না। সে স্বামীর মানমর্য্যাদার প্রতি নিজের বিবেককে সজাগ রাখিবার জন্য প্রতিনিয়তই চেষ্টা করিত; ললিতমোহন নিখিলেশের এই দুর্ব্বলতাটাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত, বাধ্য হইয়া কাজের খাতিরে কোনদিন তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু নিখিলেশের প্রাণে আঘাত লাগিবার ভয়ে সে এ সম্বন্ধে বড় বাড়াবাড়ি করিতে সাহসী হইত না। এ ভাবের প্রশ্রয় পাইয়া নিখিলেশের এই একঘেয়ে আবেগটা দিনদিনই মাত্রা ছাড়াইয়া পড়িতেছিল, বলিয়া ললিতমোহন মনে মনে বিশেষ একটা অস্বস্তি বোধ করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলে নাই।

নিখিলেশও এই যায়গাই ললিতমোহনের সহিত ভিন্নমত হইয়া পড়িত। সেদিনকার সেই টাকার কথাটা হইতে সে ললিতমোহন ও সরসীর প্রতি যেন কেমন একটু বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু জলের মাছ যেমন জল ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, হাড়ীর ভাত যেমন হাড়ী ছাড়িলে পচিয়া যায়, প্রাণ যেমন দেহকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি একপ্রাণ সরসী বা ললিতমোহনের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করা তাহার পক্ষে ঘোর অশান্তি ও তাপের কারণ বলিয়া সে প্রাণ ধরিয়া ইহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা অসৌজন্য প্রকাশ করিতে পরে নাই। আজ কিন্তু ললিতমোহনের কথার উত্তরে সে চটিয়া উঠিয়া বলিল—"তা তাঁদের নামে তোরই বা এত জ্বালা কেন, তুই কিন্তু মনে করিস, তারা মানুষই নন।"

ললিতমোহন এবারও হাসিয়া বলিল—"ঐ দেখ, কি যে বল্‌ছিস্, যেন জ্ঞানই নেই। ও ভাবের খারাপ ধারণাত আমার কারু প্রতি নেই যে, তাদের অমন ভাব্‌তে যাব। তবে কথা এই, যা রয় সয় তাই ভাল। মানুষকে ত চারদিক সাম্‌লিয়ে কাজ কত্তে হবে।"

নিখিলেশ আর কোন কথা না বলিয়া মুখ বাকাইয়া সরসীর দিকে চাহিতেই ললিতমোহন নিখিলেশের মুখের চুরুটটা টানিয়া মুখে গুজিতে গিয়া বলিল—"সে যাক, তোকে কিন্তু আমার একটা কাজ কত্তে হবে"

নিখিলেশ সোৎসুক ভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া ললিত-মোহনের কথাটার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ললিতমোহন বলিল—"এবারে কৃষ্ণগঞ্জে যা দেখে এলুম, তাত বলেছি। এই যে মহামারী, আমি কিন্তু তার কারণ দেখ্‌লুম, এক জলের অভাব। একটা গ্রামের মধ্যে এমন জল নেই, যে জল মুখে তোলা যায়, তাই সে গ্রামে একটা পুকুর কাট্‌বার চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু যে জায়গায় পুকুর কল্লে সাধারণের উপকার হতে পারে, তেমন জায়গা একজনের হয়ে ওঠে না। তিন চার জন লোক কিছু কিছু ক্ষতিস্বীকার কল্লে তবে হতে পারে।"

সরসী পূর্ণ উৎসাহে বলিল—"তা হলেত আরও সুবিধে, একজনের হলে অনেক ক্ষতি হত, সে স্বীকার কত্ত কি না তাও বলা যায় না। পাঁচজনের মধ্যে যখন পড়েছে, তখন সকলেই সাধারণ ক্ষতিস্বীকার করে, এমন একটা মহৎ-কাজ কত্তে বাধা জন্মাবে, সে কখনও হবে না।"

ললিতমোহন গাঢ়স্বরে বলিল—"না সরসী, সে ভেব না। একজনের হলে

হয়ত সোজা হ'ত। বিশেষ করে তোমাদের কতক যায়গা তাতে পড়েছে। তোমার দাদা তা ছেড়ে দিতে একেবারেই নারাজ। আমি এত করে বল্লুম, তাত শুন্লেনই না, উচিত টাকা পেয়েও দিতে চাচ্ছেন না। তাই বল্‌ছিলাম নিখিল যদি বিভূতিবাবুকে একটু অনুরোধ করেত কাজটা হয়ে যায়।"

নিখিল সহজ গলায় বলিল—"আমি তা কি করে পারি। তাদের যায়গা, ক্ষতিবৃদ্ধি সুবিধাঅসুবিধা না জেনে আমিত এমন অন্যায় অনুরোধ কত্তে পার্‌ব না।"

বিস্মিত ললিতমোহন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—"অন্যায় ?"

"যার ন্যায়অন্যায়ের ধারণা আমার নেই, সে সম্বন্ধে তাদের মতের বিরুদ্ধে অনুরোধ করা অন্যায় বৈ কি ?"

ললিতমোহন এবার স্বর খাট করিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"তা যাই হ'ক, আমার অনুরোধে অন্ততঃ তোকে একাজ কত্তে হচ্ছে।"

নিখিলেশ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"দেখ দেখি, এ অন্যায় অনুরোধ আমি কি করে করি, না ভাই, আমিত তা পার্‌ব না।"

"পার্‌বি না, সে আগেই জানি। আমি দেখ্‌ছি, তুই দিন দিন একেবারে গোল্লায় যাচ্ছিস্। তাঁরা প্রতিকাজে এমনই আচরণ কর্‌বেন, যা মানুষের চামড়া নিয়ে সহ্য করা চলে না। আর তুই এইভাবে তার প্রশ্রয় দিবি" বলিয়া ললিতমোহন বিরক্তিভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল।

নিখিলেশ বিরক্তি বা অনুরক্তির কোন লক্ষণই প্রকাশ না করিয়া সহজ শান্ত গলায় আবারও বলিল,—"এটা কিন্তু তোরও একটা মস্ত দোষ, যা তুই ভাল মনে করিস্, আর কেউ যদি সেটাকে পছন্দ না করে ত, সেই গোল্লায় যাবে ! কিন্তু এমন স্বপ্রাধান্যত চিরকাল চলে না।"

সরসী এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এখন কথাটা একটু বাড়াবাড়ীর মধ্যে যাইতেছে দেখিয়া নম্র গলায় বলিল,—"ললিতবাবু, আপনি এর জন্যে ভাব্‌বেন না। আমিই না হয় বাবাকে অনুরোধ কর্‌ব খ'ন।"

নিখিলেশ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, —"না সরসী, তুমি ওর মধ্যে যেয়ো না বল্‌ছি। ও যে তাঁদের একটা মানুষ বলেই মনে করে না, এটাও কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না।"

সরসী অস্ফুটস্বরে বলিল,—"অন্যায় কল্লে বল্‌বেন, তার আটকই বা কি করে কর্‌ব।"

নিখিলেশ চোক ঘুরাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া ডাকিল,—"সরসী ?"

সরসী মাথা নীচু করিয়া রহিল। ললিতমোহন ভীত হইয়া নিখিলেশের হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"মাপ কর ভাই, সরসীকে কোন অনুরোধ কত্তে হবে না। এ অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করে দেখ্‌ছি আমিই অন্যায় করেছি।" (ক্রমশঃ)

গণক

[লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত]

বৃহস্পতিবার—মেল-ডে। সকালে তাড়াতাড়ি আফিসে যাইতে হইবে। স্নান করিতে গিয়া দেখি কলতলা জোড়া। বকাবকি করিয়া কোন প্রকারে স্নান সমাপন করিয়া আহার করিতে বসিলাম। ভাত গরম, ডাল গরম, মুখে দেওয়া যায় না—মেজাজও গরম হইয়া উঠিল। আফিসের কাপড় পরিতে গিয়া দেখি নূতন কলার বাহির করিতে হইবে; আগেকার কলার একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে,—ব্যবহার করা চলে না। কলারের ভিতর দিয়া টাই টানা এক বিষম বিপদ। তার উপর তাড়াতাড়ি। "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো—"পত্নীর উপর বিষম রাগ। যতই মনে হইতে লাগিল যে, আফিস যাইতে দেরি হইলে বড় সাহেব রাগ করিবেন, ততই পত্নীর উপর রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যদি রাগই যথার্থ পুরুষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে আমার সে অবস্থা যিনি দেখিবেন, তিনি তখনই আমাকে "মহাপুরুষ" বলিয়া স্থির করিবেন। তবে কথাটা কি, রাগ পড়ে গেলে নিজের লজ্জা হয়। পত্নীও মেজাজটার বিষয় আমায় "congratulate" না করিয়া দুই একটা ছোট খাট কথা (অবশ্য রহস্য করিয়া) শুনাইয়া দেন। আর আমার এক কালেজে পড়া ভাই আছেন, তিনি একেবারে আমাকে "coward" বলেন, আর আমার ব্যবহার যে "mediavel period এর" "chivalry" সম্পূর্ণ অভাব তাও স্পষ্ট করিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তবে সুখের কথা, আমি সওদাগরী আফিসে কাজ

করি। বিদ্যার দৌড় বেশী দূর নয়। তার কথাগুলি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। আভাসে এইমাত্র বুঝি যে, তিনি আমার কার্য্যের অনুমোদন করেন না।

এই প্রকার মেজাজে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়িলাম। ট্রাম ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। এখানে বলা আবশ্যক যে আমার পুরা নাম শ্রীমান হীরালাল সেন ; কিন্তু পাড়ার লোকে আমাকে "Mr. Sen" বলিয়া ডাকেন। তাহার কারণ আমি সাহেবী পোষাক পরিয়া আফিসে যাই। দ্বিতীয় পাড়ার মজলিসে আমি যোগ দি না। তৃতীয় পাড়ার বারোয়ারীতে চাঁদা দিতে গোলমাল করি, চতুর্থতঃ পাড়ায় একটা ক্লাব সৃজন করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলাম। পঞ্চমতঃ পাড়ায় যাহারা মাতব্বর বলিয়া খ্যাত তাহারা সম্মানের উপযুক্ত না মনে করিলে তাহাদিগকে খাতির করিতাম না। পাড়ার একটি ছেলেকে আমি একটি ইংরাজি কথার বাঙ্গালা মানে বলিয়া দি। বালকটি আমাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমি ডাকিয়া তাহাকে বলিয়া দি যে, ইংরাজিতে শিষ্টতার অনুরোধে অন্য ব্যক্তির কাছে কোন বিষয়ে বাধিত হইলে "Thank you" বলিতে হয়। সওদাগর আফিসে কাজ করার দরুণ এ সব কায়দা কানুন আমার বড় দুরস্ত ছিল। আমার বড়সাহেব একদিন আমার কাছ হইতে চুরুট ধরাইবার জন্য একটি দেশলাই চান। আমি দেশলাই দিয়া "Thank you" বলায় বড়সাহেব হাসিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। হাসিমুখে তিনি বলেন "হীরালাল-বাবু, আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিব, তা নয় আপনি আমায় ধন্যবাদ দিলেন।" আমি বলিলাম "আপনি মনীব, আপনি চাইছেন এতেই আমার সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে।" সাহেব প্রীতমনে "Thank you"বলিয়া চলিয়া গেলেন। সে যাহা হউক, যে ছেলেটিকে আমি "Thank you" শিখাইয়া দিয়াছিলাম, তার বাপ তাহাকে এক জোড়া নূতন কাপড় কিনিয়া দেন। ছেলেটি কাপড় হাতে লইয়া বাপকে "Thank you" বলে। বাপ সেকেলে লোক, একে বারে চটে লাল। ছেলেটি ভয়ে আমার নাম করে বলে, হীরালালবাবু বলিয়া দিয়াছেন ; এসব স্থলে শিষ্টতার অনুরোধে "Thank you" বলা উচিত। ছেলের কথা শুনিয়া বাপ বলিয়া দিলেন "বাপ খুড়োকে" Thank you বলা বাঙ্গালা দেশে রীতি নাই। তুমি হীরালালবাবুর সহিত মিশিও না।" এ বলিয়া তিনি যদি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে আর বিশেষ গোল-

যোগ ঘটিত না। তাহার অদৃষ্টক্রমে তিনি পাড়ার মাতব্বরদের একথা বলেন। সে পর্য্যন্ত আমার বাপ ঠাকুরদাদা প্রদত্ত আদরের "হীরু" নামটার পরিবর্ত্তে আমি "Mr. Sen" নামে অভিহিত হইতে লাগিলাম। সে যাহা-হউক, আমায় তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া পাড়ার দুই একটা দুষ্ট ছেলে ভান করিয়া আমার সামনে পড়িতে লাগিল এবং "Excuse me" বলিয়া সরিয়া গিয়া হাসিতে লাগিল। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমি হেদোর দক্ষিণ মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার অল্পদূরে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেখানে গিয়া দেখি একটি হিন্দুস্থানী পাঁজি পুথি খুলিয়া বসিয়া আছে, আর কতকগুলি লোক তাহাকে ঘিরিয়া হাত দেখাইতেছে। যে সব লোক ভাগ্যগণনা করিতেছিল, তাহারা সকলেই গরীব লোক। কাহারও চাকরী নাই, কবে হইবে, তাই গণনা করিতে আসিয়াছে। পণ্ডিতজী যথাযোগ্য উত্তর দিয়া নিজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া লইতেছিলেন। এমন সময়ে আমি দেখিলাম যে একটি বিবি একদৃষ্টে নিবিষ্টচিত্তে পণ্ডিতজীর কার্য্যকলাপ সব দেখিতেছেন। বিবিটির বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ কিম্বা ছত্রিশ বৎসর হইবে। অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, যৌবনকালে তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সকরুণ দৃষ্টিতে একটা মানবপ্রীতি স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে! সেই সময় তাঁহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, যেন তিনি পণ্ডিতজীর বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ দেখিয়া কোন সুদূর অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি কোন কালে কোন গণককে বিশ্বাস করিতাম না। একজন গণক এতগুলি নিরক্ষর লোকদিগকে যাহা তাহা বলিয়া পয়সা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতেছে, এ দৃশ্যটি আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যখন একজন বিদেশী বিবি পণ্ডিতজীর এসব কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন, তখন আমার মনে হইল বিবিটি সম্ভবতঃ সব ভারতবাসীকে এই প্রকার প্রতারক বলিয়া ভাবিবেন, এবং স্বদেশে গিয়া এই গল্প করিয়া ভারতবাসী মাত্রকেই নীচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। একজন প্রতারকের দরুণ কোটি কোটি ভারতবাসী প্রতারক বলিয়া বিদেশে পরিচিত হইবে, ইহা আমার

পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। পণ্ডিতজীর সম্মুখে গিয়া হিন্দি ও বাঙ্গালাভাষা সংমিশ্রিত এক অপরূপ ভাষায় পণ্ডিতজীকে জুয়াচোর বলিয়া গালি দিলাম ও হাতের ছড়ি দিয়া সব দর্শকবৃন্দকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলাম। পণ্ডিতজী আমার ব্যবহার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু গতিক খারাপ দেখিয়া পাঁজি পুথি গুটাইয়া পণ্ডিতজী উঠিবার উদ্যোগ করিল। এমন সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিলাম।

ট্রামের যে কামরায় আমি বসিয়া ছিলাম, বিবিটি তাহাতে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরে ইংরাজি কায়দা অনুযায়ী আমায় "Beg your pardon" বলিয়া বিবিটি অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু তুমি অদৃষ্ট গণনায় বিশ্বাস কর না। আমি অত্যন্ত সবিস্ময়ে উত্তর দিলাম—'না'—তাহার কারণ গণকেরা প্রায় জুয়াচোর হয়। আর ভবিষ্যৎ কেহ গণনা করিয়া বলিতে পারে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার বড় বড় কথা বলিতে লাগিলাম। বিবিটী নিবিষ্টচিত্তে আমার কথাগুলি শুনিলেন। কোন প্রকার প্রতিবাদ করিলেন না। আমারও একটু গর্ব্ব বোধ হইতে লাগিল যে, বিবিটী স্বদেশে আর ভারতবাসীর বুদ্ধির অভাবের বিষয় বলিবেন না। ভারতবাসীদেরও আর আর সব সভ্যদেশবাসীদের ন্যায় অদৃষ্ট গণনায় অন্ধ বিশ্বাস নাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার সে ভ্রান্তি দূর হইল। বিবিটী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"বাবু, তোমরা যাহাই বল বা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতরা যাহাই বলুন, আমার বিশ্বাস এক এক জন মনুষ্য আছেন, যাঁহারা ভবিষ্যতে কি হইবে বলিতে পারেন। ভারতে এই বিশ্বাস যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। আজ কাল ভারতবাসীরা অদৃষ্টগণনায় বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই বলুন বা দোষেই বলুন। কিন্তু আমার বিশ্বাস পুরাকালে ভারতীয় মনীষিগণ এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন ও অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।" বিবিটীর কথা শেষ হইলে আমি এবং আমার পার্শ্বের একটী ভদ্রলোক তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। বিবিটি আমাদের চাহিবার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমার উপরোক্ত কথাগুলি বলিবার কারণ আছে।

আমার জীবনে এ বিষয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হইয়াছে। এই বলিয়া বিবিটি অল্পকাল অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। আমরা অগত্যা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরে বিবিটি বিষাদমাখা হাসিমুখে বলিতে লাগিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা; আজ হইতে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে। আমি তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। আমাদের সংসারে পিতা মাতা ও আমরা তিনটি ভগিনী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। পিতামাতার প্রথমা কন্যা বলিয়া আমি বড় আদরের ছিলাম। ইংলণ্ডের দক্ষিণে হারফোর্ড নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীর হইতে অনন্ত দিগ্‌ব্যাপী সমুদ্র দেখা যায়। প্রাতঃকালে উঠিয়া সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া আমরা প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দেখিতাম এবং সায়ংকালে প্রত্যহ সূর্য্যাস্ত দেখিয়া আমারা বড়ই আনন্দবোধ করিতাম। এখন সে সব কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। সমুদ্রের এক গভীর ভাষা আছে। সেই ভাষা মানবহৃদয়ের সহিত একসূত্রে গাঁথা। যাহারা কখনও সমুদ্রতীরে বাস করে নাই, তাহারা সমুদ্রের ভাষা বুঝিতে পারে না। সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে আমাদের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত ও আমরা সেই তরঙ্গ-উদ্বেলিত সাগরবেলায় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতাম। আমার মাতা অত্যন্ত গৃহিণী ছিলেন। গৃহস্থঘরের মেয়েদের সুখের সংসার করিবার জন্য যে সকল গুণের দরকার, অতি বাল্যকাল হইতে মাতা আমাদিগকে সযত্নে তাহা শিক্ষা দিতেন। প্রতিবেশী সকলের সহিত আমাদের সদ্ভাব ছিল। আমার পিতার নাম ছিল 'হারকোর্ট ডেলভ্' ও আমার নাম ছিল "মেরী।" আমাদের দেশে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী। শীতকালে সূর্য্য প্রায় দেখা যাইত না। বসন্তসমাগমে লোকের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। শীত অবসান হইয়াছে এবং বসন্ত পুনরায় আসিয়াছে এই ঘোষণা করিবার জন্য যুগ যুগান্তর হইতে আমাদিগের দেশে একটী উৎসব হয়। মে মাসের প্রথম তারিখে ইংলণ্ডের সকল গ্রামে গ্রামে সেই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সে উৎসবে লোকে কি প্রকার আমোদে মাতোয়ারা হয়, না দেখিলে অন্য দেশবাসী তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না। বসন্তে ফুলের অভাব হয় না। একটি দণ্ডকে নানা প্রকার ফুলদ্বারা মণ্ডিত করিয়া মধ্যে স্থাপিত করা হয়। তাহার চতুঃপার্শ্বে ফুলে বিভূষিত হইয়া বালিকারা, যুবতীরা হাত ধরাধরি

/·

করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, সে এক মহান্ দৃশ্য। চলিত প্রথানুযায়ী গ্রামের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীকে সেই দিনে সকলে মিলিয়া "মে রাণী" সাজাইয়া দেয়। ফুলে ফুলে তাহার অঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আর সেই দিনে তাহার সম্মানের অবধি নাই। বালিকাজীবনে "মে রাণী" হওয়া বিশেষ গৌরবের কথা।

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি। প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা তিন ভগিনী কুটীরসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাগান হইতে ফুল আহরণ করিয়া "মে মেলায়" যাইব বলিয়া উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে আমাদিগের প্রতিবেশী "আঙ্কেল টম" আসিয়া বলিল—"ওহে হারকোই মেরীকেই আজ 'মে রাণী' সাজিতে হইবে।" আমরা সকলে আনন্দে নাচিয়া উঠিলাম। মা স্বহস্তে আমায় সাজাইতে বসিলেন। টম কাকার ছেলে চার্লি আমায় দেখিতে আসিল। চার্লি আমার চেয়ে তিন চার বৎসরের বড়। মহা আনন্দে "মে রাণী" সাজিয়া আমি মেলায় উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিক হইতে "মে রাণীর" সম্মানের সকলবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। মহা সমারোহে সমস্ত দিন ধরিয়া আনন্দে কাটাইয়া আমরা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে একদল জিপ্‌সি তাঁবু পাতিয়া বাস করিতেছে। এ দেশে যেমন ইরানীরা কোন জায়গায় স্থিরভাবে বসবাস করে না, দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই প্রকার জিপ্‌সিরা য়ুরোপের সর্ব্বত্র গমন করে ও তাঁবুতে বাস করে। জিপ্‌সিদের তাঁবুর কাছে আসিয়া দেখি, একটি বৃদ্ধা জিপ্‌সিকে ঘিরিয়া খুব ভিড় হইয়াছে। আমরা সেখানে দাঁড়াইলে বৃদ্ধা আমাকে "বসন্তরাণী" বলিয়া অভিবাদন করিল। পিতা কৌতুহল বশতঃ বৃদ্ধাকে আমার হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধা আমার হাত দেখিয়া অনেক কথার পর শেষ কথা বলিল,—'You will meet with your lover accross the seas while he wlll be on horse back' অর্থাৎ সমুদ্রের পরপারে তুমি তোমার স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইবে, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিবেন।

কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। সুখের ক্ষুদ্র কুটীর ছাড়িয়া সুদূর দেশে গমন করিবার আমাদের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমি গ্রামের মধ্যে

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকা। গ্রামে অনেক যুবক আমাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে সুখী হইবে। চার্লির সহিত টমকাকা আমার বিবাহ দিবার কথা পরিহাসচ্ছলে দুই এক বার বলিয়াছিলেন, কিন্তু চার্লিকে আমার একেবারে পছন্দ হয় নাই, আর প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাকে বড় ভাইয়ের মত দেখিতাম, সে যাহা হউক, পথে এ বিষয় লইয়া খুব আলোচনা হইল। কিন্তু এই সুখের দিনে আমার হৃদয়ে একটা বিষাদরেখা অঙ্কিত হইয়া গেল।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল অবস্থা নাই। পিতা অগ্রে, তৎপরে মাতা আমাদিগকে ছাড়িয়া ইহ-ধাম হইতে চির বিদায় লইয়াছেন। আমার কনিষ্ঠ দুই ভগিনী লণ্ডনে কোন দোকানে কাজ করিতেছে। গ্রামে আমাদের নিরানন্দ কুটীরে আমি একলা বাস করিতেছিলাম। এমন সময়ে একজন ধর্ম্মপ্রচারক আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে আসিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাহার সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন যে, আফ্রিকায় ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য কতকগুলি শিক্ষিতা রমণীর আবশ্যক আছে। যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তিনি আমার জন্য একটি কাজ যোগাড় করেন। এ পর্য্যন্ত উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া জীবন কাটাইতে ছিলাম। এখন যাহা হউক ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারিব এই আশায় হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি রাজি হইলাম।

ইহার কিছুদিন মধ্যে আমি আফ্রিকায় যাত্রা করিলাম। আমার কনিষ্ঠা ভগিনীরা অনেকে মানা করিয়াছিল; কিন্তু আমি অনেক যুক্তিদ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, ঈশ্বরের কার্য্য করা অপেক্ষা মনুষ্যজীবনে আর অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে পারে না।

আফ্রিকায় আমি পাঁচ বৎসরকাল কাটাইলাম। আমার হৃদয়ে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রাম ও ক্ষুদ্র কুটীর সর্ব্বদা জাগরুক হইয়া থাকিত। বাল্যজীবনের সুখস্মৃতি মনে উদয় হইলে আমি একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতাম, কিন্তু কালে তাহা ক্রমশঃ স্মৃতিপথ হইতে সরিয়া পড়িল। পাঁচ বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আমাকে বোম্বাই নগরে প্রেরণ করিলেন। বোম্বাইতে কিছুকাল থাকিয়া তাহারা আমাকে সিমলায় পাঠাইয়া দিলেন। যে দিন সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম,

সে দিন আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আমি অনেক জায়গার পর্ব্বত দেখিয়াছি। কিন্তু সিমলার ন্যায় মনোহর দৃশ্য আমি কোথাও দেখি নাই। তুঙ্গের পর তুঙ্গ, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ উঠিয়া থর বিথরে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তোমরা হাইলণ্ডের পার্ব্বতীয় শোভা ইংরাজি কবিতায় পড়িয়াছ। আজ একজন কবির অভাবে সিমলার পার্ব্বতীয় শোভার বিষয় সভ্যজগত কিছুই জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমুদ্রতটবাসিনী, আমার কাছে এই পার্ব্বতীয় শোভা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। আমার সর্ব্বদা বোধ হইত যে আমি জগৎপিতা জগদীশ্বরের অত্যন্ত সন্নিকটে বাস করিতেছি। সকালে ও বৈকালে মালে আমি প্রত্যহ বেড়াইতাম। আমার একলা বেড়াইতে অধিক আমোদ বোধ হইত। একদিন মালে বেড়াইতেছি। এপ্রিল মাসের তরুণ অরুণের আলোকে চতুর্দ্দিকে এক হাসির ফোয়ারা উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কি জানি আমার হৃদয় যেন কোন্ অজানা সুখস্মৃতিতে বিভোর হইয়া উঠিল। এমন সময় অদূরে অশ্বখুরোত্থিত ধ্বনিতে আমার চেতনা পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। আমি আস্তে ব্যস্তে রাস্তার মাঝখান হইতে সরিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ক্ষণকালমধ্যে এক অশ্বারোহী পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে ভীত দেখিয়া তিনি কায়দানুযায়ী আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু আমার হৃদয়ে সে কথা প্রবেশ করিল না। আমি নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল পূর্ব্বে ইহার সহিত আলাপ ছিল। কিন্তু কোথায়, কোন্ স্থানে কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমায় এই প্রকার দেখিয়া যুবক অপ্রতিভ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সস্নেহস্বরে বলিলেন "চলুন আপনি ভীত হইয়াছেন। আপনার বাসা পর্য্যন্ত আমি রাখিয়া আসি।" আমি মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত চলিলাম। তিনি আমায় বাসায় রাখিয়া যাইলেন। তার পর দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই প্রকারে দুই জনের প্রণয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি আমায়, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিবাহান্তে তিনি আমায়, রঙ্গালয়ে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের সাক্ষাতের কোন্ সময় আমি তাঁহার প্রণয়ে বশ হইয়াছিলাম। আমি বলিলাম প্রথমে। যে প্রথম হইতে তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখিয়া আমি

মুগ্ধা হইয়াছিলাম। কথাটি বলিবামাত্র আমার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই বৃদ্ধা জিপ্‌সির কথাগুলি আমি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

বিবিটি এই বলিয়া চুপ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে বলিলেন আজ বৎসরাবধি আমি আমার প্রিয়তম জনকে হারাইয়া উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা হয়, সেই বৃদ্ধা জিপ্‌সির সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করি কতকাল পরে জর্জ্জের সহিত আমি পুনরায় স্বর্গরাজ্যে মিলিত হইব।

আমি স্থির হইয়া গল্প শুনিতে ছিলাম। গল্প থামিলে দেখিলাম ট্রাম হাইকোর্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে আপিস যাইতে প্রায় দশ মিনিট লাগিবে। সর্ব্বশুদ্ধ অর্দ্ধ ঘণ্টা দেরী হইল। সাহেব কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে আপিসে উপস্থিত হইলাম। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী কেন? সাহেব দুই তিনবার খোঁজ করিয়া গিয়াছেন।" একে দেরী তাহাতে সাহেব খোঁজ করিয়াছেন। আমার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। তার উপর বড়বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "হীরু বাবু, যান একবার সাহেবের সহিত দেখা করুন। ভয় কি! দেরীর কারণ বুঝাইয়া দিলে গোল চুকিয়া যাইবে।" এমন সময়ে চাপরাশী আসিয়া তলব দিল। "আমার অদৃষ্ট" বলিয়া সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলাম। সাহেব হাসি-মুখে বলিলেন,—"হীরু বাবু আপনার ২০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি প্রথমে ভাবিলাম, সাহেব পরিহাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহার হুকুম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম কথাটা সত্য। বড়গোছের একটা সেলাম করিয়া এবং নানা প্রকার আবল তাবল 'Thank you' এর সঙ্গে সংমিশ্রণ করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। বড় বাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হীরু বাবু, খাওয়াচ্ছ কবে।" আমার সকলেই ভাল বাসিত। আমার উন্নতিতে সকলে সন্তুষ্ট হইল।

বাড়ী আসিয়া পত্নীকে খবরটা দিলাম। পত্নী মহা খুসী ; আর সঙ্গে সঙ্গে সকালের দেরী; মেম সাহেবের গল্প ও অদৃষ্টের গতিকে চাকরী না গিয়া মাহিনা বৃদ্ধি এ বিষয় লইয়া খানিকটা গল্প হইল। পত্নী গল্প শুনিয়া বলিলেন "তোমাদের অদৃষ্ট।" আমি বলিলাম, "কি রকম"। পত্নী বলিলেন, "তোমাদের সাহেব মেমের মুখে কোন কথা না শুনিলে ভক্তি ত হয় না।

মেম বলেছে 'অদৃষ্টে আছে'—তোমাদের বিশ্বাস—'অদৃষ্ট আছে'। সাহেব বলেছে—'গীতা ভাল'—তোমাদের বিশ্বাস—'গীতা ভাল'। এ সব তোমাদের 'অদৃষ্ট' ?"

লছমী

লেখক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মিত্র

ব্যবসার জন্য একবার কোল-ডিষ্ট্রিক্ট রাণীগঞ্জে মাস কয়েক আমায় থাকিতে হইয়াছিল ; সেই অল্পদিন অবস্থানের মধ্যে এমন একটী ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম, যাহা আজও আমার স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে। আজ সেই ঘটনার কথাই বলিতেছি।

আমার খনির নিকটেই বরুয়া বলিয়া একজন সাওতাল বাস করিত। সাওতাল হইলেও বরুয়ার চালচলন অনেকটা সভ্য-জনোচিত ; তাহার কারণ সে খনীতে সর্দ্দারী করিয়া দু-পয়সা রোজগার করিত। বরুয়া বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারিত, বাঙ্গালীর ন্যায় কোচাকাচা দিয়া কাপড় পরিত এবং জটাজূট দীর্ঘ কেশের পরিবর্ত্তে দশ আনা ছ-আনা করিয়া চুল কাটিয়া গায়ে একটা আধ ময়লা পিরান পরিয়া খনিতে খনিতে কাজ দেখিয়া বেড়াইত। সংসারে তাহার ছিল একটী বিধবা ভগ্নী ও এক বুড়ী মা। ভগ্নী লছমী যুবতী, বয়স আঠারো বৎসরের বেশী হইবে না। সে প্রায়ই ভায়ের জন্য ভাত লইয়া আমাদের খনিতে আসিত। তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু ও মসীনিন্দিত বর্ণের মধ্যেও স্বাস্থ্য ও পরিপুষ্টিজনিত একটা সৌন্দর্য্য ছিল, যাহা অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না। সকলের অপেক্ষা সুন্দর ছিল তাহার চক্ষু,—সরল চাহনিতে সে যখন চাহিত, তখন তাহাকে বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইত।

লছমীর শৈশবে বিবাহ হয়। তাহার ভাই বরুয়া খুব ধুমধাম করিয়া

ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতে লছমীর স্বামীর মৃত্যু হয়, লছমী সাজিয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল, আবার হাসিতে হাসিতে ভায়ের সংসারে ফিরিয়া আসিল। সে বিবাহকে নিশ্চয়ই একটা মজার খেলা মনে করিয়া থাকিবে।

সাওতালদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রিয়বিয়োগবিধুরা রমণী অবাধে অন্যপুরুষের সঙ্গে মিশিতে পারে, সমাজে তাহার জন্য তাহাকে নিন্দিত হইতে হয় না। মুকুলিত-যৌবনা লছমী যখন বুঝিতে পারিল বিবাহ ছেলেখেলা নয়, তখন তাহার প্রাণটা হা হা করিয়া উঠিল।

(২)

লছমীর বাটীর কিছুদুরে জিতুয়া নামক একটী যুবক বাস করিত। এক সময়ে জিতুয়ার অবস্থাও মন্দ ছিল না; কিন্তু অল্প বয়সে তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার চরিত্র দোষ ঘটে। জুয়া খেলিয়া ও মদ খাইয়া, সে পিতা মাতার সঞ্চিত সামান্য অর্থ কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। অন্য উপায় না থাকায় জিতুয়া নেশার পয়সা যোগাড় করিবার জন্য সুবিধা পাইলে প্রতিবাসীদের বাড়ী হইতে অপরের অলক্ষ্যে এটা ওটা সরাইতেও ছাড়িত না।

এই জিতুয়া লছমীর ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল। বাল্যকাল হইতেই জিতুয়া লছমীর বাড়ীতে যাতায়াত করিত। কতদিন লছমীর মা, জিতুয়া ও লছমীকে একত্রে বসাইয়া খাওইয়াছে। কতদিন খেলিতে খেলিতে ছুটিয়া আসিয়া লছমী ও জিতুয়া উভয়েই লছমীর মার নিকটে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে; আবার কতদিন লছমীর মা সন্ধ্যায় দুই জানুতে দুই জনকে বসাইয়া গল্প বলিতে বলিতে ঘুম পাড়াইয়া দুইজনকে একই শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াছে। লছমী এখন এই সব পুরাণ কথাই ভাবিত। সে ভাবিত তাহারা দুইটি ত বেশ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, তবে কেন তাহাদিগকে এমন কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইল। বিবাহ হইল ত, জিতুয়ার সঙ্গে বিবাহ হইল না কেন?

আসল কথা হইতেছে, মদন ঠাকুর তাহার তীক্ষ্ণ শরটি বেচারী লছমীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার ফল এই হইল যে, লছমী জিতুয়াকে

প্রায়ই ডাকিয়া আনিয়া, কখন খাওয়াইত কখন বা গৃহকার্য্য সারিয়া মাঠের মধ্যে গাছের ছায়ায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করিত। বরুয়া প্রথমে কিছুই জানিতে পারে নাই, কিন্তু এইরূপ কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর সমস্ত ঘটনা জানিতে তাহার আর বাকি রহিল না। যদিও লছমীর আবার বিবাহ দিবারই বরুয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তথাপি জিতুয়ার স্বভাব চরিত্র ভালরূপে সে জানিত বলিয়াই তাহার সহিত লছমীর মেলা মেশা তাহার ভাল লাগিল না; একদিন সে লছমীকে ডাকিয়া সাবধান করিবার জন্য বলিয়া দিল, "দেখ্ লছমী, তুই জিতুয়াকে বেশী আমল দিস্ না; সে বড় সুবিধার লোক নয়।" কিন্তু এ কথায় লছমী কর্ণপাত করিল না। সে পূর্ব্বের ন্যায় জিতুয়ার সহিত আমোদ করিয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

ক্রমে জিতুয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে একটি হতভাগিনীর সমস্ত মনটা দখল করিয়া লইয়াছে, তখন সে লছমীকে নানারূপে জ্বালাতন করিতে লাগিল। টাকার জন্য প্রায়ই লছমীকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত; শ্বশ্রূগৃহ হইতে আনিত দুই এক খানি রূপার অলঙ্কার সে ইতিপূর্ব্বে জিতুয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রত্যহ পয়সা চাই! লছমী কোথা হইতে তাহা যোগাইবে? এইজন্য জিতুয়া প্রায়ই লছমীকে তিরস্কার করিত। কোনরূপ উপায় না দেখিয়া লছমী দুঃখ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিত।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বরুয়া খনির কার্য্যে চলিয়া গেল; বিশেষ কাজের জন্য সেরাত্রে তাহার আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই জানিয়া; বরুয়া ঝণ্টু নামক একজন কুলিকে বাড়ীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেল। সন্ধ্যা-সতী তারার মালা পরিয়া দেখা দিলেন, লছমী ও তাহার মা রাত্রের ভোজন সারিয়া বাহির দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

লছমী তাহার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ জিতুয়ার স্বরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এতরাত্রে লুকাইয়া জিতুয়াকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লছমী প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার হাত ধরিয়া লছমী তাহাকে আপনার শয্যায় বসাইল।

সে দিন জিতুয়া অত্যন্ত নেশা করিয়াছিল। লছমীর আদর তাহার ভাল লাগিল না। সে অর্দ্ধ অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমার টাকার দরকার, রোজ রোজ তোর নিকট ঘ্যান ঘ্যান করিতে পারি না। আমাকে তোর ভায়ের

টাকার বাক্সর চাবির সন্ধান বলিয়া দে, আমি আমার আবশ্যক মত অর্থ লইয়া যাই। পরে আমার নাম গোপন করিয়া তোর ভাইকে বলিস্ টাকা চুরি গিয়াছে।" লছমী এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিল না। লছমীর আপত্তি দেখিয়া জিতুয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার চক্ষু ভাটার মত ঘুরিতে লাগিল. সে বস্ত্রের মধ্য হইতে শাণিত অস্ত্র বাহির করিয়া কহিল, "আজ তোর ভাই বাড়ী নাই, সুবিধা বুঝিয়া আমি আজই আসিয়াছি; আমার সঙ্গে আরও ছয়জন সঙ্গী আছে, আমার কথা মত চাবি দিস্ ভালই, নতুবা তোদের তিন জনকে খুন করিয়া রাখিয়া যাইব; আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আমায় সঙ্গীদের ডাকিতেছি দেখ," বলিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র ছয়জন ভীমকায় সাওতাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

লছমীর বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই লছমী আপনাকে সামলাইয়া বলিল বেশ লোক ত তুমি; তুমিও কেন আজ আমায় সঙ্গে লইয়া চল না। আমি সমস্ত গুছাইয়া লইয়া যাই।" জিতুয়া দেখিল এ প্রস্তাব মন্দ নহে, অর্থ ও নারী দুই যখন মিলিতেছে, তখন একটা লইয়া আর একটাই বা ছাড়ি কেন? সে তাহাতেই সম্মত হইল। জিনিষ পত্র গুছাইবার জন্য ও টাকা কড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য লছমী ঘরের বাহির হইয়া গেল।

লছমীর যত দেরী হইতে লাগিল, জিতুয়া ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পর লছমী জিতুয়ার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দূরে ঐ যে লণ্ঠনের আলো দেখিতেছ, ঐ আলো লইয়া আমার ভাই আসিতেছে। সঙ্গে যে লোক আছে এ কথা তোমায় আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। সব ঠিক ঠাক করিবার ভাণ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াই ঝণ্টুকে দিয়া দাদার নিকট খবর পাঠাই। ভাই হইলেও সে যতক্ষণ হাতে তুলিয়া না দেয়, ততক্ষণ সে টাকায় আমার কোন অধিকার নাই। এ কথা তোমায় আমি অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু আজ যখন দেখিলাম, তুমি কিছুতেই শুনিবে না, একটা অনর্থ ঘটিবার ভয়ে তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি, মাপ করিও।"

পরদিন আমার খনির মধ্যে কুলিদের নিকট শুনিতে পাইলাম, গত রাত্রে চোর আসিয়া লছমীকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ডের নীচে আঘাত, কোন শাণিত অস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হইয়া লছমীর মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিস খুনের কোন কিনারাই করিতে পারিল না! এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আমার আফিসে বসিয়া এই খুনের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি, নানাজনে নানা কথা বলিতেছে, এমন সময়ে বরুয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যায় নির্জ্জনে সে আমায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল,—"বাবু আজ আমার ভগ্নীর সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু কে তাহাকে খুন করিয়াছে, আমি তাহা জানি। আর আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আপনি খুনের কথা প্রকাশ করিবেন না, তবে আপনাকেও সব কথা বলিতে পারি। এত বড় একটা জটিল বিষয় জানিবার জন্য আমি তখন বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম, সুতরাং আমিও সব বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। বরুয়া তখন আমার নিকট লছমীর বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই রাত্রের ঘটনা সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, "বাবু লছমী মরণকালে যখন আমার পা ধরিয়া জিতুয়ার নাম অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য বারংবার মিনতি করিতে লাগিল, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যাহা হইবার হইয়াছে; তার শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করিব না। এই জন্যই এখনও জিতুয়া বাঁচিয়া আছে, নতুবা অনেকদিন তাহাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে হইত।"

এক অসভ্য সাওতাল পরিবারে এত গভীর প্রেম, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ভগ্নীপ্রীতির সুন্দর উদাহরণ দেখিয়াছিলাম, আমাদের কয়টী পরিবারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়?
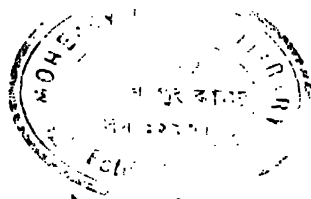
৪র্থ বর্ষ, } শ্রাবণ, ১৩২৩ { ৪র্থ সংখ্যা

ডাকাতের উপর বাটপাড়ী

১

বিলাতে মেডিকেল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় মিলিটারী বিভাগে চাকরী পাই, এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে শিমলা শৈলে বদলী হই। বড়লাটের রক্ষী সৈন্যদলের রেজিমেণ্টের চিকিৎসার ভার আমার হস্তে অর্পিত ছিল। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি—তখন শ্বেত কৃষ্ণে—জেতায় ও বিজোত', একালের মত অসদ্ভাব ছিল না ; উচ্চপদস্থ মিলিটারী কর্ম্মচারীরা আমাদের মত কালো নেটিভ সহযোগীদেরও শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, বন্ধুভাবে আমাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সামাজিক ব্যাপারেও আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এ কালে এমনটি আর দেখিতে পাই না। দোষ তাঁহাদের—না আমাদের, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; তবে এক হাতে তালি বাজে না, এ কথা ঠিক।

যাহা হউক, এ কালের এই রাজনৈতিক বৈষম্যের জন্য আক্ষেপ না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করি।

আমি সিমলায় উপস্থিত হইয়া একটি মুসলমান বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম ; তাঁহার নাম সর্দ্দার আবদুল হাকিম, তিনি ১৭ নং ল্যান্সার্স সৈন্যদলের রেসালদার মেজর ছিলেন ; তাঁহার ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ দেশীয় সৈন্যদলে অল্পই দেখা যায়। মুসলমান হইলেও আমাকে তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রেজিমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। সৈন্যদলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সে সময়ে তিনি প্রৌঢ় হইয়াছিলেন।

সিমলা শৈলে আমাদের দিন এক ভাবেই চলিতেছিল। 'রুটীন্' বাঁধা কাজ, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে কাহারও কোনও ঝঞ্ঝাট নাই; তবে সীমান্তে দুর্দ্দান্ত পাঠানজাতি কিছু গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিল, সে জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইত, আমরা শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম বটে, কিন্তু সে সশস্ত্র শান্তি! আমি সিমলায় বদলী হইবার কয়েক মাস পরে একজন ইংরাজ সদাগর, সেফীল্ডে তাঁহার প্রকাণ্ড লোহার কারখানা আছে, তাঁহার যুবতী কন্যা এডিথকে লইয়া সিমলায় উপস্থিত হন। তখন নভেম্বর মাসের আরম্ভ মাত্র। এডিথের পিতার নাম সেপ্টিমস্ ব্রাউন; তিনি কুবের তুল্য ধনবান্।

ব্রাউন সাহেব তাঁহার কন্যা এডিথের ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় ভারতে আসিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, শিমলার পার্ব্বত্য জল বায়ুতে এডিথের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। লাট-পারিষদের কোনও মাননীয় সদস্য মিঃ ব্রাউনের পরম আত্মীয় ছিলেন, তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার শিমলায় আগমন।

কন্যাটীর কি রোগ তাহা আমি যে I, M, S, ডাক্তার, আমিও স্থির করিতে পারি নাই; তবে ভাবভঙ্গিতে অনুমান হইয়াছিল, উহার প্রেম-রোগ' বিলাতের, এমন কি, এ দেশেরও বড়লোকের মেয়েদের প্রেম ব্যাধিটা একটা দুশ্চিকিৎসক—সংক্রামক ব্যাধি! যে সকল যুবতীর আহার ও নিদ্রা এবং প্রেমের উপন্যাস পাঠ ভিন্ন সময় কাটাইবার অন্য কোনও উপলক্ষ্য নাই, কেবল তাহারাই যে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, এ কথা আমার অজ্ঞাত ছিল না; তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের নিদান তত্ত্বে এ ব্যাধির কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে! যাহা হউক, মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের কোন কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে জানিতে পারিলাম, আমার অনুমান কতকটা সত্য; কিন্তু সর্ব্বজয়ী কন্দর্প এ ক্ষেত্রে উল্টা বুঝিয়া ছিলেন! শুনিলাম বৃদ্ধ ব্রাউন ইংলণ্ডে কোনও লর্ডের সহিত এডিথের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। এই লর্ড মহাশয় পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড সভার একজন সভ্য, তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। প্রৌঢ় লর্ড, এডিথের রূপে গুণে মুগ্ধ হইলেও অষ্টাদশী এডিথ পিতার বয়সী লর্ডকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহার ফলে হিষ্টিরিয়া এবং ঐ শ্রেণীর নানা রকম উৎকট অসুখ ঘটাইয়া বসিলেন। তখন মিঃ ব্রাউন্

অগত্যা ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার শ্রীমতীর বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। মিঃ ব্রাউন্ কন্যাকে লইয়া হাওয়া বদলাইতে এ দেশে আসিলেন বটে, কিন্তু ভাবী জামতাকে ভরসা দিয়া আসিলেন, তিনি যেন হতাশ না হন, দেশে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কন্যা এডিথকেও জানাইয়া রাখিলেন, বসন্তকালে দেশে প্রত্যাগমন করিয়াই তাহাকে তিনি লর্ড মহাশয়ের অঙ্কলক্ষ্মী করিবেন, কোন ওজর আপত্তি শুনিবেন না।

একথা শুনিয়া, এদেশে আসিয়াও এডিথের মন প্রফুল্ল হইল না,—তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল না। এডিথ বোধ হয় তখন জানিতেন না,

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কখন ধরা পড়ে কে জানে?
গরব সব হায়, তখন টুটে যায়,
সলিল ব'হে যয়ে নয়নে।"

চার্লি বিঙ্গহাম্ বড়লাট বাহাদুরের একজন এডিকং। চার্লি আমাদের রেজিমেণ্টের সব্ অলটার্ণের কাজ করিতেন। সিমলায় আসিয়া বড়লাটের দরবারে চার্লির সহিত এডিথের পরিচয় হইল। চার্লির বয়স তখন প্রায় ত্রিশ বৎসর। চার্লির ন্যায় সুপুরুষ যুবক আমি ইংরাজের মধ্যে অতি অল্পই দেখিয়াছি. তাহার উপর রমণীর মনোরঞ্জনে তাঁহার অসামান্য শক্তি ছিল। চার্লি যে যুবতীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতেন. বা যাহাকে নাচিবার সঙ্গিনী করিতেন, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইতন অনেক ইংরাজ-কুমারীই মনে করিতেন, চার্লি যাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন—সে কত ভাগ্যবতী!

কিছুদিনের মধ্যেই চার্লির সহিত এডিথের একটু মাখা-মাখি ভাব দেখা গেল। তাহাদের পরস্পরের নিকট হৃদয়ের ভাব গোপনের চেষ্টায় যেন তাঁহাদের মনের ভাব বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাউন বড়ই চিন্তিত হইলেন; চার্লি যাহাতে নিরুৎসাহ হন, এজন্য বন্ধু সমাজে প্রকাশ করিলেন, এডিথের বিবাহ অমুক লর্ডের সহিত স্থির হইয়াই আছে—স্বদেশে ফিরিয়া গীর্জ্জায় উপস্থিত হইতে যা কিছু বিলম্ব; কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী,'—প্রণয়ীযুগলের মন ফিরিল না। বৃদ্ধ ব্রাউন্ যে, উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

শীতকালে সিমলা শৈলে আমোদপ্রমোদের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে

একদিন শুনিলাম যুতোগ (jutogh পাহাড়ের ওধারে বড়লাট বাহাদুর সদলবলে বনভোজন করিবেন। বড়লাটের বনভোজন, ব্যাপার কিরূপ গুরুতর বুঝিতেই পারিতেছেন। পাঁচ সাতদিন ধরিয়া তাহার আয়োজন চলিল। নির্জ্জন দুর্গম উপত্যকায় একেবারে বাজার বসিয়া গেল। বন-ভোজনের জন্য বন নগরে পরিণত হইল !

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা যথাস্থানে যাত্রা করিলেন। 'যার যেখানে ব্যথা—তার সেখানে হাত।' এডিথ তাঁহার পনিতে উঠিয়া চলিতে চলিতে দেখিলেন—চার্লির পনি ঠিক তাঁহার পার্শ্বেই দৈবক্রমে উপস্থিত। তখন উভয়ে মহানন্দে গল্প করিতে করিতে চলিলেন, ঘোড়াও দুটি কিছু ক্ষিপ্রগামী, তাহারা উভয়ের সম্মতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। ক্রমে তাঁহারা সহযাত্রীর দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন !

তাঁহারা একটি নির্জ্জন অরণ্য-সঙ্কুল উপত্যকা দিয়া অশ্ব পরিচালিত করিতেছিলেন, হঠাৎ অরণ্যের অন্তরাল হইতে একটি ব্যাঘ্র বাহির হইয়া এডিথের 'ফক্সটেরিয়ার'কে আক্রমণ করিল, কুকুরটি এডিথের পনির পার্শ্বে পার্শ্বে ছুটিতে ছিল। কুকুরটি আক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, পাশে বাঘ দেখিয়া এডিথের ঘোড়া ভয় পাইয়া একদিকে ছুটিল। এডিথ ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া ঘোড়া হইতে ভূতলশায়িনী হইলেন ; চার্লিও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার অশ্ব হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ঘোড়াও শিক্ষিত যুদ্ধাশ্ব, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বাঘের পিঠে পা চাপাইয়া দিল। আহত ব্যাঘ্র শিকার ত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে পলায়ন করিল। চার্লির অশ্বও একদিকে ছুটিল।

চার্লি তখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, এডিথের মূর্চ্ছা হইয়াছে। চার্লি তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন, কুকুরটাও তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার বদন লেহন করিতে লাগিল ! অল্পকালমধ্যেই এডিথের চৈতন্য সঞ্চার হইল। এডিথ হাসিয়া বলিলেন,—"তাঁহার দেহে আঘাৎ লাগে নাই, তবে তিনি বড় ভয় পাইয়াছেন বটে।" এই উপলক্ষে উভয়ের হৃদয় প্রবাহিত প্রেমমন্দাকিনীর ধারা হঠাৎ সবেগে উৎসারিত হইল, লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া এডিথ চার্লিকে বলিলেন "প্রিয়তম !" চার্লিও বলিলেন, "প্রিয়তমে !"

তাহার পর উভয়পক্ষে চুম্বনের আদানপ্রদান চলিল, সুতরাং ব্যসনটা যে উৎসবে পরিণত হইল, ইহা বলাই বাহুল্য।

এডিথ ও চার্লির অশ্ব সোয়ারহীন অবস্থায় নগরের দিকে ফিরিতেছে দেখিয়া বড় লাটের পারিষদ্‌বর্গ বিশেষতঃ এডিথের পিতা মিঃ ব্রাউন্ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং সকলে দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত যইয়া ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেন। চার্লি চাবুক প্রযোগে বাঘ তাড়াইয়াছেন শুনিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিলেন; এমনকি, মিঃ ব্রাউন চার্লির প্রতি তেমন প্রসন্ন না থাকিলেও তিনিও চার্লির প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

মহাসমারোহে বনভোজন শেষ হইয়া গেল। মিঃ ব্রাউন কন্যাসহ হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; উল্লিখিত দুর্ঘটনার পর চার্লির প্রতি এডিথের অধিকতর পক্ষপাত লক্ষ্যে তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু এডিথের মন হইতে কিরূপে চার্লির প্রভাব নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তিনি চার্লির নামে দশহাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ চার্লিকে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং সেই দিনই কন্যাসহ সিমলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আম্বালায় যাত্রা করিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আম্বালা পর্য্যন্তই রেল গিয়াছিল, সিমলা হইতে আম্বালায় যাইতে হইলে টোঙ্গায় যাইতে হইত।

চার্লি বিঙ্গহাম যথাসময়ে চেকখানি পাইলেন, প্রেমিকপ্রেমিকেরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে; চার্লি চেকখানি পাইয়াই ব্যাপার কি, তাহা কতক কতক অনুমান করিতে পারিলেন। তিনি চেকখানি পকেটে পুরিয়া অপরাহ্নকালে হোটেলে মিঃ ব্রাউনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন; হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; তিনি চক্ষুতে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, মিঃ ব্রাউন কন্যাসহ একখানি ফীটনে উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার লগেজগুলি কয়েকখানি টোঙ্গায় সজ্জিত হইয়াছে। চার্লি বুঝিলেন, ইহা চিরবিদায়ের সূচনা।

চার্লি একবার ছলছল নেত্রে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখের দিকে চাহিলেন। এডিথ ফীটনে তাঁহার পিতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার আদরের "ফক্সটেরিয়ার"

টি কোলে লইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু। অশ্রু-মুখী যুবতীর মুখখানি কি সুন্দর! চার্লি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্রাউন্ পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় উপবিষ্ট, তাঁহার মুখমণ্ডল ভাবসংস্পর্শশূন্য।

চার্লি বোধ হয় মিঃ ব্রাউন্‌কে কোন কথা বলিতেন, কিন্তু এডিথের সাক্ষাতে মনের কথা প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি সোজা সুজি বলিলেন, "বিদায় মিঃ ব্রাউন্! আপনি যে, এত শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহা মনে করিতে পারি নাই; আপনি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, ইহাতে আমরা সকলেই বড় দুঃখিত। মিস্ ব্রাউন্, আপনার নিকটেও বিদায় প্রার্থনা করি, আপনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, যে কথা যখনই মনে পড়িবে, তখনই বোধ হয় সিমলার স্মৃতি আপনার মনে জাগিয়া উঠিবে।"

চার্লি আর কোনও কথা না বলিয়া ফিরিলেন; দুঃখে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়া ছিল, অশ্রুভারে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া ছিল; তিনি একটু দাঁড়াইলেন, তাহার পর পকেট হইতে চেকখানি বাহির করিয়া তাহাতে দেশলাইয়ের আগুণ ধরাইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার চুরুটটি ধরাইয়া লইলেন।

ব্রাউন্ সাহেবের গাড়ী রাজপথে অগ্রসর হইল, হোটেলের ভৃত্যবর্গ অশাতীত বকশিস্ পাইয়া ঘটা করিয়া সেলাম বাজাইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে মিঃ ব্রাউন্ মনে মনে বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম ছোকরা বুঝি চেকখানি ফেরত দিতে আসিয়াছে; কিন্তু সেত তাহা ফেরত দিল না! ভালই করিয়াছে, বেচারা অল্প বেতনের মিলিটারী কর্ম্মচারী, দশহাজার টাকার লোভ কি ছাড়িতে পারে? আমার নির্ব্বোধ মেয়েটা ওই হতভাগার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে! প্রেমটা পাকিয়া উঠিবার আগেই সরিয়া পড়িলাম তাই রক্ষা,—নতুবা মান সম্ভ্রম বজায় রাখা কঠিন হইত।"

এডিথ পিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না, তিনি প্রিয়তমের বিরহে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। চার্লি যে তাঁহাকে ভালবাসে, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

পরদিন অপরাহ্ণে আমি আমাদের ক্লাবে বসিয়া আছি, এবং রাত্রে একটা নিমন্ত্রণে যাইব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় চার্লি বিঙ্গহাম অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ক্লাবে উপস্থিত হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া

বলিলেন, "ডাক্তার আপনাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি ? বেচারার কি হইয়াছে দেখুন !"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, চার্লির কোলে একটি ছোট কুকুর, কিন্তু ইহা যে এডিথের "ফক্সটেরিয়ার" তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দেখিলাম, কুকুরটীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ধূলিধূসরিত ; যন্ত্রণায় সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে !

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ? তোমার কুকুর কি কাহারও ঘোড়ার পায়ের তলে পড়িয়াছিল ?

চার্লি বলিল, "এ আমার কুকুর নয়, এ কুকুর এডিথের অর্থাৎ মিস্ ব্রাউনের।"

আমি এডিথকে চিনিতাম, তিনি যে তাঁহার পিতার সহিত পূর্ব্বদিন আম্বালা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম ;—সুতরাং এডিথের কুকুর দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম। চার্লিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিস্ ব্রাউন ত এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কুকুর এখানে কিরূপে আসিল ?"

চার্লি বলিলেন, "আমিও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কুকুরটাকে একটু ঔষধ দিন, আর আপনি এ দেশের লোক, এখানকার স্থানীয় নেটিভদের রীতিচরিত্র আপনি বেশ জানেন; ব্যাপার কি তাহার একটু সন্ধান করিবেন কি ?"

আমি কোন উত্তর না দিয়া কুকুরটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিলাম, তাহার কোমরের উপর তরবারীর আঘাত ! কেহ বোধ হয় তাহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য তরবারী প্রয়োগ করিয়াছিল।" আমি কুকুরটার ক্ষত ধোয়াইয়া ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিলাম।

অনন্তর আমি চার্লিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে ?"

চার্লি বলিলেন, "আমি কেরিঘাট রাস্তা দিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম ; হঠাৎ দেখিলাম কুকুরটা পাহাড়ের দিক হইতে অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে। কুকুরটাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, ইহা এডিথের কুকুর। নিশ্চয়ই কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে। নতুবা এডিথ কখনও

তাঁহার কুকুরকে এভাবে ছাড়িয়া দিতেন না। আপনি এ রহস্য ভেদের জন্য একটু চেষ্টা করিবেন না? আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে।"

এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় দ্বারে কে আঘাত করিল, দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, রেসালদার মেজার সর্দ্দার আবদুল হাকিম বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বোধ হয় আমার নিকট কোন কাজে আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমার নিকট তাঁহার কি আবশ্যক, জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিলাম; তাহার পর ব্রাউন সাহেব ও তাঁহার কন্যার আম্বালা যাত্রার কথা বলিয়া কি অবস্থায় কুকুরটাকে পাওয়া গিয়াছে তাঁহার গোচর করিলাম।

আমার কথা শুনিয়া রেসালদার মেজরের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"ডাক্তার সাহেব, ব্যাপার বড় গুরুতর বোধ হইতেছে।"

হিন্দীতে আমাদের কথা চলিতেছিল, চার্লি অল্পদিন পূর্ব্বে বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন, আমাদের কথা বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুলদৃষ্টিতে আমাদের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

সর্দ্দার বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস এ বকসী ডাকাতের কাজ! মাস দুই পূর্ব্বে কালকাতে তাহার দলের সহিত পুলিশ ফৌজের লড়াই হয়, সেই লড়াইয়ে বকসীর দুই ভাই মারা যায়। বকসী দলের অবশিষ্ট লোকজন সঙ্গে লইয়া পলায়ন করে বটে, কিন্তু শুনিয়াছি সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এ অঞ্চলের সাহেব লোকদের হাতে পাইলেই তাহাদের মাথা লইবে, কাহাকেও ছাড়িবে না। এ বকসীর কীর্ত্তি সন্দেহ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন উপায়? সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু যে কাহাকেও জীবিত রাখিয়াছে, এমন ত বোধ হয় না।"

আমার প্রশ্নে আবদুল হাকিম কোন উত্তর না দিয়া নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এডিকং চার্লি বিঙ্গহাম হিন্দী বুঝিতেন না, আমাদের কথোপকথনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর আমাদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আমার কথা শুনিয়া চার্লি দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং আমি তাঁহাকে সাহায্য না করিলেও তিনি একাকী এডিথ ও তাঁহার পিতার অনুসন্ধানে যাইবেন ইহাও প্রকাশ করিলেন।

আমি চার্লির আগ্রহে উত্তেজনাবশে হঠাৎ নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়া বসিলাম ; কর্ত্তৃপক্ষকে কোন কথা না জানাইয়া আবদুল হাকিম ও চার্লিকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে কেরীঘাট অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এডিথ ও তাঁহার পিতা সেই পথে শিমলা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রায় পনের মাইল দূরে একটি চটি ছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মিঃ ব্রাউন অনুচরবর্গ সহ সেইস্থান অতিক্রম করিয়াছেন ; কিন্তু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে মিঃ ব্রাউনের ফীটন, তাঁহার টোঙ্গাগুলি ও অনুচরগণ পরবর্ত্তী আড্ডা সোলনে উপস্থিত হন নাই। মধ্যপথেই তাঁহারা অদৃশ্য হইয়াছেন! এমন কি, সোলন হইতে তাঁহাদের অনুসন্ধানে সোয়ার প্রেরিত হইলেও তাহারা তাঁহাদের কোন সন্ধান পায় নাই। কেহ কেহ বলিল,—"তাঁহারা হয়ত উচ্চ পার্ব্বত্য পথ হইতে গড়াইয়া পথিপ্রান্তস্থ গভীর গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন।"

এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া আবদুল হাকিম বলিলেন,—"ইঁহারা আহা-ম্মুখের মত কথা বলিতেছে, ফীটন, টোঙ্গা,-বাহকগণসহ সমস্তই খাদে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?"

আড্ডারক্ষক বলিল,—"সর্দ্দার সাহেব, আপনি এ অন্যায় কথা বলিতেছেন, খোদার মর্জ্জিতে দুনিয়ায় কি অসম্ভব ?"

সর্দ্দার আবদুল হাকিম কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ সময়ে সাহেবদের অনুসন্ধানে সোয়ার বাহির হইয়াছিল ?"

আড্ডারক্ষক সভয়ে বলিল,—"টোঙ্গার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, এই সংবাদ পাইবা মাত্র, হুজুর !"

সর্দ্দার বিরক্তি ভাবে বলিলেন,—"কোন্ সময়ে রে শুয়ার ! তখন কটা বাজিয়া ছিল ?"

আড্ডারক্ষক বলিল,—"সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে হুজুর ; তখনও ঢের বেলা ছিল।"

সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"সময় কত ?"

আড্ডারক্ষক বলিল,—"তিনটা।"

বলা বাহুল্য মিঃ ব্রাউন পূর্ব্বদিন তিনটার অনেক পরে সিমলা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ; আড্ডারক্ষক যে মিথ্যা কথা বলিতেছে ইহা তাঁহার

বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সক্রোধে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, তাহার পর আড্ডারক্ষকের ঘাড় ধরিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "ঝুট বাত বদ্‌মাস! আমার সঙ্গে গোস্তাকি? এখন যাহা বলি শোন্। এ বক্‌সী ডাকাতের কাজ, তুই তা জানিস্; মিথ্যা কথায় আমাদের ভুলাই-বার চেষ্টা করিতেছিস্! কি হইয়াছে ঠিক বল, যদি কোন কথা গোপন করিস্—তবে এই তলোয়ারের এক খোচায় তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।"

আড্ডারক্ষক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"আমি যাহা জানি ঠিক বলিতেছি হুজুর; সত্যই এ বক্‌সী ডাকাতের কাজ। সাহেব যখন এখান হইতে দুই মাইল দূরের ঐ জঙ্গলের ধার দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় বক্‌সী ডাকাত দলবল লইয়া সাহেবকে আক্রমণ করে। ডাকাতেরা সাহেবের অনুচরদের কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া পার্শ্বের খাদে ফেলিয়া দিয়াছে। সাহেবের জিনিষপত্র লুঠ করিয়াছে—সাহেবকে ও মিস্ সাহেবকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি সকালে এ সংবাদ জানিতে পারি, কিন্তু পাছে এ সকল কথা প্রকাশ করিলে বকসী আমাদের কাটিয়া ফেলে এই জন্য হুজুরকে প্রথমে কোনও কথা বলিতে সাহস করি নাই।"

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বক্‌সীর দলে কতজন ডাকাত ছিল? ঠিক বল নিমকহারাম। মিথ্যা বলিয়াছিস্ কি তোর গর্দ্দান লইয়াছি।"

আড্ডারক্ষক বলিল,—"আপনার কথার ঠিক জবাব দিতে পারিলাম না হুজুর, আমি ত চক্ষে দেখি নাই, তবে শুনিতেছি, তাহার দলে পনোর ষোল জন ডাকাত ছিল।"

সর্দ্দার আড্ডারক্ষককে ছাড়িয়া দিয়া পুনর্ব্বার অশ্বে আরোহণ করিলেন। চার্লি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি ডাক্তার?"

আমি কোন কথা গোপন না করিয়া সকলই তাঁহাকে বলিলাম। চার্লি সকল কথা শুনিয়া আরক্ত-নেত্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে মুহূর্ত্তকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সবেগে সম্মুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

আমি দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় যাও?"

চার্লি বলিলেন,—"এডিথ ও তাঁহার পিতাকে দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করিতে।"

আমি বলিলাম,—"ক্ষেপিয়াছ? সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, সম্মুখে অন্ধকার

রাত্রি, এই দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ, সম্পূর্ণ অজানিত পথ ; এ ডাকাতের দলকে এ রাত্রি কোথায় খুঁজিয়া পাইবে ? তাহারা নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে ; আর যদি নিকটে কোথাও আড্ডা করিয়া থাকে ত তুমি একাকী তাহাদের আক্রমণ করিয়া কি ফল পাইবে ? এডিথকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে প্রাণ হারাইবে।"

দেখিলাম চার্লি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়াছেন ; আমি এই ভাবে বাধা দেওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, আমাকে আবেগভরে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালী বীরপুরুষের মতই কথা বলিয়াছ ! কিন্তু আমি বাঙ্গালী নহি, বৃটন-নন্দন, মৃত্যুভয়ে কাতর নহি, একবারের বেশী ত মরিব না।"

স্বজাতির নিন্দা শুনিলে কাহার না রাগ হয় ? আমারও বড় রাগ হইল, আমি কাপুরুষ কি না—অন্ততঃ চার্লির অপেক্ষা আমার সাহস অধিক কি না সে পরিচয় অনায়াসে দিতে পরিতাম, কিন্তু ঔদ্ধত্য প্রকাশ বীরপুরুষের লক্ষণ নহে, হঠাৎ বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া বিপন্ন হওয়াও বিবেচকের লক্ষণ নহে। আমি চার্লিকে বলিলাম,—"যদি বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কোন ফল পাইতে—আমি তাহাতে বাধা দিতাম না। কিন্তু এই বকৃসীকে তুমি জান না। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহার ন্যায় দুর্দ্দান্ত নির্ভীক ও ভীষণপ্রতীজ্ঞ দস্যু আর একজনও আছে কি না সন্দেহ,—তাহার অনুচরেরাও তাহার ন্যায় সাহসী ও পরাক্রান্ত। বিশেষতঃ তাহারা সকলেই আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত। এই যে বিভিন্ন শিবির হইতে মধ্যে মধ্যে বন্দুক চুরী যায়, ঘোড়া চুরী যায় এসকল তাহারই কীর্ত্তি। তাহাদের বিরুদ্ধে একদল মিলিটারী পুলিশ পাঠাইলে যদি কোনও ফল পাওয়া যায়। এ রাত্রে আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া কি করিব ? তোমার কি মত সর্দ্দার সাহেব ?" সর্দ্দারের মুখের দিকে চাহিয়া আমি এই প্রশ্ন করিলাম।

সর্দ্দারও আমার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন, তিনি বলিলেন, "চলুন আমরা ডাকাতের সন্ধানে দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া সোজা পথ ধরিয়া সোলনে যাই। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষকে সকল কথা জানাইলে নিশ্চয়ই একদল মিলিটারী পুলিশ অতি প্রত্যুষে দস্যুদলের সন্ধানে বাহির হইবে ; আমরা তখন তাহাদের সঙ্গে ডাকাত ধরিতে যাইব। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত কার্য্য হইবে।"

চার্লি অনিচ্ছার সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, দুইজনের মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। আমরা সেইস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া ধীরে ধীরে সোলনের পথে অগ্রসর হইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছিল।

২

আমরা দ্রুতগতি অশ্ব পরিচালিত করিয়া যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম, তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। যথাসাধ্য তাড়াতাড়ী করিয়াও আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম, কিন্তু সেই দুর্গম পথে অশ্ব পরিচালিত করা অতি কঠিন। পথে কোন কোন স্থল সমতল হইলেও সেই পার্ব্বত্য পথে 'চড়াই উৎরাই' অত্যন্ত অধিক। কিছুক্ষণ চলিয়া বিঙ্গহাম তাঁহার অশ্বকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া গতি মন্থর করিয়াছিলেন, আমি ও সর্দ্দার আবদুল হাকিম অগত্যা তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলাম।

চলিতে চলিতে সর্দ্দার হঠাৎ থামিলেন; বয়স অধিক হইলেও তাঁহার সুর্‌মা রঞ্জিত নয়নের জ্যোতি, যুবক আমরা, আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তিনি পথিপ্রান্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াই অশ্ব হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিলেন, এবং অদূরবর্ত্তী খদের সন্নিকটে গমন করিয়া উভয় হস্তে কি একটি জিনিস আঁকড়িয়া ধরিলেন; তাঁহার কাজ দেখিয়া আমাদের বিস্ময়াবেগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমরাও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম।—দেখিলাম, তিনি যে জিনিসটি আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন তাহা একটা নরমুণ্ড! 'কাটা মুণ্ডু' নয়, একটা মানুষ সঙ্কীর্ণ খাদে দেহ সঙ্গোপন করিয়া পথের উপর কেবল মাথাটি উচু করিয়া বসিয়াছিল। আমরা সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহা একটা গুল্ম বলিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতাম, কিন্তু সর্দ্দারের দৃষ্টি, গুল্মে আর দীর্ঘ কেশাবৃত নরমুণ্ডে পার্থক্য আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হয় নাই। সর্দ্দার মুণ্ডটি ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিবামাত্র মানুষটি আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পথের উপর উঠিয়া আসিল।

সর্দ্দার তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "যদি চিল্লাইবি ত এক থাপ্পড়ে তোর শির উড়াইয়া দিব—বল্ তুই কে?"

লোকটি বলিল, "আমি মানুষ।"

সর্দ্দার বলিলেন, "তুই জানোয়ার নহিস্ তাহা দেখিতেছি, তোর নাম কি ?"

"ভুলিয়া গিয়াছি হুজুর !"

সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বদমাইসি আরম্ভ করিলি ?—জানিস্ তোর বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিব।—তুই এখানে কি করিতেছিলি ?"

লোকটি বলিল, "বকৃরি খুঁজিতে ছিলাম।"

সর্দ্দার বলিলেন, "ঝুঠ বাত্। গর্ত্তে বসিয়া লোকে বকৃরি খোঁজে !"

আমি অগ্রসর হইয়া পকেট হইতে ম্যাচ বাক্সটা বাহির করিলাম। দেশলাই জ্বালিতেই তাহার আলো লোকটির হাঁড়ির মত মুখে পড়িল। সেই আলোকে তাহার মুখ দেখিবামাত্র সর্দ্দার বলিয়া উঠিলেন। 'আল্লা ! এযে দেখিতেছি বকসী ডাকাতের দলের লোক। বেটা ডাকাত ! আমার কাছে গোস্তাকি ?" সর্দ্দার তাহার গণ্ডে ১০৫ শিক্কা ওজনের একটি চপেটাঘাত করিলেন।

বলা বাহুল্য সর্দ্দার আবদুল হাকিম যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহার অনুমান মাত্র, কিন্তু তাঁহার সেই সজীব চপেটাঘাতে আশাতীত ফল পাওয়া গেল। লোকটা মনে করিল, আমরা পুলিশ কর্ম্মচারী, আমাদের নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিয়া কোনও লাভ নাই ভাবিয়া লোকটি কাতর স্বরে বলিল, "হুজুর, আমাকে আর মারধোর করিবেন না, যদি আমাকে কয়েদ না করেন ত আমি আপনাদের সকল কথা খুলিয়া বলিতে রাজী আছি।"

সর্দ্দার তখন সুর বদ্‌লাইলেন, নরম হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোকে চিনিয়াছি, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, যদি ঠিক ঠিক সকল কথা বলিস্ তাহা হইলে তোকে ছাড়িয়া দিব, আর যদি মিথ্যা বলিস্ তাহা হইলে তোর ঘাড়ে মাথা থাকিবে না। আমার তলোয়ার দেখিতেছিস্ ? এক কোপে তোর মাথা কাটিয়া ধড় ও মুণ্ড ঐ খাদে ফেলিয়া দিব।"

দস্যু সর্দ্দারের কথা শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমাকে জানে মারিবেন না হুজুর, সব বলিতেছি।"

অতঃপর সে যে সকল কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, সে সত্যই বকসী ডাকাতের দলের লোক। বকসী সদলবলে পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইয়াছিল, সাহেব এই পথ দিয়া যাইবার সময় সে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীদের আক্রমণ

করে। তাহারা টোঙ্গাওয়ালাদের হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহ খাদে নিক্ষেপ করিয়াছে; সাহেবের ফীটন ও টোঙ্গা গুলি চূর্ণ অবস্থায় নালার মধ্যে পড়িয়া আছে। সাহেবের সঙ্গে যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী ও টাকা ছিল সমস্তই তাহারা আত্মসাৎ করিয়া ব্রাউন সাহেব ও তাঁহার কন্যাকে পাহাড়ের দুর্গম অংশে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

দস্যুর উক্তি শ্রবণ করিয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বকসীর দলে তোরা কতজন ডাকাত ছিলি?"

দস্যু বলিল, "বকৃসীকে লইয়া আমরা পনের জন ছিলাম।"

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা সকলে কোথায়?"

দস্যু বলিল, "সাহেবকে ও মিস্ সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের সঙ্গে না গিয়া তুই এখানে কি করিতেছিলি?"

দস্যু বলিল, "আমিও দলে ছিলাম। বকৃসী সর্দ্দার একখানি চিট্ দিয়াছে, সেই চিট্ লইয়া আমি সিমলার পাহাড়ে যাইতেছিলাম।"

সর্দ্দার বলিলেন, "কাহার নামে চিট্ দিয়াছে?"

দস্যু বলিল, "সিমলার এক সাহেবের নামে; আমি সেই চিট্ লইয়া যাইতে যাইতে এইখানে আসিয়া ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাই, তাই ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ী ঐ খাদের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়াছিলাম, মৎলব ছিল, আপনারা চলিয়া গেলে উঠিয়া সিমলার দিকে যাইব। তখন কি আর জানি যে অন্ধকারের মধ্যেও হুজুরের চোখ জ্বলে!"

সর্দ্দার কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দস্যুর কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আমি বলিলাম,—"সে চিট্ কোথায় শীঘ্র বাহির কর।"

দস্যু তাহার বস্ত্রপ্রান্ত হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিল। আমি কাগজখানি হাতে লইয়া পুনর্ব্বার ম্যাচ জ্বালিলাম। কাগজের উপর ইংরাজী ভাষায় লেখা ছিল,

"C. Bingham, Esqr,

আমি বিঙ্গহামের নামটি পাঠ করিবামাত্র বিস্ময়াভিভূত। বিঙ্গহাম আমার হাত হইতে পত্রখানি লইয়া খুলিলেন, আমি তখন একটির পর একটি করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া পত্রের উপর ধরিলাম। বিঙ্গহাম সেই চঞ্চল আলোকে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্রের মর্ম্ম এইরূপ,—

"প্রিয় মহাশয়, একদল দস্যু আমাকে ও আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে বন্দী করিয়াছে। তাহারা আমার সঙ্গের লোকজনদের হত্যা করিয়াছে; আমাদের দু'জনকে প্রাণে মারে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের হস্তে আমরা অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছি। এই দস্যুদলের দলপতি আমাকে জানাইয়াছে, যদি আপনি প্রেরিত লোকের মারফৎ দুই হাজার মোহর পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে সে আমাকে ও এডিথকে মুক্তিদান করিবে। আমাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবে; কিন্তু যদি কেহ তাহাদিগের অনুসরণ করে বা আমাদিগকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধারের-চেষ্টা করে,তাহা হইলে তাহারা আমাদের উভয়কেই হত্যা করিবে। দস্যুদলপতি আমাদের এ কথাও জানাইয়াছে যে, আমি কোন ব্যাঙ্কে এই টাকার জন্য পত্র লিখিতে পারিব না, যিনি কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া অবিলম্বে মোহরগুলি দিবেন, এরূপ কোনও বন্ধুকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও টাকার জন্য অনুরোধ করিতে পারিব না, এবং যিনি মোহরগুলি দিবেন, তিনিও এ সম্বন্ধে কোনও কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। দস্যুর অঙ্গীকারে নির্ভর করা যায় না, কিন্তু দুই হাজার মোহর না পাইলে যে সে আমাদের বধ করিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্যে যাহা হয় হইবে, কিন্তু এডিথকে রক্ষা করুন। টাকা পাইলে সে হয়ত আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেও পারে। কিন্তু না পাইলেই সর্ব্বনাশ! এ বিপদে আমি আপনারই সাহায্যপ্রার্থী হইলাম, যদি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারি, তখন আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে বিলম্ব হইবে না।

সেপ্টিমস্ ব্রাউন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া চার্লি অধীর হইয়া উঠিলেন। সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

আমি সংক্ষেপে তাঁহাকে পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলাম।

সর্দ্দার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"বড় বিপদের কথা বটে, এই ডাকাতটা যদি নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে মোহরগুলি লইয়া বকসীর নিকট ফিরিয়া না যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই মিঃ ব্রাউনকে হত্যা করিবে। নরহত্যায় তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই, টাকার লোভেই সে মিঃ ব্রাউন ও তাঁহার কন্যাকে জীবিত রাখিয়াছে।"

এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য আমি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, চার্লির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল।

সর্দ্দার এ অঞ্চলে দস্যুগণের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বকসীর সহচরকে সক্রোধে বলিলেন,—"ওরে হারামজাদ্! তুই টাকা লইতে আসিয়াছিস। আয় তোকে টাকা দিই।'—সর্দ্দার সবেগে তাহার নিতম্বে পদাঘাত করিলেন।

সর্দ্দারের সবুট পদাঘাতে দস্যু আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—"দোহাই হুজুর, আমাকে মারিবেন না, আমার কোন দোষ নাই, আমাকে যে হুকুম করিবেন করিব।"

সর্দ্দার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হস্তস্থিত ঘোড়ার চাবুক বাগাইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ঠিক বলিতেছিস্ ?"

দস্যু বলিল,—"হাঁ হুজুর, ঠিক বলিতেছি, মিথ্যা বলিয়া জান্ খোওয়াইতে কে যায় ?"

সর্দ্দার বলিল,—"যদি মিথ্যা কথা বলিস্, তাহা হইলে আমি তোর জিভ টানিয়া ছিঁড়িব। তাহার পর তোকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তোর গোস্ত কুকুর দিয়া খাওয়াইব। এখন বল বকসী ডাকাত কোথায় আছে ?"

দস্যু বলিল,—"কাল তাহার সঙ্গে যেখানে আমার দেখা করিবার কথা, সেখানে সে নাই, আজ সে আর এক জায়গায় আড্ডা লইয়াছে, সে স্থান এখান হইতে পাঁচ ক্রোশের বেশী নয় !"

সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"সে স্থান কোথায় রে শুয়ার ? সোজা জবাব কর।"

দস্যু বলিল,—"পাহাড়ের উপর একটি গুহার ভিতর সে লুকাইয়া আছে। সে গুহা অতি গোপনীয় স্থান, আপনি তাহার আশে পাছে হাজার বৎসর ঘুরিলেও সে স্থানের সন্ধান পাইবেন না, আমার সঙ্গে যাইলে আমি আপনাদের সেই গুহা দেখাইয়া দিতে পারি।"

সর্দ্দার বলিলেন,—"সেখানে পাহারার কিরূপ বন্দোবস্ত আছে ?

দস্যু বলিল, "না হুজুর, সেখানে কেহ পাহারায় নাই, যেখানে লুকাইলে কেহ সন্ধান পাইবে না, সেখানে পাহারায় লোক রাখিবার কি আবশুক।"

সর্দ্দার বলিলেন, "উত্তম, আমাদিগকে সেইখানে লইয়া চল। যদি আমাদের সঙ্গে চালাকি না করিয়া ঠিক জায়গায় লইয়া যাস্, তাহা হইলে

তোকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু যদি বিপথে লইয়া গিয়া আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিস, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তোর মাথা কাটিব।"

দস্যু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তাহার সঙ্গীদের ধরাইয়া দিতে অনিচ্ছুক নহে, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

দস্যুকে সঙ্গে লইয়া যখন আমরা বক্সী ডাকাতের আড্ডার দিকে চলিলাম, তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, শশধরের সুস্নিগ্ধ কৌমুদী-ছটায় পার্ব্বত্য প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল। আমাদের অশ্বগণ পার্ব্বত্য পথ ভ্রমণে দক্ষ, সুতরাং সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে অশ্ব পরিচালিত করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হইল না। আমরা হিমালয়ের নিভৃত অধিত্যকার অন্তবর্ত্তী অতি দুর্গম অংশে অগ্রসর হইলাম।

অনেক অরণ্য, উপত্যকা, গিরিগুহা অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদূরে চলিলাম। মনটা তেমন প্রসন্ন ছিল না, রেজিমেণ্টের কাহাকেও কোনও সংবাদ দিই নাই আমাদের এই আকস্মিক অভিযানের কথা অন্য কেহই জানে না। হিমাচলের এই দুর্গম প্রদেশে এই নিভৃত নির্জ্জন গিরি উপত্যকার প্রান্তভাগে হঠাৎ যদি আমারা দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই ও তাহারা আমাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া কোন খদে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে আমাদের সন্ধান পর্য্যন্ত হইবে না। আমি বাঙ্গালী হইলেও সমরবিভাগে কাজ করিয়া অনেকবার অনেক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, কিন্তু এমন দুঃসাহসের কার্য্যে আর কখনও প্রবৃত্ত হই নাই।

কিন্তু চার্লির অবস্থা ভিন্ন রূপ। তাঁহার প্রিয়তমার জীবন বিপন্ন; এ সংবাদে তিনি একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন; উন্মত্তের ন্যায় তিনি বেগে অশ্ব পরিচালিত করিতেছিলেন। সর্দ্দার পথপ্রদর্শক দস্যুকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এবং তাহার গতি মন্থর হইলেই তাহার পৃষ্ঠে চাবুক প্রয়োগ করিতেছিলেন। আমারও চার্লির নিকট এক একটি রিভলভার ছিল। সর্দ্দারের সঙ্গে বন্দুক ছিল না, তাঁহার কোষে দীর্ঘ তরবারি এবং কোমরবন্ধে সুশাণিত তীক্ষ্ণ ধার ছোরা। এই ছোরা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

৩

তিন ঘণ্টা কাল ক্রমাগত অশ্ব পরিচালিত করিয়া অবশেষে যখন আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। স্থানটি কিরূপ বিপদসঙ্কুল, দুর্গম ও ভয়াবহ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। সে একটি উপত্যকা। উপত্যকাটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু হিমালয়ের অতি ঊর্দ্ধদেশে

অবস্থিত, তাহার চারিদিকে অরণ্য, মধ্যে মধ্যে নির্ঝর। নির্ঝরের নির্মল জলরাশি তমচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন সুগভীর খাদের ভিতর দিয়া উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া কুলু কুলু শব্দে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। নির্ঝরসলিলের এই অশ্রান্ত শব্দ ভিন্ন সেই গভীর রাত্রে কোন দিকে অন্য কোন শব্দ ছিল না। নৈশ-প্রকৃতি চন্দ্রকিরণে যেন নিদ্রা যাইতেছিল, আর দূরে দূরে ধূসর গিরি-শৃঙ্গগুলি যেন নিদ্রিতা প্রকৃতির মৌন প্রহরী, আকাশে মাথা তুলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। সেকি বিরাট ভীষণ সৌন্দর্য্য! তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গগুলির দিকে চাহিয়া আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল।

চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া বন্দী হঠাৎ থামিল, এবং অদূরবর্ত্তী একটি গিরিশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, উহার পাদমূলে একটি প্রশস্ত গুহা আছে, গুহাটি এত বড় যে, তাহার ভিতর এক রেজিমেণ্ট সৈন্য অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পরে। গুহার চারিদিকে নানা জাতীয় পার্ব্বত্য তরু। সেই নিবিড় অরণ্যে গিরিগুহাটি এমন ভাবে সমাচ্ছন্ন যে, দূর হইতে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্থানটি যদিও একশত গজের অধিক দূরে নহে, কিন্তু আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে চড়াই অত্যন্ত অধিক। তবে এইটুকু আশার কথা যে, বহু কষ্টে সেখান পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে গমনের সুবিধা ছিল।

আমি ও চার্লি সেইদিকে চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, দেখিলাম সর্দ্দার কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আমাদের পথপ্রদর্শক দস্যুর মুখ পাগড়ী খুলিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন! তখন আমার মনে হইল, তিনি খুব বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন, কারণ যদি সে দুর্ব্বৃত্ত হঠাৎ চীৎকার করিয়া তাহার সঙ্গীদের সতর্ক করিত, তাহা হইলে সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে আমাদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হইত। বজ্রীর অনুচরবর্গের বন্দুকের গুলিতে আমাদের প্রাণ যাইত। সেই বিজন অরণ্যের অন্তরাল হইতে হঠাৎ শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া আমাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। আমি সর্দ্দারের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সর্দ্দার ধরাশায়ী দস্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুই এখানে এইভাবে পড়িয়া থাক! যদি বুঝিতে পারি, তুই আমাদিগকে মিথ্যা ধোকা দিয়া

এখানে আনিয়াছিস, তাহা হইলে আমি তোকে কাটিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইব।

দস্যু কোনও কথা বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার ভীতি-ব্যাকুল চক্ষুর দিকে চাহিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, সে আমাদের সহিত প্রতারণা করে নাই।

আমি সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি কর্ত্তব্য ? চার্লি বলিলেন, "কর্ত্তব্য—দস্যুদের আক্রমণ করা।"

সর্দ্দার বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইবেন না মহাশয়, আগে উহাদের সন্ধান করা যাক্– তাহার পর আক্রমণের ব্যবস্থা করা যাইবে। দস্যুরা কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহা না জানিয়াই কিরূপে আক্রমণ করিব ?"

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আর ঘোড়া চলিল না। তখন একটা গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া আমরা 'শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্' আরম্ভ করিলাম। চলিতে চলিতে চার্লির পদস্খলন হইল, আমি তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়া না ফেলিলে তিনি গড়াইতে গড়াইতে কোথায় গিয়া পড়িতেন, কে বলিবে ? আমি তাঁহাকে রক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে একটা পার্ব্বত্য সর্প আমার দক্ষিণ পাখানি জড়াইয়া ধরিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিতেই থামিয়া গেলাম। ভাগ্যে চীৎকার করি নাই, নতুবা সকল দিক নষ্ট হইত, হয়ত, আমাদিগকেও নিহত হইতে হইত।

যাহা হউক, সাপটাকে পদাঘাতে নিষ্পেষিত করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি, দস্যু যে গুহার কথা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক গুহা নহে, পাহাড়ের একটি প্রশস্ত খদ।

এই খদের কিছু দূরে আটটি ঘোড়া চরিতেছিল, সেখানে ঘাস ছিল না, তাহারা কি খাইতেছিল, তাহা তাহারাই জানে, বোধ হয় পার্ব্বত্য শৈবালে ক্ষুধা নিবারণ করিতেছিল। খাদের মধ্যে অরণ্যের অন্তরালে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল, তাহার চতুর্দ্দিকে দস্যুদল লম্বা হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। কিছু দূরে মিঃ ব্রাউন ও তাঁহার কন্যা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, দস্যুরা তাঁহাদের হাত পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়াছে।

মিঃ ব্রাউন ও এডিথ উভয়েই তখন নিদ্রিত। সর্দ্দার নিঃশব্দপদসঞ্চারে এডিথের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদের বন্ধন ছেদনে উদ্যত হইলেন।

সর্দ্দার অবনত মস্তকে তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকাদ্বারা বন্ধন কাটিলেন, ঠিক সেই সময় এডিথ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সর্দ্দার তাঁহাকে সাবধান করিবার অবসর পাইলেন না। এডিথের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া পাঁচ ছয় জন দস্যু লাফাইয়া উঠিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের পিস্তল হইতে গুলি বর্ষিত হইল। দুই ফায়ারে চারিজন দস্যু সেই স্থানে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিল না।

দস্যুদলের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল, তাহারা মনে করিল, মিলিটারী পুলিশের রেজিমেণ্ট আসিয়া তাহাদের 'ঘেরাও' করিয়াছে। তাহারা আর মুহূর্ত্তকাল সেখানে অপেক্ষা না করিয়া খদের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। তাহাদের অনুসরণ করি আমাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল না, আর সত্য বলিতে কি সেরূপ সাহসও ছিল না। যদি তাহারা বুঝিতে পারিত, আমরা তিন জন লোক তাহাদের আক্রমণ করিয়াছি এবং যদি তাহারা না পলাইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে সে দুর্গম স্থান হইতে প্রাণ লইয়া আমাদের ডেরায় ফিরিয়া আসা কঠিন হইত। চার্লি বাপাজীবনের প্রেম বিয়োগান্ত নাটকের ঘটনায় পরিণত হইত; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হইল।

কিন্তু আমাদের এই আত্মপ্রসাদ দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে হইল না।

আমরা মিঃ ব্রাউনের নিকট অগ্রসর হইতে না হইতে আহত দস্যু চতুষ্টয়ের একজন সংজ্ঞা লাভ করিয়া চক্ষুর নিমিষে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তাহার পায়ে গুলি লাগিয়াছিল। সে তাহার পাশ হইতে ভূপতিত একটি রাইফেল তুলিয়া লইয়া এডিথের মস্তক লক্ষ্য করিল।

তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইল না, আমি তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম; কিন্তু এডিথের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, গুলি দস্যুর মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

চার্লি তাহার প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার জন্য তৎপূর্ব্বেই এডিথের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন, দস্যুর গুলি এডিথকে না লাগিয়া চার্লিই তদ্দারা আহত হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সর্দ্দার এক লম্ফে দস্যুর উপর নিপতিত হইয়া তাঁহার বিশাল তরবারির এক আঘাতে দস্যুর শিরশ্ছেদ করিলেন। চক্ষুর নিমিষে এই কাণ্ড ঘটিল।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লোকটাকে কাটিয়া ফেলিলেন?"

সর্দ্দার নির্ব্বিকার ভাবে তরবারির রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "অন্য দস্যু হইলে কাটিতাম না, কিন্তু এই বেটাই বক্‌সী ডাকাত। অনেকদিন হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল, উহার অত্যাচারের প্রতিফল দিব।

প্রকৃত ব্যাপার কি, এডিথ তাহা এতক্ষণ পরে বুঝিয়াছিল। এডিথ বাঙ্গালীর মেয়ে হইলে সে সময় সে অবস্থায় কি করিতেন বলিতে পারিনা, বোধ হয় মূর্চ্ছা যাইতেন। কিন্তু এডিথের আত্মসংযম দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি তাঁহার প্রিয়তমাকে সংজ্ঞাহীন ভাবে ভূপতিত দেখিয়া নতজানু হইয়া স্তব্ধভাবে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন, তাঁহার নেত্র পলকহীন, নিশ্বাস পড়িতেছিল কি না সন্দেহ! চার্লির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার পর তিনি উঠিয়া তাঁহার পিতার নিকট আসিলেন।

মিঃ ব্রাউন অদূরে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তিনি সকলই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উঠিবার বা বন্ধন মুক্ত করিবার শক্তি ছিল না; রুদ্ধ আক্রোশে তিনি হাত পা ছুড়িতেছিলেন।

তাঁহার সেই অবস্থায় এডিথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "যদি চার্লি মরিয়া যান, তাহা হইলে বাবা তুমিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। আজ হইতে আমি আর তোমার কন্যা নই, তোমার গৃহে আর আমার স্থান নাই, আমি সন্ন্যাসিনী হইয়া কোনও মঠে প্রবেশ করিব, আর তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না। যে আমার জন্য প্রাণ দিয়াছে, এ প্রাণ আমি তাঁহাকেই দিয়াছিলাম, যতদিন বাঁচিব, তাঁহারই স্মৃতির পূজা করিব।"

বৃদ্ধ 'টাকার কুমীর' নিরুত্তর। কন্যার কথায় প্রতিবাদ করিবার তাঁহার সাহস ছিল না। সর্দ্দার তাঁহার হস্ত পদের বন্ধন কাটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

দস্যুরা পলায়ন করিয়াছে বুঝিয়া আমাদের সাহস বাড়িল। এডিথ চার্লির নিকটে আসিয়া তাঁহার মস্তক নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে চার্লির চেতনা হইল, তিনি চক্ষু খুলিয়া চাহিয়াই তাঁহার কামনার ধনকে হৃদয়ের সন্নিকটে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি ফুটিল। চার্লি হাসিয়া বলিলেন, It's all right; only my collar-bone. Beustly nuisance!"

অদূরে যে ঘোড়াগুলা চরিতেছিল, তাহাদের একটাকে ধরিয়া আনিয়া ধরাধরি করিয়া চার্লিকে তাহার পিঠে তুলিয়া দিলাম ; এবং আমরা তাঁহার ঘোড়ার আশে পাশে চলিতে লাগিলাম। ডেরায় উপস্থিত হইতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

চার্লি ও এডিথের কুকুর,—কয়েকদিন রোগ শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। এডিথ প্রাণপণ যত্নে তাঁহার উভয় কুকুরেরই সেবা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্রাউনের আর সিমলা ত্যাগ করা হইল না, দুই মাস পরে সিমলার গীর্জ্জায় মহাসমারোহে এডিথের সহিত চার্লির বিবাহ হইল। মিঃ ব্রাউন সগৌরবে বলিলেন, চার্লি লর্ড নয় বটে, কিন্তু বীর পুরুষ 'None but the brave deseaves the fair' কবিবর ড্রাইডেনের এই উক্তির অমর্য্যাদা করি আমার এত শক্তি নাই।

আমি মনে মনে বলিলাম, "মেয়ের গোঁ ফিরাইতে পারিলে, ড্রাইডেনের এ সম্মান কোথায় থাকিত।"

বক্সী ডাকাতকে ধরিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন, সর্দ্দার সেই পুরস্কার পাইলেন ; কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল হইল, আমি বিনা এতেলায় ডেরা ছাড়িয়াছিলাম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের তিরস্কার ভাজন হইলাম। একজন পাইল কামিনী, আর একজন পাইল কাঞ্চন ; আর আমার ভাগ্যে তিরস্কার ! আমি আমার চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইহা 'ডাকাতের উপর বাটপড়ী,' না ঝকমারির মাশুল !

যাহা হউক একটা লাভের কথা না বলিলে চলিতেছে না। চার্লি পরে গবর্ণমেণ্টের অতি উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এই গরীব 'নেটিভ' বন্ধুকে কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি কখনও আমি ভুলিতে পারিব না। এখন চারিদিকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে আক্ষেপ হয়, সে সময় কি সুখের কালই ছিল ! রঙ্গের চেয়ে মানুষ তখন গুণেরই অধিক সম্মান করিত।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

'কমলা'

(১)

"মা, আমাদের কি হবে গো! কাকাবাবু! আমাদের কি গতি হবে গো"!

"ছি সরলা, কাঁদিস্‌নে, কেঁদে আর মায়া বাড়াস্‌নে; বৌদি পায়ে পড়ি, কেঁদ না, দাদাকে শান্তিতে মর্ত্তে দেও। সন্তোষ, সরে এসে তোর বাপের সম্মুখে দাঁড়া, কাঁদিস্‌নে; কাঁদলে কি আর তোর বাবাকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌বো"?

অল্পক্ষণ পরেই মুমূর্ষের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সকলে শব দাহ করিতে শশ্মানে লইয়া গেল।

এক মাস পরে রামজয় বাবুর ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া-পদ্ধতি যথারীতি সম্পন্ন করিয়া সন্তোষ কলিকাতায় পড়িতে গেল। পিতৃব্য হরজয়বাবু, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রী সরলাকে নিয়া হুগলিতে বাস করিতে লাগিলেন। হরজয়বাবু একজন উকীল, কিন্তু উকালতীতে তাহার এত পসার ছিল না যাহাতে তিনি এই পরিবারটী একা প্রতিপালন করিতে পারেন। স্বর্গীয় ভ্রাতা পাটের কলের ম্যানেজার ছিলেন। অনেক টাকা রোজগার করিতেন, তাই তাঁদের সংসারটি স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া বিশেষ টাকা পয়সা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শ্রাদ্ধেই ব্যয় হইয়া গেল। হরজয় বাবু সন্তোষের পড়ার খরচ দিয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিলেন।

সন্তোষকে তাহার কাকাবাবু সর্ব্বদাই অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অনেকে কিন্তু ইহাকে বাহ্যিক লোক দেখান মনে করিত। কিন্তু রামজয় বাবুর মৃত্যুর পরেও যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না তখন সকলেই তাঁহার স্নেহের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিল। অতি কষ্টে সরলার বিবাহ দিয়া হরজয় বাবু চারিদিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃদত্ত পত্নীর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া সরলার বিবাহ দিয়াছেন। কিছু কিছু ঋণও হইয়াছে। এখন কিরূপ সন্তোষের পড়ার খরচ চালাইবেন তাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। এমন

সময় পরমেশ্বর তাঁহার মুখপানে তাকাইলেন। তিনি তাঁহার শ্যালকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানা পত্র পাইলেন যে তাহাদের গ্রামের জমিদার রাজকিশোর বাবু সন্তোষের সহিত তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ও ছেলে যতদিন পড়িতে চাহে তিনি ততদিন তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। সন্তোষ বি, এ পাশ করিলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই সংবাদে হরজয় বাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি জমিদার বাবুকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বিবাহে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তিন বৎসর পরে সন্তোষ বি, এ পাশ করিল। শুভ লগ্নে জমিদার কন্যা কমলার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের মুখ দেখিয়া সন্তোষের বিধবা মাতা অত্যন্ত সুখী হইলেন। বাস্তবিক কিন্তু কমলা রূপে ও গুণে যেন সাক্ষাৎ কমলাই ছিল। বিবাহের পর এম, এ পড়িবার জন্য সন্তোষ কলিকাতায় চলিয়া গেল।

জমিদার রাজকিশোরবাবু খুব দাম্ভিক ও অহঙ্কারী ছিলেন। তিনি মেয়েকে গরিবের ঘরে দিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এখন ভারী লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও এমন গরিবের গৃহে মেয়ে দিতেন না, কিন্তু তাঁহার পত্নী সন্তোষের রূপ গুণের কথা শুনিয়া এমনই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না; তাই এমন একটা গর্হিত কাজ করিয়া বসিলেন। এখন তাহার সমস্ত ক্রোধটা নিরীহ হরলালবাবুর উপরেই গিয়া পড়িল। তাই তিনি যখন বৌমাকে পাঠাইবার জন্য লিখিলেন, তখন রাজকিশোর বাবু বলিয়া পাঠাইলেন যে, গরিবের ঘরে তাহার মেয়ের থাকিতে কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি কমলাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে অসমর্থ। তিনি সন্তোষকে ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে পিতৃব্য অপেক্ষা সে তাহার নিকটই অধিক ঋণী। নির্ব্বোধ সন্তোষও সেই রকমই বুঝিল। শ্বশুরের উপদেশে মাতা পিতৃব্যের নিকট পত্র দেওয়া একরকম বন্ধ করিয়া ফেলিল।

'এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষের মার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। হরজয় বাবু সন্তোষের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন, কিন্তু শ্বশুরের প্ররোচনায় সে পিতৃব্যের সহিত দেখা করা উচিত মনে করিল না। মনের ক্ষোভে হরজয়বাবু বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষের ব্যবহারেব কথা শুনিয়া তাহার মার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল

মায়ের শুশ্রূষার জন্য সরলা শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল। যে সন্তোষ তাহাদের সকল দুঃখ মোচন করিবে বলিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল, সে সন্তোষ যে তাহাদিগকে এত দূর কষ্ট দিবে, সরলা ইহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাহার দাদা যে এতদূর অধঃপাতে যাইবে, তাহা সে কল্পনা করিতেই পারে নাই। মাতার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সরলা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইল। সে সন্তোষকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়া পাঠাইয়া দিল।

দাদা!

তুমি বিদ্বান্ হইয়া যে এইরূপ মূর্খের মত কাজ করিবে, তাহা কখনও ভাবি নাই। তোমার ধন, দৌলত, বিদ্যা, যশ, সুন্দরী পত্নী প্রভৃতি সকলই থাকিতে পারে, কিন্তু সেই জন্য যে তুমি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে ভুলিয়া যাইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই। বৌদিদির অসুবিধা হইবে বলিয়া তুমি তাহাকে এখানে আনিতে চাও না, তাই বলিয়া কি তোমার দুঃখিনী মাতাকে বৎসরে একটীবারও আসিয়া দেখিতে পার না? মা হইতে কি স্ত্রী এতই বড়? মায়ের এখন অন্তিম অবস্থা, বোধ হয় এখন না আসিলে এ জীবনে আর দেখা হইবে না। যাহা ভাল মনে কর, তাই করিও, এক স্ত্রী গেলে শত স্ত্রী পাইবে; মা গেলে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়া পাইবে না। তুমি ও বৌদিদি আমার প্রণাম লইও।　　　　সেবিকা

সরলা।

যথাসময়ে পত্র জমিদারবাটী পৌঁছিল। সন্তোষ সে দিন বাড়ীতে উপস্থিত না থাকায় পত্রখানা কমলার হাতে গিয়া পড়িল। বালিকা-সুলভ চপলতা বশতঃ কমলা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। জীবনে এক এক সময়ে এমন একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে, যাহাতে মনুষ্যের মন সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পত্র পড়িয়া কমলার মনে প্রথমে এই প্রশ্ন উদিত হইল যে, সে কি তাহার শ্বাশুড়ীর চরণ তলে বসিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না? তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এক মাত্র তাহার জন্যই তাহার শ্বাশুড়ী আজ রোগে মৃতপ্রায়। তখন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে রূপেই হউক শ্বাশুড়ীর সেবা তাহাকে করিতেই হইবে। সন্তোষ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে কমলা তাহার নিকট সমস্ত কথা বলিল। সব শুনিয়া সন্তোষের মনে কিরূপ একটা ভাব উপস্থিত হইল। সেও তখন বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সন্তোষের মার শরীর দিন দিন খারাপ হইয়া চলিল। পীড়ার বাহ্যিক লক্ষণ কিছুই নাই কেবল দুর্ব্বলতা মাত্র। ডাক্তারেরা বলিলেন, পীড়া মানসিক, সুতরাং ঔষধ সেবনে কোনও ফল হইবে না। দুর্ব্বলতার জন্য মধ্যে মধ্যে ফিট্ হইতে লাগিল।

সকলের মুখেই নিরাশায় একটা ব্যাকুল চিহ্ন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সরল হৃদয় হরজয়বাবু ও তাঁহার পত্নী রোগীর শয্যা-পার্শে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক ষোড়শী যুবতী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সকলের দৃষ্টি সেই রমণীর উপর পতিত হইল। সরলা অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল "বৌ-দি"। কমলা সকলকে প্রণাম করিয়া শাশুড়ির শয্যা পার্শ্বে গিয়া বসিল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই সন্তোষ নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কাকাবাবু ও কাকীমাকে প্রণাম করিয়াই বিছানায় গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বালকেরী ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

আজ তিন দিন পরে সন্তোষের মার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে। প্রথমে তিনি সন্তোষ ও কমলাকে চিনিতে পারেন নাই। একমাস পরে কমলার অক্লান্ত শুশ্রূষা ও যত্নে সন্তোষের মা রোগ মুক্ত হইলেন। ডাক্তারেরও বলিলেন যে, কমলা এইরূপ ভাবে শুশ্রূষা না করিলে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন হইত। চতুর্দ্দিকে কমলার প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল। হরজয়বাবুর সংসার আবার সুখের সংসার হইল।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চৌধুরী।

রূপের মোহ।

(লেখক শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ, এম, আর, এস্।)

(১)

নীরোদ কুমার কলিকাতার মেসে থাকিয়া বি, এ পড়েন। অবস্থা ভাল নয়। পিতা বহুদিন হইল স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, মাতা নিজের কিছু জমা জমি বিক্রয় করিয়া, ভবিষ্যতের আশায় পুত্রকে পড়াইতেছেন। পুত্রের

কিন্তু অবস্থার দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি এসেন্স, সাবান সুবাসিত তৈল ব্যবহার না করিয়া ছাড়েন না। বিধবা মাতা নিজে না খাইয়া, কত কষ্ট করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুত্রের খরচ যোগাইতেছেন, এদিকে ছেলে বাবুগিরি করিতেছেন। তিনি বি, এ পড়েন, এ সময়ে একটু বাবুগিরি প্রয়োজন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল নীরোদকুমারের বিবাহ হইয়াছে, নববধূকে ভাল ভাল ছবিওয়ালা ডাক কাগজ, পিয়ার্স সোপ, ইত্যাদি দিতে হইতেছে, বালিকা কিন্তু এসব বুঝে না, সে পত্রের উত্তরই দেয় না। নীরোদকুমার সেই জন্য এই অশিক্ষিতা স্ত্রীর উপর বড়ই অসন্তুষ্ট। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ভাবেই হউক, স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিতেই হইবে। যখন বি, এর পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসেন, তখন সেই স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির কথা মনে পড়ে। অতএব পড়ায় বড় উন্নতি হইতেছিল না। নীরোদকুমারের বিধবা মাতা মনে করিতেছেন যে, পুত্র উপযুক্ত হইলেই তাঁহার দুঃখ দূর হইবে।

নীরোদকুমার সাক্সপীয়র লইয়া বসিয়াছেন, নায়কের চরিত্র অতি মধুর, নীরোদকুমারের ঐরূপ নায়ক হইতে সাধ গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ মিরাণ্ডার চরিত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। নীরদকুমার সংস্কৃত কোর্স লইয়াছিলেন, অভিজ্ঞান শকুন্তলা খানা খুলিয়া বসিলেন, শকুন্তলার চরিত্র বড় মধুর বোধ হইল। শকুন্তলা শ্রেষ্ঠ কি মিরাণ্ডা শ্রেষ্ঠ? তিনি এই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে নবপরিণীতা বালিকা ভার্য্যার মুখখানি মনে হইল, আর পড়া হইল না, বই দুইখানি বন্ধ করিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কে আসিয়া ডাকিল--"নীরোদ !"

নীরোদের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন তাঁহার বন্ধু শচীন্দ্র কুমার রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। শচীন্দ্র বলিলেন,—"তাড়াতাড়ি এস,—শীগ্‌গির কাপড় নেও, আমার সঙ্গে যেতে হবে।" নীরদ বলিলেন,—"কোথায়? এত তাড়াতাড়ি কেন?" শচীন্দ্র বলিলেন.—"সে কথার কি দরকার, শীগ্‌গির নেবে এস।" নীরদ আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। একটি সার্ট ও চাদর লইয়া বাহির হইলেন।

(২)

নীরদকুমার শচীন্দ্রের সঙ্গে তাহার বাসায় গেলেন। শচীন্দ্র বড় লোকের ছেলে, নিজে বাসা করিয়া থাকেন। শচীন্দ্রের পিতা নরহরি মুখোপাধ্যায়

দিনাজপুরের একজন জমিদার। নীরদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গরীবের ছেলে, তথাপি শচীন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বড় বন্ধুত্ব। অদ্য শচীন্দ্রের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলে বাটী হইতে আসিয়াছেন, আহারের বিশেষ উদ্যোগ হইয়াছে, তাই শচীন্দ্র তাঁহাকে নিজবাসায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। নীরদ বড় সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল, তিনি গিয়াই শচীন্দ্রের পিতাকে প্রণাম করিলেন, শচীন্দ্র বলিল "ভাই, চল, মাকে প্রণাম কর্‌বে, আমি মাকে তোমার কথা বলেছি।" নীরোদকুমার বড়লাজুক, তথাপি বন্ধুর অনুরোধে বাটীর ভিতর গেলেন এবং শচীন্দ্রের মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শচীন্দ্র বলিলেন "মা' এই যে নীরদ এসেছে"। নীরদ তাঁকে প্রণাম করিলেন, মা আশীর্ব্বাদ করিয়া শচীন্দ্রকে বলিলেন "নীরদের জন্য খাবার নিয়ে আয়"। শচীন্দ্র ডাকিলেন "নীলিমা!" একটি কক্ষ হইতে উত্তর আসিল" কি দাদা!" শচীন্দ্র বলিলেন "একথালা খাবার নিয়ে আয়ত।" শচীন্দ্রের ছোট ভগিনী নীলিমা একখানি রৌপ্য রেকাবে কিছু খাবার সাজাইয়া ও একটি রৌপ্য গ্লাসে জল আনিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একটি অপরিচিত লোক তথায় বসিয়া আছে, সে লজ্জায় নতমুখে খাবার রাখিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিল। শচীন্দ্র বলিলেন "তোর আবার লজ্জা কি? এযে আমার বন্ধু নীরোদ, তোকে কতবার নীরদের কথা বলেছি। নীরদকেও দাদা বলে ডাকৃবি। নীরদের সম্মুখে খাবার রাখ্।" নীলিমা সলজ্জভাবে রেকাবখানা নীরদের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল, নীরদের বোধ হইল, যেন চাঁদ মেঘের অন্তরালে লুকাইল। এমন সুন্দরী তিনি কখনও দেখেন নাই। এক খানি নীলাম্বরী পরিধানে, গাত্রে বহুমূল্য অলঙ্কার। নীরোদ মস্তক হেট করিয়া অল্প অল্প আহার করিলেন। মাতা বলিলেন "বাবা, তুমি লজ্জা কর্‌বে কেন? শচীন্দ্রও যে, তুমিও সে, এতে আবার লজ্জার কথা কি! খাও ঐ রসগোল্লাটা খাও, ঐ কঁচুরি খানা খাও।" নীরদ কুমার আহার করিয়া শচীন্দ্রের হত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। নীলিমার সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে লাগিয়াই থাকিল। শচীন্দ্র বলিলেন, "ভাই, আমার এই একটি মাত্র ভগিনী, আমরা কুলীন, এখনও উহার বিবাহ হয় নাই। নীলিমা ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, নাচ, গান, সবই শিখেছে। সুন্দর হার্ম্মোনিয়ম্ বাজায়, তোমাকে একদিন ওর গান শুনাবো। নীরদ কুমার বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন।

(৩)

নীরদকুমার বাটী আসিয়াছেন! তাঁহার মা আজ বড় আনন্দিত, নানা-রূপ পিষ্টকাদির আয়োজন করিয়াছেন। সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, না। তিনি বড় বিরক্ত হইলেন, মনে মনে মাতার উপরেও অসন্তুষ্ট হইলেন। মাতা নিকটে বসিয়া আহার করাইলেন। রাত্রে আহারান্তে নিজ শয়নগৃহে গেলেন, তখনও শয্যা খালি। নীরদকুমার শয়ন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে নববধু চোরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যার নিকট আসিল। দেখিল স্বামী নিদ্রিত। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিল। নীরদকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী পায়ের নিকট বসিয়া আছে। তিনি তাহাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিলেন "কমলা, আমাকে একখানি পত্রও লেখ নাই কেন?" কমলা সরল ভাবে উত্তর করিল" আমার হাতের লেখা বড় খারাপ, লিখ্‌তে লজ্জা করে।" স্বামী বলিলেন "হাতের লেখা ভাল কর না কেন? আমি এবার খাতা, কলম, সব দিয়ে যাচ্ছি, ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌বে!" বালিকা বলিল "আমি সময় পাইনা, সংসারের কাজকর্ম্ম কর্‌তে হয়, মায়ের সেবা কর্‌তে হয়। তিনি এ বয়সে কোন কষ্ট না পান, তাহা আমার দেখ্‌তে হয়।" কমলা গৃহিণীর মত নলক দুলাইয়া এ সব কথা বলিতে লাগিল। নীরদকুমার এই সব কথায় বড় আমোদ বোধ করিলেন, তিনি মনে মনে বলিলেন "পাড়া গেঁয়ে স্ত্রীলোকগুলি জন্তুবিশেষ।" তিনি বলিলেন "কমলা, আমি পাশ কর্‌লেই একটা যা হয় চাকরী কর্‌বো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, তাতে তুমি সুখী হবে, আর এ দাসীগিরি কর্‌তে হবেনা।" বালিকাবধূ বলিল "তাকি হয়? মায়েব যে কষ্ট হবে?" নীরদ হাসিয়া বলিলেন "মায়ের আবার কি কষ্ট হবে? আমি মাস মাস টাকা পাঠাবো, তিনি একটা ঝি রেখে নেবেন।" বধুর কিন্তু একথা ভাল লাগিল না, সে মায়ের সেবা শুশ্রূষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাতেই আনন্দ বোধ করে। স্বামীর সহিত থাকিবে, ইহাও সুখের বিষয় বটে, কিন্তু শাশুড়ীকে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন চায় না। নীরদকুমার বলিলেন "যা হক, সে কথা পরে বুঝ্‌বো, আমি মাকে বুঝাবো। তুমিত আর চিরদিন দাসী হয়ে থাকৃতে এসোনি।" বধূ আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না।

(৪)

নীরদকুমার আবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। আসিয়াই শচীন্দ্রের বাড়ীতে দেখা করিতে গেলেন। এখন আর সে সঙ্কোচ ভাব নাই, যখন তখন তিনি অন্দরে যান, শচীন্দ্রের মাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন, যত্নের ত্রুটি নাই। প্রত্যহই জলখাবারের উদ্যোগ হয়। নীরদকুমারের সঙ্গে নীলিমার প্রত্যহই সাক্ষাৎ হয়। এখন নীলিমা আর লজ্জা করে না, জলখাবার আনিয়া দেয়, পান তৈয়ার করিয়া আনে, যত্ন করে।

নীরদের স্ত্রী তারাসুন্দরী এবার পত্র লিখিয়াছে, কিন্তু বড় সংক্ষেপ। নীরদের তৃপ্তি হয় না। তিনি মনে মনে স্ত্রীর উপর ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইতেছেন, এক দিন মনে হইল "আমি যদি নীলামাকে বিবাহ কর্‌তেম, তবে কত সুখী হ'তেম। ছুটো গান শুনেও প্রাণ শীতল হত।"

একদিন সন্ধ্যা বেলা শচীন্দ্রের বাড়ী গেলেন, বাহির হইতে হার্ম্মোনিয়মের স্বর শুনিতে পাইলেন, তার পর হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া সুমিষ্ট গান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তন্ময় হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন, কতকক্ষণ শুনিয়া বৈঠকখানা ঘরে গেলেন, নীলিমা গান করিতেছে। তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন।

গৃহে আর কেহই ছিল না, নীরদকুমার ভিতরে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। গান ক্ষান্ত হইল, নীলিমা পশ্চাত দিকে তাকাইয়া দেখিল, নীরদকুমার দাঁড়াইয়া আছে, সে তখন বড় লজ্জা বোধ করিল। নীরদকুমার বলিলেন "তোমার গান বড় মিষ্টি, আমি আত্মহারা হ'য়ে শুনছিলেম।" নীলিমা উঠিয়া দাড়াইল। নীরদকুমার দেখিলেন, কি সৌন্দর্য্য! কি অপ্সরানিন্দিত মূর্ত্তি! সেই সময় গ্যাসের আলোক জ্বালান হইল, নীলিমার রূপ উছলিয়া উঠিল। নীরদকুমার বলিলেন "নীলিমা, তুমি একটি রমণী রত্ন, যে এ রত্ন লাভ কর্‌বে সে কত সুখী।" একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, নীলিমা সে দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইল, তাহার মনে কি হইল কে জানে। নীরদকুমার বলিলেন "আমি তোমার দাদার বন্ধু, তোমাকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি সুখী হও, আমার মত অসুখী হ'য়ো না।" এবার নীলিমার কথা ফুটিল, সে ধীরে ধীরে বলিল "আপনি অসুখী কিসে?" নীরদ কুমার বলিলেন "সে কথা আর শুনে কি কর্‌বে? আমার দুঃখ আমার মনেই থাক্‌, আমি বিদায় হই, তোমার দাদাকে বলো, আমি এসেছিলেম, সাক্ষাৎ হ'ল না।" নীরদকুমার বাহির হইয়া গেলেন।

(৫)

এই ভাবে আরও কিছুদিন গত হইল, নীরদকুমার আর বাটী যান না। বাটী যাওয়ার জন্য মা চিঠি লিখিতেছেন। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তারা-সুন্দরী কত লিখিতেছে, নীরদকুমার উত্তর দেন যে পড়ার ক্ষতি হইবে, তিনি পড়ায় বড় ব্যস্ত। হঠাৎ পত্র আসাও বন্ধ হইল, মা যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফেরত আসিল, মালিক যে কোথায় স্থির হইল না। মা বড় ব্যস্ত হইলেন। একমাত্র পুত্র—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিলেন। তারাসুন্দরীও কান্নাকাটি করিয়া সঙ্গে এলেন। কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন, যে বাসায় নীরদকুমার ছিলেন সে বাসায় তিনি নাই, কোথায় যে গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। তখন মায়ের চক্ষে জল দেখা গেল, তিনি পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার একটি আত্মীয় ভবানীপুর থাকিতেন, সেই বাসায় উঠিলেন এবং নানারূপ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে শুনিলেন যে, শচীন্দ্রের সঙ্গে নীরদের বড় বন্ধুতা, তিনি শচীন্দ্রের বাসা বহু কষ্টে ঠিক করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন সে বাড়ীতে তালাবদ্ধ, একজন প্রতিবেশী বলিল যে, উহারা হাওয়াপরিবর্ত্তন জন্য পশ্চিমে গিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারি না। তখন মা নিরাশ্বাস হইয়া পুত্রবধূ সহ ফিরিয়া আসিলেন। মনে করিলেন তাঁহার ছোট ছেলে—হয় ত কুলী করিয়া চাবাগানে চালান দিয়াছে, নতুবা কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই দিন হইতেই তিনি শয্যাশায়ী হইলেন, বধূ বহু কষ্টে কিছু আহার করাইত। তারাসুন্দরী স্বামীর জন্য অস্থির ও চিন্তান্বিত হইল, তথাপি সে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিল না, শাশুড়ীর সেবাশুশ্রূষা যথেষ্ট করিতে লাগিল।

এক দিন ডাকপিয়ন একখানা পত্র আনিয়া দিল। তাহাতে এই লেখা আছে—

"আপনার পুত্র এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জে আছেন। বড় পীড়িত, একবার আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, পত্র পাঠ চলিয়া আসিবেন।" কোন নাম নাই, কিন্তু হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকের। তারাসুন্দরী পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইল। মা আর বিলম্ব করিলেন না। এত অসুখেও পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া ও গ্রামের এক জন আত্মীয়কে লইয়া এলাহাবাদে রওনা হইলেন।

(৬)

এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ ভরদ্বাজ আশ্রমের নিকট একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, সেই কুটীরে জীর্ণ কম্বলে নীরদকুমার শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। নিকটে একটি সন্ন্যাসিনী বসিয়া ঔষধ সেবন করাইতেছেন। নীরদকুমারের বসন্ত হইয়াছে, অপর লোক ভয়ে আর তথায় আসিতেছে না। নীরদ-কুমারের জীবনের আশা কম, তবে সন্ন্যাসিনীর যত্নে অনেক সুস্থ বোধ করিতেছেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "বাবা, নিশ্চয়ই তুমি আরোগ্য হবে, আমার এ ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ, তুমি কোন চিন্তা করো না।"

নীরদকুমারের চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল।

নীরদকুমার শচীন্দ্রের অনুরোধে তাহার পিতা মাতার সঙ্গে পশ্চিম যাত্রা করেন, শচীন্দ্র বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেশে যান। নীলিমাকে দেখার জন্যেই নীরদকুমার যাইতে স্বীকৃত হইলেন। শচীন্দ্র বলিলেন, "ভাই, আমি ত যেতে পার্‌বো না; বিশেষ কাজে দেশে যেতে হবে, তুমিও ত আমার ভাই, তুমি এই সঙ্গে যাও"। নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে এলাহাবাদে আসেন। তথায় নীরদকুমারের বসন্ত হয়।

শচীন্দ্রের পিতা বড় বিপদে পতিত হইলেন, এরূপ রোগীকে সঙ্গে রাখা চলে না, বিশেষ রেলে যাইতে দিবে না। তিনি সত্বর হরিদ্বার যাইবেন ও তথা হইতে অযোধ্যা হইয়া দেশে ফিরিবেন। তিনি নীলিমাকে নিকটে যাইতে নিষেধ করিলেন, নীলিমাও ভয়ে নীরদকুমারের কক্ষের নিকট গেল না। তখন নীরদকুমারকে হাসপাতালে রাখা স্থির হইল, ভরদ্বাজ আশ্রমের। কুটীরের সন্ন্যাসিনী তাঁহার সেবা-ভার গ্রহণ করিলেন, শচীন্দ্রের পিতা রক্ষা পাইলেন। তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "বাবু, আমার অর্থের আবশুক নাই? আমি সন্ন্যাসিনী—চিরদিন ভিখারিণী"। সেই রাত্রেই শচীন্দ্রের পিতা সপরিবারে হরিদ্বার রওনা হইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসিনী নিরোদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য হইলে তাঁহার কে কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার মাতাকে পত্র লিখিলেন। সন্ন্যাসিনীর ব্যবহারে নীরদকুমার অবাক হইলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "বাবা, আমার ত মৃত্যু ভয় নাই, আমি সন্ন্যাসিনী, আমার জন্য কে কাঁদ্‌বে?"

(৭)

নীরদকুমার আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। সন্ন্যাসিনী অনবরত শুশ্রূষা করিতেছেন। আজ নীরদকুমারের মাতার ও স্ত্রীর কথা মনে হইল। ইহারা ত তাঁহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না? পৃথিবী কি স্বার্থপর! এই সব কথা মনে হইতে লাগিল। একবার নীলিমার কথা মনে হইল, নীলিমা যাওয়ার সময় একবারও তাঁহাকে দেখিতে আসিল না। কি আশ্চর্য্য! নীলিমার এরূপ পীড়া হইলে তিনি ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন না? একবার মায়ের কথা মনে হইল, মাকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন, একখানি পত্রও লেখেন নাই। মায়ের মনঃকষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় সেই জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে এই শাস্তি দিলেন। তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন, সেই জন্য ঈশ্বর এ শাস্তি দিয়াছেন। তিনি নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন, তাঁহার অনুতাপ হইল।

একখানি গাড়ী আসিয়া গড়্ গড়্ করিয়া কুটীরের দ্বারে লাগিল। নীরদকুমার দ্বারের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন তাঁহার মা ও তারাসুন্দরী আসিয়াছেন। মা আসিয়াই মাথার নিকট বসিলেন, স্ত্রী পায়ের নিকট বসিল। সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন,—"মা, তোমার কৃপায় আমার ছেলে পেয়েছি, তুমি জগতের মাতা, তোমাকে আর কি ধন্যবাদ দিব?" সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের এই কার্য্য, সকলেই আমার পুত্র ও কন্যা, এখন তোমার ছেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বাড়ী যাও, আর ভয় নাই।" নীরদকুমারের চক্ষে জল দেখা গেল, তিনি হস্ত বাহির করিয়া মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তার পর গদ্গদস্বরে বলিলেন,—"মা, কুপুত্র অনেক পাপ করেছে, ক্ষমা কর, তোমার পদধূলি মাথায় পড়্‌লেই আমি সুস্থ হব"। স্ত্রীকে বলিলেন,—"তোমার নিকট আমি শতগুণে অপরাধী, এতদিন বুঝি নাই, আজ বুঝ্‌লেম। এখন থেকে আর কষ্ট দিব না, আমাকে ক্ষমা কর।" মা কাঁদিয়া পুত্রকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইলেন, তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু বহিল।

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১১)

"কেন এমন হয় বলত ?"

"কি করে বল্‌ব ভাই, আমি ত অনেক ভেবেও আজ পর্য্যন্ত কোন পথই খুজে পাচ্ছি না। মনকে কত করে বোঝাচ্ছি, কৈ কিছুতেই সেত বুঝ্‌ মান্‌তে চাইছে না। কতবার ভাবি, যা তাঁর ইচ্ছে করুন, সর্ব্বস্ব যাচ্ছে যাক, আমার তাতে কি ? আমি ত ভেসে যাচ্ছিলাম, তুলে নিয়ে যে পায়ে স্থান দিয়েছেন, তাই ঢের। আবার ভাবনা উল্টে যায়, মনে হয়, তাঁর ত আর কেউ নেই, মা নেই, বাপ নেই,—একটি বোন বা ভাইও নেই যে, ভাব্‌বে,—বল্‌বে। আমি যদি না দেখিত উপায়ওত নেই। ঐ শীর্ণ শরীর, ম্লান বিষণ্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি কল্লেই প্রাণ আশঙ্কায় আকুল হ'য়ে ওঠে, সংযম ভেঙ্গে যায়, আপনাকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না। কেবলই ভাবি, এত উচ্ছৃঙ্খল বলেইত দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছেন।" সরসীর কথার উত্তরে প্রিয়ম্বদা এই কথাকয়টি বলিয়া রুদ্ধ অশ্রুতে ব্যাকুল হইয়া বামহাতে সরসীর হাতখানা জড়াইয়া ধরিয়া বোকা মেয়েটির মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বৃক্ষের আশ্রয় না পাইয়া লতা যেমন ঘাতে-প্রতিঘাতে আপন সত্তাটা হারাইতে গিয়া সমীপবর্ত্তী কোন লতাকেই জড়াইয়া ধরে, আশ্রয়হীনা প্রিয়ম্বদাও সুখদুঃখ-সঙ্গিনী সরসীকে সম্মুখে পাইয়া তেমনই জড়াইয়া ধরিয়া বাপী-সোপানে বসিয়া তাহার ব্যথাভরা প্রাণের কথাগুলি খুলিয়া বলিতেছিল। বর্ষায় উচ্ছ্বসিত ঘননীল বাপীজল নিজের গর্ব্বে নিজেই ফুলিয়া ফুলিয়া কূল প্লাবিত করিয়া আপনার মধ্যে সোপানের শ্বেত-প্রস্তরগুলির প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিতেছিল। স্বচ্ছ জলটা থাকিয়া থাকিয়া বায়ুর মৃদুমন্দ আঘাতে হেলিয়া দুলিয়া আপন বক্ষটাকে তরঙ্গের ঈষৎ কম্পনে কাঁপাইয়া

শ্যামাঙ্গী-রমণীদ্বয়ের আল্‌তামাখা রাঙাপায়ের তলায় আছার খাইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আত্মাভিমানের জন্য যেন পরিহার মানিয়া লইতেছিল; আর স্বীয় পূর্ণ-যৌবনের নিকট ইষদতিক্রান্তযৌবনা যুবতীদ্বয়ের যৌবনের তেজকে খর্ব্ব করিতে গিয়া অবহেলার বক্র ইঙ্গিতে মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

সরসী নিজের বুকের উপর প্রিয়ম্বদার মাথাটি টানিয়া আনিয়া স্নেহ-পরিপূর্ণ স্বরে বলিল,—"কেন অত ভাব দিদি, মেয়েমানুষের কাজ, ওদের যত্ন-পরিচর্য্যা করা, যাতে সুখে থাকেন, তাই কর্‌বে। ললিতবাবু যখন ঐ রকমের রকমারি কাজ কর্ত্তে ভালবাসেন, তখন ওতে বাধা নেই বা দিলে। দেখ্‌তে ত পাচ্ছ, ঐ রকমের বাঁধা দিয়ে দিন দিন অনিষ্টই হচ্ছে, বরং উনি যা ভালবাসেন, তাই করে মনটা ফিরিয়ে নিতে পারত, আপন থেকেই সব সুধ্‌রে যাবে।"

"সে ত আমিও অনেকবার মনে করেছি ভাই, কিন্তু কেন জানি না, কাজের বেলা সব ভাব্‌নাই ঘুরে যায়। শুধু টাকা নিয়েই কথা হ'ত ত, ভেবে ছিলুম, আর কথাটি কৈব না, যাচ্ছে সর্ব্বস্ব যাক্‌, দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষা করেও ত দুটা পেট চল্‌বে! কিন্তু দিদি, শরীরের প্রতি যে মোটেই দৃষ্টি কর্‌বেন না, এত আমি প্রাণ ধরে সইতে পারি না। আমাকে অবজ্ঞা করেন, ঘৃণা করেন, করুন,—তা'বলে নিজের শরীরটা এমনি শেষ কচ্ছেন কেন বলত?" বলিয়া প্রিয়ম্বদা কাপড়ের আঁচলে উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিল। মুখে যাহাই বলুক, স্বামীর অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য যে দিন দিন বৃশ্চিকদংশনের তীক্ষ্ণ জ্বালায় তাহার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশকে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা সরসী স্ত্রী-হৃদয় লইয়া সহজেই বুঝিল, এবং সাবধানে প্রিয়ম্বদার চোক মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"ছিঃ দিদি, কাঁদ্‌ছ, কেঁদে কি হবে বলত? যে ভাবে যেমন করে এদ্দিন স্বামীর সেবা করে যাচ্ছিলে তাই কর। একদিন তাঁর স্বভাব ফির্‌বেই; তিনি সব বুঝ্‌বেন।"

বুক হইতে মুখ তুলিয়া প্রিয়ম্বদা হতাশার স্বরে বলিল,—"না দিদি, সে আশা আর আমার নেই। কদ্দিন কোথায় গেছেন, একটা সংবাদও যদি পাওয়া যেত ত এতটা ভাব্‌তে হত না। এমনই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাক্‌লে কি করে ঘরে থাকি বলত?"

বিস্মিতা সরসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় গেছেন, তাও বলে জাননি! তুমিও ত জিজ্ঞেস কর্ত্তে পার্ত্তে।"

"বলে আর কবে কোথায় যান, তাতে ত তাঁরও বড় দোষ নেই। যাঁর যাওয়ার স্থানের ঠিক থাকে না, সে বলেই বা যায় কি করে। আর জিজ্ঞেস কর্‌বার কথা যা বল্‌ছিলে, অতটাত আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে ওঠে না। কোথাও যে যাবেন, তা কি আর আমি জানি, যে জিজ্ঞেস কত্তে যাব।"

পুকুরের পরপারে ঠিক কুঞ্জটির মত লতাজালজড়িত একটা নলের ঝোপ হইতে সহসা একটা পেচক চীৎকারের স্বরে ডাকিয়া উঠিল। বর্ষার জলে ভাসা অলস পল্লী সে স্বরে সজাগ হইয়া কানায় কানায় প্লাবিত জল হইতে ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের মাটির ভিটাগুলি রক্ষা করিবার জন্য যেন ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বারআনা নিমজ্জিত শাখাবহুল বৃক্ষগুলি হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া জলটাকে একটু দূরে সরিয়া যাইবার জন্য মিনতি জানাইতেছিল, আর তাহাদের শাখাগুলির অগ্রভাগ ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রপল্লবের সহিত জলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিরপ্রস্থিত দুঃসহ গ্রীষ্মের দগ্ধ দাহটাকে লাঘব করিয়া লইতেছিল। শান্ত প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিয়া মাঝে মাঝে পাড়ার পান্‌সী নৌকাগুলি বাহকের হস্তচালিত বাহনীর আঘাতে ঠন্ ঠন্ শব্দ করিয়া সমস্ত পাড়াটাকে সতর্ক জাগ্রত করিয়া দিয়া একবার এদিক্ আবার ওদিক্ চলিয়া যাইতেছে। বেলা বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার স্নিগ্ধ নব রবিকর গাছের মাথা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া আসিয়া অলক্তকরাগরঞ্জিত রমণী-দ্বয়ের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া নিজের জন্য যেন ঐ গাঢ় রক্ত রাগটা মাগিয়া লইতেছিল। রৌদ্রস্পর্শে সহসা প্রবুদ্ধের মত তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল,—"ওঃ, বড্ড বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, চল ঘরে যাই।"

সরসী কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। ঝি বামীর মা ঝড়ের মত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল—বৌদি, তোমরা এখানে বসে বুঝি গপ্প কচ্ছ, দাদাবাবুর যে অসুখ করেছে।"

সরসী ও প্রিয়ম্বদা সত্বরপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহনের আকৃতিদর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। প্রিয়ম্বদার চোকের দুই কোণ উচ্ছ্বসিত আবেগের প্রবল আক্রমণে ভরিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে কান্না চাপিয়া রাখিয়া ললিতমোহন পায়ের গোড়ায় ঠিক কাটের পুতুলটির মত বসিয়া পড়িল।

সরসী বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি অসুখ করেছে আপনার ?"

ললিতমোহন সে কথায় লক্ষ্য না করিয়া প্রিয়ম্বদার বিষণ্ণ মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিল—"সরসী, মাথাটা একটু টিপে দাও ত, ওঃ বড্ড কামরাচ্ছে।"

প্রিয়ম্বদার নড়িবার শক্তি ছিল না, স্বামীর নেড়া মাথা, কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, মলিন মুখ, শ্রীহীন শীর্ণ শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার বাক্‌শক্তির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন অসার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আশঙ্কার প্রতিকূল আঘাতে থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, যদি কোন প্রকারে মাটীর ভিতর মিসিয়া যাইতে পারে ত, এ যাত্রা সে মান লইয়া পরিত্রাণ পায়। মনে মনে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মেয়ে বলে সীতাদেবীকে ত কোলে স্থান দিয়েছিলে, এ অভাগিনীর কি স্থান হয় না মা?"

সরসী ললিতমোহনের মাথায় হাত দিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বেশী কিছু অসুখ করেনি ত, ডাক্তার ডেকে পাঠাব?"

ললিতমোহন মৃদু হাসিয়া বলিল—"না সরসী, কিচ্ছু হয়নি, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। ক'দিন একটু জ্বর হচ্ছিল, তার ওপর আবার বড্ড খাটতে হয়েছে, তাই শরীরটা দুর্ব্বল ঠেক্‌ছে!"

জোক যেমন মানুষের পূর্ণ অনিচ্ছা ও যত্নকে অবহেলা করিয়া গায়ে লাগিয়া শরীরের রক্ত টানিয়া আনিয়া ঘায়ের মুখে দাঁড় করাইয়া দেয়, আর পথ পাইয়া রক্ত যেমন আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এই কথাটাও ঠিক সেইরূপ প্রিয়ম্বদার শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ বিরক্তির ভাবটা টানিয়া আনিয়া কথার মুখে দাঁড় করিয়া দিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার মুখ দিয়া আপন হইতে বাহির হইয়াপড়িল, "এমন কোন্ জমিদারিটাই লাটে উঠ্‌ছিল যে, জ্বর নিয়ে না খাট্‌লে চলে নি।" প্রিয়ম্বদা উত্তেজিত কণ্ঠে এ কথা বলিয়া ললিতমোহনের পা কোলে করিয়া আস্তে আস্তে তাহাতে হাত বুলাইয়া দিত লাগিল। ললিতমোহন দুঃখম্লান নয়নে একবার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের কটাক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"প্রিয়ম্বদা, যাও ত তুমি এখান থেকে।"

প্রিয়ম্বদার কথাটায় সরসীও কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, স্বামী যাহাই করুন, তাহার প্রাণের পীড়াজনক কোনও কথা যে স্ত্রীর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, তাহা যেন সে আজই এই প্রথম শুনিয়া ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইয়া

পড়িল। তবুও মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"দিদিত ঠিক বলেছেন, কেন আপনি এই শরীর নিয়ে খাটতে গেছিলেন ?"

ললিতমোহন কাতর-দৃষ্টিতে সরসীর প্রতি তাকাইয়া বলিল—"না সরসী, কাজ নেই আমার মাথা টিপে, আমি একাটিই বেশ থাকব। তোমরা তোমাদের কাজে যাও।"

প্রিয়ম্বদা স্বর নামাইয়া বলিল,—"ঐ এক কথা, যে এ সব বিষয়ে কথাটি কইবে, তাকেই দূরে থাকতে হবে!"

"এখান থেকে যাও বলছি, শুধুই আমায় বিরক্ত কর না প্রিয়ম্বদা ?" দৃঢ়স্বরে কথাকয়টি বলিয়া ললিতমোহন পাশ ফিরিয়া খোলা জানালায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অসারের মত পড়িয়া রহিল। সরসী বা প্রিয়ম্বদা নড়িলও না, যে যার কাজই করিতে লাগিল।

(১২)

"রাত কত হয়েছে বলতে পার প্রিয়ম্বদা ?"

ঘরের পাশে টাঙ্গান ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে প্রিয়ম্বদা বলিল,—"এই এগারটা বেজে গেল।"

"ওঃ এত রাত হয়েছে, তুমি এখনও বসে রয়েছ! আর সবাই ঘুমিয়েছে বোধ হয় ?"

প্রিয়ম্বদা তেমনই অস্পষ্টস্বরে বলিল,—"দিদি এখনও ঘুমোন নি ?"

সরসী বাহির হইতে ডাকিল, বলিল,—"দিদি খাবে এস।"

ঘাড় নাড়িয়া প্রিয়ম্বদা বলিল,—"তুমি খাওগে দিদি, আমি আজ আর খাব না, সেত বামুনঠাকুরকে বলে দিয়েছি।"

সরসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"তুমি না খাবেত আমিও খাব না, তা আজ আমি তোমায় ঠিকই বলে রাখছি।"

ললিতমোহন বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"এখনও তোমাদের খাওয়া হয় নি! যাও, খাও গে।"

প্রিয়ম্বদা নড়িল না। সরসী উত্তেজিত স্বরে বলিল—"দেখুন দেখি, এমনি না খেয়ে না ঘুমিয়ে কদ্দিন থাকবে। আজ তিন দিন আপনার এই একটুকু জ্বর হয়েছে, এর মধ্যে একটি দিন দুবেলা ভাত মুখে দিলে না। দুপুরে ধরে বেঁধে নিয়ে পিড়ীতে বসাই, একমুঠো মুখে দিয়ে উঠে পরে। বল্লে আবার বলে, 'আমার খেতে ইচ্ছাই যাচ্ছে না।' রাতে ঘুম নেই, ঠায় বসে আছে।"

বিস্মিত ললিতমোহন একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া বলিল—"বল কি ? আমার এমন কি হয়েছে যে, না খেয়ে না দেয়ে রয়েছ। দু'দিন একটু জ্বর হয়েছে বৈত নয়।" তার পর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া একটা দুঃখপূর্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"যাও প্রিয়ম্বদা, আমি বল্‌ছি খেয়ে এস ?"

প্রিয়ম্বদা চৌকী হইতে নামিয়া পড়িল, বলিল—"চল দিদি।" স্বামীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্নেহের আদেশ পতিপত্নীর হৃদয়বিনিময়ের শুভ শংসা সূচনা করিয়া দিয়া এতকাল পরে আজ যেন তাহার চির নীরস কঠিন হৃদয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একটা অমৃতময় প্রেমের ভাবপ্রবাহ ছুটাইয়া দিল, সে আদেশ পালন করিতে আজ প্রিয়ম্বদা একটা গাঢ় আনন্দ বোধ করিল। সে ত জীবনে স্বামীর নিকট হইতে এমন স্নেহের আদেশ আর একটি বারও শুনিতে পায় নাই।

* * * * * * *

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেলে সে শব্দে সহসা জাগিয়া উঠিয়া ললিতমোহন দেখিল, প্রিয়ম্বদা তাহার পা কোলে করিয়া তেমনি বসিয়া রহিয়াছে। ললিতমোহনের ব্যথিত সমবেদনাকাতর হৃদয়ের উপর সহসা একটা কৃতজ্ঞতা বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিল। এ কি, যাহাকে সে এক-দিনের জন্যও অবজ্ঞা ভিন্ন আদর করে নাই; অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর রোগে তাহার এ মনঃপ্রাণসমর্পিত পরিচর্য্যা সত্যই আজ তাহাকে ব্যাকুল বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিন তাহার একটু সামান্য জ্বর হইয়াছে, এই তিন দিনের মধ্যে সে যখনই অনুভব করিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে, প্রিয়ম্বদা ঠিক এক ভাবেই বসিয়া বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। মাছের আঘাতে পুকুরের জলগুলি যেমন লাফাইয়া ওঠে, প্রিয়ম্বদার এই সযত্নপরিচর্য্যার সুখের আঘাতে ললিতমোহনের হৃদয়ও সেইরূপ লাফাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। ললিতমোহন একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রিয়ম্বদাকে পায়ের তলা হইতে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল—"এবার ঘুমোও প্রিয়ম্বদা, আমি ত এখন বেশ ভাল আছি।"

প্রিয়ম্বদা শুইল না, আস্তে আস্তে ললিতমোহনের মাথার মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু অদ্যকার এই এত বড় আদরটা তাহার দুর্ব্বল হৃদয় সহ্য করিতে পারিতেছিল না, অনেক দিনের রুদ্ধ অশ্রু আজ এই অচিন্ত-

নীয় আদরের মৃদু আঘাতে চোক বাহিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল। ললিতমোহন আবারও প্রিয়ম্বদাকে টানিয়া আনিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা বুকের উপর রাখিয়া বলিল—"কেন এ হতভাগার জন্য এত কষ্ট বলত? আমি ত তোমার জন্য একটি দিনও কিছুই কত্তে পারিনি। যাকে দিয়ে সুখশোয়াস্তির কোনই আশা নেই, তার জন্য এত করে আর তাকে পাপে ডুবিও না।"

প্রিয়ম্বদা আর থাকিতে পারিল না। গণ্ড বহিয়া যে জলধারাটা পড়িতেছিল, তাহা কাপরের আচলে মুছিয়া ফেলিয়া অসংযত শ্লথ বচনে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমায় জ্বালা দিও না! ও গো, আমার বুকটা যে দিনরাতই জ্বলে যাচ্ছে।"

বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টিতে একটিবার চাহিয়া লইয়া ললিতমোহন উপায়হীনের মত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কল্লে তোমার এ জ্বালা জুড়ুবে প্রিয়ম্বদা?"

প্রিয়ম্বদা সে কথার উত্তর না করিয়া আস্তে আস্তে ললিতমোহনের বুকের উপর নিজের তপ্ত বুক রাখিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পড়িয়া রহিল। ললিতমোহনও প্রাণ ধরিয়া আজ আর এই অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ স্বতঃপ্রবৃত্ত শুভ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না, সেও পরিপূর্ণ আবেগে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া প্রিয়ম্বদাকে একেবারে বুকের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"বলত প্রিয়ম্বদা, কি কল্লে তোমায় সুখী কত্তে পারি।"

আদরের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে প্রিয়ম্বদার হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারে স্পন্দহীন হতচেতন হইয়া পড়িল। উষ্ণ অশ্রুর মৃদু আঘাতে দ্রুত কম্পিত ললিতমোহন প্রিয়ম্বদার সেই শ্রীহীন মুখেই আজ একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইল, তাহার শুষ্ক হৃদয় যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটা নূতনতা লাভ করিয়া হাত বাড়াইয়া জীবনে একটা শান্ত নবীন সুখের স্বাদ অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি ও সান্ত্বনাময় রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল!

* * * * * *

দিনতিনেক পরে ললিতমোহন যে দিন প্রথম অন্ন পথ্য করিল, সে দিন দুপুরেই সে জামা পড়িয়া নেড়া মাথায় উড়ানীর পাগড়ী বাঁধিয়া কোথায় যাইতেছিল। প্রিয়ম্বদা মিনতি করিয়া বলিল—"দেখ, আজকের দিনটি বেরিও না। কদ্দিন পরে আজ এই দুটি ভাত খেয়েছ, একটা দিন সবুর কর, তার পরে যা করবার থাকে কর।"

ললিতমোহন অপরাধীর মত সুর খাট করিয়া বলিল—"না গেলে যে নয় প্রিয়ম্বদা, তুমি ত জান না, রতন খুড়ো কি বিপদে পড়েছেন, আমি যে এ ক'দিন যেতে পারি নি, তাতেই হয়ত তার বিপদ্ কত বেড়ে যাচ্ছে।"

রতন খুড়ার নাম শুনিয়া প্রিয়ম্বদা কাঁপিয়া উঠিল—কাতর নয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ রতন খুড়ো, যিনি ডোবা ভরাবার মোকদ্দমায় তোমাকে জেলে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।"

"আজও সে কথাটা মনে করে রেখেছ প্রিয়ম্বদা! বড্ড কষ্টে পরেছেন তিনি, একটি মাত্র ছেলে, এই সে দিন আফিঙ্গ খেয়ে মরেছে। সে ত গেছে, পুলিশ থেকে তার ওপর প্রকাণ্ড দাবী এনেছে। এর বিশিষ্ট কারণ দেখাতে না পাল্লে তাঁকে বা জেলেই যেতে হয়। আমি ছিলুম, তাই সে দিন তাঁর রক্ষা। একটা লোক মরা ছুতে চাইলে না! আমায় আবার এরি জন্য মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়েছে। বেচারা ধনে প্রাণে মারা যাচ্ছেন।"

কাহিনীটা শুনিয়া প্রিয়ম্বদার হৃদয়েও একটু আঘাত লাগিল, সেও একটু দুঃখিত হইল, তবু কিন্তু সে তাহাদের পূর্ব্বের ব্যবহারের কথা ভুলিতে পারিল না। এক বছর পূর্ব্বে ললিতমোহন যখন ম্যালেরিয়ার উপদ্রব নিবারণের জন্য এই রতনবাবুদেরই গ্রামের ডোবাগুলি নিজব্যয়ে ভরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি ললিতের পেছনে লাগিয়া তাহাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, অবশেষে অনধিকার-প্রবেশের মামলা করিয়া ললিতমোহনকে জেলে পর্যন্ত দিতে চেষ্টা করেন। সে যাত্রা পয়সার জোরেই ললিতমোহন রক্ষা পাইয়াছে। আজ প্রিয়ম্বদার সে কথা মনে জাগিয়া উঠিতেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এমন লোকের উপকার করিতে গিয়াও যে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার নাই। ললিতমোহন আবার বলিল—"যাই আমি, তুমি আর বাধা দিও না।"

প্রিয়ম্বদা এবার পরিষ্কার ভাবে বলিল—"না যতটা করেছ, সেই যথেষ্ট, আর তোমার যেয়ে কাজ নেই।"

"বল কি, আমি না গেলে তাঁর কি হবে বুঝ্‌তে পাচ্ছ। এর ভাল কোন কারণত নেই, আমি যদি দারোগাকে অনুরোধ করে দিতে পারি,—"

উত্তেজিত স্বরে বাধা দিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"কি হবে না হবে সে আমি বুঝ্‌তেও চাইনি। তিনিও তা বোঝেন নি। বরং বৃথাই আমাদের সর্ব্বনাশ কত্তে যাচ্ছিলেন।"

"সে কথা আবার কেন, তিনি যদি একটা ভুলই করে থাকেন, মানুষের ত ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।"

প্রিয়ম্বদা যেন মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গিয়া এবার পূর্ব্বাপেক্ষাও রুষ্টস্বরে বলিল —"ভুল হয়ে থাকে ত হয়েছে। তোমারও ত প্রাণ বাঁচিয়ে কাজ কত্তে হবে।"

ললিতমোহনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। কোন্ দিন কে কি অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবে না, এমন কথা যে সে ভাবিতেই পারে না। তবু সে নতমুখেই বলিল—"তুমি ভেব না, আমি এখুনি আবার ফিরে আসব।" বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, প্রিয়ম্বদা একেবারে দোড় আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল —"না, তোমায় আজ আমি কিছুতেই যেতে দেব না।"

বিষণ্ণ ললিতমোহন আর একবার প্রিয়ম্বদার দিকে দৃষ্টি করিয়া কেবলই ভাবিতেছিল, প্রিয়ম্বদা আজ এত জোড় এত স্পষ্ট নির্ব্বন্ধতা কোথায় পাইল। সে প্রতিকার্য্যেই ললিতমোহনকে বাধা দিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা যেন কেমন পর পর—দাবীশূন্য, আজ ত আর তাহা নহে, এ যে ঠিক কর্ত্তাটির মত দাঁড়াইয়া হুকুম করিয়া যাইতেছে। তাহার সেই একদিনের এক মুহূর্ত্তের প্রাণের আদর-টুকু যে প্রিয়ম্বদাকে হিন্দুরমণীর পরম পবিত্র জিনিস স্ত্রীত্বের সারভাগ প্রদান করিয়া তাহাকে মহীয়সী শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে, সে যে একটিদিন বিন্দুমাত্র পতিপ্রেম লাভ করিয়া আপনাকে অমৃতময় করিয়া তুলিয়া এক মুহূর্ত্তে পতির শুভাশুভের একমাত্র অধিকারিণী হইয়া নিজের মধ্যে এতটা দাবীর অধিকার টানিয়া আনিয়াছে, ললিতমোহন তাহা বুঝিল না। সরসী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল—"যাচ্ছেন যান, তুমিই বা বাধা দিচ্ছ কেন?"

প্রিয়ম্বদা আর উত্তর করিতে পারিল না। ক'দিন পূর্ব্বের ললিত-মোহনের সেই কণামাত্র প্রাণের দান তাহাকে যে অপরিমিত সুখের আভাস দিয়া গিয়াছিল, আজ আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা আকাশকুসুমের মত অসম্ভব ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া ইলেক্‌ট্রিকের কলটা টিপিয়া দিলে উজ্জ্বল গৃহখানা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষাও নীবিড় গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ও তেমনি দ্বিগুণ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকারময় দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, সরসীর এ কি গুণ, সে সব কাজে বাধাও দেয়, তিরস্কারও করে, অথচ সময় বুঝিয়া এমন মন যোগাইয়া থাকিবার শক্তি তাহার আসে কোথা হইতে!

(১৩)

সঙ্গে লোকজন ছিল না। ভরা খালে ছোট্ট একখানা পান্‌সী নৌকা বাহিয়া ললিতমোহন ও নিখিলেশ কথায় কথায় পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল। খালের দুই ধারে জলে ডোবা পাড়ের উপর স্বভাবজাত লতা-গুল্মগুলি আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া কোনমতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। কোন কোনটা বা জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে, আবার কতগুলি শিকড়শুদ্ধ পচিয়া গিয়া রৌদ্রের তাপে শুষ্ক পাতাগুলি জলের মধ্যে উপহার সমর্পণ করিয়া নীরস ডাঁটামাত্র সার হইয়া মস্তকহীন অবস্থায় কবন্ধের মত পূর্ব্ব সজীবতার সাক্ষ্য দিতেছিল। মাঝে মাঝে বাঁশগাছগুলি আকাশের সহিত মিশিয়া পড়িবার জন্য তাহাদের দীর্ঘ দেহটাকে সটান দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেন নিস্তেজ হইয়া অসমর্থ অবস্থায় আকাশ ও স্বজাতিগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াই নোয়াইয়া পড়িয়া আপনাদের লজ্জিত মুখ জলের কোলে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে সিমূলগাছের দীর্ঘতায় অপমানাহত মাদারের কাঁটাপূর্ণ ডালগুলি ক্রোধভরে প্রসারিত হইয়া পড়িয়া পথিকের আয়াসের কারণ হইয়া রহিয়াছে। ললিতমোহন নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে একমনে এ দৃশ্য দেখিতেছিল, আর নিখিলেশকে পল্লীজননীর এই স্নিগ্ধ সুষমার কথা প্রাণ ভরিয়া খুলিয়া বলিয়া প্রাণের তৃপ্তি করিয়া লইতেছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় নৌকাখানা একটা কাঁটার ঝোপের মধ্যে গিয়া পড়িতেই নিখিলেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, —"এই বিদ্যে নিয়ে মাঝিগিরি ফলাতে এসেছ। আমি না তখন এত করে বল্লুম, একটা চাকর অন্ততঃ সঙ্গে নি।"

ললিতমোহনও ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"এতে এমন কি দোষ হ'ল রে, অনেক ভাল মাঝিদের নৌকও ত সময়ে এম্‌নি আট্‌কে যায়। আর চাকর নিয়ে আমি আস্‌তে চাইনে কেন জানিস, আমরা যাচ্ছি, স্ফূর্ত্তি কত্তে, তারা যাবে প্রভুর আজ্ঞাপালন কত্তে, তাতে যেন কেমন একটা অশান্তিই এসে পড়ে; আমি ভাই এরি জন্যে যে কাজ তাদের দিয়ে না করালেই নয়, তাই করিয়ে নি. নিজে পাল্লেত আর কাউকে কিছু বলি না। ওদের ওপর কষ্টের কোন কাজ চাপাতেও আমার যেন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়।"

নিখিলেশ মনে মনে ললিতমোহনকে প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে বলিল,—"থাক্, আর বক্তৃতা কত্তে হবে না। এখন ঝোপ থেকে নৌকটা বের করে নে দেখি।"

ততক্ষণে নৌকাখানা বিপরীত স্রোতের টানে আপনি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ললিতমোহন দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"দেখ্ত আমার মাঝি-গিরির কেমন গুণ, কইতে না কইতেই নৌকা বের করে ফেলেছি।"

"এমন লোকের জন্য ভগবান্ আপন থেকেই পথ করে দেন।" অস্ফুট-স্বরে এই কথা বলিয়াই নিখিলেশ চাহিয়া দেখিল, নৌকাখানা একেবারে বিলের পথে আসিয়া পড়িয়াছে, আর ললিতমোহন একদৃষ্টিতে সেই ভাদ্রের ভরা বর্ষার সান্ধ্য প্রকৃতির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে ধ্যানমগ্নের মত চাহিয়া রহিয়াছে। নিখিলেশ ডাকিল,—"ললিত ?"

প্রায় পনর মিনিট ললিতমোহন কথাটি বলিল না, তার পর হঠাৎ নিখিলেশকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল,—"একটিবার চেয়ে দেখ, ভগবান্ কি পূত সৌন্দর্য্য দিয়ে আমাদের এ দেশটিকে গড়েরেখেছেন।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নিখিলেশও প্রকৃতির সেই অনন্ত অফুরন্ত ললাম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, ললিতমোহনের স্বর তাহার কাণেও গেল না। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানা খাল ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

যে মাঠ গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নব নব স্নিগ্ধ শস্যসম্ভার বুকে করিয়া শ্যাম-সৌন্দর্য্যে মানুষের মন তৃপ্ত করিত, আশার পুলকে প্রাণ উল্লাসপূর্ণ করিয়া তুলিত, সেই সমস্ত মাঠটা আজ বর্ষার এই অলস সন্ধ্যায় সবুজ বর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ফেলিয়া মুখরা যুবতী যেমন হতাশপ্রণয়ীর প্রতি অপাঙ্গে বিলোল অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া ঠোট ফুলাইয়া হাসিয়া ওঠে, ঠিক তেমনি হাসিতেছে। তাহার সেই স্ফীতাধরের মৃদুমন্দ হাসিরেখা ভীষণ প্লাবনে নিমজ্জিত শস্যসম্ভারের দুঃখসংবাদ ঘোষণা করিয়া পল্লীবাসীদের হৃদয়ে একটা হতাশার অভিনব উন্মাদনার সমাবেশ করিয়া দিতেছিল। পল্লীমেখলা স্বচ্ছ জলগুলি বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া পরপুরুষসংস্পর্শে সতী রমণীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া কদাচিৎ কখনও লজ্জাসংবৃত যুবতিজনের সমুন্নত বক্ষঃস্থলের শোভা ধারণ করিয়া ভাসমান তৃণখণ্ডকে একবার নিম্নগামী ও আরবার উর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া মানুষের দশাবিপর্য্যয়ের কথা জানাইয়া দিতেছিল; আবার

থাকিয়া থাকিয়া তরঙ্গহীন অচঞ্চল জলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মস্তকহীন একটী ক্ষুদ্র সর্পের ন্যায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিল। খালের মোহনার সবুজবর্ণ জলগুলি নদীসমুত্থিত সাদাজলের সঙ্গে মিশিয়া পড়িয়া ক্ষণেকের জন্য যেন সগর্ব্বে গঙ্গা ও সরযূর পূত শোভার অনুকরণ করিয়া লইতেছিল। বহুদূরে বায়ুভরে স্পন্দমান শস্যসম্ভার মাথায় করিয়া আপন গর্ব্বে আপনি নত দু'একখানা সবুজ ধান্যক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল। লুব্ধ ভ্রমরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাগুলি আশার প্রবল টানে ধানের খাড়া সুঙের উপর বসিতে গিয়া বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে প্রণয়িনী-তাড়িত লম্পটের মত এ-পাশে ও-পাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহারই উপরে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। মাঠের পারে পারে অর্দ্ধনিমজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া আগমনীর জন্য শান্তশিষ্ট মূক ছেলেটির মত মা, মা বলিয়া অব্যক্ত ভাষায় বিশ্বজননীকে হাত বাড়াইয়া আহ্বান করিতেছিল। দিগন্তের কোলে সীমাহীন একটা কালরেখার মত দেখা যাইতেছে; দৃষ্টিশক্তির সমস্তটা নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ্চ বৃক্ষের নীচে নীচে পল্লীবাসীদের ক্ষুদ্র গৃহগুলি আনতমস্তকে নীরব ভাষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন আপন সজীবতা ঘোষণা করিতেছে। কদাচিৎ কোথায়ও শাপ্‌লা-ফুলের ফুটন্ত কোরকগুলি জলের আঘাতে মাথা নাড়িয়া মানিনীর মত অন্য-সংশক্ত বারিরাশিকে দূরে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমার পূর্ণজ্যোৎস্নার শ্বেতবাস পড়িয়া নিশা সতী যেন উপর হইতে এই ক্ষণ পূর্ব্বেই স্বচ্ছতার জন্য অহমিকাপূর্ণ সলিলগুলিকে উপহাস করিয়া নাচিতে নাচিতে ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার গায়ে চূর্ণ রজতকণা ছড়াইতেছিল, পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের পত্রপল্লব ভেদ করিয়া তাহাদের মস্তকে আপন স্নিগ্ধ কর ঢালিয়া দিয়া এই স্নিগ্ধ কররাশি মাতার মত কোমল হাত বুলাইয়া দিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগটা দীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। প্রকৃতির নিজহাতে গড়া এই অভিনব দৃশ্যদর্শনে ললিতমোহন একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল, ভাসাহীন ভাবরাশি তাহাকে প্রকৃতির পেলব অনন্ত সুষমার মধ্যে টানিয়া আনিয়া একটা উন্মত্ত ভাবনার মধ্যে লইয়া ফেলিল। উপরে শান্ত নীলাকাশ তাঁরার মালা পড়িয়া বিরাট স্তব্ধতায় আপন মনে আপনি বিভোর, নীচে স্বচ্ছবারিরাশিও অচঞ্চল স্থির, পরপারে পল্লী-জননী যেন তদপেক্ষাও স্থির, অচঞ্চল, সমস্ত মিলিয়া পৃথিবী-টাকে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত গম্ভীর, কামনারহিত করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা একটা মাছ লাফাইয়া উঠিয়া সশব্দে জলগুলিকে আলোড়িত করিয়া আবার জলের মধ্যেই ডুবিয়া গেল। সে শব্দে স্বপ্তোত্থিতের মত নিখিলেশ একমুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া ললিতমোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"হারে এম্নি কদ্দিন কাট্‌বে বলত।"

সহজ শান্তস্বরে ললিতমোহন বলিল,—"কিসের কথা বল্‌ছিলি ভাই?"

"এই তোদের ব্যবহারের কথা, একটি দিন শান্তি নেই, যা-তা নিয়ে কেবলই মন কষাকষি। এ ভাবেত মানুষ বাচ্‌তে পারে না।"

হতাশার দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন বলিল,—"তা আমিও জানি, জেনেও ত কিছু কত্তে পাচ্ছি না। আর এদ্দিনের অভিজ্ঞতায় আমি এখন বেশ বুঝেছি, দুজনার একজন না সরে পড়্‌লে শান্তি হ'বার আর যো নেই। ভগবান্ ত তারও কোন উপায় কচ্ছেন না। আমায় যদি সরিয়ে নিতেন ত, দুটা প্রাণই এ জ্বালা থেকে রক্ষা পেত।"

নিখিলেশ এবার ভারি বিরক্ত হইয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল,—"তোর ঐ এক কথা, যা কল্লে সব দিকে সুবিধে হবে, সুখশান্তিতে থাক্‌তে পার্‌বি, সে দিক্ দিয়ে যাবি না, যাতে কেবলই মানুষের মনে আঘাত লাগ্‌বে, তাই কর্‌বি।"

ললিতমোহন ধীরে ধীরে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল,—"বুঝ্‌তে না পেরে তোরা আমায় বৃথাই অনুযোগ করিস্, এ বড় দুঃখ।" বলিতে বলিতে দরবিগলিত হইয়া তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। নিখিলেশ মনে মনে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হইয়া ললিতমোহনের কাছে ঘেসিয়া আসিয়া গায়ের উপর ভর করিয়া বলিল,—"অন্যায় করেছি ভাই, মাপ কর, কিন্তু কি ক'রে যে তোদের এ দুঃখ যাবে, তাত ভেবে পাচ্ছি না।"

"অন্যায় তেমন কিছু করিস্ নি, আর তোরা যে আমার সুখের জন্যই বলিস্, তাও আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু আমি যে প্রাণপণে যত্ন কচ্ছি, কিসে কি কল্লে এ যাতনা থেকে উদ্ধার পেতে পারি,—তুইও এটা বুঝিস্ না, এ দুঃখ রাখ্‌বার ত আমার আর যায়গা নেই।"

নিখিলেশ কোন কথা বলিল না, নিজের হাঁটুর উপর ললিতমোহনের মাথাটা রাখিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ললিত-মোহন আবার বলিল,—"বুঝ্‌তে ত পাচ্ছিস্, এতে আমি কি কষ্টটা পাচ্ছি। এক একবার যখন বিদেশ থেকে নানা জ্বালা নিয়ে ফিরে আসি, পথে আস্‌তে

আস্‌তে কত আশা হয়। ভাবি এবার গিয়ে প্রিয়ম্বদাকে আর এক রকম দেখ্‌ব। তাকে বুকে রেখে হৃদয়ের দগ্ধ জ্বালা জুড়াব, কিন্তু ভাই, ঘরে এসে আমার সে আশা মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত পিপাসাকেই বাড়িয়ে তুলে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে দেয়। তবু হু'দিন একদিন মুখ বুজে কোনরকমে পড়ে থাকি, যে ভাবে হ'ক, অন্ততঃ ওকে ত কষ্ট দেব না। কিন্তু হু'দিনের জায়গায় তিন দিন হলেই আর মনকে ঠিক রাখ্‌তে পারি না। নানা কথায় সে বেকিয়ে বসে। জ্বালার উপর জ্বালা বেধে একটা প্রবল আগুন জ্বেলে দিয়ে দাবানলের মতই সম্মুখে যা পায়, তাকে দগ্ধ কত্তে চায়। তাতে ঘরে বসে আমরা ত জ্বলিই, বাইরে থেকে তোরাও তার তাপে শুকিয়ে উঠিস্।" এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ললিতমোহন আব একবার সেই দীপ্ত চন্দ্রালোকের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল,—"চল এবার বাড়ী যাই, রাত ত অনেক হয়ে গেল; সরসী আবার অনুযোগ কর্‌বে।"

(১৪)

সুবোধ ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ ছিল, যে প্রকৃতির মানুষ সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না, পরের ভালমন্দ সুখসুবিধার খোঁজ করে না, কেহ বুঝাইয়া না দিলে সংসারের ঘোরপ্যাচগুলি বড় বুঝিতে পারে না। আপনার সুখসুবিধার জন্য উন্মুখ থাকিয়া পরের সুখদুঃখ বা বিপদ্‌আপদে জড়াইতে গিয়া নিজেকে ব্যস্তবিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে মোটেই ইচ্ছা করে না। নিজের সুখটিই তাহার সর্ব্বতো ভাবে প্রয়োজনীয়। সামান্য কোন আঘাতেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অল্প অচিরস্থায়ী বুদ্ধি লইয়া লোকচরিত্রে তাহার আদৌ জ্ঞান ছিল না, থাকিবার প্রয়োজন সে কল্পনাও করিত না। বিশেষের মধ্যে দোষই বল, আর গুণই বল, নিজের পক্ষ হইয়া সুখ-সুবিধার অতি তুচ্ছ কোন প্রস্তাবও যে কেহ করিত, তাহার আজ্ঞা বা উপদেশ সে একেবারেই শিরোধার্য্য করিয়া লইত।

বাল্য হইতে সুবোধের সহিত ললিতমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশ, তাহার কারণটা দাঁড়াইয়াছিল এইরূপ,—সুবোধের পিতা যখন ঋণদায়ে সর্ব্বস্ব হারাইয়া শ্রান্ত অবসন্ন দেহে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন অনুকূল দৈব অতিশীঘ্রই তাঁহাকে মৃত্যুপথের যাত্রী করিয়া দিয়া নির্ব্বিঘ্ন করিল বটে, কিন্তু চিরশত্রুর মত এই দুঃস্থ পরিবারের প্রতি একবার একটা কটাক্ষও করিল না। পিতার

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইবে এমন একটি গাছতলাও সুবোধের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। উত্তমর্ণগণ করালকাল অপেক্ষাও কঠোর হইয়া ইহাদের বসতবাড়ীখানা পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া নিলাম করিয়া লইল। সুবোধের স্বামিশোকবিমূঢ়া বিধবা মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া যখন ভিখারিণীর মত পথে দাঁড়াইয়া চোখের জলে পৃথিবীটাকে অভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন অনুকূল ঘটনার চক্র ললিতমোহনের সহিত ইহাদের মিলন করাইয়া দিল। পরদুঃখ-কাতর ললিতমোহন বাল্য হইতেই বন্ধুভাবে এই দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপন হাতে লইল এবং যথাসাধ্য সুবোধের পড়ারও বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সুবোধের হৃদয় ললিতমোহনের এই উপকারে একেবারেই গলিয়া গেল, সে সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলি উপহার দিয়া ললিতমোহনের অনুগামী হইয়া রহিল। ঘটনার সঙ্ঘর্ষের অভাবে অবিশ্লিষ্টচরিত্র সুবোধের সম্বন্ধে বিশেষত্বটুকু ললিতমোহনের নিকট দুর্জ্জ্ঞেয় শত্রুহৃদয়ের অভিসন্ধির ন্যায় চাপা পড়িয়া রহিল। ললিতমোহন সুবোধকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিত, বন্ধুভাবে স্নেহ করিত; তাহারই জোরে লীলার যখন অন্য কোনও স্থানে বিবাহ সম্ভবই হইল না, তখন সুবোধের হাতে দিলে আর কোন প্রকারে না হউক, চরিত্রগুণে যে সুবোধ লীলাকে পত্নীর স্বভাবপ্রাপ্য ভালবাসা দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে, তাহাতে একান্ত বিশ্বস্ত হইয়া সুবোধকে ডাকিয়াই লীলাকে তাহার হাতে অর্পণ করিল। ললিতমোহনের কথাতেই হউক বা লীলার রূপ দেখিয়াই হউক, সুবোধও অবিচারিতভাবে লীলাকে গ্রহণ করিয়া নিজের সুখদুঃখ ও ধর্ম্মের সহচরী বলিয়া যতটা মনে না করিল, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি-পোষণের প্রকৃষ্ট উপাদান মনে করিয়া সে মনে মনে এ বিবাহে আনন্দিতই হইল।

বিবাহের অনতিকাল পরেই লীলার দুর্ভাগ্যদেবতা আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়া ললিতমোহনের অভ্যন্তরস্থিত গূঢ়ভাবে আবৃত হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বিকাশ করিয়া দিয়া লীলাকে ও ললিতমোহনকে কঠোর কষাঘাতে জীর্ণ জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

ঘরে ভাত না থাকিলেও কৌলীন্যমর্য্যাদার অপ্রতিহত প্রভাবে বিবাহের দিক্ দিয়া সুবোধের খাতিরযত্নের অভাব ত ছিলই না, বরং নানাস্থান হইতে আগ্রহটাই বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। ললিতার সহিত পূর্ব্ব হইতেই সুবোধের বিবাহের কথা চলিতেছিল, কিন্তু বিধির কূট

চক্র যখন লীলাকে আনিয়া তাহার ঘরের লক্ষ্মী করিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, তখন ললিতার মাতা বড় একটা আশায় হতাশ হইয়া তাহার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে গিয়া কল্পনা ও কূট-বুদ্ধির অপ্রতিহত সূক্ষ্মতত্ত্বালোচনার জোরে সহসা দ্বিগুণ উৎসাহে মাথা উচু করিয়া একেবারে সোজা দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ললিতার ধনগর্ব্বিতা বিধবা মাতার কন্যাদায়ে ব্যস্ত হইয়াও কৌলীন্যের প্রতি অমর্য্যাদা প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। তিনি তাঁহার সেই অপ্রতিহত কৌলীন্যাভিমানের জোরে বিবাহের অনতিকাল পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শিখাইয়া পড়াইয়া সুবোধের নিকট পাঠাইলেন। মাতার উপদেশ অনুসারে পুত্র আসিয়া ললিতমোহন ও লীলার নামে অযথা এমনই কতকগুলি কথা শুনাইয়া দিল যে, দৃঢ়তাহীন আত্মসুখপরায়ণ সুবোধও মুহূর্ত্ত মূঢ়ের মত নিরুত্তর হইয়া রহিল। তারপরে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না মশায় ?"

ললিতার ভ্রাতা অনিলকুমার একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—"আরে এই দেখ, তোমরা ছেলেছোকরার দল, লোকচরিত্রের কতটা বুঝ্‌বে ?"

কথাটা সন্ধিস্থানে গিয়া আঘাত করিল। লোকচরিত্রে যে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, সে কথাটা সুবোধ নিজেই এত বুঝিত যে, এ কথার পর তাহার বলিবার আর কিছুই রহিল না। তথাপি সে জোর করিয়াও আর একবার বলিল,—"যাই বলুন আপনি, ললিতবাবুকে ত কেউ কোনদিন এমন কথা বলে নি ?"

"ঐ ত তোমাদের বুঝ্‌বার ভুল, এটাই ধর না কেন, সত্যি যদি আমরা জান্তে না পেরে থাকিত, তোমাকে সে কথা বল্‌তে আসি। আমি ত বল্‌ছি, হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে তবে তোমায় স্বীকার করাব।"

সুবোধ তবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। মাতার কাছে শিক্ষিত অনিলকুমার ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"তা হ'লে বিশ্বাস কচ্ছ না আমার কথাটা। আচ্ছা একবার ফলই ভোগ কর। কি বল ? তা হলে এবার আমি উঠি।"

সুবোধ খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"যাবেন তার আর অত ব্যস্ত কেন, বসুন না আর দু'মিনিট।"

যাওয়ার সম্বন্ধে ব্যস্ততা অনিলকুমারের মোটেও ছিল না, দু'মিনিটের জায়গায় আর যে দু'ঘণ্টা তিনি বসিবেন, সেটা ঠিক করিয়া লইয়া পূর্ব্ব হইতেই বেশ জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। এবার প্রায় ঘণ্টাখানি ধরিয়া একথায় সে কথায় তিনি সুবোধকে যখন একেবারেই মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিলেন, তখন মাছ টোপ গিলিয়াছে বুঝিয়া টান দিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"তা হলে আমার কথাটায় রাজি আছ, কি বল?"

সুবোধ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"ললিতবাবু না হ'লে যে আমাদের একটি দিন চলে না।"

অনিলবাবু এবারও হাসিয়া বলিলেন,—"আরে সে কথা আমায় আবার নূতন করে কি বল্‌ছ। আমি ত সবই জানি, আর জেনেই তোমার কাছে এসেছি, আমার একটি মাত্র বোন, যখন তোমার হাতে তাকে দিচ্ছি, তখন তোমাদের সুখসুবিধের জন্য আর তোমায় ভাব্‌তে হবে না, এটা ঠিকই জেনে রেখ।"

এবার আর সুবোধ আপত্তি করিবার মত কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না। এই অতিবড় অপ্রত্যাসিত বন্ধুটির মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লীলা ও ললিতমোহনের কলুষিত চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু দ্বিধা তাহার ছিল, তাহা নিরাশ করিবার ভার ইঁহাদের হাতেই সমর্পণ করিয়া সে ললিতাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিল। বড়শিতে গাথা মাছটা তুলি তুলি করিয়া যদি কোন রকমে ছুটিয়া যায়, এই আশঙ্কায় অনিলকুমারও আর অবকাশের সময় না দিয়া সেদিনই সুবোধকে ধরিয়া লইয়া রওনা হইয়া পড়িলেন। নূতন শ্বশুর-বাড়ীতে সুবোধ ললিতাকে দেখিয়া লীলাকে ত্যাগ করিতে গিয়া যতটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইয়া মনে মনে তাহার দ্বিগুণ আনন্দের নূতন ছবি অঙ্কিত করিয়া লইল। লীলার তাপহীন তীক্ষ্ণতাবিরহিত শারদ রৌদ্রের ন্যায় শান্ত রূপের আলোকে পরাস্ত করিয়া ললিতার নিদাঘের দীপ্ত জ্বালাময় রূপের ফুটন্ত আভা সুবোধের চোখের উপর ঝলসিয়া উঠিয়া সেই পূত সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়া দিল। সুবোধ সেই দীপ্ত তেজে আপনার হৃদয়কে আলোকিত দেখিয়া হাস্যমুখে বিবাহের পর ললিতাকে সঙ্গে করিয়া একেবারে বাড়ী আসিয়া পা দিতেই তাহার মাতা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। ব্যাপারটার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"এ কি করে এলি রে।"

সুবোধ নতমস্তকে লজ্জিত ভাবে বলিল—"দেখ্‌তেই পাচ্ছ মা, আমায় আবার জিজ্ঞেস কচ্ছ কেন ?"

সুবোধের মাতা শিষ্টাচার ভুলিয়া গেলেন। নববিবাহিতা পুত্রবধূর অন্তরে আঘাত লাগিবে এ কথাটা তাঁহার মনেও হইল না। এবার তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও স্বর চড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এমন লক্ষ্মী-বৌ ঘরে থাক্‌তে তোকে এ মতি দিলে কে শুনি ?"

সুবোধ মনে মনে ভাবিল, একবার মাতাকে লক্ষ্মী-বৌর গুণগুলি প্রকাশ করিয়া বলে, আবার যেন তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। যাহা সে শ্যালক, তার পর শাশুরী ও নবোঢ়া পত্নীর নিকট ক্রমশঃ সালঙ্কারে সর্ব্বাবয়বে শুনিয়া নিশ্চিতভাবে স্থির বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল, আজ মাতার কাছে সেই ললিতমোহন সম্বন্ধে এমনই একটা জঘন্য কথা উচ্চারণ করিতে তাহার জিহ্বা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বলি বলি করিয়াও সে কথাটা বলিতে পারিল না, তাহার মাতা আবারও বলিলেন—"হারে এমন করে তুই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি, ঘরে এমন বৌ, আর যে তোকে প্রাণ দিয়েছে, তোর মাকে ভিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাকেই শাস্তি দিলি।"

এবার সুবোধ মাতার প্রতি একটু বিরক্ত হইল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার বাক্‌শক্তিটা তখনকার মত কে আকৃড়িয়া ধরিয়াছিল। এবারও তাহাকে নীরবে মাথা নীচু করিয়াই সাধের বিবাহটার ভালমন্দ বিচারে মগ্ন হইয়া থাকিতে হইল।

কোথায় বৌ-বরণ, পাল্কী হইতে ললিতাকে লইতে কেহ আসিল না। ললিতা হৃদয়ের মধ্যে ছট্‌ফট করিতেছিল। তাহার অসংযত বাক্ এক একবার যেন মুখের আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া থামিয়া যাইতেছিল। অভিমানিনী গর্ব্বিতা ললিতা এক একবার ভাবিতেছিল, সে তাহার শক্তিটা দেখাইয়া দিয়া এ আচরণের উপযুক্ত শিক্ষা এখনই দিয়া দেয়, আবার মাতৃপ্রদত্ত মন্ত্র যেন তাহাকে রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত নীরব রাখিয়া বলিয়া দিতেছিল, সপত্নীকে জয় করিয়া আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এখন কয়েকটা দিন তাহাকে সমস্তই ঘাড় পাতিয়া সহ্য করিয়া লইতে হইবে।

লীলা কিন্তু এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, ভাগ্যদেবতা যে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাতে এমনই একটা দারুণ অশনি ছুড়িয়া ফেলিবেন, তাহা

তাহার কল্পনারও অতীত। সে মনোযোগের সহিত কি একটা সূচের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ মাতাপুত্রের এই বাদপ্রতিবাদ শুনিয়া বারেণ্ডায় দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাণ্ডটা কি দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পর ইহাদের কথাবার্ত্তায় যতটা বুঝিতে পারিল, তাহাতে সমস্তটা বুঝিবার সামর্থ্য তাহার আর রহিল না, বিবাহের কথাটা শুনিয়াই বুকটা সশব্দে কাঁপিয়া উঠিল। লগুড়ের দারুণ অতর্কিত আঘাতে মানুষ যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়; জ্বালার সহিত সেইরূপ একটা বিস্ময়বিমিশ্রভাব তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে ক্ষণেকের তরে জ্বালাটাকে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কি মনে করিয়া একেবারে বাহির হইয়া পাল্কীর দোড়ে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে বড় ভগিনীর মত ললিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া নামাইতে গিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—"নেবে এস দিদি, চল ঘরে যাই।"

(ক্রমশঃ)

ঘরের লক্ষ্মী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

[লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল]

(১১)

পুত্রের গৃহ হইতে বিন্দুবাসিনী যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার প্রাণের ভিতরে আনন্দের তরঙ্গ আশার বাতাসে নৃত্য করিতেছিল। বিবাহের কথাটা পুত্রের নিকট পাড়িবার পর হইতেই কার্য্যটা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার যেন আর সবুর সহিতে ছিলনা। তিনি তখনই হরিচরণকে ডাকিয়া কথাটা শেষ করিতে চাহেন। তিনি যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পুত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। নীহারও বাউনদিদি তখন পর্য্যন্তও সেইখানেই বসিয়াছিল। বিন্দুবাসিনীর সহসা নীরবে অমন করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার কারণটা কি, এতক্ষণ ধরিয়া নানা সম্ভবঅসম্ভব কথা তুলিয়া তাহারই মীমাংসায় নিযুক্ত ছিল। বিন্দুবাসিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে

করিতে বাউনঠাকৃরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“যাও তো বাউন-ঠাকৃরুণ একবার শোভাদের বাড়ীতে,—শোভা কি প্রভা যাকে হয় বলে এস, ঠাকুরপো আফিস থেকে এলেই যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে।”

সহসা হরিচরণের এত জরুর তলবের কারণটা কি, বাউনঠাকৃরুণ বুঝিতে না পারিয়া বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন মা, কি দরকার ?”

উত্তরটা শুনিবার জন্য বাউনঠাকৃরুণ তাহার কানটা যেন একটু সজাগ করিয়া তুলিল। শোভার কথাটা সেই আসিয়া এখানে পাড়িয়াছিল, তাহার পর পুত্রের গৃহ হইতে ফিরিয়া বিন্দুবাসিনী যখন হরিচরণকে ডাকিয়া পাঠাইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধেই হরিচরণের সহিত কোন একটা কথা হইবে। কাজেই উত্তরটা শুনিবার জন্য বাউনঠাকৃরুণের আগ্রহটা কিছু অধিক পরিমাণে হওয়া একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিন্দুবাসিনী কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “শোভার সঙ্গে তোর দাদার বিয়ে দেব ভাব্‌ছি।”

বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে খেলা ধূলা করিয়া নীহার ও শোভার সখীত্ব সম্বন্ধটা রীতিমতই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর কথায় নীহারের প্রাণটা একেবারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গল্পগুজবের ভিতর ইঙ্গিত ইসারায় শোভার মনের ভাবটা নীহারের নিকট কিছুই গোপন ছিল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—“তাহ’লে বেশ হয় মা,—শুভি সত্যই দাদাকে বড় ভালবাসে।”

বিন্দুবাসিনী সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। বাউনঠাকৃরুণ কথাটা পাড়ায় রাষ্ট্র করিবার জন্য একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, “তা যদি হয় মা, তাহলে ভুল্লভবাবুর মুখের মত হবে, থেতো মুখ একেবারে ভোতা হয়ে যাবে। যেমন শুভির এ বাড়ী আসা বন্ধ করেছেন, তেমনি জব্দ হবেন।”

বামুনঠাকৃরুণের যেন আর তর সহিতে ছিল না, সে বিন্দুবাসিনীর উত্তরটা পর্য্যন্ত শুনিবারও অপেক্ষা রাখিল না। কথাটা শেষ করিয়াই বিন্দুবাসিনীর হুকুম তামিল করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিন্দুবাসিনী আবার রামায়ণ খুলিয়া বসিলেন।

রাত্রির অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। কলিকাতার ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য অট্টালিকাগুলির আলিসার উপর বায়সগণের সন্ধ্যা-সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। কাকা রবে সভাপতিকে সম্ভাষণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ বাসার অন্বেষণে ছুটিল। সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণছায়া মিলাইয়া গেল। নবোদিত শুক্ল পক্ষের তরুণ চাঁদের মৃদু মধুর আলোক চারিদিকে ফুটিয়া পড়িল। বিন্দুবাসিনী ছাদের উপর উৎকর্ণ ভাবে বসিয়া হরিচরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কথাটা হরিচরণের মুখে পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার যেন আর কোন কাজেই মন বসিতে ছিল না। আগ্রহের আতিশয্যে তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। একাকী চাঁদের দিকে চাহিয়া বিন্দুবাসিনীর কত কথা মনে উদয় হইতেছিল। সাদা পাতলা খণ্ডমেঘ একটার পর একটা আসিয়া চাঁদের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাতে চাঁদের মধুর হাসি মাঝে মাঝে যেন ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। বিন্দুবাসিনী ভাবিতে ছিলেন, ঠিক এই ভাবেই সংসারে অশ্রু ও হাসির ভিতর দিয়া এক দলের পর একদল আসিয়া অগ্রগামী দলের স্থান জুড়িয়া বসে,—তাহাদের কাজ শেষ হইলে আবার এক নূতন দলের অধিষ্ঠান হয়,—এইভাবে দলের পর দল, অনন্ত দল, অনন্ত কাল হইতে সংসারের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে,—তিনিও একদিন ঠিক এইরূপ ভাবেই দল বাঁধিয়া ছিলেন, তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; তাই আবার নূতন দলের অধিষ্ঠান হইবে। চিন্তার ভিতর দিয়া পুরাতন অনেক কথাই মনের দ্বারে আঘাত করিতে ছিল,—পুরাতন অনেক স্মৃতিই প্রাণের মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল,—আজ যেন সেগুলাকে ধুইয়া দিবার জন্য চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। এমন সময় নীহার আসিয়া সংবাদ দিল,—"মা কাকাবাবু এসেছেন? তাঁকে কি এখানে ডেকে আন্‌বো?"

কন্যার স্বর কর্ণে যাওয়ায় বিন্দুবাসিনী ফিরিলেন,—তিনি হরিচরণেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "চ—আমিই যাচ্ছি।" কথার সহিত বিন্দুবাসিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

হরিচরণ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া-ছিলেন। দুর্লভ মিত্রের কাশী যাইবার পর হইতে তাঁহার যেন লুপ্তশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কুভাবনাগুলাকে দূর করিয়া দিয়া, এক্ষণে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া সুভাবনা একেবারে রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বিন্দুবাসিনীকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ যেন একটু ব্যস্ততার ভাবে বলিলেন "এই যে বৌঠান্‌,—আমি আফিস্‌ থেকে আসতেই প্রভা খবর দিলে, বাউন্‌ঠাকুরুণ নাকি আমায় ডাক্‌তে গেছ্‌লো। না না গোলোযোগে একবার যে আসবো তারও ফুরশুধ করে উঠ্‌তে পারিনি ; সময় তো আর বেশী নেই,—বিয়ের সমস্ত খুটিনাটি এর ভেতরই জোগাড় করে ফেল্‌তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা হরিচরণ নীরব হইতেই তিনি যেন একটু মুস্কিলে পড়িলেন, কথাটা পাড়িবার মত কোন কথাই তাঁহার ঠোটের আগায় জোগাইল না। তিনি ভিতরে ভিতরে যেন একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন। নীহার জননীর সহিত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল,—সে কথা কহিয়া সে বিপদ হইতে তাঁহাকে যেন পরিত্রাণ করিল। নীহার হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ কাকাবাবু! শুভি আর আমাদের বাড়ী আসে না কেন?"

হরিচরণের মুখে একটা ম্লান হাসি ভাসিয়া উঠিল, ;—তিনি যেন একটু অসংলগ্ন ভাবে নীহারের প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"আসবে বইকি, তোদের বাড়ী না এসে কি আর সে থাকৃতে পারে। সে রোজই তোদের বাড়ী খবর নেয়।"

তাহার পর বিন্দুবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তবে কি জান বৌঠান্, বড়লোকে বড়লোকে একটু রেষারেষী হয়েই থাকে,—তার ওপর যদি তাদের বাস এক জায়গায় হয়। দুর্লভবাবুর সঙ্গে তোমাদের তো আর কোনদিনই সদ্ভাব নাই। শুভি দুদিন বাদে সেই দুর্লভবাবুর বৌ হবে,—কাজেই তোমাদের বাড়ী তার আসা নিষেধ করেছেন। এ অবস্থায় আর কেমন করে আসে বল! সে তো তোমাদের বাড়ী আসবার জন্য দিন রাত ছট্‌ফট্ করছে।"

বিন্দুবাসিনীর হৃদয়ের ভিতরে যে মাতৃত্বের স্নেহরস শোভারজন্য লুক্কাইত ভাবে সঞ্চিত হইয়াছে,—হরিচরণের কথায় তাহা যেন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত একটীও কথা কহেন নাই, কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। একেবারেই আসল কথা পাড়িলেন, অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঠাকুর পো, তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেম শোন। তোমাকে আমার একটী কথা রাখ্‌তেই হবে।"

হরিচরণ বিন্দুবাসিনীকে আর কথা কহিতে দিলেন না,—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"বৌঠান্, অঘোরদার উপকার গুলো কি এরই মধ্যে ভোলা যায়। তোমার কথা রাখ্‌বো না তো কার কথা রাখ্‌বো! সে কথা যতই শক্ত হক্, আমি নিশ্চয়ই সম্পন্ন করবো তা'আর বল্‌তে হবে।"

বিন্দুবাসিনীরও এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, হরিচরণ যে তাঁহার কথা কিছুতেই ঠেলিতে পারিবেন না, তাহা তিনি একরূপ নিশ্চয়ই জানিতেন। হরিচরণ চুপ করিলে পর তিনি আবার মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন,—"তা জানি ঠাকুর পো,—তোমার উপর জোর চলে বলেই যখন তখন ডেকে পাঠাই। তা আমি কি স্থির করেছি শোন ঠাকুর পো,—আমি শোভার সঙ্গে প্রফুল্লের বিয়ে দেব ভাব্‌ছি। শোভা যে আর আমার বাড়ী আস্‌তে পারবে না, তা হতেই পারে না। তারই একটা ব্যবস্থা করবার জন্যই আজ আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

নিশীথরাত্রে সহসা ভূমিকম্পে লোক সুপ্তির কোল হইতে যে ভাবে জাগিয়া উঠে, হরিচরণও ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যাহা তিনি কোন দিন কল্পনাও করেন নাই,—যাহা ভাবিতেও তাঁহার সাহস নাই,—যাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সেই কথাটা বিন্দুবাসিনীর মুখ হইতে বাহির হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, প্রথম বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়া গেলে, তাঁহার মুখ হইতে যেন একটা মহা আকুল আগ্রহে বাহির হইল, কি বলছ, বৌঠান্! শোভার সঙ্গে প্রফুল্লনাথের বিয়ে দিবে !"

হরিচরণের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বিন্দুবাসিনী একটু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। হরিচরণের এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ কি,—তবে কি প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে তাহার কোন আপত্তি আছে! বিন্দুবাসিনী অতি গাঢ়স্বরে হরিচরণের কথার উত্তর দিলেন,—"ঠাকুর-পো, যদি তোমার আপত্তি থাকে,—আমি তোমায় জোর কর্ত্তে চাইনি। আমার ছেলে—ঠিক আমি বল্‌তে পারিনে, তবে আমার খুব বিশ্বাস, দুর্লভবাবুর ছেলের চেয়ে প্রফুল্ল খারাপ নয়!"

জননীর মুখে পুত্রের প্রশংসা যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সেই কথাটা স্নিগ্ধ গভীর স্নেহরসে সমস্ত প্রাণটীকে একেবারে আলোড়িত করিয়া দেয়। তখন জননীর প্রাণ হর্ষে,—গর্ব্বে যেন এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। বিন্দুবাসিনীরও তাহাই হইল। তিনি নীরব হইলেন। প্রথম বিস্ময়ের ধমকটায় হরিচরণ লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"না বৌঠান্, সে কথা আমি বলিনি। প্রফুল্লনাথ যে কত ভালো ছেলে, তার গুণ যে কত, তা আর আমার জান্‌তে কিছু বাকি নেই। তবে—"

বিন্দুবাসিনী ভয়ঙ্কর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তিনি হরিচরণকে বাধা দিয়া একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে! তবে তোমার আর আপত্তি কি ঠাকুর-পো!"

কথাটার উত্তর দিতে হরিচরণের মুখটা একেবারে সাদা হইয়া গেল,—তিনি হেটমুণ্ডে জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপত্তি! প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিয়ে হবে, এর চেয়ে আর সুখের কি হতে পারে! বৌঠান, কথাটা যদি আর পনের দিন আগে বল্‌তে,—আমি যে এখন দুর্লভবাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি। বুড়ো বয়সে কথার খেলাপ কর্ব্বো।"

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৪র্থ বর্ষ, } ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৩ { ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অতীতের স্মৃতি।

(শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী)

১

যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আমার হাতে কোনও জরুরী কেস্ না থাকায় একপ্রকার চুপ করিয়াই বসিয়াছিলাম। বেলা তখন বারটা। বৈঠকখানা হইতে একটু দূরে একটা রাস্তা। দেখিলাম রাস্তার একপার্শ্বে একটা ঝাউগাছে অঙ্গ হেলাইয়া এক বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া যেন শ্রান্তি দূর করিতেছে। বৃদ্ধের পরিধেয় বসন ছিন্ন ও মলিন, শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, আমি এল্ এম্ এস্ উপাধিধারী ডাক্তার—নূতন। তেমন পসার না জমিলেও যাহা উপার্জ্জন করিতেছি, তাহাতেই বেশ স্বচ্ছল ভাবেই সংসার চালাইতেছি। কিন্তু আমারই পিতা, ঐ বৃদ্ধ ভিখারীর মত একদিন একমুষ্টি অন্ন, লোকের দোরে দোরে ঘুরেও মিলাতে পারেন নাই। স্নেহময়ী জননী আমার, আধ-পেটা খেয়ে কতদিন না কাটাইয়াছেন।

সব কথা একে একে আমার মনে পড়িল, একখানি সংবাদপত্র হাতে ছিল, তাহাতেও আর মনোনিবেশ হইল না। মনে কেমন একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে একটা ছাতা মাথায় দিয়া সেই বৃদ্ধের নিকটস্থ হইলাম।

বৃদ্ধ সেই ঝাউগাছটীতে আপনার কঙ্কালসার দেহভার যেন এলাইয়া দিয়াছে। তাহার দুই চক্ষুতে দরদরধারে জলধারা পড়িতেছে। একি?—বৃদ্ধ এমন করিয়া কাঁদে কেন? দ্বিপ্রহর অতীত, হয়ত এখনও ওর পেটে

জলবিন্দু পড়েনি। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কি কাঁদিতেছে ? হইতেও পারে। এ সংসারে ক্ষুধার তাড়না কেউ সহ্য করতে পারে না। ক্ষুধার অসহ্য যাতনায় ভাল মানুষও পাগল হয়। অন্যমনস্কভাবে এইরূপ কত কি ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরে বৃদ্ধ একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরনয়নে আমার মুখপানে চাহিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"এমন করে কাঁদ্‌ছেন কেন ? আপনার নিবাস কোথায় ? বৃদ্ধ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"গলায় পৈতা দেখ্‌ছি,—মহাশয় কি ব্রাহ্মণ ?"

বৃদ্ধ—হাঁ বাবু! ব্রাহ্মণবংশেই আমার জন্ম। তা দীন ভিক্ষুকের আর জাতীয় গৌরব কি আছে বাবু!

আমি—মহাশয়! যদি কোনও বাধা না থাকে, তা হ'লে আতিথ্য স্বীকার করূলে বড়ই সুখী হ'তেম। আমিও ব্রাহ্মণ।

বৃদ্ধের বদন ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইল। সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আমি তাহার হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেলাম। স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসিলাম। এবং একখানি নূতন সাদা পেড়ে ধুতি পরিতে দিলাম। সামান্য একখানি নূতন কাপড় পরিয়া বৃদ্ধ আমাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলা বাহুল্য, একজন ব্রাহ্মণ অতিথি পাইয়া আমার পত্নী অনুপমার আনন্দের সীমা ছিল না।

(২)

এইখানে আমার অতীত জীবনের আভাস দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার বয়স তখন সবে বার বছর,—আমার কনিষ্ঠা মিনিও তখন নিতান্ত শিশু। দুর্ভিক্ষ—দেশময় হাহাকার। জননীদেবীর মুখে শুনিয়াছিলাম, আমাদের নাকি অনেক ধানের জমি ছিল, প্রতি বৎসর যে ধান পাওয়া যাইত, তাহাতেই সারাটী বৎছর বেশ চলিয়া যাইত। যে বৎসরের কথা বলিতেছি; সে বৎসর মাটীতে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল না। কৃষকেরা জলাভাবে ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করিতে পারিল না। আবার আষাঢ়ের বিপুল প্লাবনে মরুভূমির ন্যায় সেই ধূ ধূ প্রান্তর ভাসাইয়া লইয়া গেল। বর্ষার বেগ এতই প্রবল যে, অনেকের ঘর দোর ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া

গেল। আমাদের বাড়ীখানি কতকটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত ছিল। তাই বাড়ীখানি অনেক কষ্টে রক্ষা পাইল। কিন্তু ঘরে একমুঠা চাল ছিল না। বাবা কত লোকের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছু কিছু চাল আনিতেন। তাহাতেও সকলের সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। তাও আবার সবদিন মিলিত না। কোনও কোনও দিন আমাদিগকে খাওয়াইয়া নিজেরা অনাহারে থাকিতেন। আবার হয়ত কোনও কোনও দিন সকলকেই না খাইয়া থাকিতে হইত। আমি যদিও তখন ছেলেমানুষ, ততটা বুঝিতেও পারিতাম না, কিন্তু বাবা মার কান্নাকাটী দেখিয়া একটা যে কিছু হইয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিতাম। ক্ষুধা পাইলে যখন একবার চাহিয়া আর পাইতাম না,—তখন বেশী আবদার না করিয়া চুপ করিয়াই থাকিতাম। কিন্তু মিনি নিতান্তই ছেলেমানুষ, সে তা বুঝিত না। খিদে পেলেই "বড় খিদে পেয়েছে মা! খেতে দে মা" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিত, তাহার কান্না দেখিয়া মা মাটীতে মাথা খুঁড়িয়া রোদন করিতেন, বাবাও চোখের জলে বুক ভাসাইতেন। বাবা মার কান্না দেখিয়া আমিও বসিয়া বসিয়া কত কাঁদিতাম। কোনওদিন অর্দ্ধাসনে কোনওদিন বা অনশনে—কয়দিন কোনও-রূপে কাটিয়া গেল,—কিন্তু আর চলে না, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সে জ্বালায় ভাল মানুষও পাগল হয়। নিজের জন্য হোক না হোক আমাদের দুইটী ভাইবোনের জন্য ভেবে ভেবে বাবা মা যেন সত্য সত্যই পাগল হলেন। কিন্তু অন্নকষ্টরূপ ভীষণ ব্যাধির কি প্রতিকার আছে? নাই কেন?—আছে। সে প্রতীকারে কয়টা লোক যত্নবান্ হয়? যে হয় সে বুঝি মানুষ নয়? সে সত্য সত্যই দেবতা, তেমন লোক এ সংসারে কয়জন? বিশেষতঃ যাহার ভাগ্য মন্দ, তাহার কোন দিকেই সুবিধা হইয়া উঠে না। সত্য সত্যই তাহাকে 'হীরের দরে জীরে কিনিতে' হয়। বড় দুঃখেই চারটা মাস কাটিল, কিন্তু তবুও দুর্ভিক্ষের বিশ্বগ্রাস দানবমূর্ত্তি সংযত হইল না।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে সোনার গাঁ নামে একটী গ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার সুখেন্দুবাবু বড় দয়ালু লোক। বাবা কত বড় লোকের কাছেই যাইতেন, কিন্তু ভিখারীর মত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। শেষে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় সুখেন্দু বাবুর কাছে গেলেন। যাঁর কাছে কোনও প্রার্থী নিরাশ হয়ে ফির্‌তো না, অদৃষ্টদোষে তাঁহার সাক্ষাতই পাইলেন

না। আমাদের মত গরীবের কথা বড়লোকের কানে খুব অল্পই উঠে—সেইদিন আমার ছোটবোন মিনির বড় জ্বর হইয়াছিল। বড়ই বেশী জ্বর; জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছিল, সন্ধ্যার পরে বাবা সুধেন্দুবাবুর কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিলেন। মিনির এইপ্রকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কি হইতেছিল, অন্তর্য্যামী জানেন। মা চিকিৎসক ডাকিবার জন্য বড় জিদ্ করিতে লাগিলেন, ঘরে একটী পয়সা ছিল না, কেমন করিয়া বাবা চিকিৎসক ডাকিবেন? দারুণ দুশ্চিন্তায় নিশ্চেষ্টভাবে তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঐ সব বিষয় লইয়া মায়ের সঙ্গে তাঁর কি একটু খচসা হয়, আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ধৈর্য্য ধরিবার,—সহ্য করিবার শক্তি তাঁহার হৃদয়ে বুঝি আর ছিল না। নৈরাশ অভিমানে সেই রাত্রেই বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন। কে জানিত যে সেই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা,—কে জানিত আর তিনি গৃহে ফিরিবেন না। মা কত পায়ে ধরিয়া কাঁদিলেন। আমিও নাকি শিশুর ভাষায় কত কি বলিয়াছিলাম, কিন্তু আর তিনি কারুরই কথা শুনিলেন না। কারুরই মুখ চাহিলেন না। নানাকারণে এই সময়ে তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা বোধহয় বড় ভাল ছিল না।

আমাদের দুটী ভাই বোন্‌কে লইয়া মা যে কি বিপদে পড়িলেন বলা যায় না। এই দারুণ দুঃসময়ে বোধ হয় বিধাতা আমাদের সহায় হইলেন। তাহা না হইলে আমরা যে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, তাহার স্থিরতা ছিল না। তাহার পর দিবস বৈকালে সুধেন্দুবাবু স্বয়ং পদব্রজে আমাদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। বোধ হয় কাহারও মুখে আমাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়াছিলেন। আর লজ্জা করিলে চলিবে না বুঝিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কান্নাকাটী করিয়া মা সমস্ত অবস্থা তাঁহার নিকটে বিবৃত করিলেন। সেই অবধি আমাদের দুঃখ কষ্টের অনেকটা অবসান হইল। অন্ততঃ পেটের জ্বালাটা ঘুচিল। দয়াবান্ জমীদারবাবু আমাদের সকলেরই প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি আমরা তাঁহার আশ্রয়েই বাস করিতে লাগিলাম। এমন কি আমার শিক্ষারও একটা সুবন্দোবস্ত হইল। তাঁহারই সাহায্যে আমি সোণার গাঁয়ের এণ্ট্রান্সস্কুলে লেখাপড়া করিতে লাগিলাম। আমি মনোযোগ দিয়া পড়া শুনা করিতাম বলিয়া একদিন সুধেন্দু বাবু আমার জননীকে বলিয়াছিলেন, মা তোমার এই ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে

বিদ্বান্ হইবে। কতদিনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পিতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ সুধেন্দুবাবুরই সাহায্যে তাঁহার পুত্রের সহিত কলিকাতায় পড়িতে গেলাম, বলা বাহুল্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হওয়ায় মিনি অল্পদিনেই আরোগ্য করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সুধেন্দুবাবুর পুত্র আমার সমপাঠী। সে আমাকে ঠিক বড় ভাইয়ের মত ভয় ও ভক্তি করিত এবং দাদা বলিয়া ডাকিত। উভয়েই একসঙ্গে পরীক্ষা দিলাম ও পাস করিলাম। যথাসময়ে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া এল, এম, এস উপাধি লইয়া সুধেন্দুবাবুর আলয়ে ফিরিলাম। সে বৎসর পূজায় আরও বেশী ধুমধাম হইল। জোড়া মহিষ বলি হইল; দেবীসমক্ষে আরও কত কি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইল। সেই একটী দিন মায়ের আমার মলিন মুখে একটু হাসি দেখিলাম। ভগবানের লীলা অপূর্ব্ব। যাহা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, তাহাই হইল। পূজা শেষ হইল। একটী শুভদিন দেখিয়া সেই দিনে আমার কনিষ্ঠা মিনি শ্রীমতী সুকুমারী দেবীর সহিত সুধেন্দুবাবু তাহার একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। আমি দরিদ্র আশ্রয়হীন। বলা বাহুল্য, এ বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। তখন মিনির বোধ হয় বয়স বার বছরের বেশী হইবে না। এর চেয়ে আরও বিস্ময়জনক ব্যাপার, এই গৃহশূন্য আশ্রয়শূন্য দীন ভিখারীর সহিত আর একটী শুভদিনে তাঁহার একমাত্র কন্যা অনুপমার বিবাহ দিলেন। কিন্তু মায়ের আমার চক্ষে সর্ব্বদাই জল, যখন তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু নীরবে দড়াইয়া পড়িল। শুভদিনে চক্ষের জল নাকি অমঙ্গলের নিদান। মাকে আমার কত জনেই কত কি বলিল। আমি সব শুনিলাম। কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাঁহার রোদনের অর্থ কে বুঝিবে? তাঁহার পুত্র নিজের, পুত্রবধূ ও নিজের, কিন্তু ঘর যে পরের। পরের ঘরে নিজের ধন তুলিয়া কে কবে সুখী হয়? মনে মনে স্থির করিলাম, যেমন করিয়াই হউক জননীর এ মনকষ্ট দুর করিব। সুধেন্দুবাবু কেবল এই নূতন সম্বন্ধেই আত্মীয় নন্দ। তিনি আমার আশ্রয়দাতা পিতা। ভগবানের অনুগ্রহে, তাঁহার দয়ায় অকূলসাগরে কূল পাইয়াছিলাম। নতুবা কয়টী জীব কোথায় যে ভাসিয়া যাইতাম, তাহার স্থিরতা কি? তাঁহার নিকটে সহস্র ঋণী হইলেও শ্বশুরালয়ে ওরূপ ভাবে বাস করা ভাল বলিয়া বোধ করিলাম না। অবশ্য তাঁহার কাছে

মনোভাব কিছুই প্রকাশ করিলাম না। তাঁহার মত লইয়া ভিন্নস্থানে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। চারি পাঁচ বৎসরে বেশ উপার্জ্জন করিলাম। শ্বশুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজগ্রামে পিতৃপিতামহের পরিত্যক্ত ভদ্রাসনেই এই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিলাম। বাড়ী শেষ হইলে একটী ভাল দিন দেখিয়া মাতা ও পত্নীসহ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। আমার মনে সেই দিন যে কি আনন্দ, তাহা আর কি বলিব। আমার বোধ হইল, বহুদিন পরে সুদূর বিদেশ হইতে যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলাম।

এই বাস্তু ভিটার সহিত প্রাণের কি যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, কি যে মমতা জড়িত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। বৎসরের নয় মাস কাল ম্যালেরিয়ায় ভুগি, তবুও ইহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিনা। তবুও ইহা আমার সম্পদের শান্তি, বিপদের আশ্রয়, আমার বস্তুভিটা। অতীত বংশাবলীর কত নিদর্শন এইখানে। আমার কত পূর্ব্ব পুরুষ পল্লী-মায়ের এই কোণ টুকুতে ঘুমিয়েছেন, আমিও কি সেই ভাবে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ঘুমুতে পাব না ?

আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। মায়ের মনোদুঃখের কারণ শুধু তাই নয়। তাঁহার সান্ত্বনা আর জীবনে মিলিল না। তাঁর চোখের জল আর জীবনে ফুরাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতেই তাঁহার দেহাবসান হইল। যে আশায় তিনি বড় দুঃখেও জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, সে আশা সে সাধ আর পূর্ণ হইলনা। পিতৃদেব আর গৃহে ফিরিলেন না। নানা ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে মা আমার স্বর্গ গমন করিলেন। চিকিৎসার ত্রুটী হইল না। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতে পারিলাম না।

পীড়িতাবস্থায় একদিন বড় জিদ্ করিয়া ধরিয়া বসিলে তিনি একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন। "আর ওষুধ খেয়ে কি করবো বাবা! আমার শরীরের কাজ ফুরিয়েছে, তোমাদের দুটী ভাই বোন্‌কে যে সুখী দেখে মরতে পারছি এই আমার পরম সুখ। বেঁচে থাক বাবা! আমার মাথার যত চুল তত প্রমাই হ'ক। তবে মনে একটী দুঃখ রয়ে গেল। মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হল না। তাঁর পায়ে মাথা রেখে মরতে পেলেম না। একটী কথা আমার রাখ্‌বে বাবা!'

আমি—কি কথা মা! তোমার আদেশ আমি নিশ্চয়ই পালন করবো।

মা—তত কিছু নয়। যদি কখনও তিনি ফিরে আসেন, কখনও তাঁর দেখা পাও, তা হলে তাঁর দাসীর সমস্ত দোষ তাঁকে মার্জ্জনা করতে বলো। বড় কষ্ট তাঁর মনে দিয়েছি বাবা! এ পাপের বুঝি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

আমি—মা! তুমি এমন জ্ঞানবতী হয়ে দেবতার প্রাণে ব্যথা দিলে কেন মা!

সাধ করে নয় বাবা! সে কথাতো তোমাকে আর একবার বলেছি। মেয়ে মানুষের প্রাণ বড় দুর্ব্বল। তত কষ্ট সহ্য করবার বল বুঝি মেয়েমানুষের বুকে থাকে না। তবুও আমি মহাপাপিনী!" এই বলিয়া মা আমার নীরব হইলেন। এই শেষ কথা। আমাদের মাতা পুত্রে আর কথা হয় নাই।

ইহার পরদিন আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মা স্বর্গ গমন করিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধ দৈহিক কার্য্যাদি সমাপনান্তে কত স্থানেই নিরুদ্দিষ্ট পিতার অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না।

(৩)

আহারাদি অন্তে সেই বৃদ্ধ অতিথির হস্ত ধারণ করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেলাম। সেখানে একটী পালঙ্কে বিছানা পাতা ছিল। উভয়েই একত্রে তথায় শয়ন করিলাম। বৃদ্ধ নীরবে তথায় শয়ন করিয়া আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু নীরবে গড়াইয়া পড়িল। আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। অকস্মাৎ এইরূপ রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ অর্থশূন্য চাহনিতে কিয়ৎক্ষণ আমার মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"বাবু! ঘৃণা অবজ্ঞা ভিন্ন এ সংসারে আর কিছুই পাইনি। এ দীনহীনের প্রতি আপনার ন্যায় সদয় ব্যবহার সত্যসত্যই জগতে বুঝি দুর্লভ। বুড়ো মানুষ আমি আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও। আরও উত্তরোত্তর আপনার উন্নতি হক। এ দীনের দুঃখময় জীবনকাহিনী শুনে আর কি হবে বাবু!"

আমি নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, শুনুন "বাবু! জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করা সহজসাধ্য নয়। জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে, এমন আঘাতও বুকে লাগে, সে আঘাত সহ্য করবার বল বুঝি সকলের বুকে থাকে না। আমিও পারলেম না—বুক ভেঙ্গে গেল, তাই বুঝি সংসার আমাকে অকর্ম্মন্য বোধে দূরে নিক্ষেপ করলে।"

কত স্নেহ মমতায় গড়া সাধের পুতুলগুলি একে একে ভেঙ্গে ফেলে, পাগল হয়ে ছুটে বেরুলেম। সেই এক মুহূর্ত্তে যদি আমার ধৈর্য্যের বাঁধ না ভেঙ্গে যেত, তা হলে বুঝি আমার সব বজায় থাকতো, আজ আমার এ দশা হতো না। যা হারিয়েছি, জীবনভরা হাহাকারেও আর তো তা ফিরে পাব না।"

বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, একটু গলা ঝাড়িয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চিরদিনই আমি এমন ছিলেম না। আমারও ঘর দোর বৌ ছেলে সবই ছিল। আবার আমিই ভাগ্যদোষে সব হারিয়েছি। জীবনে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন একমুষ্টি অন্নের জন্য লোকের দোরে দোরে ঘুরেও পাইনি। সকলের চেয়ে ঘৃণিত বৃত্তি ভিক্ষা। অদৃষ্ট মন্দ হইলে তাহাও মিলে না। যখন বড় ক্ষুধায় আমার প্রাণাধিক শিশু দুইটী ছটফট করে কাঁদতো, তখন নিষ্ঠুর আমি, পিতা হয়ে অঞ্জলি অঞ্জলি জল তাদের মুখে দিতেম। ক্ষুধার মুখে বাছারা আবার তাই পেটপুরে খেতো। এও আমি চক্ষে দেখেছি, এত কষ্টও আমি এই বুকে সহ্য করেছি। দুর্ভিক্ষে মানুষ রাক্ষস হয়। তখন কেউ কারুর মুখ পানে চায় না। বাবু! অন্নকষ্টে মরিতে আমাদের মত গরীবেরাই মরে, বড়লোকের কি আসে যায়? আমি যেসব হারাইয়া পাগল হইয়া বাহির হইয়াছি, আমার মতন কয়টালোক সেরূপ হইয়াছিল? শুধু দুর্ভিক্ষে নয়, বুঝি অদৃষ্টের দারুণ প্রহারেই আমার এ বিড়ম্বনা। সামান্য লিখাপড়াও জানিতাম, চাকরীর আশায় কত স্থানেই ফিরিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে মিলিল না। লজ্জা নিবারণের সম্বল যার ছিন্ন বসন, তৈল অভাবে যার মস্তক রুক্ষ; কোন্ বড়লোক তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাকরী দিবে। আমাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে এক জমীদারের বাড়ী। আমার মত গরীবের সঙ্গে যদিও বাবুর পরিচয় ছিল না, তবুও গেলাম। সে চেষ্টাও বিফল হলো। নিরাশহৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম। কিন্তু কি হইবে কেমন করিয়া শিশু দুটীকে রক্ষা করিব, ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম আর রক্ষা নাই। একে একে সকলকেই মরিতে হইবে। কিন্তু চোখের উপর শিশু দুটী না খাইয়া মরিবে, সে দৃশ্য কেমন করিয়া দেখিব। কতই কাঁদিলাম, কতই মনোবেদনা ভগবান্‌কে জানাইলাম, বুঝিবা আমার মত মহাপাপীর প্রতি বিধাতাও বিমুখ। যে দৃশ্য দেখিবার কল্পনা করিতেছিলাম, একদিন সেদৃশ্য সম্মুখেই উপস্থিত। আমার শিশু মেয়েটী প্রবলজ্বরে যায় যায় হইয়া

উঠিল! এইবার আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, এইবার আমি সত্য সত্যই পাগল হইলাম! তখন পৌষমাস। হইলে কি হইবে দেশের দুর্ভিক্ষ যদিও গেল, আমার দুর্ভিক্ষ গেল না। হাতে একটী পয়সা ছিল না, কেমন করিয়া ডাক্তার ডাকিব? দারুণ হতাশায় বুক ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময়ে আমার স্ত্রী একটু কড়া ভাবেই আমাকে দু একটী কথা বলিল। তেমন কথা সংসার করিতে গেলে অনেক হইয়া থাকে। কিন্তু তখন আর সহ্য হইল না, সহ্য করিবার শক্তি আমার ছিল না। অমাবস্যার রাত। ঘুট্ ঘুটে আঁধার। রাত তখন দুপুর, বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। ঘর বাড়ী, পুত্র, কন্যা কাহারও মুখ চাহিলাম না। সেদিন সারাটী দিন পেটে অন্ন যায় নাই, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক, কিন্তু সে জ্ঞান আমার ছিল না। একেবারে ছুটিয়া চলিলাম! ছুটিতে ছুটিতে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম, মাঠের পথ ধরিলাম। মাঠের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে একটী বটগাছ। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একখানি কম্বল মুড়ি দিয়া সেই গাছতলায় শুইয়া পড়িলাম। বিলের ধার। জলো হাওয়ায় দারুণ শীতে শরীর যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, শীতে যদি মরণ হয়তো বাঁচিতাম, বুকের এ কুল কাঠের আগুন আর সহ্য করতে পারিনে। কিন্তু দুঃখী লোকের কি মরণ আছে? মরিলাম না। রাত প্রভাত হইল। একটু রোদ উঠিলে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। পা আর চলে না, সমস্ত শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল! বড় কষ্টেই সে মাঠ পার হইয়া একটী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যাইতে যাইতে একটা বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কি জানি কেন মাথা ঘুরিতে লাগিল, পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল! আমি হতচৈতন্যাবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া গেলাম। কতক্ষণ সে অবস্থায় ছিলাম জানি না। জ্ঞান ফিরিলে দেখিলাম, আমি একটী ক্ষুদ্র চালাঘরে একখানি মাদুরের উপর পড়িয়া আছি। একজন ইতরশ্রেণীর যুবক আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট। সে আমার কাণের কাছে মুখ লইয়া কত কি বলিল; তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় কর্ণেই প্রবেশ করিল না। ইঙ্গিতে জানাইলাম, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। যুবক বোধ হয় আমার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিল। একখানি কদলীপত্রে কতক গুলি ভুট্টার খই ও একটু গুড় আনিয়া দিল। আমি লোলুপ দৃষ্টিতে সেই-গুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। মুখে তুলিয়া দিবার সামর্থ্য ছিল না।

সেই যুবক আমার মনোভাব বুঝিয়া, একটী বাটীতে খানিকটা কাঁচা দুগ্ধ আনিল। এবং একটু একটু করিয়া আমার মুখে দিতে লাগিল। ক্রমে সেই একবাটী দুগ্ধ নিঃশেষ করিলাম। দুগ্ধটুকু পান করিয়া যেন আমার মৃত দেহে জীবন আসিল। দুটী একটী করিয়া খই মুখে দিলে অনেকগুলি খই খাইয়া ফেলিলাম। ক্ষুধার মুখে সেই ভুট্টাগুলিতে যেন অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলাম। শেষে এক গেলাস জল পান করিয়া বেস একটু সুস্থতা অনুভব করিলাম। সে বেলাটা সেখানেই কাটাইলাম। পরে বেলা একটু শেষ হইলে সেখান হইাত রওনা হইলাম। মনে এমন বল ছিল না যে, দুই দিন একস্থানে থাকি। কি যেন একটা ভাব, কি যেন একটা চপলতা আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে গ্রাম ছাড়িয়া সারা দিন রাত অবিশ্রান্ত ভাবে পথ চলিয়া আরও কত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম। এ চলার শেষ কোথায়, কেন, কোথায় চলিয়াছি, তাহার কিছুই স্থির ছিল না। লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন ভাবে কেবলই চলিতেছিলাম। ক্ষুধায় যখন অবসন্ন হইতাম, কাহারও বাড়ীতে উঠিতাম, চাহিয়া যাহা পাইতাম, তাহাতেই ক্ষুন্নিবারণ করিতাম। প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহের দুলাল শিশু দুইটীকে মরণের মুখে ফেলিয়া আসিলাম, সে সব কথা ছায়ার মত এক একবার মনে জাগিত। ভাবিতেই মাথার মধ্যে গোলমাল হইয়া যাইত, মাথায় যেন আগুন জ্বলিত। আর স্থির থাকিতে পারিতাম না, কেবলই ছুটাছুটি করিতাম। সে সময়ে প্রত্যেক মানুষের উপরেই আমার রাগ হইত।

সে রাগ বড় সহজ নয়। চক্ষু কপালে উঠিত। ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইত। হাতে খর্ব্ব একখানি যষ্টি থাকিত। সেই যষ্টিখানি লইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতাম, তাহাকেই তাড়া করিতাম। পাগল ভাবিয়া কেহই আমার কাছে ঘেঁসিত না! গ্রামের নামটী ঠিক স্মরণ পড়িতেছে না, সেই গ্রামে বোধ হয় দীর্ঘদিন ছিলাম। কত বৎসর ছিলাম ঠিক মনে পড়ে না। পরণের কাপড়খানি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। এক বাবু দয়া করিয়া একখানি কাপড় দিয়াছিলেন। সেই খানি সর্ব্বদাই পরিয়া থাকিতাম। সেখানিও যখন ছিন্ন হইল। তখন বলিব কি একে-বারেই নগ্ন হইলাম। সেই অবস্থায়ই যেখানে সেখানে যাতায়াত করিতাম। লজ্জা, ভয় আমার কিছুই ছিল না। সে অবস্থায় গ্রামের লোকে বড়ই

তাড়া করিতে লাগিল। শেষে লোকালয় ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম, বনের পথ ধরিলাম। সুন্দর বনে বড় বাঘ, ভালুকের ভয়। আমার মনে সে ভয় একটুও ছিল না। আমি নির্ভয়ে সেই নিবিড় বনে গতায়াত করিতাম; বনের মধ্যে অনেক অসভ্য জাতির বাস। তাহারা দয়া করিয়া আমাকে ফল, মূল, কাঁচা মাংস প্রভৃতি খাইতে দিত। আমি ক্ষুধার মুখে সেই সব ফল, মূল, মাছ মাংস প্রভৃতি মনের আনন্দে তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতাম। দিবা রাত্রি কোনও সময়েই আমার চোখে একটুও ঘুম আসিত না। ক্লান্তি বোধ হইলে যখন যেখানে খুসী পড়িয়া থাকিতাম। বাবু! পাগল হইলে লোকে যাহা করে, জ্ঞান ফিরিলে প্রায়ই মনে পড়ে না, কিন্তু কেন জানিনা, আমার উন্মাদজীবনের অতীত স্মৃতিগুলি একে একে সব আমার মনে পড়িতেছে। যে ঘুমে ঘুমিয়েছিলেম, সে ঘুম আমার কেন ভেঙ্গে গেল বাবু! কেন আমার জ্ঞান ফিরে এল? আর ভাল হয়ে কি ফল? এ সংসারে যা হারিয়েছি, আরতো ফিরে পাবার উপায় নেই। পাগল হয়েই বুঝি ভাল থাকতুম!

একদিন বড়ই ক্ষুধা পাইল। পেটের জ্বালায় কত জনের কাছেই গেলাম, কেউ সেদিন আমার প্রতি দয়া করিল না। এক বন্য রমণী একটী টুকরীতে কতকগুলি শসা, কলা ইত্যাদি নিয়ে আমার সম্মুখ দিয়ে যায়। আর সহ্য হইল না। তাহার টুকরী হইতে কয়েকটী শসা জোর করিয়া কাড়িয়া লইলাম। মেয়েটী চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার চীৎকারে ভীষণ চেহারার অনেকগুলি অসভ্য লোক সেইস্থানে উপস্থিত হইল। আমার সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি একটী বৃক্ষতলায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেই শসাগুলির সৎকার করিতেছিলাম। এ লোক-গুলি বন্য ভাষায় চীৎকার করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া কত গালাগালি করিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অকস্মাৎ উহাদের মধ্য হইতে একজন যণ্ডা চেহারার লোক ছুটিয়া আসিয়া আমার পৃষ্ঠে মস্তকে দমাদম কয়েকটী লাঠীর আঘাত করিল, তাহার পরে কি হইল আর মনে নাই। বোধ হয় আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া গিয়াছিলাম। জ্ঞান ফিরিলে দেখিলাম, আমি একটী দালানের প্রকোষ্ঠে পরিষ্কার শয্যায় শায়িত। আমার পার্শ্বে এবং মেঝেয় ইতর, ভদ্র নানা শ্রেণীর লোক উপবিষ্ট। আমার পালঙ্কের পার্শ্বদেশে একখানি চেয়ারে

এক বাবুকেও বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। বড়ই বিস্মিত হইলাম, প্রথমে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। চেতনাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মস্তকে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই, যাহা ভুলিয়াছিলাম, একে একে সব আমার মনে পড়িল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ঘর, বাড়ী সবই স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। ভাবিতেই মন অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? আমার নড়িবার সামর্থ্য ছিল না। লক্ষ্য করিলাম আমার পরণে কাপড় নেই। কতলোক সেইখানে, বড় লজ্জা হইল। আমি সেই বাবুটীর কাছে একখানি কাপড় যাচ্ঞা করিলাম। বাবু আমাকে নড়িতে বা কথা কহিতে নিষেধ করিয়া উঠিয়া গেলেন এবং একখানি ধৌত বস্ত্র আনয়ন করিয়া স্বহস্তে আমাকে পরাইয়া দিলেন। সেদিন গেল। পরদিন ভাবিয়া ভাবিয়া এবং অনেক রোগীর গতায়াত দেখিয়া স্থির করিলাম, এটা একটা ডাক্তারখানা। আর ঐ বাবুটী ডাক্তার। মস্তকের যন্ত্রনায় বুঝিলাম, মস্তকে কোনও পীড়া হইয়া হয়তঃ অজ্ঞান হইয়াছিলাম, দয়া বশতঃই হউক অথবা অন্য কোনও কারণেই হউক আমাকে এখানে আনিয়া চিকিৎসাদি করিতেছেন। কোথা হইতে আসিলাম ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সমস্ত কথাই আমার মনে পড়িল। সেই বাড়ী হইতে আসা অবধি বন্যরমণীর নিকট হইতে শসাগ্রহণ, তাহার ফলে মস্তকে আঘাত পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই মনে হইল। ডাক্তার বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও শুশ্রূষায় প্রায় তিনমাসে আরোগ্য লাভ করিলাম। ডাক্তারবাবু বড় দয়ালু। দয়াবশতঃই তিনি আমার অচৈতন্য দেহ পথ হইতে আনিয়াছিলেন এবং এত পরিশ্রম করিয়া আমার জীবন দান দিলেন। একদা তাঁহার নিকটে আমার দুঃখময় জীবনের অতীত কাহিনী সমুদায় খুলিয়া বলিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। অনেক বলিয়া কহিয়া পরদিন সেস্থান হইতে বিদায় হইলাম। নিজগ্রামের নামটী ঠিক মনে হইয়াছিল। অচেনা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় একমাসে স্বগ্রামে ফিরিলাম। গ্রাম প্রান্তে পদার্পণ করিতেই হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। অনিশ্চিত হতাশায় বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, হায়! কেন আমি বাড়ী ছাড়িয়া গেলাম, কত দীর্ঘ দিন পরে যাহাদের জন্য আজ ফিরিয়া আসিতেছি, তাহারা কি বাঁচিয়া আছে। আর কি তাহাদিগকে দেখিতে পাইব? এইরূপ শত অমঙ্গল চিন্তায় অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। ধীরে ধীরে কম্পিত পদে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম গ্রামের যেখানে যা ছিল, প্রায় সব ঠিকই আছে। আমার কুটীরের অতি নিকটে রাস্তার ধারের আমার স্বহস্ত রোপিত সেই ঝাউ-গাছটী বায়ুভরে তেমনি সন্ সন্ করিতেছে। কিন্তু আমার সাধের ঘর অনেকদিন ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। আমার সাধের প্রদীপ কয়টী অনেক দিন নিভিয়া গিয়াছে। আর কি দেখ্‌তে এলাম, দেখিলাম আমার বসতি স্থানে অন্যলোক বসতি করিতেছে। জীর্ণ কুটীরের স্থানে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। চোখ ফাটিয়া জল আসিল, দারুণ হতাশায় ঝাউ-গাছটীর মূলদেশে বসিয়া পড়িলাম। অতীতের দুঃখময়ী স্মৃতিগুলি একে একে মনে পড়িতে লাগিল। সেই ব্যাধিপ্রপীড়িত অনশনক্লিষ্ট সন্তান দুইটী, সেই প্রাণহতেও প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নী, সকলেরই মুখ একে একে মনে পড়িতে লাগিল। নীরবে রোদন করিতে ছিলাম। বাবু! এই সেই গ্রাম, এই গ্রামেই পুরুষানুক্রমে আমার বসতি ছিল! আর যেস্থানে আজ আপনি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, ঠিক এই স্থানেই একদিন এই হতভাগ্যের পর্ণকুটীর ছিল। বৃদ্ধের এই সুদীর্ঘ আত্মকাহিনী শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বাষ্পাকুলিতনেত্রে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম। আর আমায় সংশয়ে রাখবেন না। বলুন,—আপনিই কি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা?

বৃদ্ধ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সবিস্ময়ে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"সেকি? সেকি? আপনি কে? যে একদিন স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়ে পলায়ন করেছিল, সেই রুদ্রকান্ত রায়ের পুত্র আপনি?"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। এমন সৌভাগ্য আমার হবে এ আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। এই বৃদ্ধ অতিথিই আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা।

আমি পিতৃদেবের চরণতলে পতিত হইয়া বলিলাম—"বাবা! আমিই আপনার পুত্র হতভাগ্য সুশীলকান্ত, আপনিই আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা। হর্ষোদ্বেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিলাম না।

পিতৃদেব শীর্ণ বাহুযুগলে ধীরে ধীরে আমার হৃদয় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাঁহার স্নেহসজল চক্ষু দুইটী আমার মুখের উপর সংবদ্ধ। তেমন স্নেহমধুর দৃষ্টি আর দ্বিতীয় বার দেখি নাই, এ জীবনে তাহা আর ভুলিতেও পারিব না।

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক— শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১৫)

ঠিক ছোট বোনটির মত ললিতার হাত ধরিয়া লীলা যে তাহাকে আনিয়া গৃহে প্রবেশ করাইল, সে গৃহপ্রবেশই যে তাহাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের প্রত্যক্ষ পরিণামস্বরূপ এমন দারুণভাবে একেবারে বাহিরে আনিয়া অসহায়-ভাবে দাঁড় করাইয়া দিবে, তাহা কিন্তু সৎ ও সরল বুদ্ধি লইয়া সে একটিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। একেবারেই অপ্রত্যাশিত গুরু শোকসংবাদের মত স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সংবাদে সহসা তাহার মনটা যেন কেমন আলোড়িত এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ শরীরের সমস্ত রক্তটা যেন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া উঠিয়া তাহার মাথাটাকে কেমন সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। এমনই অবস্থায় মুহূর্ত্তমধ্যেই লীলা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া একেবারেই ঠিক করিয়া লইল যে, নারীর দেবতা স্বামীইত স্ত্রীর সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কারণ, তাঁহার যাহাতে সুখ, যাহাতে শান্তি, তাহাতেইত স্ত্রীকে সুখী হইতে হইবে, পৃথক্‌ভাবে স্ত্রীরত কোন সত্তা বা স্বাধীনতা নাই, তাহা ছাড়া স্বামীর কার্য্যের ভালমন্দ দোষগুণ বিচারের শক্তি ত স্ত্রীর থাকিতেই পারে না। স্বামী যাহাকে আপন সুখ-সুবিধার জন্য ধর্ম্মসঙ্গিনীরূপে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছেন, সেত তাহার মায়ের পেটের বোন অপেক্ষাও স্নেহের, আদরের ভালবাসার ও পূজার পাত্রী। এই একেবারেই নিশ্চিত ধারণাটার জোরে লীলা প্রথম দর্শন হইতেই ললিতাকে নিজের অপেক্ষাও স্নেহে যত্নে পরিচর্য্যায় আপনার করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। কাজে কিন্তু কিছুই হইল না,তেল যেমন শত চেষ্টা করিয়াও জলের সহিত মিশিতে পারে না, লীলাও প্রাণের পরিপূর্ণ আগ্রহ ও প্রযত্ন-

পরম্পরাদ্বারা ললিতাকে আপনার করিয়া লওয়া পরের কথা,একটি দিন তাহার হাসিমুখও দেখিতে পাইল না, বরং বিষম বিষলতার নিকটে থাকিয়া তাহার দূষিত তীব্র তাপে লতা যেমন আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, তেমনই নীরবে নিরুপায়ে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ আমিষলোলুপ দুরন্ত শার্দ্দূল যেমন অনতিদূরে প্রিয়তম সুস্বাদ নরমাংস বা স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল মৃগযূথ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে ফুলিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বহিঃস্থিত প্রাণিমাত্রের মহাভীতি উৎপাদন করে, একবার ছাড়া পাইলে বিশ্বপ্রকৃতিটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে,—প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িবে বলিয়াই মনে হয়, মাতার কূট মন্ত্রণাবদ্ধ বিশেষ করিয়া নিজ ভবিষ্যৎ সুকর করিয়া লইবার প্রবল আশার নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত ললিতারও প্রথম স্বামিগৃহে ঢুকিয়া ঠিক সেই অবস্থাটিই ঘটিয়াছিল। সেও মনে মনে ফুলিয়া রক্তনেত্রে বিষ উদ্গীরণ করিয়া কবে স্বামীকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া লীলার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিবে, কবে নিজ হৃদয়ের হলাহল পূর্ণমাত্রায় লীলার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত দেখিয়া আপন ক্ষুধিত পিপাসিত হৃদয়ের গুরু তৃষা জুড়াইবে, তাহারই জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিয়া ক্রুদ্ধ অবরুদ্ধ গর্জ্জনে আপনার মধ্যে আপনি আচ্ছন্ন হইয়া মাতার পরামর্শমত বিদ্যুদ্দীপ্ত রূপচ্ছটা ও ভরা যৌবনের সমুন্নত অবয়বের পূর্ণ আবেগ লইয়া প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে নূতন নূতন উপায়ে স্বামীর নয়নমনোরঞ্জন করিয়া যখন তাহাকে একেবারেই আপন মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিল, তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জোর করিয়া যেমন রোগীকে বিষতিক্ত ঔষধ খাওয়ায় তেমনই লীলা ও ললিত-মোহন সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত কুৎসাগুলি তিন সন্ধ্যাই সুবোধের মনের মধ্যে বিষদিগ্ধ শলাকার মত প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিল। তাহার ফলে লীলার আর দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণার অবধি রহিল না, সপত্নীদ্বেষের প্রতিমূর্ত্তি ললিতার ঘোর চক্রে আবদ্ধ সুবোধ লীলাকে দুর্ব্বিসহ ভর্ৎসনায়, অপমানে অবজ্ঞায় লাঞ্ছনায়, তাড়নে বিকল বিহ্বল করিয়া ফেলিল, লীলার দিনগুলি অনাহারে অনিদ্রায় চোকের জলের সহিত কোন প্রকারে কাটিতে লাগিল।

এতটা করিয়াও কিন্তু ললিতা সন্তুষ্ট হইল না, লীলার আধপেটা আহার, ছিন্ন বসন, স্বামীর হতাদর ও অবজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া সে মনে মনে উৎসাহিত পুলকিত হইল বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে পথে দাঁড় করাইতে না পারিলে

যে তাহার বিষদিগ্ধ মনোরথ সফলকাম বলিয়া যে কোন প্রকারেই ভাবিতে পারে না, তাই সে পুনর্ব্বারও মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া একেবারেই সর্ব্বনাশকর লীলার নামীয় কখানা চিঠি জাল করিয়া ইহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা প্রকাশ করিয়া লীলা যে ব্যভিচারিণী তাহা প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া গর্ব্বভরে অথচ কারুণ্য-বিজড়িত স্বরে বলিল—"এবারে কিন্তু তুমি ওকে আর ঘরে যায়গা দিতে পারবে না। ওকে তুমি তাড়িয়ে দাও, অমন দুষ্টার সঙ্গে একবাড়ীতে থাকতে আমার কিন্তু কেবলই কেমন ভয় হচ্ছে।"

ললিতাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া সুবোধ বলিল—"আছে থাকুকই না, তাতে আমাদেরত আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না, বরং যা যখন দরকার, তাই আমরা ওকে দিয়ে করিয়ে নি। ওত একটা ঝাঁচাকরাণীর মত মাটিতেই পড়ে থাকে।"

ললিতা এবার স্বরল শান্ত শিষ্ট মেয়েটির মত মিনতি করিয়া বলিল—"নাগো না, সে আমি চাইনি, ওকে দিয়ে তুমি যখন আমার পা টিপিয়ে নাও, তখন সত্যি আমার বড্ড ভয় হয়, মার কাছে শুনেছি বেশ্যা মাগীদের স্পর্শ কল্লেও স্বামীর অমঙ্গল ঘটে।"

সুবোধ যেন ভাবিয়াই পাইতেছিল না, এমনই মাটির মত স্বভাব, যাহাকে কোন বিষয়ে একটী কথা বলিবারও যো নাই, তাহাকে কি করিয়া বলিবে "ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।" তাই এবার নম্রভাবে বলিল—"তোমরা কিন্তু বলেছিলে একদিন হাতে হাতে ধরিয়ে দেবে। কৈ তাত আজও পার নি, তা যদি পারতে ত আমি আবার ওকে ঘরে যায়গা দি।"

স্মিতমুখে ললিতা এবার সুবোধের অধোরোষ্ঠে নিজের পল্লবরক্ত তাম্বূল-রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ মিলাইয়া ডানহাতে গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ ত্যাগ করিয়া অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল—"এই দেখ, আজই বলছ কিনা তাত পারনি, দুটা দিন কি আর সবুর কত্তে নেই, আগে একটি-বার আসতেই দাও তাকে, কথাটা এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, দুদিন সবাই গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে, দুদিন বাদে যে সবই ধরা পড়ে যাবে, আমি তোমায় তা ঠিকই বলে রাখছি।"

"তা যদি হ'তত, কথাটি ছিল না, জানত তোমার দাদার সঙ্গে কথা হয়ে রয়েছে, তোমায় নিয়ে কলকাতা গেলেই তিনি আমার একটা ভাল চাকরি করে দেবেন, আর যেকটা দিন কোন কাজকর্ম্ম থাকবে না, সেকটা দিনত

তোমার মাই খরচ চালাবেন। আমি কেবল অপেক্ষা কচ্ছি কেন জান, মা ও'র দিকে, প্রকাশ্যভাবে একটা দোষ দেখিয়ে দিতে না পাল্লেত মাকে ললিত সম্বন্ধে কোন কথাই শোনাতে পার্‌ব না। জানত ললিত আমাদের কি উপকার করেছে। একটিবার মাকে বোঝাতে পাল্লে ওকে দূর করে দিয়ে তোমায় নিয়ে পর দিনই কল্‌কাতায় যাব, এত আমি ঠিক করেই রেখেছি।"

ললিতা সুবোধকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া আদরে সোহাগে গলিয়া গিয়া কপোলে কবোষ্ণ চুম্বন করিয়া পৃথিবীর পরপারে নিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল—"তা যেতে হয় যাবে, না গেলেওত আমার কোন আপত্তি নেই, তোমায় নিয়ে যেখানে থাকি, তাতেই আমার স্বর্গসুখ, ভগবান্ যেন সেই করেন, তোমায় নিয়ে বনে থাকৃতেও যেন আমার কোন কষ্ট না হয়।"

গাছের আগায় বসিয়া কোকিল কাকলী তুলিয়া কলতানে গান গাহিতেছিল, পাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া সুমধুর কোমলকণ্ঠে ডাকিতেছিল, পূর্ণ সুধাকর তাহার স্নিগ্ধ কর বিকিরণ করিয়া আকাশ পাতাল ভাসাইয়া একটা মাদকতায় সমস্ত পৃথিবীটাকে হাসির মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া জানালা গলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া এই যুবতীর দীপ্ত মুখখানা আরও দীপ্ত করিয়া দিতেছিল, বসন্তের বায়ু নব আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া তাহার তীব্রতায় নিজেকে উন্মত্ত মনে করিয়া পুকুরের জলে ডুব দিয়া গন্ধটাকে হ্রাস করিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আছার খাইয়া পড়িতেছিল, আর তাহার মৃদু কম্পনে ললিতার বেগুনি রঙ্গের কাপড়খানা হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, এক-একবার সুবোধের গায়ে আঘাত করিতেছিল, আবার ললিতার কবরীচ্যুত মসীকৃষ্ণ কুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। মুহূর্ত্তে ললিতার গণ্ডে, কপোলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিয়া তাহাকে আরক্ত ব্যস্ত করিয়া দিয়া উদ্বেলিত আবেগে সুবোধ বলিল—"তোমার কথাই ঠিক ললিতা, আমি আজই ওকে বের করে দেব ঘর থেকে।"

তাহার পর সেই দীপ্ত চন্দ্রালোকে নির্ম্মল আকাশের তলে সদ্যঃ গৃহ-বহিষ্কৃতা অপমানাহতা, মর্ম্মপীড়ায় পীড়িতা, স্বামিপরিত্যক্তা লীলার হাত-খানা হাতের মধ্যে লইয়া ললিতমোহন যখন জননীর ন্যায় কন্যার ন্যায় ভগিনীর ন্যায় লীলার গাঢ় বেদনার অংশ লইতেছিল, তখন সুযোগ পাইয়া বিড়ম্বিত দৈব একেবারে প্রত্যক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ সুগম করিয়া দিল, যেন তাঁহারই নির্দেশে ললিতা আসিয়া পেছন হইতে দেখিতে পাইয়া সুবোধকে

চক্ষুর সম্মুখে ধরাইয়া দিল। ইহার পর আর সুবোধেরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না, সে কোন প্রকারের বিচার বা বিবেচনা না করিয়া পর দিনই ললিতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(১৬)

মানুষ যাহা ভাবে,তাহার চিন্তাশক্তি কেন্দ্র হইয়া তাহাকে যে ভাবে ঘুরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে, বিধাতার কল সকল সময়ে ঠিক তার অনুকূল হইয়া চলিতে বাধ্য হয় না, সুবোধ বড় আশা করিয়া অবাধে ললিতার রূপযৌবন ও প্রাণের ভালবাসা উপভোগ করিবার জন্য পত্নীর স্নেহ, যত্ন ও পরিচর্য্যা লাভের প্রত্যাশায় আশান্বিত হইয়াছিল, কলিকাতায় আসিয়া কয়েকমাস অতীত হইতে না হইতেই তাহার সেই প্রবল আশাটা নেশার ঘোরের মত চন্দ্রপক্ষের ক্ষীয়মাণ কলার ন্যায় আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া আসিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল ; যে সময় হইতে ললিতা বুঝিতে পারিল, স্বামী তাহার মুঠার মধ্যে এমন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, এ মুঠা ছাড়াইয়া তাহাকে আর বাহিরে বাহির হইতে হইবে না, তখই সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুবোধের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া বসিল।

যে ভাবে যেমন করিয়া হউক, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুখে দুঃখে সম্ভোগের মধ্য দিয়া ইহাদের দীর্ঘ দুইটি বছর কাটিয়া গেল। ললিতার চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুবোধ ক্রমে ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িতে গিয়াও মদের উগ্র উন্মাদকর নেশার মতই তাহার ভরা যৌবনের পূর্ণ প্রবল স্রোতের আকর্ষণে ভাসিয়া চলিল। রূপের নেশা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমনই মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে, ললিতার কথার উপরে সে কথাটি বলিতে পারিত না, কোন সময়ের জন্য লীলার চিন্তা মনে আসিলেই ললিতার সেই তড়িৎপ্রভা মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যাইত, ইহার উপর আবার সে নিজেও জানে না, ভাবিয়াও বুঝিতে পারে না, ললিতার প্রতিকূলে কোন কথা বলিতে কোন কাজ করিতে কেমন একটা ভয় কেমন একটা আশঙ্কা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ব্যস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।

এমনই অবস্থার মধ্যেও আজ যেন সুবোধ মুহুর্ম্মুহুঃ কেমন অন্যমনা হইয়া পড়িতেছিল, ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত গাধার খাটুনি খাটিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই ললিতা অকারণ আজ তাহাকে এমন কতকগুলি কথাই শুনাইয়া দিয়াছিল যে, সে তাহার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া চৌকির একপাশে

একটা বালিশের উপর মাথা রাখিয়া কেবলই কি যেন ভাবিতেছিল, হায় মানুষের মন! কোন্ আঘাতে যে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কি ভাবে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই দীর্ঘ দুই বৎসরে সুবোধ ললিতার নিকট কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা যে ভোগ করিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই, তবু কিন্তু সে ললিতাকেই আপনার সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী, সুখ-দুঃখের একেবারেই পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়াছে, আর আজ, আজ যেন সামান্য আঘাতেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, চিন্তা-স্রোত অন্যদিকে গা ঢালিয়া দিয়াছিল। ললিতা শয্যায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে মাথার যন্ত্রণায় 'উঃ আঃ' করিয়া উঠিয়া তাহার নিত্যনৈমিত্তিক এই রোগের প্রবলতাটায় সুবোধকে আরও বিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল। অন্য দিন হইলে সুবোধ এমন অবস্থায় ললিতাকে দেখিয়া পাগল হইয়া তাহার মাথা টিপিয়া দিত, বাতাস করিত, এমনই আর কত রকমে কিসে ললিতা সুস্থ হইবে, তাহারই জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িত, আজ আর সে সেদিকে দৃষ্টিও করিতেছে না, দেখিয়া ললিতার মনেও কেমন একটা সন্দেহ সাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল, সে আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া হাইম ছাড়িয়া কাতরস্বরে বলিল—"ওগো, বসে কি ভাব্‌ছ? আমি যে মাথার যন্ত্রণায় মলেম্, একটিবার মাথাটা একটু টিপে দাও না।"

সুবোধের চমক ভাঙ্গিল, তবু যেন সে ললিতার কথার অর্থ সম্যক্ প্রণিধান করিতে না পারিয়া অন্যমনস্কভাবে সহসা জিজ্ঞসা করিয়া ফেলিল—"বল্‌তে পার ললিতা, লীলার কি হচ্ছে?"

ললিতা এবার সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ওঃ, এই কথা ভাব্‌ছিলে? তাই বল, আমি ভাব্‌ছিলুম কিই যেন একটা মস্ত চিন্তা কচ্ছ? আচ্ছা তোমার লজ্জা হয় না সে বেশ্যাটার কথা ভাব্‌তে—"

এমন কথা সুবোধ অনেকবারই কথাচ্ছলে ললিতার মুখ হইতে শুনিয়াছে, শুনিয়া সে যেন প্রীতই হইত, কিন্তু আজ আর অন্যদিনের মত সে প্রীতিটা তাহার হইল না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা খোচা খাইয়া কেমন হইয়া পড়িয়া নূতন ভাবে কেবলই সে ভাবিতে লাগিল, যে সুবোধ জীবনে ভাবনা কাহাকে বলে তাহা জানিত না, আজ যেন জোর করিয়া কে সেই সুবোধকে একেবারে চিন্তারাজ্যে নিয়া ডুবাইয়া দিল। লীলাত তাহার পরিণীতা স্ত্রী, তাহার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বিশ্বাস করিবার আগে একটু ভাবা, লীলাকে একবার

জিজ্ঞাসা করাও তাহার উচিত ছিল নাকি ? ভাবিয়া কোন কূলকিনারাই আজ যেন সে পাইতেছিল না, অথচ ললিতার কথার উত্তরে এসম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না। ললিতা এবার উত্তেজিত হইয়া শ্লেষ করিয়া বলিল—"ওগো, আর মাথাগুজে ভাবতে হবে না, সে বেশ ভাল আছে, অমন মানুষের আবার মন্দ হবে, তা হলে যে পৃথিবীর হাড়টা জুড়াত।"

সন্ধ্যার ছায়া লইয়া আস্তে আস্তে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদ ভয়ে ভয়ে যেন মুখ লুকাইয়া মেঘের কোল হইতে উঁকি মারিতেছিল, উপরে আকাশের গায়ে দিনান্তের সংবাদ ঘোষণা করিয়া একটা পাখী গাহিয়া চলিয়া গেল, সে শব্দে চমকিত সুবোধ বাহিরে দৃষ্টি করিয়া আনমনে ললিতার কথার উত্তরে বলিল —"তাই হক্, বেঁচে থাক্, আমিত তাকে ত্যাগ করেছি, কিন্তু কোন অপরাধ যদি তার না থাকেত, ভগবান্ তাকে রক্ষা করবেন।" তার পর কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সুবোধ প্রশ্ন করিয়া বসিল —"আচ্ছা ললিতা, কাজটা কি আমারই ভাল হচ্ছে।"

ললিতা এবার অতিসন্তর্পণে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল, কয়েকবার 'উঃ আঃ' করিয়া রুষ্টস্বরে বলিল—"না বড্ড মন্দই হচ্ছে, কিন্তু কে তোমায় বলছে মন্দ কত্তে, এবার থেকে ভাল যা তাই কর, তাকে এনে মাথায় করে রাখ।"

"তোমার মত মাথায় থাকবার ত সে ছিল না, সে যে পায়ের তলাই বড় ভালবাসত।" অস্ফুটস্বরে কথা কয়টি বলিয়া সুবোধ ললিতাকে বলিল— "তা নয় ললিতা, ধর এই মাকে পর্য্যন্ত তিন তিনটা বছর একটি পয়সা দিচ্ছি না, তাঁরা খাচ্ছেন কি ?"

ললিতা পূর্ব্বাপেক্ষাও রুষ্ট কঠোরস্বরে বলিল—"তাঁরা খাচ্ছেন কি, সে ভাবনা ভেবেত তোমার ঘুম হচ্ছে না, কিন্তু এ ক'টা বছর আমাদের চলছে কি করে তাত একটি দিনও ভাবছ না, আর একজন যে আমাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন।"

সুবোধ ভীত হইয়া পড়িল, অথচ সে ভাবিয়া পাইল না, কে তাহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। সে সারাদিন খাটিয়া নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেইত তাহাদের দু'টা লোকের বেশ চলিয়া যাইবার কথা, অথচ ললিতার নিকট প্রায় প্রতিদিন প্রতিকথাতেই তাহাকে শুনিতে হইতেছে যে, জামাতার জন্য তাহার মাতা একেবারেই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িতেছেন, আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে; সে এপর্য্যন্ত এমন কোন সংবাদ রাখে না যে, তাহার

শ্বাশুড়ী তাহাদের আনুকূল্যের জন্য কপর্দ্দকও সাহায্য করিয়াছেন। তথাপি কিন্তু সে ভীতভাবে অন্য কথা পাড়িয়া বলিল—"সে হলেও আমার ত উচিত মাকে ও লীলাকে খেতে দেওয়া—"

অসমাপ্ত কথাটার মাঝখানে বাধা দিয়া ললিতা চীৎকার করিয়া বলিল—" উচিত হয় করই না, আমি ত আর আট্‌কে রাখ্‌ছি না, এতই ভার হয়ে থাকিত, না হয় কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।" বলিয়াই ললিতা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৭)

পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে নটা বাজিবার শব্দ রাত্রির পরিমাণটা জানাইয়া দিতেছিল। ললিতার শরীর আজ মোটেই ভাল না, সন্ধ্যাবেলায় লীলার নামটা হইতেই সে যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পর হইতে ক্রমবর্দ্ধমান মাথার বেদনাটা তাহাকে একেবারেই অস্থির করিয়া তুলিল। সুবোধেরও আজ সে দিকে যেন মন ছিল না, তাহার চিন্তার ধারাটাও যেন কেমন একরকমের খাপছাড়া গোছের হইয়া পড়িয়াছিল।

বাড়ীর দক্ষিণে জমিদারের গৃহসংলগ্ন বিস্তৃত উদ্যান। নৈশ হিমকণ-বাহী শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া জানালার ছিদ্র দিয়া চোরের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। চাড়াগাছগুলির তাম্ররক্ত নবপল্লব দূর হইতে ললিতার তাম্বূলরক্তরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বাতাসের ভরে যেন নুইয়া পড়িতেছিল, আর এই অসহায় অপমানাহত পল্লবগুলির দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের রাগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া গর্ব্বোন্নত করিবার জন্য চন্দ্রের পূর্ণকর উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া রজতকণা ছড়াইয়া দিতেছিল। বৃক্ষের শাখায় শাখায় পক্ষিকুল কলকণ্ঠে তান তুলিয়া গাহিয়া গাহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সুবোধের সে দিকে লক্ষ্যও ছিল না। আজ যেন কেবলি মাতার করুণ অন্নাহারে জীর্ণ মূর্ত্তি তাহার চোকের উপর থাকিয়া থাকিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। বালোচিত আত্মসুখপরায়ণতা ও বিবেকহীনতা তাঁহাকে অন্ধ করিয়া একেবারেই অনুভূতিহীন করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমবিকাশ-মান ললিতার দুর্ব্বোধ দুরন্ত চরিত্র যেন চিত্রাকারে পরিণত হইয়া তাহার হৃদয়ে আজই প্রথম একটা মৃদু অভিব্যক্তির অস্পষ্টচ্ছায়ায় তাহাকে কম্পিত শিহরিত করিয়া দিতেছিল। ললিতার যে প্রদীপ্ত অনলশিখার ন্যায় দীপ্ত

তেজের ও সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত আত্মবিক্রীত সুবোধ তাহার ক্ষণেক বিচ্ছেদে পৃথিবী অন্ধকার দেখিত, উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, যাহার বিচ্ছেদের আকুল আশঙ্কায় রামগিরির বিরহী যক্ষের মত প্রাণপ্রিয়া ললিতার অনন্ত সুষমামণ্ডিত প্রতিকৃতিজড়িতস্মৃতি নীল আকাশে,শ্যামলপত্র বৃক্ষে, স্পষ্ট চন্দ্রালোকে, মেঘের কোলে, বিদ্যুদ্দীপ্তিতে দেখিয়া দেখিয়া হাত বাড়াইয়া স্পর্শের স্পষ্ট অনভিব্যক্তিতে শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, কোকিলের তানে, বীণার মৃদু মন্দ ধ্বনিতে. কামিনীকুলের অলঙ্কারের নিঃস্বনে প্রাণপ্রিয়া ললিতার স্বরসংযোগ অনুভব করিয়া তাহার অসান্নিধ্যে হতাশ হইয়া দরদরধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, আজ বাল্যের মাতৃস্নেহের অগাধ অতল স্পর্শ ভালবাসার তীব্র বেগটা শৈলাবরুদ্ধ ক্ষীণনির্ঝরিণী যেমন বর্ষার জলে পুষ্ট হইয়া অবাধ গতিতে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই ভাসাইয়া দেয়, তেমনি সুবোধের হৃদয় হইতে ললিতার ভাবনাগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মাতৃস্নেহের গভীর পূত স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবল স্রোতের টানে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে যেমন টানিয়া সাগর ছাড়াইয়া বহুদূরে নিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়. সুবোধকেও আজ যেন তেমনই টানিয়া লইয়া ললিতার নিকট হইতে দূরে বহুদূরে দাঁড় করাইয়া দিল। সে ভাবিয়া পাইল না, তাহার কি হইয়াছিল, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির অপ্রকাশ্য আক্রমণে ললিতার এত নিষ্ঠুরতা এত প্রভুতা সে মোহাচ্ছন্নের মত তিন তিনটা বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তিনটা বৎসর বিনা ওজরে নিরবচ্ছিন্ন সে ললিতার সেবাই করিয়া আসিয়াছে! আজ সহসা কোন্ দৈবশক্তির দ্রুত কষাঘাত অভিশপ্তের মত তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিল। বাল্যের সেই চিরমধুর মাতৃস্তন্যের কথা মনে হইতেই সুবোধের শুষ্ক জিহ্বা আর্দ্র হইয়া উঠিল। যে অযাচিত অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত স্নেহ লৌহবর্ম্মের মত বাল্য হইতে তাহাকে নিরাপদ নির্ব্বিবাদ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যেন সেই স্নেহই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাহার অকৃতজ্ঞতার বীভৎস ব্যাপারটা অঙ্গুলীসঙ্কেতে দেখাইয়া দিল। মাতৃস্নেহের স্মৃতিগুলির সঙ্গে জড়িত ললিতমোহনের কার্য্যাবলীও যেন বিমুখ হইয়া তাহার নিদ্রিত মূঢ় হৃদয়ের উপর অজ্ঞাতে একটা দাগ বসাইয়া দিয়া অজ্ঞাতেই মিলাইয়া গেল।

এতটা নীরবতা ললিতার সহ্য হইতেছিল না। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া

জড়িতস্বরে বলিল,—"ব'সে ব'সে কি যে ভাব্‌ছ, তা ত আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, যাওনা দু'টি রে'ধে নাও, আমার মাথাটা বড় জ্বালা কচ্ছে, আমি ত আজ আর রাধ্‌তে পারব না।"

সাংসারিক নানা কাজেই ইতিপূর্ব্বে সুবোধকে যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছে, ললিতার আজ এ রোগ, কাল এ রোগ, তাহার উপর আবার এই নিত্য-নৈমিত্তিক মাথাধরাটা কাজের সময় যেন তাহার মধ্যে লাগিয়াই থাকিত, ললিতার কথামত কাজ করিতে সুবোধেরও এতদিনের মধ্যে এক দিনের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য, আপত্তি বা অসন্তুষ্টি দেখা যায় নাই। আজ এই সময়টুকুর জন্য যেন তাহার সে ভাবটা ছিল না, তাই সে কথাও বলিল না। ললিতার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবার সে রুক্ষস্বরে বলিল,—"বসে কি দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান কচ্ছ, না আর কিছু. বসে থাক্‌লে আজ খাওয়া হবে না, সে আমি ঠিকই বলে রাখ্‌ছি।"

সুবোধ তথাপি উত্তর করিল না। সহসা ললিতার হৃদয়ে আশঙ্কার একটা চাপা মেঘ যেন উকি দিয়া তাহার স্বাধীন আশঙ্কাহীন মনের উপর একটা আবিলতা চাপাইয়া দিল। স্বামীর এই অবজ্ঞার নীরব আঘাত যেন তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিল, তাহাদের সমস্ত দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ললিতা এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইতেই সুবোধ তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"যাচ্ছ কোথা, শরীর ভাল নেই, শুয়েই থাক না।"

ললিতা স্বর নামাইয়া মৃদুমন্দভাবে বলিল,—"না, যাই, দুটি রেধে নি, সারাটা রাত না খেয়ে থাক্‌বে, সে হয় কি করে?"

সুবোধ একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ললিতার মুখে এমন কথাত সে এই তিন বৎসরের মধ্যে একটি দিনও শোনে নাই, এক রাত্রি কেন তিন দিন তিন রাত্রি না খাইয়া থাকিলেও ত ললিতা যখন শয্যা লইয়াছে, তখন তাহাকে উঠিতে দেখা যায় নাই। সে অন্যমনস্কের মতই বলিল,—"না আজ আমার মোটেই খেতে ইচ্ছা যাচ্ছে না, রাধ্‌তে হবে না তোমার।"

ললিতার মন এবার আরও নরম হইয়া পড়িল। অভিমান ও দর্পের গোড়ায় প্রকাণ্ড আঘাত পাইয়াও সে নিজের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় তটস্থ হইয়া উঠিল, কি জানি ইহারপর লীলা আসিয়া তাহার সাজান

বাগানের মালিক হইয়া বসিয়া প্রতিকূল বাতাসে তাহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে,—ললিতাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। তাই সে ম্লানমুখে সুবোধের হাত ধরিয়া কাতরবচনে বলিল—"বল না আমায়,আজ তোমার হয়েছে কি ?"

সেই ম্লান মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহসা সুবোধ যেন আবার কেমন হইয়া গেল, ললিতার এই বিন্দুমাত্র ক্লেশ সুবোধের হৃদয়কে বায়ুর মৃদু আঘাতে উদ্বেল সমুদ্রের মত একেবারে উদ্বেগে অস্থির করিয়া তাহার মনের গতি ফিরাইয়া তুলিল, সে ললিতার চিরদীপ্ত কাতর চক্ষুর কাল তারা দু'টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মূকের মত চাহিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ঘর ঘর করিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ী শ্লথ গতিতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সে শব্দে দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিয়া সুবোধ ও ললিতা উভয়েই বিস্মিত বিবর্ণ হইয়া পড়িল। প্রথমে ললিতমোহন, পেছনে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর হাত ধরিয়া কষ্টে রোগা শরীর বহিয়া লীলা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

বিষধর উদ্যতশীর্ষ সর্প দেখিয়া মানুষ যেমন একেবারেই হতাশ হয়, এই ব্যাপারে লীলা তদপেক্ষাও হতাশ হইয়া জীবনের মত সমস্ত হারাইতে বসিয়াছে, মনে করিয়া লাল হইয়া ঘামাইয়া পড়িল। সুবোধ মুহূর্ত্ত বজ্রাহত পথিকের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাশ্রুনেত্রে মাতার পাদস্পর্শ করিয়া পা মাথায় করিয়া লইতেই মাতার অবরুদ্ধ অশ্রু দেবীঘটের শান্তির জলের মত সুবোধের শরীরে ফোটার আকারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

ললিতমোহন কি বলিবে এতক্ষণ যেন তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না, সহসা প্রায়মৃত্তিকাসংলগ্ন লীলার মূর্ত্তি চোকে পড়িতেই সে ডাকিল —"সুবোধ ?"

সুবোধ এতক্ষণে মায়ের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, এ আহ্বানে আবার বাহিরে আসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ললিতমোহন তাহার হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া স্নেহপ্রবণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছিস্ রে ?"

সুবোধ কোন কথা বলিল না,কথা বলিবার শক্তিও তাহার তখন ছিল না। সুবোধকে নীরব দেখিয়া ললিতমোহন এবার সহজ শান্তস্বরে বলিল—"লীলার

এবার মরণাপন্ন ব্যামো হয়েছিল, বাঁচ্‌বে এমন আশা কাহারও ছিল না, অনেক চেষ্টায় এখন তবু কতক সেরেছে, কিন্তু রোগের আক্রমণ ত যাচ্ছে না, তাই তোর এখানে নিয়ে এলাম, এখানে ভাল চিকিৎসক দেখিয়ে যদি সারাতে পারিস।"

সুবোধ যেন সহসা কথা বলিবার মত মস্ত সুযোগ পাইল, সে শ্লেষ করিয়া বলিল—"কৈ অসুখের সংবাদও ত আমায় দেয় নি, তবে আজ আবার আমার এখানে কেন?"

ললিতমোহন কোন প্রকারের দ্বিধা না করিয়া স্পষ্ট পরিষ্কারস্বরে বলিল—"বলিস কি, তোকে যে আমি নিজহাতে তিন তিনটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করেছি।"

সুবোধের মনটা আর একবার আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল—"তিন তিনটা টেলিগ্রাম, সে ত আমি ঘুণাক্ষরেও জানিনি।" তার-পর একটু চিন্তা করিয়া মুখ তুলিতেই ললিতার প্রদীপ্ত অনলোল্লাস দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলাইয়া গেল। সুবোধ এতটুকু হইয়া পড়িয়া বলিল—"সে যাক্, কিন্তু তোমারই ত বাসা রয়েছে, চিকিৎসা যদি কত্তেই হয় ত সেখানেও কত্তে পার, এখানে ত সুবিধে হবে না।"

লীলা এবার দেওয়াল ধরিয়া আস্তে আস্তে মাটির মধ্যে বসিয়া পড়িতেছিল, তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ললিতমোহন বলিল—"আমার ওখানে রেখে চিকিৎসা কত্তে আমার কোন আপত্তি ছিল না, আর আমি বলেও ছিলাম তাই, কিন্তু লীলা ত রাজি হচ্ছে না।"

দূর হইতে চীৎকার করিয়া ললিতা বলিল—"ওসব ন্যাকামি এখানে খাটবে না, আমি কিন্তু বলে রাখ্‌ছি, এসব লোক যে বাড়ীতে থাক্‌বে, আমি তার ত্রিসীমায়ও থাকতে পার্‌ব না।"

"চুপ কর ললিতা" বলিয়া সুবোধ থামিতেই ললিতমোহন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"লীলা বল্‌ছিল, মর্‌তে হয় স্বামীর কাছেই মর্‌ব, ঘর থেকে যদি তাড়িয়েও দেন, তবু আমি সেই মাটি আক্‌ড়ে পড়ে থাক্‌ব। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।"

ললিতা গন গন করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা সুবোধের মাতা আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এসব কি কথা বাছা, ছি, এমন

সোণার বৌ, মিছে দোষ দিয়ে ওকে ত তুই আর তাড়াতে পারবি না। ওতে যে তোর পাপ হবে।"

ললিতা ঘাড় বাঁকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল--"মিছে দোষ, তাই না, আচ্ছা দিক্‌ই যায়গা, তখন দেখা যাবে।"

সুবোধ একেবারে বসিয়া পড়িল, একদিকে স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি মাতার নিষেধ, অন্যদিকে ললিতার বিধি, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ললিতা আবারও চীৎকার করিয়া বলিল—"রেখেই দেখ, আমি কালই চলে যাচ্ছি এবাড়ী থেকে। দাদাকে সব বল্‌ব, এই যে চাকরী হচ্ছে, দেখি কদ্দিন থাকে, সবাই যদি না খেয়ে মরে ত তখন আমায় দোষ দিও না।"

দুর্ব্বলচিত্ত সুবোধ ভীত হইয়া পড়িল। ললিতার আদেশ মাথায় পাতিয়া লইয়া বলিল—"আমি ত ওকে ত্যাগ করেছি, আর যার জন্য ত্যাগ করেছি, তাও তোমার অবিদিত নেই, তবে আর আমার এখানে কেন।"

ললিতমোহন লীলার দিকে চাহিয়া অনায়াসে এই আঘাতটাও সহ্য করিয়া লইল। মনে মনে বলিল—"আমার ত কোনই লক্ষ্য নেই, তবে আর কেন, মানুষের কথায় আমার কি যায় আসে! লীলার সুখের জন্য প্রাণ দিতেও ত আমি কুণ্ঠিত নই, আমার জীবনের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে ত, সে লীলার সুখ, দেখি মরেও যদি তা ঘটাতে পারি!" তারপর প্রকাশ্যে বলিল—"এ কথার উত্তরত ভাই আমি দিতে পারি না, লীলার অমতে তাকে আমার বাড়ী নেবার অধিকারও আমার নেই। ও এখানে আস্‌তে চেয়ে ছিল, আমি পৌঁছে দিতে এসেছি মাত্র।"

সুবোধ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না না, সেকথা এখন আর আমি শুনতে পারি না।"

সুবোধের বৃদ্ধা মাতা হাত ধরিয়া সুবোধকে বলিলেন—"থাম বল্‌ছি সুবোধ, মার কথা অবজ্ঞা করিস্ না।"

সুবোধ কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই ললিতমোহন দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমি আর কোন কথা বল্‌তে চাইনি, কোন কথা শুনবারও আমার দরকার নেই। এই লীলা তোর স্ত্রী, ওকে রাখা না রাখা তোরই হাত, এটা সবাই জানে যে, স্ত্রীতে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সবারই রয়েছে।" বলিয়া ললিতমোহন আর কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিয়া বলিল—"জল্‌দি হাঁকাও।"

(ক্রমশঃ)

শোভনা।

[লেখক—শ্রীশ্রীধরচন্দ্র সমাদ্দার বি, এ,]

(১)

সে অনেকদিনের কথা। ভারতাকাশে তখনও হিন্দুর গৌরবরবি দেদীপ্যমান। কিন্তু সে সময়ে সমগ্র ভারতের উপর এমন একচ্ছত্র সম্রাট্‌ রাজত্ব করিতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিগণ আপন আপন সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র রাজত্বের উপর প্রভুত্ব করিতেন। আর প্রত্যেকেই আপনাকে অসীম ক্ষমতাপন্ন বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। কাজেই মুসলমান যখন দেশ আক্রমণ করিল, তখন সকলে একত্র হইয়া বাধা প্রদান করিলেন না, প্রত্যেকেই বালির বাঁধ দিয়া আপনার পৃথকত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেন। এবং ফলে সকলেই প্রবলকায় মহম্মদীয় শক্তির স্রোতে ভাসিয়া গেলেন।

তখন রাঠোরবংশে জয়চন্দ্র রাজত্ব করিতেন এবং চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে চিরবৈরীভাবে কালযাপন করিতেন। যেদিন জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের অবমাননার জন্য তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বীরোপাসিকা কন্যা সংযুক্তা সেই মূর্ত্তির গলদেশেই বরমাল্য অর্পণ করিলেন, আর তন্মুহূর্ত্তেই পৃথ্বীরাজ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন, সেইদিন হইতে তাঁহাদের বৈরীভাব যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে দুইটী যুবক পৃথ্বীরাজের রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল কমল সিংহ আর অরুণ সিংহ। দুইজনে কৈশোরে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এক অস্ত্র-শিক্ষকের কাছে অস্ত্র-বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন, এক শাস্ত্রাধ্যাপকের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন এবং কৌশোরের এক শুভ প্রাতঃকালে উভয়ে আপনাপন তরবারি বদল করিয়া চিরবন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

কমলসিংহ এবং অরুণসিংহ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট আদর, অনুগ্রহ লাভ করিতেন, প্রজাদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, আর রাজানুচরদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতেন। একদিন দুইবন্ধু গোপনে পরামর্শ

করিয়া ছদ্মবেশে দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। পৃথ্বিরাজ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলেন না,তাঁহারা কোথায় কি উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছেন। রাজার নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ করিয়া, তাঁহারা রাজার অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই।

তাঁহারা এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথে দীনদুঃখী দেখিলে তাহার শুশ্রূষা করিতেন, পাপের অনুষ্ঠান দেখিলে তাহা দমন করিতেন। আবার এক রাজসভায় গমন করিয়া আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিতেন।

অবশেষে তাঁহারা রাজা জয়চন্দ্রের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। একদিন তাঁহারা রাজধানীর সমীপবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বৃদ্ধা বিধবার একমাত্র পুত্রকে রাজপুরুষগণ বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া তাহার নির্দ্দোষিতার কথা জ্ঞাপন করিতেছে, কিন্তু রাজপুরুষগণের কঠিন হৃদয় তদ্দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিগলিত হইতেছে না।

দুই বন্ধু দেখিয়া সেখানে থামিলেন। অরুণসিংহ ব্যাপার কি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা বলিল—"ওগো! কে রাজসরকারের হরিণ বাণদ্বারা বিদ্ধ করেছে, তাই আমার নির্দ্দোষী ছেলেকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে।" সেখানে দর্শকদিগের মধ্যে একটী বৃদ্ধ লোক ছিল। সে বুড়ীর কথার সমর্থন করিয়া বলিল—"রাজার বাগানে কতকগুলি মৃগ চরিতেছিল। তাহার মধ্যে একটাকে কে বাণবিদ্ধ করেছে।" রাজকর্ম্মচারিগণ গ্রামে আসিয়া তাহাই তদন্ত করিতেছিলেন! তখন গ্রামের সকলে একত্র হইয়া অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই যুবকের নাম করিয়াছে। যুবকের অপরাধ এই যে, সে অত্যন্ত সাহসী; কাহাকেও ভয় করে না। প্রতিবেশীগণ এই প্রকারে তাহার প্রতিশোধ লইল।

বুড়ী আবার কাঁদিয়া বলিল—"ওগো! আমার এই একটীমাত্র ছেলে, কোন দোষ করে নাই, উহাকে ছাড়িয়া দাও।" এমন সময়ে কমলসিংহ রাজ পুরুষদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"তোমরা ঐ নির্দ্দোষ যুবকটীকে ছাড়িয়া দাও। আমিই হরিণ বধ করিয়াছি, আমাকে লইয়া চল।"

কথাটা শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যুবকের প্রতি বিস্ময়াবিষ্ট নেত্র স্থাপন করিল। দেখিল সে বিদেশী, হস্তে তীরধনু রহিয়াছে। তাহার

চেহারা ও সাহস দেখিয়া কথাটা অসম্ভব বোধ হইল না। বিশেষতঃ নির-পরাধী কি পরের দণ্ড গ্রহণ করিতে আসিতে পারে। আর বৃদ্ধার পুত্র রাজা জয়চন্দ্রের প্রজা, সে কি রাজমৃগ বধ করিতে সাহসী হয়!

রাজপুরুষগণ অবিলম্বে বৃদ্ধার পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কমলসিংহকে ধরিবে, এমন সময়ে অরুণসিংহ অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তোমরা উহাকে ধরিও না, বাণ আমিই মারিয়াছিলাম।"

কমল কহিল—"সেকি অরুণ, তুমি মারিলে কই! বিনা দোষে আমার জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতে কেন আসিয়াছ?"

অরুণ সে কথার প্রতিবাদ করিলেন, এবং উভয়েই তর্ক করিয়া আপনাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। রাজপুরুষগণ দুই জনের মধ্যে কে প্রকৃত অপরাধী ঠিক করিতে না পারিয়া উভয়কেই বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেন, রাজার নিকট তাহাদের বিচার হইল। তাঁহার সাক্ষাতেও দুইজনে পূর্ব্বের মতই নিজকে অপরাধী ও বন্ধুকে নির্দ্দোষ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন।

রাজা জয়চন্দ্র বলিলেন—"তোমরা যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার প্রকৃত শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজন অপরাধ করিয়াছ, কারণ মৃগের শরীরে একটিমাত্র বাণ বিদ্ধ হইয়াছে, একের অপরাধে দুইজনকেই শাস্তি-প্রদান করা আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব যে পর্য্যন্ত তোমাদের কে প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত উভয়কেই আমি বন্দি করিয়া রাখিব। তবে তোমরা বিদেশী ও অবয়বে বুঝিতেছি তোমরা ভদ্রবংশীয়। তাই তোমাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে হইবে না। বিনাশ্রমে তোমাদিগকে কারাগারে রাখা হইবে।"

দুইবন্ধু রাজাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন রাজাদেশে প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে সভার বাহিরে লইয়া গেল।

(২)

রাজোদ্যানের অনতিদূরে কিঞ্চিদুন্নত ভূমিতে একটী অপ্রশস্ত গৃহে কমল ও অরুণ বন্দীজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দুইবন্ধু অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যে বাল্য, কৈশোরের ও যৌবনের কত ঘটনা অবলোকন করিতেন—দেখিতে দেখিতে কোন কোন দিন সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত। আবার যখন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয় আলোচনা করিতেন

তখন উভয়েরই বদনে এক চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইত। কোন কোন দিন পরামর্শ করিতেন যে প্রভু পৃথ্বিরাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তাহাই বা কোন মুখে করিবেন? আসিবার সময়ে তাঁহার অনুমতি লইয় আসা হয় নাই? আর এই কারাগারে ত তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমেই আসিয়াছেন মৃত্যুকেও ত তাঁহারা আলিঙ্গন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন—এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন!

একদিন বসন্তের অপরাহ্নে অরুণসিংহ ক্ষুদ্র কারাগৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন। কমলসিংহ উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট উপবেশন করিয়া উদ্যানের রমণীয়তা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন—এ নিশ্চয়ই কোন দেবকন্যা, অথবা পরীর রাণী হইবেন।

অরুণ মস্তকোত্তলন করিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে? কাহার কথা বলিতেছ কমল?

কমল সে কথার উত্তর প্রদান না করিয়া পুনরায় বসিলেন—নিশ্চয়ই দেববালা।

অরুণ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া গবাক্ষের সন্নিকটে আসিয়া বলিলেন—এ নিশ্চয়ই রাজকন্যা শোভনা, পৃথ্বিরাজ-মহিষী সংযুক্তা দেবীর কনিষ্ঠা সহোদরা। যদি কোন দিন মুক্ত হইতে পারি তবে যে প্রকারেই হউক তাঁহাকে বিবাহ করিয়া জীবন সার্থক করিব।

কমলসিংহ কহিলেন—অরুণ তাহা মনেও ভাবিও না। আমিই উঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি। উঁহাতে শুধু আমারি অধিকার—তোমার কদাচ নহে।

অরুণ বলিল—তুমি উঁহাকে মানব বলিয়া দেখ নাই, কোন দেবকন্যা অথবা পরী বলিয়াই ভাবিয়াছিলে, পরে আমি দর্শন মাত্র শোভনাদেবীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। শোভনা আমারি হইবে।

দুইবন্ধু এই প্রকার তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা বন্দী; কোন দিন মুক্ত হইতে পারিবেন কিনা তাহার ঠিক নাই, আর মুক্ত হইলেই কি রাজকন্যাকে অমনি বিবাহ করা চলিবে! স্বয়ম্বর সভায় শোভনা কোন এক রাজার গলে বরমাল্য অর্পণ করিবেন ইহাই সম্ভবপর, কিন্তু বন্ধুদ্বয় তত চিন্তা করিলেন না। এই এক মুহূর্ত্তের জন্য একটী আকাশ কুসুম অবলোকন করিয়া উভয়ে চিরসৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইলেন। যেন একে অন্যের কতই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত।

এদিকে রাজকুমারী শোভনা সহচরীদের সহিত কুসুমোদ্যানে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া অনেকগুলি পুষ্প চয়ন করিয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। প্রকৃতিদেবী কালো পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। দুইবন্ধুর মনে হইল যেন শোভনার অন্তর্দ্ধানেই উদ্যানটী মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল। আর সেই অস্তগামী সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিরবন্ধুত্ব ভাব অন্তর্হিত হইল।

(৩)

উপরোক্ত ঘটনার তিনদিন পরে একদিন প্রত্যুষে প্রহরীগণ দেখিতে পাইল যে নানা প্রকার কৌশলে তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া অরুণসিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাহারা কমলকে তাঁহার বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞসা করিল, কিন্তু তিনি কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তখন কাজেই কথাটা রাজার কানে উঠিল। রাজা চিন্তা করিয়া বলিলেন— উহাদের মধ্যে যে প্রকার দৃঢ় বন্ধুত্ব তাহাতে পলায়নের সংবাদ কমলসিংহ নিশ্চয়ই জানে। উহার সহায়তায়ই সে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন উহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহা হইলেই পলাতকের খবর পাওয়া যাইবে!

প্রহরিদিগকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিলেন, বলিলেন, যদি আসামীকে ধরিয়া আনিতে পার তবে পুনরায় চাকরী দেওয়া যাইবে। তাহাদের স্থানে নূতন প্রহরী নিযুক্ত হইল। কমলসিংহের যেমন কড়া পাহারা তেমন কঠিন পরিশ্রম চলিতে লাগিল। এ পরিশ্রম তিনি অনায়াসে সহ্য করিতে পরিতেন, কিন্তু যখন ভাবিতেন যে অরুণ হয়ত দেশে ফিরিয়া পৃথ্বিরাজের নিকট সৈন্য ভিক্ষা করিয়া লইয়া শোভনাকে কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিবে তখন তাঁহার দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

এদিকে অরুণসিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বরাবর স্বদেশে পৃথ্বিরাজের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বিরাজ অনেক দিন পরে অরুণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কমলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অরুণ বলিলেন—আমরা এ স্থান হইতে একত্র বহির্গত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কিছু দূর গমন করিয়াই দুইজন দুই পথ ধরিয়া গিয়াছিলাম। কাজেই তাহার খবর আমি কিছুই পাই নাই।

অরুণ এই প্রকারে পৃথ্বিরাজকে প্রতারণা করিয়া রাজসভায় কিছু দিন বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ শোভনার নিকট বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই পৃথ্বিরাজের রাজসভা তাঁহার নিকট কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কমলের সহিত মনোমালিন্যের পর হইতে তাঁহার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এখন তৎসম্বন্ধে অথবা শোভনার বিষয়ে পৃথ্বিরাজকে কিছু না বলিতে পারায় মন আরও ব্যথিত হইতে লাগিল।

একদিন তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পুনরায় স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সৈনিকের বেশে জয়চন্দ্রের রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের সভায় সৈনিকবেশ-ধারী অরুণসিংহকে কেহই চিনিতে পারিলেন না। মহারাজ প্রথম তাহাকে সৈনিক বিভাগে একটী সামান্য পদ প্রদান করিলেন, কিন্তু অল্প দিনেই অরুণ স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে অতি উচ্চপদ লাভ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন।

(৪)

আজ রাজা জয়চন্দ্রের বিশেষ মৃগয়ার দিন। প্রতি বৎসর এই দিনে পাত্র মিত্র অনুচর ও পৌরজনবর্গ সঙ্গে করিয়া তিনি মৃগয়ায় বাহির হন। সে দিন উৎসব আমোদের কোন ত্রুটী হয় না।

অন্যান্য অনুচরবর্গের সহিত অরুণসিংহও আজ মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। তিনি একটী ক্ষিপ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া অগ্রে চলিয়াছেন। হঠাৎ একটী মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি অমনি তাহার পশ্চাতে অশ্ব ধাবন করিলেন। হরিণ প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে যে দিক্ পথ পাইল সেই দিকেই চলিল। অরুণও মৃগয়ায় পারদর্শী; তিনিও পিছন পিছন ছুটীলেন। এই রূপ অনেক দূর গমন করিয়া দেখিলেন মৃগ দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পশ্চাতে চাহিলেন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন তিনি অন্যান্য সকল হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাই বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন এবং হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন—যদি শোভনাকে লাভ করিতে না পারি তবে আমার জীবনে কি কাজ।

"তোমার জীবনে কাজ নাই, অরুণসিংহ! পিছন হইতে কে বজ্রগম্ভীর স্বরে ইহা বলিয়া উঠিল। এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাহার কোষ হইতে, তরবারি তীর ধনুক ও বর্শা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অরুণ প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই

তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। বিস্ময়ে ও ক্রোধে চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে কমলসিংহ!

কমলসিংহ কহিলেন—অরুণ, বিলম্ব করিও না। আমার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। হয় তোমাকে শেষ করিব, না হয় আমাকে শেষ করিয়া ফেল। আমি তোমার ভীষণ শত্রু। তোমাকে বধ করিব বলিয়া জেল হইতে ছলে বলে পলায়ন করিয়াছি।

অরুণ বলিলেন—কমল, তুমি কাহার সাক্ষাতে কথা বলিতেছ জান কি? আমি এ রাজ্যের একজন প্রধান সেনানায়ক। এখনি তুমি পলাতক বলিয়া ধরাইয়া দিব। কাল তুমি ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বমান হইবে।

"বটে! আর তুমি পলাতক নও!" বলিয়া কমলসিংহ অরুণকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, অরুণ তাহা ফিরাইয়া লইলেন। তখন দুইজনে তুমুল মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেন একজন আর একজনের মজ্জাগত শত্রু। বন্ধু শত্রু হইলে যেমন হয়, তেমন বুঝি চিরশত্রুও কখন হয় না।

হঠাৎ দশ পনর জন লোক আসিয়া তাঁহাদের যুদ্ধের ব্যাঘাত জন্মাইল। তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, স্বয়ং রাজা জয়চন্দ্র লোকজন সহিত সেখানে উপস্থিত। মহারাজ অরুণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন তুমি এ কাহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে? অরুণ বলিলেন মহারাজ, ইঁহার নাম কমলসিংহ। ইনি আপনার একজন বন্দী। পলায়ন করিয়া গিয়াছিলেন।

কমলসিংহ বলিলেন—মহারাজ আর ইঁহার প্রকৃত নাম অরুণসিংহ, ইনিও আমার সহিত একই কারণে কারারুদ্ধ হইয়া একই প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। তারপর একদিন আমারও অজ্ঞাতসারে ইনি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আপনার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মহারাজ চিন্তা করিয়া বলিলেন—বেশ কথা। কিন্তু তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেন? একদিন দেখিয়াছি তোমরা পরস্পর বন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ মস্তক পাতিয়া মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে।

কমলসিংহ বলিলেন—মহারাজ চিরদিন কাহারও সমান যায় না। তারপর বন্ধুত্ব হইতেও যদি শ্রেষ্ঠতর জিনিস সম্মুখে উপস্থিত হয় তবে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কি প্রকারে?

ইহা কহিয়া তিনি সরল, অকম্পিত ভাবে রাজোদ্যানে সেই সুন্দরী

শ্রেষ্ঠ শোভনাকে তাঁহারা যেরূপে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতে কিরূপে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহার অজ্ঞাতে অরুণ পলায়ন করিলেন এবং আজ সমস্ত প্রহরী মৃগয়ায় গমন করিলে অবশিষ্ট একমাত্র প্রহরীকে নানা প্রকারে ছলনা করিয়া তিনি কিরূপে এই বনের মধ্যে আসিয়াছেন, সম্পূর্ণ যথাযথ নিবেদন করিলেন।

মহারাজ ক্রোধে, বিস্ময়ে তাহার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তোমাদের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া আবশ্যক। আচ্ছা আর একটি সত্য কথা বল দেখি—তোমাদের জন্মস্থান কোথায় ?

কমল বলিলেন, মহারাজ বলিয়াছি ত সবই সত্যকথা বলিব। আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন। আমরা চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের —।

তাঁহার বাক্য সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন বলিলেন—কি সেই কাপুরুষ, ভীরু, হতভাগার লোক আমার রাজত্বে আসিয়া এত কাণ্ড করিল, আমি তোমাদের প্রাণ —।

জয়চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পিছনের হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া কুমারী শোভনা আসিয়া মহারাজের পাদস্পর্শ করিলেন এবং বিনয় নম্র বচনে বলিলেন—পিতঃ! এই দুই বীর-যোদ্ধার প্রাণ ভিক্ষা চাই।

রাজমহিষীও আসিয়া কন্যার সহিত একই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

(৫)

জয়চন্দ্রের রাজ্যে এক জনরব উঠিল যে মহারাজের এক নূতন খেয়াল হইয়াছে। তিনি সে বৎসর সংযুক্তার স্বয়ম্বরে অপমানিত হইয়াছেন বলিয়া এবার কনিষ্ঠা কন্যা শোভনার বিবাহে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিবেন না। কোথাকার দুটি জেল ভাঙ্গা কয়েদী; তন্মধ্যেই একজনকে জামাতা নির্ব্বাচন করিবেন। সেই দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ হইলে যিনি জয়লাভ করিবেন, তাঁহার গলেই শোভনা বরমাল্য অর্পণ করিবেন।

কথাটা অনেকে প্রথম বিশ্বাসযোগ্য মনে করিল না। কিন্তু অবশেষে যখন রাজদূত আসিয়া গ্রামে যুদ্ধ দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তখন সকলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাজ প্রাসাদের অনতিদূরে এক সমতল ক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করা হইল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য অধিক স্থানের প্রয়োজন হইল না; মাত্র

দুইজন লোক যুদ্ধ করিবেন। দর্শক বৃন্দের জন্যই অধিক স্থান রাখা হইল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বেই দর্শকমণ্ডলী যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

রাজা, রাণী, রাজকন্যা ও অন্যান্য পরিজন বর্গের জন্য সুন্দর আসন স্থাপিত হইল। যথা সময়ে তাঁহারা আসন পরিগ্রহ করিলেন। সকলেই এই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত।

যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজা জয়চন্দ্র শোভনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— মা! সত্যই কি তুমি এই বীর যুগলের একজনকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?—শোভনা মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা বলিলেন তবে যুদ্ধারম্ভের আজ্ঞা দিই?

শোভনা বলিলেন—পিতঃ আপনি যোদ্ধাদ্বয়কে আদেশ করুন যে প্রাণবধ না করিয়া পরাজিতকে বন্দী করিয়া আনিতে পারিলেই জয় সাব্যস্ত হইবে, নচেৎ নহে।

মহারাজ কন্যার অনুরোধ ক্রমে তাহাই প্রচার করিলেন। তখন দুই বন্ধুতে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, শোভনার প্রতি একবার করুণ কটাক্ষ পাত করিয়া দুইটী অশ্বারোহণ করিয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুইজনেই ধনুর্বিদ্যা বিশারদ, দুইজনেই শিক্ষিতাশ্বারোহী, উভয়েরই তূণে সমসংখ্যক তীর, অশ্বগাত্রে সমসংখ্যক বর্ষা, কাজেই অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যালোকে উভয়ের উজ্জ্বল অস্ত্ররাশি ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, অনেকক্ষণ অশ্ব হ্রেষারব করিয়াছিল। কেহই বুঝিতে পারিল না, কে হারিবে, কে জিতিবে।

অবশেষে তাহাদের অস্ত্ররাশি নিঃশেষ হইয়া আসিল, ইহার পরে কি প্রকার যুদ্ধ হইবে তাহাই অনেকে চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ কমলসিংহের দৃষ্টি একবার শোভনার উপর পড়িল। শোভনা নির্নিমেষ লোচনে তাঁহাদের যুদ্ধে অবলোকন করিতেছিল, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছিল কিনা তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় ছিলনা। এমন সময়ে কমলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতেই চারি চক্ষুর মিলন হইল। কমল ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র, জয় পরাজয়, সম্মুখে অরুণসিংহ সব ভুলিয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তে অরুণ কমলের অশ্বকে এমন এক আঘাত করিলেন যে

অশ্বটী ভূতলশায়ী হইল। কমল প্রস্তুত ছিলেন না তিনিও তৎসঙ্গে ভূতলশায়ী হইলেন। ভূতলশায়ী হইবামাত্র কমল আর একবার শোভনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—শোভনা তাহার পতনে কি মনে করিতেছেন! তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান লোপ হইল। অবসর বুঝিয়া অরুণ আসিয়া কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

বন্দী কমলসিংহকে তখন বাধ্য হইয়া অরুণসিংহের অনুগমন করিতে হইল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে ও নৈরাশ্যে কমল সঙ্কুচিত হইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল! অরুণের উদয়ে কমল বিলীন হইয়া আসিল।

তাঁহার দুইজন রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দ্দিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করা কষ্টকর হইল। মহারাজ বলিলেন—অরুণসিংহ জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি পৃথ্বিরাজের লোক হইলেও এ যাবত এদেশে থাকিয়া অনেক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন আমার ইচ্ছা যে স্নেহের কন্যা শোভনা তাঁহার গলেই বরমাল্য অর্পণ করেন।

রাজা থামিলে চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি হইল। তখন কমলসিংহ পুনর্ব্বার শোভনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাতে শুধু কাতরতা কোমলতা মাখা। শোভনাকে বুঝি সে দৃষ্টিতে আকুল করিয়া তুলিল। সকলে দেখিল তাহার চোখের পাতা বহিয়া এক ফোঁটা জল পড়িল। মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি বলিলেন—শোভনা! তোমার প্রতি-শ্রুতি মতে অরুণসিংহের গলে বরমাল্য প্রদান কর।

তখন মন্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিলেন—মহারাজ শীঘ্র দেখুন অরুণসিংহের একি হইল!

সকলে চাহিয়া দেখিলেন অরুণসিংহের সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। তখনি চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ওঁর আঘাত গুলি কিছু গুরুতর হয়েছে। সেইজন্যই জ্ঞান লোপ হইয়াছে; কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এখন অবিলম্বে উহাকে এস্থান হইতে লইয়া যাওয়া দরকার।

মহারাজ তদ্রুপই আদেশ প্রদান করিলেন। কমলসিংহ লজ্জায় ও অপমানে স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

যুদ্ধের পর সাতদিন চলিয়া গিয়াছে। এই সাতদিন তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না। স্বয়ং রাজকন্যা শোভনা সহচরীর সহিত

দিবারাত্রি রোগীর শুশ্রূষা করিতেন। আর মনে মনে বলিতেন "বিধাতা সংসারে অশান্তি সৃজন মানসেই কি রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ক্ষুদ্র রমণীর জন্য প্রতিদিন কাঙ্গালের কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কত কি কাণ্ড ঘটিতেছে। এক সীতার জন্য সমগ্র সোনার লঙ্কা ধ্বংশ হইল। জ্যেষ্ঠাভগ্নী সংযুক্তার জন্য পৃথ্বিরাজ ও পিতার মনে চিরদিনের মত বৈরীভাব রহিয়া গেল। আর এই হতভাগিনীর জন্য দুই বীর পুরুষের মধ্যে একজন ত মৃত্যুশয্যায় শায়িত, আর একজন সেই কমলাসিংহ, জানি না অবমননা সহ্য করিতে না পারিয়া কি করিতেছেন।"

অষ্টমদিনে অরুণসিংহের আসন্ন কাল উপস্থিত হইল। তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে মহারাজ, রাজকন্যা শোভনা ও অপরাপর রাজানুচরগণ উপস্থিত হইলে জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া অরুণ বলিলেন "মহারাজ, আমিত চলিলাম। আপনাকে প্রতারণা করিয়াছি—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন একটা অনুরোধ—শোভনাকে কমলের হস্তে অর্পণ করবেন; এমন পাত্র আর মিলিবে না—তাঁহাকে বলিবেন—আমি পূর্ব্বের বন্ধুভাবে তাঁহাকে বরণ করিয়া বিদায় হইলাম।" বলিতে বলিতে অরুণের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া গেল। সকলেই বীরের মৃত্যুতে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

(৬)

তখন মহাম্মদঘোরী পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছে, পৃথ্বিরাজের রাজ্যে তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। কমলসিংহ মনে করিলেন পাঞ্জাবে গিয়া মহম্মদ-ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

যোদ্ধৃবেশে অশ্বারোহণ করিয়া যখন যাত্রা করিবেন সেই সময় জয়চন্দ্রের দূত প্রণাম করিয়া পত্র দিল। তাহাতে লেখা ছিল "আপনি শোভনার পাণি গ্রহণেচ্ছু ছিলেন। অবিলম্বে দয়া করিয়া আসিবেন। আপনার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিব। আপনার সঙ্গে যুদ্ধে আহত হইয়া অষ্টম দিনে অরুণ-সিংহ আপনার সহিত পুনঃ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।" পত্রে রাজা জয়-চন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল।

কমলসিংহের অশ্ব পাঞ্জাবাভিমুখে ধাবিত না হইয়া জয়চন্দ্রের রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল।

যথা সময়ে সালঙ্কৃতা, সহাস্য বদনা শোভনার সঙ্গে তাঁহার শুভ পরিণয় হইয়া গেল।

কৃতজ্ঞতা।

[লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায়]

(১)

সহসা বাহিরের কড়া ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল;—সুধার কর্ণে প্রথমে সে শব্দ প্রবেশ করে নাই, শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র সে তাড়াতাড়ী উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; তাহার অবশ অঙ্গ শয্যায় ঘুরিয়া পড়িল। সে প্রাণের আবেগে অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া আবার উঠিল,—ভাবিল নিশ্চয়ই তাহার স্বামী ফিরিয়াছেন, সে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাড়াতাড়ী দরজা খুলিয়া দিল। সে যাহার আশায় দরজা খুলিয়া দিল এতো সে নয়, এ যে রামচরণ; তাহার শ্বশুরের পুরাতন ভৃত্য।

রামচরণ বলিল,—"বৌদিদি, দাদাবাবু কোথায়?"

সুধা কি বলিবে উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। রামচরণ সুধার কান্না দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, সে একটু দম খাইয়া আবার বলিল,—"কি হয়েছে বৌদিদি কাঁদছ কেন?"

তথাপি উত্তর না পাইয়া সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না, অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে নির্ব্বাক, কেবল সুধা কাঁদিতেছিল। যখন সুধা বলিল,—"কি হবে রামচরণ?"

তখন প্রভুভক্ত রামচরণ আবেগে বলিয়া ফেলিল,—"ভাবনা কি বৌদিদি, ভগবান আছেন! বাবার পুণ্যে দাদাবাবু নিশ্চয়ই খোলসা পাবে। আর টাকাত মোটে তিন হাজার, এর জন্য ভাবনা কিসের। বাবার নাম করে যে বড়লোকের কাছে হাত পাতবো সেই তিন হাজার টাকা দেবে। তুমি কেঁদনা, আমি এলুম বলে, দাদাবাবু ততক্ষণ এসে পড়বে।"

সুধাকে আর কথা বলিতে অবসর না দিয়া রামচরণ বাহির হইয়া গেল, সুধা মনে মনে বলিল,—"মা ভবানী, রামচরণের কথাই যেন সত্য হয়, সে সেই নির্জ্জন বাড়ীটীতে একলা বসিয়া স্বামী ও রামচরণের আশায় পল গুণিতে লাগিল।

রামচরণ সুধার কাছ হইতে বিদায় হইয়া চলিতে লাগিল, তাহার কোথায় কিছু লক্ষ্য ছিল না, কেবল ভাবিতে ছিল, তিন হাজার টাকা, নতুবা তাহার প্রভুপুত্রের জেল হইবে। রামচরণ তাহা কি সহ্য করিতে পারে? সে জীবনের তৃতীয় অংশকাল যাহার অন্নে পরিপুষ্ট, যে মনিবের কৃপায় রামচরণ ঘর সংসার বাঁধিয়া সংসারী হইয়াছে, তাহার পুত্র জেলে যাইবে, সামান্য তিন হাজার টাকার জন্য। রামচরণ এই সকল কথা দুই একবার মনোমধ্যে ওলোট পালট করিয়া আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

হায়! বড় কষ্টে সে এই সংসারের চাকুরী ছাড়িয়াছে, পরেশের পিতৃঋণে যখন তাহাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল, তখন রামচরণ মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক বুঝিয়া অন্য স্থানে চাকুরী করিতে গিয়াছে; নতুবা এ সংসার ত্যাগ করিয়া সে কি যাইতে পারে? সে বহুবাজারে এক ধনীর বাটী চাকুরী করে, আর অবসর পাইলেই ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া এই সীমলার ক্ষুদ্র জীর্ণ বাড়ীটীর দরজায় আঘাত করে। রামচরণ যাহাদের কেবল দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র, তাহাদের কি অবস্থা হইবে মানসচক্ষে বুঝিয়া সে পাগলের মত হইল। রামচরণ কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কিছুই স্থিরতা নাই, সে দ্রুত—আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

(২)

সুধা সামান্য শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেছিল, কিছুতেই সে স্থির হইতে পারিতেছিল না। যত রাত্রি বাড়িতেছিল, চিন্তারাক্ষসী ততই তাহাকে উন্মাদিনীর মত নাচাইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া, কোথায় পরেশ একবার দেখিয়া আসে। সুধা দুইহাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার অশ্রু আর কিছুতেই বাধা মানিতে চাইতেছিল না। শ্রাবণের ধারার মত তাহার চক্ষুদ্বয়কে প্লাবিত করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিতেছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে কি একটা যাতনা রহিয়া রহিয়া সমস্ত হৃদয়টা ছাইয়া ফেলিতে ছিল। তাহার ভাদ্রের ভরা নদীর মত ঢল ঢল যৌবনশ্রী, শরতের প্রভাত-কমলের মত মুখখানি, বৈশাখের নব মুকুলিত চম্পকের মত বর্ণ, সবই এই কয় দিনে কে যেন চুরি করিয়া লইয়াছে। আজ আফিস যাইবার সময় তাহার স্বামী পরেশনাথ অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছে, "সুধা কেঁদনা, ভয় কি! আমি নিষ্পাপ, ভগবান আমাদের রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সুধার প্রাণ বুঝে

কই, কি যেন কিসের একটা ভীষণ ভয় তাহাকে জড়ের মত আড়ষ্ট করিয়া দিতে ছিল! তাহার কষ্ট সে ভিন্ন আর কে বুঝিবে ?

প্রতি মুহূর্ত্তেই সে শুইয়া শুইয়া কল্পনা চক্ষে দেখিতেছিল, যেন আফিসের সাহেব বলিতেছে, পরেশ নির্দ্দোষী, আবার দেখিল সাহেবের যেন অন্য মত হইল! সুধার বক্ষ শুকাইয়া গেল! তাহার জিহ্বা হইতে কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত যেন ধূলাময়ী রুক্ষ হইয়া যাইতেছিল। তাহার আপনার বলিতে জগতে কে আছে ? যে আছে—সে আজ বুঝি আর আসিবে না, আর বুঝি সুধা বলিয়া ডাকিবে না। আজ প্রায় সপ্তাহকাল তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই। যখনই সে পরেশের মুখে শুনিয়াছে, যে আফিসের টাকা ভাঙ্গার অপরাধে পরেশ অপরাধী, সেই দিন হইতেই সুধার আহার নিদ্রা দূরে,—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। শান্তি সুখ যেন তাহার হৃদয়ের কষ্ট কল্পনার অতি ক্ষীণ-রেখায় বিকসিত হইয়াছে। তাহার শাশুড়ী দয়া করিয়া পিতৃ-মাতৃ হীনা দরিদ্রের কন্যাকে নবমবর্ষ বয়সে গৃহে আনিয়া ছিলেন, আজ ৮।৯ বৎসর তাহা সে বিনা বাধায় ভোগ করিতেছিল, কিন্তু বুঝি আর সে সুখ সহিল না। সে ত কাহারও মন্দ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না, তবে কেন তার এমন হইল। আবার কড়া নড়িয়া উঠিল, এবার নিশ্চয়ই পরেশ আসিয়াছে ভাবিয়া সে সত্বর যাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে দেখিল রামচরণ। সে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, তাহার স্কন্ধের উত্তরীয় খানি ভিজিয়া গিয়াছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"বৌদিদি দাদাবাবু এখনও আসেনি ?"

সুধা আকুল কণ্ঠে বলিল,—"কই এখনতো এলেন না।"

রামচরণ বলিল,—"ভয় কি বৌদিদি, কেঁদনা!" তারপর একটা ভারি পুটলী তাহার হস্তে দিয়া বলিল,—"আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। যদি দাদাবাবু ফিরে আস্রে তারই হাতে এটা দিও, নতুবা কাউকে দিয়া এটা দাদা বাবুর নিকট পাঠিয়ে দিও। আমি কাল আবার আসবো।"

সেই ক্ষীণ আলোকে সুধা দেখিল, বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া যেন আনন্দঅশ্রু একটা প্রবল ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সুধা আর কিছু বলিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, যেন সে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে! রামচরণ আর একটীও কথা না বলিয়া সুধার বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

সুধা যেন একটা কূল পাইল, আজ কয়দিন ধরিয়া স্রোতের ভেলার মত

ভাসিতেছিল, স্রোতে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ঘুরাইতে ছিল, এতক্ষণে যেন একটু শান্তি পাইল। আরও প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আবার দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল, বাহির হইতে পরেশ বলিল,—"দরজা খোল।"

সুধা প্রতিক্ষণই তারই ধ্যান করিতেছিল, সে অতি দ্রুত দ্বার খুলিয়া দিল। পরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সুধা আমি নিস্কৃতি পাইয়াছি। আমি নির্দ্দোষী প্রমাণ হইয়াছে, মা আমাদের মুখ রক্ষা করিয়াছেন।"

সুধা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না! সুধা স্বামীর বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে সুস্থ হইলে সুধা তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। তাহারা ভাবিয়াছিল তাহাদের তিন হাজার টাকা দেয়, এমন লোক এ জগতে নাই, কিন্তু বুঝিল যতক্ষণ রামচরণ আছে ততক্ষণ তাহাদের সবই আছে। কৃতজ্ঞতায় তাহাদের প্রাণ ভরিয়া গেল, পরে কেবলমাত্র বলিল, রামচরণ মানুষ নয়—দেবতা!

সুধা ধীরে ধীরে বলিল,—"কাল রামচরণ এলে টাকাটা ফেরত দিও।

* * * * *

নির্দ্দিষ্ট সময় রামচরণ আসিল না;—আসে আসে করিয়া ২।৩ দিন কাটিয় গেল। তথাপি রামচরণের দেখা নাই। পরেশ একদিন আফিস হইতে ফিরিয় একখানি দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতেছিল। সহসা তথায় চক্ষে যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল,—সে দেখিল একস্থানে লেখা রহিয়াছে।

"মনিবের ক্যাস বাক্স চুরি

তিন হাজার টাকা তছরূপ।

রামচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি ধনকুবের বসু বাবুদের বাড়ীতে নূতন চাকুরী করিতেছিল। সে ক্যাস-বাক্স ভাঙ্গিয়া তিন হাজার টাকা চুরি করার অপরাধে ধৃত হইয়াছে। আগামী কল্য তাহার বিচার হইবে।

পরেশের চক্ষু ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সুধা জল খাবার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার স্বামী কাঁদিতেছে, সে বিচলিত হইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"কাঁদছ কেন?" পরেশ তাহাকে রাম-চরণের কথা বলিল,—

সুধার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—তাহার জলরখাবার রেকাব শুদ্ধ ঝণ ঝণ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। চক্ষের জল কোথা হইতে আসিয়া তাহার সমস্ত বক্ষ প্লাবিত করিল। সমস্ত পৃথিবী তাহার সম্মুখে অন্ধকার বোধ হইল।

* * * * *

তখনই পরেশ রামচরণ প্রদত্ত তিন হাজার টাকা লইয়া তাহার মনিবের বাড়ী চলিয়া গেল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা বলিয়া রামচরণের খালাসের জন্য তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বাবুটীর দয়া হইল,—তিনি বলিলেন যে যথাসাধ্য তিনি রামচরণকে খালাস করিবার চেষ্টা করিবেন। তবে এখন পুলিসের হাত—চেষ্টার ক্রটী হইবে না। * * * * *

পরেশ ও রামচণের মনিবের অনেকচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে রামচরণ খালাস হইল এবং তাহার প্রভুভক্তি দেখিয়া তাহার মনিবই তাহাকে পূর্ব্ব কার্য্যে বাহাল রাখিলেন।

বংশরক্ষা।*

(লেখক—শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল।)

(১)

নানাপ্রকারের মাদুলি ধারণ করিয়া, নানা দেবতার নিকট মানৎ করিয়া ও কালীঘাটে হত্যা দিয়াও যখন ১৮ বৎসর বয়সে বসুদের বৌয়ের সন্তান সম্ভাবনা হইল না, তখন বাড়ীর গৃহিণীর মুখে আপনা হইতেই একটা বিষাদের রেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

* * * * *

সত্যলাল বসুদের বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তাহার পিতা তাহাকে শৈশবাবস্থায় রাখিয়া অকালে মরিয়া যান। সেই অবধি তাহার মাতা অতি যত্নে তাহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল ছিল না। যখন সত্যলালের খুড়ী নাবালক ভাইপোর

পৈতৃক বাসভবনের অংশটুকু ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। তখন সত্যলালের মাতা অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় সত্যলালের দূর সম্পর্কীয়া এক খুড়ীর বাড়ী আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সত্যলালের খুড়ীমা নিঃসন্তান। তিনি সত্যলালকে আদরে ক্রোড়ে স্থান দিয়া পুত্রের অভাব জনিত দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া গেলেন। সত্যলালও আলালের ঘরের দুলাল হইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

সত্যলালের খুড়া মহাশয় কলিকাতার এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ঘরে কিছুরই অভাব ছিল না। তবে তাঁহার স্বভাবচরিত্র আদৌ ভাল ছিল না। তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিতেন। সেইজন্য অকালেই পত্নীর সিঁথীর সিন্দুর মুছাইয়া এত সুখের ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর সময় তাঁহার ছেলেপিলে কিছুই হয় নাই। তথাপি সত্যলালের খুড়ীমা স্বামীর বাটীতেই থাকিয়া অপর লোকজনের দ্বারা বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা করিতেন। তবে প্রিয়জনের বিরহে ও অভাবে তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইত ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিক মরুভূমি বলিয়া মনে হইত। তাই যখন সত্যলালের মাতা পুত্র লইয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইল, তাঁহার আনন্দের ও সুখের সীমা রহিল না। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য পৌষ্যপুত্র লইবেন মনে করিয়াছিলেন, এখন সে, সংকল্প ত্যাগ করিয়া সত্যলালকেই নিজের ছেলের ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন।

সত্যলাল স্কুলে ভর্ত্তি হইল। কিন্তু অতিরিক্ত আদর পাইলে ছেলেপিলে যেমন অবাধ্য ও পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়, সত্যলালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। সে নামে মাত্র একবার স্কুলে যাইত, আর অবশিষ্ট সময় গল্পগুজব করিয়া ও বন্ধুদের সঙ্গে তাস পাশা খেলিয়া কাটাইয়া দিত। কিন্তু তাহার একটি বড় গুণ ছিল। পড়াশুনায় অমনোযোগী হইলেও তাহার স্বভাব চরিত্র যতদূর সম্ভব নির্ম্মল ছিল। তাহার খুড়ীমাও তাহার পড়াশুনা সম্বন্ধে তত গ্রাহ্য করিতেন না ; কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, সত্যলাল বুঝিয়া চলিতে পারিলে তাঁহার স্বামী তাহার নামে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাইতে পারিবে।

এইরূপে ষোড়শবৎসর বয়সে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া সত্যলাল তাহার পাঠ শেষ করিল। তাহাকে সৌভাগ্যবশতঃ কখনও চাকুরির দরখাস্ত

করিতে হয় নাই; নচেৎ তৃতীয়শ্রেণী অবধি পড়িয়াও আবেদন পত্রে প্রথম শ্রেণী অবধি পড়িয়াছি ও অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এরূপ মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতে হইত।

পড়া শেষ হইলেই নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। তাহার খুড়ীমা অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটি সুন্দরী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিলেন। লাল টুকটুকে বউ দেখিয়া সকলেরই মনে আনন্দ হইল। সত্যলালের কথা আর বিশেষভাবে কি উল্লেখ করিব? সত্যলালকে সংসারী দেখিয়া তাহার খুড়ীমা বড়ই সুখী হইলেন। তিনি কল্পনাতে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারই স্বামীর এক আত্মীয় তাঁহার ভবনে থাকিয়া দুইবেলা সন্ধ্যা জ্বালাইতেছে ও বংশের ধারা বজায় রাখিয়াছে।

মানুষ ভাবে এক ভগবান করেন আর। সত্যলালের বিবাহের পর ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার মাতার কাল হইয়াছে। খুড়ীমার আদর যত্নে সত্যলাল মাতৃবিয়োগজনিত কষ্ট তত বুঝিতে পারিল না। তিনি সত্যলাল ও তাহার স্ত্রীকে নিজের পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় সাধে ছাই পড়িল। বৌমার বয়স ১৮ বৎসর হইল, অথচ তাহার কোনও সন্তান সম্ভাবনা হইল না; বরং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের লক্ষণ সকলই স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। সত্যলালের খুড়ীমার দুঃখের সীমা রহিল না। আজ না কাল, এ বৎসর নয়, আর বৎসর বৌমার পুত্র সম্ভাবনা হইবে, এই বলিয়া তিনি ছয় বৎসর মনকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে বড়ই ভয় হইল; বুঝি তাঁহার সব আশা ভরসাই নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি বৌকে কত ঔষধ খাওয়াইলেন, কত মাদুলী ধারণ করাইলেন, নিজে কত ব্রত উপবাসাদি করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না।

(২)

সত্যলালও এ বিষয়ে প্রথম আদৌ উৎকণ্ঠিত হয় নাই। সে বেশ স্ফূর্ত্তি করিয়া আমোদে দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিল। কিন্তু ললিতা খুড়ীমার মনের ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল এবং আপনাকেই সেই কষ্টের কারণ মনে করিয়া বড়ই বিষণ্ণ ছিল। সন্তানহীন নারী-জীবন ফলহীন পাদপের ন্যায় ব্যর্থ বলিয়া তাহার মনে হইল। এই বিপদ-

হইতে উদ্ধার পাইবার এক উপায় স্থির করিয়া সে একদিন রাত্রে স্বামীকে মনের কথা খুলিয়া বলিল,—"দেখ, বয়স চলে গেল, অথচ ছেলেপুলে কিছুই হলো না। আমার সমান বয়সী মেয়েরা সব দু'তিন ছেলের মা। তোমার ছেলেপুলে না হলে খুড়ীমার কষ্টের সীমা থাকবে না। তিনি কত আশায় আমাদের আদর যত্ন করছেন যে, আমাদের সন্তান তাঁহার স্বামীর নাম বজায় রাখবে। এ সাধ তাঁর পূরণ না হলে, আমাদের পাপের ভাগী হতে হবে। তাই একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।"

সত্যলালের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কই এ কথাত এতদিন একবারও তাহার মনে উদিত হয় নাই। এ জীবন-বীণার তন্ত্রীতে হঠাৎ-করুণ ঝঙ্কার কে দিল! সে বলিয়া উঠিল, "পাগলের মতন এ সব কি বক্‌ছো? মাথা খারাপ হলো নাকি! এইত সে দিন আমাদের বিয়ে হলো, এর মধ্যে তোমার ছেলে হবার বয়স চলে গেল? এ যুক্তি তোমার মাথায় কে ঢোকালে?" এই বলিয়া সত্যলাল পূর্ব্বের ন্যায় আবেগভরে স্ত্রীর বদনকমল চুম্বন করিল। ললিতা ভাবিল যখন কথা আরম্ভ করিয়াছে, তখন শেষ করিতেই হইবে, মনকে দৃঢ় করিয়া সে উত্তর করিল,—"না, ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। যথার্থই আর আমরা ছেলে মানুষ নই। ভাল মন্দ বুঝবার আমাদের বয়স হয়েছে। আমার দোষে খুড়ীমা এত কষ্ট ভোগ করবেন। নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবেন না, তাঁহার এই অসীম ভালবাসার কি এই প্রতিদান! আমি থাকৃতে তা কখনই হতে দেব না। যা বলি, শুন। তুমি আবার বিবাহ কর।

এই বলিয়া ললিতা স্থির গম্ভীর দৃষ্টিপাতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল। সত্যলালও কথা শুনিয়া তাহার বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় স্ত্রীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। সে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আবার বিয়ের কথা কেন বলছো ললিতা! আমি কি কিছু অন্যায় করেছি, তাই তুমি আমার উপর রাগ করেছ? আজ ছয় বৎসর আমরা দুজনে কেমন সুখে কাটিয়ে দিয়েছি। আজ তবে হঠাৎ এ সব কথা কেন উঠছে? তুমি নিশ্চয় জেনো, বিয়ের সময়ও তোমাকে যে স্নেহের চক্ষে দেখেছিলাম, আজও তোমার প্রতি সে ভালবাসার একটুও কম হয় নাই। দ্বিতীয়বার বিবাহ আমি কিছুতেই করতে পারবো না, খুড়ীমাকে সুখী করতেও নয়। তুমি ওসব কথা আর মুখে এনো না।"

ললিতা স্বামীর কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই সুখী হইল। স্বামীর মুখে ভালবাসার কথা শুনিয়া স্ত্রী কখনও তৃপ্ত হয় না। সত্যলালের উত্তর শুনিয়া ললিতা আর কিছু বলিল না। রাত্রিও অনেক হইয়াছিল। সত্যলালেরও তন্দ্রা আসিল। ললিতা তখন স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল,—"ভগবান, মনে বল দাও। স্বামীর বিবাহ আমাকেই দিতে হইবে। আমার দোষে বংশের নামটা লোপ পাবে, এ কখনই হতে পারে না।" এই বলিয়া সে স্বামীর পদপ্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িল। ধন্য নারী, ধন্য তোমার ত্যাগ মহিমা!

এদিকে সত্যলালের খুড়ীমাও সে রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। তিনিও এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় মনে মনে ভাবিতেছিলেন। সত্যলালের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াই যে ইহার একমাত্র পন্থা, তাহা যে তিনি জানিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু যাহাকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন, সেই লক্ষ্মী স্বরূপা বধূমাতার কোন্ প্রাণে স্বহস্তে সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই, সত্যলালকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার পৌষ্যপুত্র লওয়া এখন অসম্ভব, তখন অন্য কোন ভাব আর তাঁহার মনে উদিত হইল না। স্থির করিলেন যে, পরদিন সকালে আহারের সময় সত্যলালকে এ বিষয়ে তিনি সব বুঝাইয়া বলিবেন। আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে! কারণ কবে বলিতে কবে তাঁহার ডাক আসিবে; সত্যলালের সন্তান না দেখিয়া গেলে মরণে তাঁহার শান্তি হইবে না, মৃত স্বামীর প্রতিও তাঁহার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না।

পরদিন দুপুরে সত্যলাল যথাসময়ে আহারে বসিল। খুড়ীমা তাহারই সম্মুখে বসিয়া "এটা খা, ওটা খা" বলিতে লাগিলেন। পরে খাওয়া যখন শেষ হয় হয়, তখন তিনি সত্যলালকে বলিলেন,—"বাবা একটা কথা বলবো, কিছু মনে করো না। বৌমার এখনও যখন ছেলেপিলে হলো না, তখন আর যে হবে বলে আশা হয় না, তা বাবা, স্বামীর বংশটা লোপ পাবে, তা কেমন করে দেখি; তুই আর একটা বে কর। তোমার কোন ভাবনা নাই, বৌমাকে আমি যেমন মেয়ের মত ভালবাসতাম, তেমনই বাসবো; কেবল স্বামীর নামটা যাতে বজায় থাকে, এই চেষ্টা!" সত্যলাল বুঝিল, ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গতরাত্রে স্ত্রীর মুখেও এই একই কথা শুনিয়াছে; তাহা হইলে সংসারে ইহা লইয়া নিশ্চয়ই আন্দোলন চলিতেছে।

সে মুখ নীচু করিয়া বলিল,—"ছোট মা, তুমি অত ভাবছো কেন ? এর মধ্যেই কি ওর ছেলে হবার বয়স চলে গেছে ?" এই বলিয়া সে আহার শেষে আসন ছাড়িয়া উঠিল।

ললিতা আড়ালে থাকিয়া কতক্ষণ এই কথাবার্ত্তা শুনিল, খুড়ীমা কষ্টে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না, তাহাও সে বুঝিতে পারিল ; সে নিজে উপযাচক হইয়া খুড়ীমার নিকট গিয়া বলিল,—"মা আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। আমারও তাই মত। বংশ লোপ পাবে, চৌদ্দপুরুষ নরকাস্ত হবে, তা প্রাণ থাকতে ঘটতে দেব না। আপনি পাত্রীর অনুসন্ধান করুন। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি, এতে আমার অমত হবে না।" খুড়ীমার চক্ষু দিয়া দরদরধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, —ললিতার মুখ গম্ভীর ও দৃষ্টি শান্ত। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"মা কালী! এমন সতী-লক্ষ্মীরও এমন সর্ব্বনাশ হইল! তোর লীলা বোঝা ভার!" তিনি সংযত হইয়া ললিতাকে বলিলেন,—"আচ্ছা মা, তাই হবে। তুমি ছেলেকে বুঝিয়ে বলো। আর তোমার কোন কষ্ট হবে না। তোমাকে যেমন ভালবাসিতাম, তেমনই বাসবো। কেবল স্বামীর বংশরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে হচ্ছে।"

ললিতা সেই রাত্রে বিবাহ করিবার জন্য স্বামীকে আবার অনুরোধ করিল। সে অনেক করিয়া সত্যলালকে বুঝাইয়া দিল যে, বিবাহ না করিলে, তাহার পাপ হইবে। সামান্য স্ত্রীর সুখের জন্য তাহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে, এ বড়ই লজ্জার বিষয়। সে আরও বলিল, —"দেখ, বিবাহে আমার কষ্ট হবে না। নূতন বৌকে আমি নিজের ছোট বোনের মতন দেখবো।" সত্যলাল বড়ই ফাঁপরে পড়িল। খুড়ীমার কথা বরং সে অনেকটা অগ্রাহ্য করিতে পারিত, কিন্তু যাহার সুখের জন্য সে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতেছে না ; তাহারই মুখে এ সব কথা শুনিয়াও বিবাহের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া সে একটু বিচলিত হইল। পাপের ভাগী হইতে হইবে, ইহাতেও তাহার মনে একটু ভয় হইল। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও টলমল করিতে লাগিল। সে বিবাহে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। ভাবিল,—"বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

(৩)

বিবাহে স্বামীর মত করাইয়া ললিতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। খুড়ীমা

পাত্রীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। ললিতার মনের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও সে মনকে জয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে একটী বড়সড় সেয়ানা মেয়ে দেখিয়া পাত্রী নির্ব্বাচিত হইল। পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন ললিতা নিজহস্তে স্বামীকে চন্দন পরাইয়া সাজাইয়া গুজাইয়া বরবেশে বিবাহ সভায় পাঠাইয়া দিল। তাহার মুখে হাসি ও কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া বাড়ীর ঝি চাকরও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। সত্যলালও একবার নিজ ঘরে বসিয়া গোপনে খুবই কাঁদিয়াছিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিবাহ করিতে চলিল।

ললিতা রাত্রে নিজ ঘরে শুইতে গেল। এতক্ষণ তাহার মনের দুর্ব্বলতা কেহ বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু নির্জ্জন ঘরে আসিয়া তাহার স্ত্রীজনসুলভ কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, নিজ চেষ্টায় নিজের সর্ব্বনাশ সে করিয়াছে। এ কার্য্য না করিলে বোধ হয় তাহার পক্ষে ভালই হইত। সে একটু বাধা দিলে, সত্যলাল বরং খুড়ীমার বাড়ী ও বিষয় ছাড়িয়া অন্য স্থানে আশ্রয় লইত; তবুও সে বিবাহে স্বীকৃত হইত না। কিন্তু পরক্ষণেই ললিতার চমক ভাঙ্গিল। সে ভাবিল, এ কি করিতেছি! এত চেষ্টা করিয়াও আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না, এ বড় লজ্জার কথা! এ মহদনুষ্ঠানের আগাগোড়াই যে নীচ স্বার্থের বলিদান! যাহাতে আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহার মনের বল ও উৎসাহ থাকে, তজ্জন্য ভগবানের উদ্দেশে সে করজোড়ে প্রার্থনা করিল। ললিতা এবার স্বামীর কথা ভাবিতে বসিল। এতক্ষণ হয়ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নববধূর মুখ দেখিয়া তিনি বোধ হয় দুঃখ কষ্ট অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছেন, বাসর ঘরে আনন্দে নিশি যাপন করিতেছেন; এই সব ভাবিতে ভাবিতে ছয় বৎসর পূর্ব্বেকার তাহারও বিবাহের দিন মনে পড়িয়া গেল; সে অবসন্ন-দেহে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সত্যলাল নববধূর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিল। ললিতাও তাহার খুড়ীমার সঙ্গে বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়া লইল। পরে প্রশান্ত-বদনে ধান-দূর্ব্বা দিয়া নববধূকে আশীর্ব্বাদ করিল। মঙ্গল কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেলে, সত্যলালকে গোপনে পাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিগো বউ মনের মতন হয়েছে ত? অনেক খুঁজে পাত্রী ঠিক করেছি।

এখন ঘটক বিদায় করতে হবে।" সত্যলাল সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

নববধূ আট দিন মাত্র থাকিয়া চলিয়া গেল। এই আট দিনই ললিতা সুরমাকে নিজ হস্তে চুল বাঁধিয়া সাবান মাখাইয়া গহনা পরাইয়া রাত্রে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিত। সত্যলালেরও প্রথম দু'এক দিন একটু চক্ষু লজ্জা হইত। কিন্তু তারপর হইতে তাহারও স্ফূর্ত্তি বেশ লক্ষ্য হইতে লাগিল। সেও সুরমার সঙ্গলাভ করিতে উৎসুক। এ ঘটনা ললিতার দৃষ্টি এড়াইল না। "নূতন ফেলিয়া কেবা পুরাতন চায়?" এই প্রবাদ বাক্য সত্যলাল অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিল; পুরুষ মানুষ কি এতই দুর্ব্বল চিত্ত! তাহার মনের ভাব কি এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে?

সুরমা চলিয়া গেলে, সত্যলালের মন উড় উড় হইল। সংসার ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। দিনের মধ্যে দু'এক বার ললিতার নিকট আসিলেও, ললিতা বেশ বুঝিতে পারিত যে, সে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছে না। তাহার মন বড়ই বিষণ্ণ। যে সত্যলাল বলিয়াছিল স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবে না, আজ সে আর স্ত্রীর ছায়াও মাড়াইতে চাহে না। পুরুষ মানুষ এতই অপদার্থ! তাহার কথার কোন মূল্য নাই—কেবল স্ত্রীলোকের মনভোলান ফাঁকা কথা; তাহাতে প্রাণের লেশ মাত্র নাই। তাহাদের প্রেম কেবল মুখে—কথার কথা।

দু'এক দিন অন্তর সত্যলাল নব শ্বশুরালয়ে যাইতে আরম্ভ করিল। তাহার খুড়ীমাও তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। তিনি একদিন ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ গা, বৌমা, সত্য কি আর তোমাকে তত গ্রাহ্য করে না? ছেলেটার মাথা খারাপ হলো নাকি? ললিতা উত্তর করিল, "না মা, তিনি ত রোজই আমার কাছে আসেন, আমার সঙ্গে খুব কথাবার্ত্তা কন, হাসেন, আমোদ করেন।" কিন্তু খুড়ীমা বুঝিলেন ললিতা তাঁহার নিকট সত্য কথা গোপন করিল। এ সব কথা জানিতে পারিলে পাছে কেহ তাহার স্বামীর নিন্দা করে, সেই জন্যই সে তাহা প্রকাশ করিল না।

ললিতা দেখিল যে সুরমাকে না আনাইলে সত্যলালের মন স্থির হইবে না। বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহে না থাকাই বাঞ্ছনীয় এই কথা খুড়ীমাকে বলিয়া ভাল দিন দেখিয়া সে সুরমাকে আনিল। ললিতার এই কার্য্যে সত্যলাল বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিমুখে ললিতার সহিত উপযাচকভাবে

দেখা করিয়া তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিল। সত্যলাল অধিকাংশ সময়ই সুরমার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে লাগিল। ললিতাই সংসারের সব কাজ দেখিত। সুরমাকে আদৌ খাটিতে দিত না; সুরমাও সারাদিন পশম বুনিয়া নভেল পড়িয়া ও স্বামীর সহিত গল্পগুজব করিয়া কাটা-ইতে লাগিল। ললিতা স্বামীর স্নান-আহারের যোগাড় করিত, শয্যারচনা করিয়া দিত। সে প্রতিদান কিছুই চায় না, স্বামী যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াও স্বামীর উপর স্ত্রীর ন্যায্য দাবি সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া সেই কার্য্য করিতে সে দৃঢ় সঙ্কল্প! সুরমাকে সংসারের কোনও কাজ দেখিতে হইলে, পাছে স্বামীর আমোদের সময় কমিয়া যায়, তিনি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে ললিতা নিজেই সংসারের কাজ কর্ম্ম সব দেখিত। সুরমাও তাহাই চায়; সে রাজরাণী হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া রহিল।

(৪)

সাত দিন হইল সুরমা আসিয়াছে। সত্যলাল গত ছয় রাত্রিই সুরমার সহিত কাটাইয়াছে; এমন কি দিনের বেলাও একবার ললিতার কাছে আসে নাই। সাত দিনের দিন তাহার খুড়ীমা ললিতাকে জোর করিয়া রাত্রে স্বামীদর্শনে পাঠাইয়া ছিলেন। ললিতাকে দেখিয়া সত্যলাল মুখ ফিরাইল। স্বামীর নৈরাশ্য ও কষ্ট সতীর বক্ষে শেলসম বিঁধিল। ললিতা শয্যাপ্রান্তে গিয়া স্বামীর পা টিপিয়া দিতে ও পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পরে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহার চরণদ্বয় মস্তকে ধরিয়া বলিল,—"যেন ঐ চরণেই আমার মতিগতি অচলা থাকে।" পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া সুরমাকে পাঠাইয়া দিল।

সুরমা ঘরে ঢুকিয়াই চুম্বনস্পর্শে স্বামীকে জাগাইল। সত্যলাল জাগিয়া উঠিয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইল, এবং মনে মনে বুদ্ধিমতী ললিতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। সত্যলাল আবেগভরে পত্নীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সুরমা তাহাতে বাধা দিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,— "যদি আমাকে ভালই লাগে না, ত বিয়ে কল্লে কেন? এতদিন ধরিয়া স্বামী সুখ ভোগ করিয়াও দিদির তৃপ্তি হইল না? আমি দুদিন এসেছি- তাও তাঁর অসহ্য হলো। আমাকে এমন করে বিয়ে করে মজান, আমার সর্ব্বনাশ করা, তোমার উচিত হয় নি।" সত্যলাল সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"না, সত্যি

বলছি, আর এমন কখন হবে না, আজ আমাকে ক্ষমা কর।" সুরমাও তখন দশনপংক্তি ঈষৎ বিকম্পিত করিয়া উত্তর দিল,—"আচ্ছা, দেখা যাবে; পুরুষের কথার দৌড় কত!"

পরদিন হইতে সত্যলাল যেন একটু রুক্ষভাব ধারণ করিল। ললিতাকে দেখিলেই সে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইত। "রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম" পুরুষ-মানুষের ইহাই প্রেম! ইহারই নাম ভালবাসা! ললিতা বুঝিল যে তাহারই জন্য স্বামী নির্ব্বিঘ্নে নিঃসঙ্কোচে সুরমার সহিত সুখ ভোগ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ভোগের পথে সে কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ভাবিল, তাহাকে মরিতেই হইবে। সত্যলাল ও সুরমার মধ্যে তাহার আর স্থান নাই। নিজের জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হইল। অপুত্রবতী স্ত্রীলোকের যখন জ্ঞান হয় যে, স্বামীর সুখবিধানের জন্য তাহার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজন নাই, তখন শরীরের প্রতি তাহার আর আদৌ লক্ষ্য থাকে না। ললিতারও অবস্থা তদ্রুপ। অসময়ে খাওয়া, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতিকে তাহার শরীর ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সত্যলাল তাহা লক্ষ্য করিল না, তাহার খুড়ীমাও ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরমার সন্তান সম্ভাবনা হইল। ললিতার আনন্দের সীমা রহিল না, সত্যলালের ত কথাই নাই। তাহার খুড়ীমাও বংশরক্ষার আশায় সব দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহার সেবার প্রতি যত্নবতী হইলেন। কিন্তু ললিতা ক্রমেই অকর্ম্মন্য ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িল। তাহার ভগ্নশরীরে প্রবল জ্বর দেখা দিল। খুড়ীমা তখন সত্যলালকে অনেক অনুরোধ করিয়া পাড়ার একজন হাতুড়ে ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার রোগীর নাড়ী টিপিয়া ও পেট দেখিয়া বলিয়া গেল—"কোন ভয় নাই, সামান্য সর্দ্দিজ্বর! যা ঔষধ দিলাম, তাতে দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।" কিন্তু ঔষধে কোনই ফল হইল না। ললিতার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। তাহার প্রাণ সংশয় হইয়া দাঁড়াইল।

সে দিন সকাল হইতে বাড়ীতে একটু চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। সুরমার প্রসব ব্যথা ধরিয়াছে। সত্যলাল তাহাকে লইয়া বড় ব্যস্ত। তাহার খুড়ীমাও উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ঘন ঘন সুরমার কাছেই যাইতেছেন, ললিতার প্রতি কাহারও তত লক্ষ ছিল না। ললিতাও নিজের রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া কখন

ছেলে হবে, সেই আশায় কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে আর বেশীক্ষণ তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ জ্বলিবে না। হঠাৎ শিশু পুত্রের জয় ঘোষণা করিয়া শঙ্খধ্বনি হইল। ললিতার পাণ্ডু ওষ্ঠদ্বয়ে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এবার স্বামীর প্রতি, খুড়ীমার প্রতি স্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে। সে এখন অনায়াসে যাইতে পারে,। একবার তাহার ইচ্ছা হইল, নবজাত শিশুকে দেখে, কিন্তু তাহার শয্যার পাশে তাহাকে আনিলে, পাছে শিশুর অকল্যাণ হয়, বংশরক্ষার পথে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে সে মনের আশা মনেই পোষণ করিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং শিশুর ও স্বামীর কল্যাণের জন্য ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা করিল। স্বামীকে একবার শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু এ সময় এ সংবাদ দিয়া তাঁহার সুখে ব্যাঘাত করিতে সে ইতস্ততঃ করিল ও মনে মনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া, স্বকৃত দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, সতী-সাধ্বী ধীরে ধীরে শান্ত অন্তঃকরণে চক্ষু মুদিল ; নন্দনকাননের পারিজাত, ধরার নশ্বিলতার সংস্পর্শে আসিয়া অকালেই ঝরিয়া পড়িল !

* * * * *

খুড়ীমা তাহাকে সুসংবাদ দিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ললিতার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তিনি "বৌমা" বলিয়া কাঁদিয়া শয্যার উপর পড়িলেন,—"মা সতীলক্ষ্মী, কর্ত্তব্য শেষ করে অভিমানে চলে গেলি মা !"

নবজাত শিশুপুত্রের ক্রন্দনে ধ্বনিতে সে আর্ত্তনাদ সত্যলালের কানে পৌঁছিল কিনা বলিতে পারি না।

মানরক্ষা

লেখক—শ্রীসত্য চরণ চক্রবর্ত্তী।

১

সেদিন রামবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া অনেক মেয়ের বাপের মনে আশা জাগিয়াছিল। রাত পোহাইয়া সকাল হইতে না হইতে তাঁর বাড়ীতে অনেক লোকের যাতায়াত পড়িয়া গেল।

তাঁর বড় ছেলে যাদবের নাম যেদিন সর্ব্বপ্রথম গেজেটে বাহির হইয়াছিল, সেই দিন থেকেই ঘটকদের গতি বিধি আরম্ভ হইয়াছিল এবং টানাটানিতে দুই হাজার পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছিল। তখন গিন্নি ভাবিয়াছিলেন একটা পাশ দিতেই যখন দু'হাজার উঠিয়াছে আর বছর দুই কাটাইয়া দিতে পারিলে, ছেলে আর একটা পাশ দিলে, কোন্ না পাঁচ হাজার পাইবেন? সুতরাং তখন তিনি আর ছেলের বিয়ের কথায় কান পাতেন নাই। রামবাবু সকলকেই মিষ্ট কথায় জবাব দিয়াছিলেন—যাদব ছেলেমানুষ, সবে একটা পাশ করেছে এরই মধ্যে বিয়ের তাড়া কি? আরো বছর দুই যা'ক, বড়-হোক, তখন তার কথা।" ঘটকেরা দুই পয়সা উপার্জ্জনের আশায় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল।

দু'বছর পরে এবারেও যখন যাদবের নাম আবার গেজেটে বাহির হইল, তখন আবার ঘটকদের সাড়া পড়িয়া গেল।

গিন্নি বলিলেন,—"আরো দুটো বছর যাক্‌না, বি-এ টা পাশ হোক, দশ হাজার আদায় করবো।" কিন্তু কর্ত্তা বুঝাইলেন—'বেশী লোভ ভাল নয়, শেষ কি হবে কে জানে, টানাটানিতে ছিঁড়ে যেতে পারে। যদি আর পাশ করতে নাই পারে? সাড়ে তিন হাজার পর্য্যন্ত উঠেছে, যখন পূরোপূরি উঠবে, চার হাজারেই ছেড়ে দিই, হয়ে যাক বিয়েটা।'

গিন্নি কহিলেন,—"গরজ দেখিওনা, পাঁচ হাজারের এক পয়সা কমে হবেনা। রূপে গুণে এমন ছেলে পাবে কোথায়? চাপ দেও, পাঁচ হাজারই আদায় হবে।'

রামবাবু ঘটকদের সঙ্গে দর কসাকসি করিতে লাগিলেন।

২

সন্ধ্যার পর সুবলবাবু ম্লানমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মুখের ভাব দেখিয়াই গৃহিনী নৈরাশ্যের আশঙ্কা করিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন দেখলে ?'

ছাই ছাই। ছোটলোকের পাড়ার ভিতরে দু'খানা খোলার ঘর ভাড়া করে আছে। দেশে ঘর বাড়ী জায়গা জমী অতি সামান্য—নেই বল্লেই হয়। ছেলেটা দেখতেও কদাকার, আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তাও ভাল নয়—টেনেটুনে একটা পাশ করেছে, এই যা। তারই দাম দুটি হাজার ? কি বলবো বল ?"

'তা হলে তো রাম মিত্তিরের ছেলেটি হাজার গুণে ভাল, যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি লেখাপাড়ায়, তেমনি ঘর। আর স্বভাব চরিত্রও শুনেছি খুব ভাল—নম্র, পর উপকারী, দয়ালু,—

বাধা দিয়া সুবল বাবু কহিলেন—'তাতো সবই বুঝলুম ভাল, কিন্তু বাপ যে চামার, কসায়ের বেহদ্দ, শুনলেনা পণ করেছে, পাঁচ হাজারের কমে কথাই কয়না ? আমার ভদ্রাসন টুকু বেচলেও যে তা হবেনা।, সুবল বাবু নৈরাশ্যের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

গৃহিনী হতাশ ভাবে কহিলেন—'এদিকে মেয়ে যে পনেরোয় পা দেয় ! লীলার মুখের পানে আর চাইতে পারিনি, শেষটা কপালে বুঝি—আর বলিতে পারিলেন না, কথা বাধিয়া গেল, আঁচলে চোখের জল মুছিলেন।

সুবল বাবু কহিলেন—'ভেবে আর কি করবে বল, কপাল ছাড়াতো পথ নেই। দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে। রামবাবু শুনলুম বিয়ের পণ কমাবার জন্য সেদিন নাকি খুব বক্তৃতা দিয়েছেন। যদি তাঁর মতিগতি ফিরে থাকে, একবার হাতে পায়ে ধরে কেঁদে কেটে দেখবো।'

৩

কিন্তু তাঁর কান্নাকাটা হাতে পায়ে ধরাই সার হইল, কিছুতেই রামবাবুর পণ নড়িল না—পাঁচ হাজারের কমে ছেলের বিবাহ দিবেন না।

যদি সুফল ফলে, যদি দয়া হয়, ভাবিয়া সুবলচন্দ্র সভার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিলেন। তাতে বরং ফল উল্টা হইল, রামবাবু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, সপ্তমে হাঁকিয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন কোথাকার ছোটলোক হে তুমি ; বক্তৃতা দিয়েছি বলে, কল্পতরু হয়ে ঘরের কড়ি পর্য্যন্ত

বার করতে হবে না কি ? যাদবের মত ছেলে কোন ব্যাটার ঘরে আছে, ওর ন্যায্য দাম—দশ হাজার টাকা। আর তিনটে বছর পরে যখন মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোবে—তখন সে মাসে হাজার টাকা ওর খুঁটে বাঁধা থাকবে বাপু ? তা আট হাজার দশ হাজার চুলোয় যাক্ আধা-কড়ি—পাঁচ হাজারে ছাড়ছি, তবু আবার ছোটলোক ব্যাটারা কথা কয়, বক্তৃতার কথা তোলে ? এতবড় স্বার্থত্যাগ কোন্ ব্যাটা করতে পারে ?

সুবলচন্দ্র একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, মুখে কথা সরিল না, চক্ষে জল আসিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন—'আজ্ঞে যা বল্লেন সত্য কথা, যাদবের মত ছেলে কম। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা কটা লোক দিতে পারে ? তা যদি পারবে, তবে গৃহস্থ ঘরে মেয়ের বিয়ে 'দায়' হবে কেন ? এমন একটা আনন্দের আদান-প্রদান এখন আমাদের ঘরে 'কন্যাদায়' নাম পেয়েছে। যাঁরা বড়লোক, স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন, তাদের তো 'কন্যাদায়' নয়—তাদের জন্য সভা সমিতি বক্তৃতারও দরকার নেই। দরকার আমাদের জন্য, গরীব যদি আমাদের মত গৃহস্থ লোকের দুঃখ কষ্ট না ঘুচে, জাতরক্ষা না হয় ; তবে তেমন বক্তৃতায়—

সুবল বাবুর কথা শেষ হইল না, রামচন্দ্র বাধা দিয়া আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তর্কের চোটে রাগে ফুলিয়া নানা কটু কহিয়া অকথ্য বলিয়া সুবলচন্দ্রকে অপমান করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন।

লাঞ্ছিত, অপমানিত, কন্যাদায়গ্রস্ত হতভাগা সুবলচন্দ্র মর্ম্ম-পীড়ায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে উঠিলেন। যাদবচন্দ্র অন্তরালে থাকিয়া সকলই দেখিতেছিলেন। সুবলবাবু খানিক দূর চলিয়া গেলে, তিনি চুপি চুপি বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া কিছুদূরে তাঁহাকে ধরিলেন।

৪

দিন পনেরো পরে ঘটকের মুখে রামবাবু শুনিলেন সুবলচন্দ্রের মেয়ের বিয়ের ঠিক হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার ভিতরেই কোথায় নাকি একটি ভাল পাত্র জুটাইয়াছেন, তার সঙ্গে আষাঢ়ের প্রথমেই বিয়ে দেবেন। রামবাবু নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন—ঃউহু ! ছোটলোকের ঘর, তেমনি জুটেছে আর কি ? বৈশাখ মাসে আমাকে এসে জেদাজেদি করে ধরেছিল। আস্পর্দ্ধা দেখ, পেটে ভাত নেই, চালে কুটো নেই, যাদবকে জামাই করবার

সাধ! তেমনি অপমান করে দূর করে দিয়েছিলুম। যাদবের মত ছেলে কটা মেলে?

'আজ্ঞে তা বটে তো। কুটুমও যা করে দিলুম পরে বুঝবেন। অতবড় ঘর খুব কমই আছে, গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখেই তা বুঝতে পারবেন। ঘটক কিছু বেশী রকম আদায়ের চেষ্টায় কথাটা পাড়িবার উপক্রম করিতেছিল। বাধা দিয়া রামচন্দ্র কহিলেন—

'তা দেখ, ঘড়িটা 'ম্যাকেবের ক্রনোমিটার' হলেই দেখতে শুনতে হয় ভাল, আর খাট খানা বেলোয়ারির, ছেলেরও ইচ্ছা তাই, গিন্নির কাছে বলেছে শুনলুম। তা এ সম্বন্ধে আমি আর বেশী পীড়াপীড়ি করতে চাইনি, তবে তুমি যদি বলে কয়ে এই দুটো করতে পার, তাহলে তোমাকেও ভাল রকম—বুঝলে?"

আজ্ঞে তা করে দেব, ওতে আটকাবেনা যখন নগদ সাড়ে চার হাজার তুলেছি তখন ঠেক্‌বেনা, আগে পত্রটা হয়ে যাক্, তিনি মেয়ে জামাইকে দেবেন—

'ঠিক কথা, আমরাতো তার প্রত্যাশী নই। আমারও বড় কম যাবে না, যে টায়রা খানা দিয়ে বৌয়ের মুখ দেখবো, সেইটেরই দাম হাজার টাকা!'

'আজ্ঞে তা বড় ঘরে কায করতে হলে ও রকম করতে হয় বৈ কি, নইলে মান থাকবে কেন? তা হলে ৪ঠাই পত্তরের দিন স্থির রইলো, আমি খবর দিই গে। আপনি যাদববাবুকে চিঠি লিখে আনান্, পাকা দেখাটা চৌঠাই হওয়া চাই। ৬ইরই দিনটি খুব ভাল, সেই দিনেই বিয়েটা হয়ে যায়—তাঁদের একান্ত ইচ্ছা।

'তাই হবে—আমারও একটা ঝঞ্ঝাট মেটে। যাদবকে আসতে চিঠি লিখেছি, আজ না হয় আবার টেলিগ্রাফ করবো। আজ মাসের আটাশে, দোস্‌রা তেস্‌রা আষাঢ় বেরোলেও চোওঠো এসে পড়বে। পুরী থেকে কল্‌কাতা আজকাল আর কতটুকু পথ বল?"

'তা বটে তো, দোসরা আষাঢ় বেরোলেই এখানে তেস্‌রা এসে পৌঁছুতে পারবেন। পাকা দেখাটা হয়ে যাক, তারপর ছেলের নাম করে যা বল্লেন, সে ঠিক আদায় করে দেব, আমাদের পাঁচ পুরুষে এই কায, আপনি ভাববেন না। তা হ'লে ৪ঠা আষাঢ় বিকালেই পাকা দেখা সাব্যস্ত রইলো?

ঘটক চলিয়া গেল। রামবাবু তখনই যাদবের কাছে পুরীতে টেলিগ্রাফ করিতে গেলেন। মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিবার আগে পাঠ ক্লিষ্ট মাথাটা দোরস্ত করিবার ইচ্ছায় বৈশাখের শেষেই যাদবচন্দ্র পুরী হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন।

যথাসময়ে যাদবচন্দ্র পিতার তার পাইলেন, তিনি জবাব দিলেন যে ৩রা রওনা হইয়া ৪ঠা দুপরের পূর্ব্বেই বাড়ী পৌঁছিবেন।

কিন্তু আষাঢ়ের ১লা তারিখের রাত পোহাইতেই তিনি পোর্টম্যাণ্টটি গুছাইয়া লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আজ ৪ঠা আষাঢ় বৈকালে যাদবচন্দ্রের পাকা দেখা। সকাল হইতেই চাকর-বাকর সরকারেরা বাজারে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে, ঘর-দোর সাফ করিবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র স্বয়ং সকল কাযের তদ্বির করিতেছেন আর প্রতি মুহূর্ত্তে আশায় আশায় রাস্তার পানে চাহিতেছেন, পূর্ব্বাহ্নেই যাদবের বাড়ী আসিবার কথা।

ষ্টেশনে লোক গিয়াছে প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি যাদবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাস্তায় যতবার গাড়ী যাইতেছে রামচন্দ্র ততবারই জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছেন।

দশটা বাজিল—তখনো কেহ আসিল না, রামচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। খানিক পরে ষ্টেশন হইতে প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল—'পুরীর গাড়ী এলো, কিন্তু যাদববাবু আসে নি!

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে কি কথা, যাদব নিশ্চয় আসিবে, না আসিতে পারিলে, তার করিবে—আসিবে না হইতেই পারে না। তবে হয়ত এ গাড়ীটা ফেল্ হইয়াছে, ধরিতে পারে নাই পরের গাড়ীতে আসিবে।

পরের গাড়ীটা কখন আসিবে জিজ্ঞাসা করায় লোকটি তার কিছু বলিতে পারিল না, সে কাকেও সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসে নাই। রামচন্দ্র তাকে 'মূর্খ' 'অকর্ম্মণ্য' প্রভৃতি গোটাকতক ভৎর্সনা করিয়া তাড়াতাড়ি নিজেই ষ্টেশনে খোঁজ লইতে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা বাহির হইবার মিনিট দশেক পরেই একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দোরে থামিল, চাকরেরা ছুটিয়া গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই আশ্চর্য্য হইয়া সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। বেনারশী পরা, টোপর মাথায় বরবেশী যাদবচন্দ্র আগে গাড়ী হইতে

নামিয়া সদ্য বিবাহিতা কণে 'লীলার' হাত ধরিয়া নামাইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

ষ্টেশন হইতে নিরাশ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া রামচন্দ্র একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। গিন্নি আসিয়া হাত নাড়া দিয়া কহিলেন— সেই সুবোল ঘোষের মেয়ে গো—সেই ছোট লোকের ঘর। তুমি না কি কবে কি বক্তৃতে করেছিলে, তাই ব্যাটা তোমার কথা মাফিক মান রেখে-ছেন। কালে কালে এ হ'ল কি!'

অতঃপর কর্ত্তা গিন্নি দিব্যি করিলেন, অন্য ছেলে দুটিকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।

অপেক্ষায়

লেখক শ্রীপরেশনাথ সরকার

(১)

ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে প্রমোদ এমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল যে তাহার সেই ভাব-বিকল মূর্ত্তি দেখিয়া প্রসিদ্ধ চিত্রকর প্রেমচাঁদ আসিয়া "তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"বাবু,—তোমার দেশ কোথায়?"

প্রমোদ যেন কোন সুদুর কল্পনারাজ্য হইতে ধরণীতে নামিয়া আসিয়া বলিল—"বঙ্গদেশ!"

প্রেমচাঁদ বলিল—"বাবু, তুমি কখনও কবিতা লিখিয়া থাক?"

প্রমোদ বলিল—"না!"

প্রেমচাঁদ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—তুমি আমার সঙ্গে এস, বাবু তুমি চিত্রকর। আমি তোমাকে আমার কতগুলি চিত্র দেখাইব! প্রমোদ তাহার সঙ্গে চলিল। পথে যাইতে যাইতে বলিল—"কি করিয়া চিনিলেন আমি চিত্রকর?" একটু হাসিয়া প্রেমচাঁদ বলিল—"বাবু এইটুকু যদি না বুঝিব, তবে আর এ কয় বৎসর কি শিখিলাম?"

দুইজনে চলিল—সেই অনন্ত উদ্দাম সমুদ্রের পার দিয়া চলিল। সমুদ্রের সে কল্লোল-নিনাদ, বায়ুর অস্ফুট মধুর সঙ্গীত, আর দুইখানি জলভরা মেঘের মত ভাব পূর্ণ দুইটি হৃদয়।

যাইতে যাইতে তাহারা একটি কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিল। কুঞ্জটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। তাহার একদিকে যেমন নীলাম্বুর মহিমময় সৌম্যদৃশ্য, অন্যদিকে তেমনি পর্ব্বতমালার নগ্ন সৌন্দর্য্য! কুঞ্জের ঠিক মধ্যদেশে একটি একতল সুন্দর ভবন। দুইজনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রেমচাঁদ বলিল—"বাবু, এইটি আমার চিত্রগৃহ। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও এ গৃহে প্রবেশ করিতে দেই নাই। আজ তোমাকে এ গৃহ দেখাইতে এনেছি! বড় যত্নে গৃহটি সজ্জিত করেছি, দেখাবার মত লোক পাইনি। এস বাবু এস, আজ আমার যত্ন-সজ্জিত গৃহ-সম্পদ দেখবে, এস!

বলিতে বলিতে প্রমোদের হাত ধরিয়া টানিয়া প্রেমচাঁদ তাহাকে একটি সজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল।

প্রমোদ দেখিল, কি সুন্দর সেই গৃহটি। কি শোভাই ফুটিয়া উঠিয়াছে! গৃহের মেজে হইতে কড়িকাঠ অবধি কি সুন্দরভাবে সজ্জিত! দেয়ালে যে কত সুন্দর সুন্দর ছবি রহিয়াছে, তাহার একখানা চিত্র হিসাবে যে কত মূল্যবান, প্রমোদ তাহার একটা কিছু ঠিকই করিতে পারিল না।

প্রেমচাঁদ বলিল—"বাবু, ঐ যে চিত্রখানা দেখিতেছ, ওই আমার জীবনের প্রথম চিত্র! প্রথম, হাঁ—আমার মনে যে দিন প্রথম ভাবের বন্যা ছুটিয়া যায়, সেই দিন অবধি প্রায় একমাস কাল আমি ঐ একখানি চিত্রে মন নিয়োজিত করিয়াছিলাম। দেখ বাবু, কি ভাবে আমার চিত্রবিদ্যার আরম্ভের সূচনা হয়। ঐ যে নদীটি বহিয়া যাইতেছে, তার তীরে ঐ যে মৃত অশ্বত্থবৃক্ষটি দাঁড়াইয়া, তার তলে এই যে শীর্ণকায়া একটি রমণী বসিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখ বাবু, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, দেখ তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখের লাবণ্যের শেষ চিহ্নটুকু তখনও বিলুপ্ত হয় নাই, নয়ন যুগলে বিলোল কটাক্ষের আবছায়াটুকু তখনও ফুটিয়া উঠিতেছে। বাবু, ঐ হতভাগিনী আমাকে বড় ভালবাসিত। গোপনে মনের নিবিড় প্রদেশে আমার জন্য যে কত প্রেমের মালা গাঁথিয়াছে, কে বলিতে পারে?

যেদিন আমি জানিতে পারি, পাগলিনী আমাকে ভালবাসে সেদিনের ছবি ঐ চাহিয়া দেখ। নির্জ্জন কুটীরের পার্শ্বে আমি ফুল তুলিতেছি, ঐ দেখ দূরে তৃণশয্যায় মুমূর্ষ আমার প্রতি কেমন করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। কি যেন এক কেমন টানে ছুটিয়া গেলাম, তোলাফুল কাপড় হইতে পড়িয়া গেল। ঐদেখ কত ফুল এখানে সেখানে ছড়িয়ে রহিয়াছে। বড় আবেগে পাগলিনীর কঙ্কালসার হস্তখানি ধরিলাম, আর দেখ নিদাঘফুলের মত পাগলিনী কেমন ঝরিয়া পড়িল।

প্রমোদ শিহরিয়া উঠিল, "বলিল, একি, একেবারে মৃত্যু ?"

প্রেমচাঁদ—হাঁ, মরণ-আহত দেহলতা কোলে টানিয়া লইলাম। পাণ্ডুর শীতল মুখখানিতে প্রেমের প্রথম ও শেষ চুম্বন-দাগ আঁকিয়া দিলাম। দেখ দেখ সে দাগটি কেমন স্পষ্ট—কেমন মধুর! প্রেমচাঁদ চক্ষু মুছিল।

(২)

প্রেমচাঁদ বলিল, বাবু তুমি বাঙ্গালী, আমি বাঙ্গালী বড় ভালবাসি! কেন ভালবাসি জান ? আমার সে যখন ঝরিয়া যায়—আমার পাষাণ বুকে একটা নদী ছুটাইয়া দিয়া—আমার মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়া—আমার পতিত মানস উদ্যানে ফুল ফুটাইয়া দিয়া, সে যেন রবিকর দগ্ধ কুসুমের মত ঝরিয়া যায়, তখন অবধি আমি বাঙ্গালী ভালবাসিতে শিখি! একজন বঙ্গদেশীয় মহাত্মা আমাকে তখন অতি যত্নে প্রতিপালন করেন, দুই বৎসর পরে জানিতে পারিলাম; আমি নাকি পাগল হইয়াছিলাম।

প্রমোদ অতি আগ্রহে প্রেমচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রেমচাঁদ একটু সুর বদলাইয়া বলিল—তারপর শোনবাবু, ঠিক দুই বৎসর পরে আমি তোমার মতন ভাবে একদিন ওই সমুদ্র কূলে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। বড় বড় তরঙ্গগুলি অনেক দূর হইতে কি যেন নূতন সংবাদ লইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেছিল। দূরে নীল সাগরখানিতে সিঁদুর মাখিয়া দিয়া সূর্য্য অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে! আর আকাশের গায়ে, না—না, সেই আকাশ যমুনায় কে যেন কনকের কলসী ভাসাইয়া দিতেছিল। আমি খুব আগ্রহের সহিত সেই সমস্ত দেখিতে ছিলাম এমন সময় রাজা মহেন্দ্র সিংহের মেয়ে জহরা আসিয়া আমাকে ডাকিল "প্রেমচাঁদ!" রাজার একমাত্র কন্যা জহরা, আমার নিকট উপস্থিত, আমি আকাশ হইতে পড়িলাম।

জহরাকে আমি চিনিতাম, আর কে না চেনে? জহরা একে রাজার মেয়ে, তার উপর রূপবতী, অবিবাহিতা!

প্রমোদের নয়নে এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিল যে তাহার দিকে চাহিয়া প্রেমচাঁদ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—বাবু, মনে করিওনা যে সেই রূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি পাগলিনীর স্মৃতি মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গেলাম। বরং সেই স্মৃতি আমাকে নবীন ভাবে আহত করিতে ছিল। রূপের আমি কাঙ্গাল নহি! আমার সে আমায় অনেক রূপ দিয়া গিয়াছে। আমি প্রভাতের হাসিতে তার হাসি দেখি, বাবু নয়ন তার বড় নীল ছিল—তাই আমি সাগরের রূপ বড় ভালবাসি। সে মরিয়া সমস্ত সংসারে এক নবীন রূপ দিয়া গিয়াছে। যাক্, জহরা আমাকে বলিল—"প্রেমচাঁদ, কাল আমার একখানা ছবি তুলতে হবে, কেমন কাল খুব ভোরে আমি তোমায় লইতে লোক পাঠাব।"

আমি মুখে 'না' করিতে না পারিলেও, এমন একটা ভাব করিলাম যে তাহা দেখিয়া জহরা বলিল—"প্রেমচাঁদ, তুমি না করিও না, আমি তোমায় অনুরোধ করি! আমি বড় আগ্রহের সহিত এসেছি, প্রেমচাঁদ।

আমি স্বীকৃত হইলাম।

(৩)

এই দেখ সেই চিত্র! জহরা একখানি নীলাম্বরী সাড়ী, বাঙ্গালী ধরণে পরিয়াছে, হস্তে একটি সদ্যতোলা প্রস্ফুট গোলাপ ফুল। আর সম্মুখে দেখত কি, দেখত বাবু ভাল করিয়া দেখ!

প্রমোদ খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এক পাগলিনীর মুখ—যতখানি মুখ, ফটোর মধ্যে দেখা যায়!

প্রমোদ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"পাগলিনী!"

প্রেমচাঁদ আবেগের সহিত বলিল—"হাঁ বাবু, সেই পাগলী! তুমি আশ্চর্য্য হয়েছ? তা হবে বই কি! আমিও হ'য়ে ছিলাম। জহরা সে পাগলিনীকে ভালবাসিত। সে ছিল তাহার সখী। কোথায় বিজন কাননে পর্ণ কুটীরের পাগলিনী, কোথায় ত্রিতল গৃহে কুন্দ-শয্যায় শায়িতা জহরা! কিন্তু ভালবাসার কি টান, জহরা অনেক সময় পাগলিনীর হাত ধরিয়া কুটীর প্রাঙ্গণে বেড়াইত। জহরা সব জানিত। পাগলিনীর নীরবে আত্মবলীদানের কথা জানিত! কিন্তু করিবার কিছুই উপায় ছিল না।

পাগলিনী বলিত, নীরব উপাসনায় দেবতার যেমন পূজা হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে।”

প্রেমচাঁদ চুপ করিয়া রহিল, তাহার নয়ন যুগল ভিজিয়া উঠিল।

প্রমোদ দেখিতে লাগিল বাঙ্গালীবেশে জহরাকে কেমন মানাইয়াছে! জহরার উন্মুক্ত সংসর্পিত কেশদাম পৃষ্ঠে, অংশে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, জহরার ঢল ঢল নয়ন যুগলে যেন শারদ চাঁদিমার অমল ধবল ফুল্ল-লহরী-মালা নৃত্য করিতেছে; আর জহরার মুখখানি যেন নীল সরসীর মাঝখানে একটি পদ্মফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রেমচাঁদ বলিল—“সেই অবধি জহরার সঙ্গে আমার প্রাণের কথার বিনিময় হইয়া থাকে। না হবে কেন? আমি যাকে ভালবাসি, জহরাও তাহাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা অনন্ত বারিধির চেয়েও উদার, অসীম আকাশের চেয়েও সীমাহীন, তুঙ্গ পর্ব্বতমালার চেয়েও সুউচ্চ, গভীর জলধির চেয়ে সুগভীর—কলকণ্ঠ বিহগকুলের কাকলীর চেয়েও মধুর—অস্ফুট চন্দ্রালোকে দিগন্ত পুলকিত বাঁশরীর তানের চেয়েও মনোমদ—অতৃপ্ত! জহরা রোজ আসে, আমি রোজ তাহার ছবি তুলি। দেখবাবু, ও দেওয়ালটা সব ভরা জহরার ছবি! ঐ দেখ জহরা ফুল তুলিতেছে—প্রভাত সমীর যুক্ত অলকের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছে। ঐ দেখ উলের সূতা লইয়া কাপড়ে বুটী তুলিতেছে, ঐ দেখ, নির্ঝরিণীর পার্শ্বে শিলাখণ্ডের উপর জহরা কেমন বসিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার কাননতলে সন্ধ্যারাণীর মত ঐ জহরা দাঁড়াইয়া। একটি মালতী ফুলের মালা গলায় রহিয়াছে, অঞ্চলখানি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখ জহরা বড় দুঃখিত হইয়া, একটি বৃদ্ধকে ভিক্ষা দিতেছে। কেমন করুণা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। “কত ভাবের কত চিত্র দেখাইল। প্রমোদ দেখিল, সব ভাবের চিত্রই আছে, কেবল ভয়ের সঙ্গে বিরক্তির চিহ্নযুক্ত মুখের ভাব, প্রেমচাঁদ কোন ছবিতে অঙ্কিত করে নাই!

প্রমোদ বলিল—“এক ভাবের ছবি আঁকা হয় নাই।”

প্রেমচাঁদ চমকিয়া উঠিল, বলিল,—কি—কি কি ভাব?

প্রমোদ একটু হাসিয়া বলিল—“ভাবের পদ্মাসনে যাহার স্থান, ছন্দের মরুভূমে তাকে কি ক’রে নামাই বলুন?”

প্রেমচাঁদ বলিল,—“ভাল ভাল, তুলি পেন্সিল দিচ্ছি, তুমি আঁকবে এস।

ঐ পাশের ঘরটায় বসে আঁকবে, জানতি চিত্র গৃহে কাহাকেও আঁকতে দিবার নিয়ম নাই।"

প্রমোদ বলিল—"হাঁ এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা ভাল। তা চলুন ঐ ঘরেই যাই। তবে জহরার ঐ ছবিখানি সঙ্গে নিন্।"

প্রেমচাঁদ—কোনখানা?

প্রমোদ—বাঙ্গালী পোষাকে!

প্রেমচাঁদ হাসিয়া বলিল. "কেন এত ছবি দেখলে বাবু, এখনও কি মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায় নাই, যে আবার ছবি দেখিয়া আঁকতে হবে!"

(৪)

প্রেমচাঁদ বলিল—বাবু, তুমি বসে আঁক, আমি খাবার জোগাড় দেখি গে, রাতও হইল! প্রমোদ কোনও কথা না বলিয়া একটা চেয়ার টেবিলের নিকট আনিয়া খুব মনোযোগের সহিত জহারার সেই বঙ্গবেশী রূপ দেখিতে লাগিল।

প্রমোদ ভাবিতেছিল কি করিয়া এই মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটান যায়! যদি কেহ মারিতে আইসে, তবে হয়ত—মুখের ভাবটা, এমনই হয়!

পরক্ষণেই ভাবিল দূর তা'হলে ছবিতে একটা অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। জহরা রাজার আদরের একমাত্র কন্যা, কে তাহাকে এই ভাবে মারিতে আসে? আর ভয়ের সঙ্গে একটু বিরক্তির ভাবও ত ফুটান চাই!

আকাশ পাতাল ভাবিয়া ভাবিয়া প্রমোদ কিছুতেই কোন সূচনা পাইতেছিল না!

তারপর ভাবিল, জহরার গতি ত সর্ব্বত্র। ভাল, সে যেন সমুদ্রের ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যার পরে এই কুঞ্জের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বেশ সময়, বেশ স্থান! সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধরণীখানি আবৃত করিয়া দিয়াছে! কুঞ্জের মাথার উপর দাঁড়াইয়া সুধাংশু হাসিতেছে। আকাশের নীল চন্দ্রাতপ তারার বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সাগরের জলে সে আলোক রশ্মি কাঁপিতে কাঁপিতে ভাসিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যায় বনানী পত্র অচল। ২।৪টি বিহঙ্গ যেন তাহার অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কুঞ্জের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। স্তব্ধভাবে জহরা দাঁড়াইয়াছে। এমন সময় সহসা এক ব্যক্তি কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া জহরার গলার মতির হারগাছিটি ছিঁড়িয়া লইয়া

গেল। জহরার মুখে—বিস্ময়—বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল—ঠিক ঠিক ঠিক, হইয়াছে।

প্রমোদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে তুলি লইয়া ভাবসাগরে ডুবিয়া গেল।

আলেখ্য শেষ করিয়া প্রমোদ একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—উজ্জ্বল দীপালোকো, সে যে প্রাণের কত আবেগ লইয়া সেই আলেখ্য খানি দেখিতে লাগিল, তাহা তেমনভাবে যে কোনও ছবি না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান কঠিন!

জহরার সে মতিহারগাছি ছিন্ন করিয়া লোকটা ছুটিল, তাহার পশ্চাতে দেখা যায় যে বালুর উপর ২।১টি মুক্তা যেন চন্দ্র কিরণে জ্বলিতেছে। চকিত, ভীত, বিস্মিত, জহরা কেমন ভাবে দাঁড়াইয়া। প্রমোদ একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল!

এমন সময় কে পশ্চাত হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল—"প্রেমচাঁদ! প্রমোদ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—জহরা!

জহরা থতমত খাইয়া বলিল—মাপ্ করবেন, আমি ভুল করেছি! প্রেমচাঁদ কোথায়?"

প্রমোদ কোন কথা বলিতে পারিল না। জহরার মুখে যে ভাব ফুটিল তা' ঠিক তাহার স্বীয় অঙ্কিত আলেখ্যরই অনুরূপ!

জহরা আর দাঁড়াইল না। যাবার কালে সে নয়ন কোণে একবার প্রেমচাঁদের অঙ্কিত ছবিখানির প্রতি চাহিয়া গেল।

(৫)

ইহার তিন চারিদিন পরে একদিন বৈকালে প্রেমচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবু, সর্ব্বনাশ!

প্রমোদ চমকিয়া উঠিল, আসন্ন বিপেদর মুখে লোকের হৃদয় যেমন কাঁপিয়া উঠে, তাহার প্রাণও তেমনি কাঁপিয়া উঠিল।

সে প্রমোদকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বাবু, এমন পরিষ্কার তোমার হাত! কিন্তু তুমি পালাও। এই মুহূর্ত্তে! একটুও বিলম্ব করিও না। দূরে দূরে যত দূরে যাইতে পার যাও!"

প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "কেন, কি হইয়াছে, বলুন না!"

প্রেমচাঁদ সত্বর বলিতে লাগিল "পালাও বাবু, যদি জীবনের আশা থাকে!

তুমি যে চিত্রখানি অঙ্কিত করেছ, ওখানাই তোমার কাল হইয়াছে! আজ কয় দিন হইল জহরার মতিরহারগাছি, ঠিক ঐ সময় ঐ স্থান হইতে কে লইয়া গিয়াছে। তুমি ঠিক সেই চিত্র অঙ্কিত করেছ! জহরা তোমার ছবিখানি দেখেছে, সে আমার কাছে চিত্রখানির কথা বলিয়া বলিল যে ঠিক ঐ চিত্রের মত ঘটনা। জহরাদের দেওয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছুটিয়া লোক দেখিতে গিয়াছেন, লোক লইয়া আসিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিবেন!

প্রমোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল।"

প্রেমচাঁদ বলিল—"কি বাবু বসিয়া পড়লে যে? বিপদে ধৈর্য্য হারাইও না। পালাও—পালাও!"

প্রমোদ হাসিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি পলাইব না!"

প্রেমচাঁদ অধৈর্য্য হইয়া বলিল—"কি বল বাবু, তুমি পালাবে না! জান কি বিপদ তোমার মাথার উপর। কি শাস্তি তোমাকে অপেক্ষা করিতেছে!"

প্রমোদ পূর্ব্ববৎ হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি কোনও দোষে দোষী নহি, আমি এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিনা; তবে আমি কেন পালাব?"

প্রেমচাঁদ আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল—"কে বিশ্বাস করিবে, কে জানিবে যে তুমি হার চুরি কর নাই?"

প্রমোদ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"ভগবান আছেন, তিনি বিশ্বাস করিবেন!"

এমন সময় কয়েকজন লোক ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রমোদকে ধরিল। এবং ধাক্কা মারিতে মারিতে রাজা মহেন্দ্র সিংহের নিকট লইয়া চলিল।

৬

যখন কাছারীতে প্রমোদের উপর চুরীর অজুহাতে পীড়ন আরম্ভ হইল, তখন জহরা আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে পাগলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তাহার পিতাকে বলিল, যে প্রমোদ হার চুরী করে নাই, আমি তাহাকে স্বেচ্ছায় হার দিয়াছিলাম। সে তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি সে হার সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিয়াছি, আর কখনও আমি হার পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার চক্ষের ভাব দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন ছেড়ে দাও।

প্রমোদকে কাটগড়া হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল। প্রেমচাঁদ ছুটিয়া আসিয়া সেই কাছারীর মধ্যেই পাগলের মত ডাকিল—বাবু বাবু! প্রমোদ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, প্রেমচাঁদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল!

বিষাদের কৃষ্ণমেঘ কাটিয়া গিয়াছে। প্রমোদ প্রেমচাঁদের সেই ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া প্রমোদের হাতে একখানি চিঠি দিল। প্রমোদ খুলিয়া পড়িল, চিঠি জহরার লেখা।

জহরা লিখিয়াছে ঃ—

বাবু—থাক্—প্রমোদ—কি লিখিব ছাই! দেবতা তুমি, আমার অপবিত্র আবছায়া লাগিয়া তোমার উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গেল! মনে কিছু করিও না, সবই বিধাতার হাত। যাক্, আমার যে মূর্ত্তি তুমি এঁকেছ, সেইখানা আমি রাখিয়া দিলাম, ফিরাইয়া দিলাম না, আজ হইতে আমি প্রবাসী হইব। সেই প্রবাসে আমার সাথী হইবে তোমার ঐ ছবিখানি! কিন্তু আমি তোমাকে একখানি চেক নাম লিখিয়া দিলাম। মনে করিও না যে আমি এমনই অপদার্থ যে সামান্য ২৫ হাজার টাকায় তোমার অমূল্য চিত্রখানি কিনিবার বাসনা রাখিব। আমি জানি তুমি দরিদ্র। সংসারে তোমার বৃদ্ধামাতা ও একটি সহোদর ভ্রাতা আছে। এই টাকায় তাহাদের উপকার করিও। আমার টাকা পরের অর্থ ভাবিও না। যদি দেখাইবার হইত—যাউক, কি লিখিব—যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু, থাক না, তোমার সঙ্গে এখন আমার দেখা করা হইবে না। যদি পার, এক বৎসর পরে এইখানে আসিও, দেখা হইতে পারে!

জহরা।

পত্র পড়িয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমোদ দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল প্রেমচাঁদ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে, প্রমোদ উঠিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এক বৎসর,—সে কত দিন!

পরীক্ষা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্ সি

(১)

শশধর অত্যন্ত মাতৃভক্ত। তাহার বয়স কুড়ি উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু এখনও সে সামান্য একটি কাজও মাতার অনুমতি ছাড়া করে না। রাত্রিতে মায়ের কাছে ঘুমায়,—শিশুর মত মাতার স্তন খুঁটিতে খুঁটিতে গল্প শুনিবার জন্য আবদার করে এবং মায়ের মুখে ভূতপেত্নী ও বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে। সে মায়ের কোলের ছেলে। মা ছেলেকে কখনও বড় ভাবেন না। শশধরের মাতাও ভাবিতেন তাঁহার বিশ বছরের শশধর পাঁচ বছরের একরত্তি শিশুটিই আছে। শশধর অপরের কাছে গম্ভীর থাকিত, কিন্তু মাতার কাছে আসিলেই তাহার গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইত,—অস্ফুট-বাক বালকের মত সে মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কত আবদার করিত, কথায় কথায় মান অভিমান করিত।

শশধর কলেজে বি এ পড়িতেছে। কিন্তু মা কাছে বসিয়া না থাকিলে তাহার পড়া মুখস্থ হয় না। এণ্ট্রান্স্ ও এল্ এ পরীক্ষার সময় তাহার মাতা ও তাহার সহিত রাত্রি জাগিয়াছেন,—পিঠে হাত বুলাইয়া তাহার ক্লান্তি অপনোদন করিয়াছেন, খাওয়াইয়া দিয়াছেন।

শশধরের একটী বৌদিদি ছিল। তিনি দেবরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেন। দেবরকে বলিতেন "তোমার যেরূপ দেখ্‌চি ঠাকুরপো, পরীক্ষার 'হলে' মা না গেলে ত অর্দ্ধেক কাগজ লিখে 'মা কৈ মা কৈ' বলে কাঁদিতে কাঁদিতে বেরিয়ে আস্‌বে।"

শশধরের মাতা ভীত হইয়া বলিলেন "হাঁ তাইত! হারে শশী 'হলে' তোর সঙ্গে আমিও যেতে পারি না? আমি বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প বল্‌ব, আর তুই বেশ লিখে যাবি।"

শশধরের বৌদি হাসিয়া বলিল "হাঁ মা, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প লিখ্‌লেই তোমার ছেলে গোল গোল নম্বর পাবে।"

শশধর ও ভাবিল পীড়ার ভাণ করিয়া মাকে পরীক্ষাগারে লইয়া যাইবে। কিন্তু পরে ইহা সম্ভবপর নয় জানিয়া ক্ষান্ত হইল।

শশধর মাকে বড় ভালবাসিত,—মায়ের সুখের জন্য নিজের প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিত। অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে "বিবাহের পর ছেলেরা মাতা অপেক্ষা স্ত্রীকে অধিক ভালবাসে। পত্নী যাদুবিদ্যা জানে। সেই বিদ্যা প্রভাবে সে স্বামীকে বশ করিয়া ফেলে, সেজন্য বিবাহের পর পুত্র মাতা অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক অনুগত হয়।" শুনিয়া অবধি শশধর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, কস্মিন্‌কালে বিবাহ করিবে না। যে পত্নী এরূপ করে সে তাহার মুখও দেখিবে না,—তাহার মুখ দেখিলেও পাপ আছে।

শশধরের বৌদিদি ক'দিন তাহাকে বিবাহের জন্য শক্ত করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু শশধর বলিয়াছে "সে এ জীবনে বিবাহ করিবে না। বধূগুলিই মাতা পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটায়।"

শশধরের বৌদিদি অবাক হইয়া বলিলেন "সে কি গো! আমিও ত তোমাদের ঘরের বৌ। কৈ আমি ত গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাই নি।"

শশধর বলিল "তুমিত এ বাড়ীরই লোক,—তুমি বুঝি গৃহবিচ্ছেদ ঘটাতে যাবে?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন "আহা মশায়ের যে কথা। আমি ত প্রথমেই এ বাড়ীর লোক ছিলাম না।"

তর্কে পরাজিত হইয়া শশধর বলিল "তা তোমার কথা আলাদা। পৃথিবীতে সকলেই যে তোমার মত লক্ষ্মী হবে তা কে জানে? না, না বিয়ে আমি করব না—ককখনো না।"

বৌদিদি "আচ্ছা সে দেখা যাবে" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেলেন।

(২)

কয় মাসপর শশধরের মাতা স্বর্গগত পতির বৎসরান্ত করিবার নিমিত্ত কাশীধামে চলিলেন। মাতার যাত্রার তিনদিন পূর্ব্ব হইতে শশধর অন্নজল ছাড়িয়া দিল, অশ্রু সার করিল। মাতা তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। "এক মাসের ভিতরই তিনি ফিরিবেন, কাঁদিবার কোনও কারণ নাই।" কিন্তু ইহা বুঝাইতে বুঝাইতে নিজেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিরুপায়। স্বর্গগত কর্ত্তা মৃত্যুর সময় পত্নীকে কাশী যাইয়া বৎসরান্ত করিতে বলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মায়ায় বদ্ধ হইয়া তিনি কি স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন? তাঁহাকে যাইতেই

হইবে। শশধর মায়ের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া, দুহাতে তাহার স্তন খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল "আমি ও তোমার সঙ্গে যাব।"

মাতা তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন "তা হলে যে তোর কলেজ কামাই হবে, বাবা।"

শশধর ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "কলেজ চুলোয় যাক্। আমি কলেজে যেতে চাই না।"

মাতা বলিলেন "ছি বাবা, বড় হয়েছিস্ এখন কি তোর এরূপ কথা সাজে ?"

তাঁহার বধূ হাসিয়া বলিল "তোমার কচি ছেলেই বা তোমার ছেড়ে কি করে থাক্‌বে, মা ? মনের দুঃখে শুকিয়ে যাবে। তোমার কোলের ছেলেকে তুমি সঙ্গেকরে নিয়ে যাও মা। তুমি চলে গেলে যখন কান্না আরম্ভ কর্‌বে, তখন কে ওকে শান্ত কর্ব্বে ?"

মাতা বলিলেন" দূর পাগ্‌লীর মেয়ে, কাঁদবে কেন ? কদিন পরেই ত আমি ফিরে আস্‌ব। কাশীধাম প্রাপ্ত হব না, ভয় নেই।"

কাশীধাম প্রাপ্তির কথা শুনিয়া শশধর বড়ই অধীর হইয়া উঠিল। 'অতদূর দেশে মাতা যাইবেন,—কি জানি যদি কিছু ভালমন্দ ঘটে। তারপর রেল জাহাজের পথ। কি জানি যদি রেলের ইঞ্জিনের বয়লার ফাটিয়া যায়, অথবা ঝড়ে জাহাজ ডুবিয়া যায়। তারপর মা বৃদ্ধা,—কাশীতে অনেক ষাঁড় আছে, ধর যদি একটা বদ্‌মায়েস ষাঁড় মাকে গুঁতাইতেই আসিল। কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে,—এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ভয় তাহার মনে জাগিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে রওনা করিয়া দিয়া সে গৃহের মেঝে বসিয়া পড়িয়া নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয় ভাবিতে লাগিল। তাহার বৌদিদি সে সব কথা শুনিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো, তুমি যেন কেমনই। এতবড় হলে তবু মায়ের আঁচল ধরে ফির্‌বে। লোকে দেখ্‌লে হাস্‌বে যে। আর কি সব উদ্ভট কল্পনাই তোমার মাথায় আসে।· কতলোক কাশীতে যাচ্ছে। কৈ কেউ জাহাজ ডুবে বা ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে মরেচে বলে ত শোনা যায় নি। তোমার ভয় নেই, কিছু হবে না। বাবা বিশ্বেশ্বর মাকে রক্ষা কর্ব্বেন। তিনি বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। শশধর ও মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে কাতরভাবে ডাকিতে লাগিল বাবা বিশ্বেশ্বর,

মাকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে এন। তোমায় একটা হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় দেব বাবা।"

(৩)

মাকে ছাড়িয়া শশধরের দিনগুলি যে কিরূপভাবে কাটিতেছিল তাহা আর কি করিয়া বুঝাইব? মাতৃহীন অস্ফুটবাক, স্তন্যপায়ী শিশুরাই কেবল তাহা বুঝাইতে পারে।

বৌদিদি দেবরটীকে ভুলাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা শশধরকে কাছে কাছে রাখিতেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন, মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং শীঘ্রই মাতা ফিরিয়া আসিবেন এইকথা বলিয়া আশ্বস্ত করিতেন।

শশধর মাতাকে প্রতিদিন একখানি চিঠী লিখিতে বলিয়া দিয়াছিল। মাতা প্রত্যহই একখানা চিঠী দিতেন। অন্ধের নড়ির মত দুঃখের ভিতর এইটীই তাহার সম্বল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া সে চিঠী কতবার পড়িত তাহার ঠিক নাই। রাত্রিতে চিঠীখানা বুকে রাখিয়া ঘুমাইত। চিঠীর স্পর্শে সে মাতার স্পর্শ সুখ অনুভব করিত!

প্রত্যহ পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া দেখিত আজ কি তারিখ। মাতা বলিয়া গিয়াছেন আগামী মাসের ৩রা তারিখ তিনি রওনা হইবেন। আচ্ছা আজ ৭ই তারিখ, তাহা হইলে আর ২৭ দিন আছে। উহুঁ ২৭ দিন নয়, ২৭+৫=৩২ দিন; কাশী হইতে তাহাদের দেশে পৌঁছিতে ৫ দিন লাগে। ঈঃ যদি কিছুদূর নৌকায় আর পাল্কীতে যাইতে না হইত, তবে হয়ত ২ দিন লাগিত। ২ দিন পূর্ব্বে মাতা দেশে পৌঁছিতেন। আর এ মাসটাও এমন বিশ্রী একবারে ৩০ দিনে পূর্ণ হইবে। কোনও কোনও মাস ত ২৮ দিনেও পূর্ণ হয়। এ মাসটা সেরূপ হইলেই ত পারিত। তবু ভাগ্যি ৩২ দিনে পূর্ণ হয় নাই, ইস্ সে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। শশধর পঞ্জিকা দেখিতে লাগিল। পাতা উল্টাইয়া সহসা স্বর্পদষ্ট পথিকের মত চম্‌কাইয়া উঠিল,—সর্ব্বনাশ এ যে ৩২ দিনে মাস। কোথায় দুদিন বাঁচাইতে চাহিয়াছিল,—কিন্তু এ যে দিন আরও বাড়িয়া গেল।

বৌদিদি রান্নাঘরে পাক চড়াইয়া কক্ষতলে একটা পিড়ির উপর বসিয়া কোলের ছেলেকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। শশধর ম্লানমুখে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনটা ছাৎ করিয়া উঠিল। আহা

তাহার মাতা এখানে থাকিলে সেও ত এই ভাবে মায়ের কোলে বসিয়া থাকিত। বৌদি তাহার ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "ঠাকুরপো এস। ভাত, মাছ হয়েছে। দাল চড়িয়েছি, হল প্রায়, সম্বারাটা বাকী। তারপর দুখানা আলুর চপ্ ভেজে দেব। তোমার কালেজের সময় হয়েছে বুঝি? তা তুমি চান করে এসো ততক্ষণ, আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে। কোলের ছেলেকে বলিল "যাও গোপাল, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে চান করে এসো।" স্তন্যপান রত গোপাল কাকাবাবুর দিকে আড়নয়নে চাহিয়া কি ভাবিয়া বলিয়া বসিল কাকাবু—মা নেই। আমা মা দুদু তাই। কাকাবু মা কৈ?" শশধরের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। তাহার বৌদিদি ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "এই আর কদিন পরই আস্‌বেন।" শশধর ঢোক্ গিলিয়া বলিল "এ মাসটা ৩২ দিনে, বৌদিদি। আচ্ছা কোনও কোনও মাস ২৮ দিনে হয়। এ মাসটা হয় না কেন?"

বৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তা তুমি কেন পাঁজি ওয়ালাদের এ ভুলটা সংশোধন করে দাও না। আচ্ছা মাস গুলো—অন্ততঃ এ মাসটা ৮ দিনে পূর্ণ হলে বেশ হত,—না? আজ ৭ তারিখ, কাল ৮—"

শশধর একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হ্যাঁ"

বৌদিদি হাসি চাপিয়া বলিলেন "দেখ্‌তে দেখ্‌তে কটা দিন কেটে যাবে। এদিকে মন দিও না ঠাকুরপো। খুব মনোযোগ দিয়া পড়া শুনা কর, দেখবে মনটা বেশ থাক্‌বে।"

শশধর তৈল মাখিয়া স্নান করিতে গেল, বেলা সাড়ে নটা বাজিয়াছিল।

(৪)

সেদিন বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া, পড়ার ঘরে বহি রাখিয়া, হাত মুখ ধুইবার জন্য শশধর গামছা কাঁধে পুকুর পানে চলিয়াছিল, এমন সময় হাস্যমুখী বৌদিদি আসিয়া বলিলেন "সুংবাদ ঠাকুরপো, কি খাওয়াবে বল?" শশধরের বুকের ভিতরটা দিয়া যেন তড়িত প্রবাহ খেলিয়া গেল। সে ভাবিল "কি সুংসবাদ বৌদি।"

"বল আগে কি খাওয়াবে?"

"ওঃ আমি জানি, তোমার বল্‌তে হবে না।" শশধর স্থির বুঝিল তাহার মাতাই ফিরিতেছেন,—ইহা ছাড়া আর কি সুসংবাদ থাকিতে পারে? আর কল্য রাত্রিতে সে এরূপ স্বপ্নও দেখিয়াছে।

বৌদিদি বলিলেন "কি তুমি জান ?"

শশধর। "আমার স্বপ্ন মিথ্যা হতেই পারে না। আজ কলেজ থেকে ফিরবার সময় আমি এক টাকা দিয়ে জ্যোতিষ দিয়ে গুণিয়ে এসেছি। শেষ রাত্রির স্বপ্ন মিথ্যা হয় না, জ্যোতিষঠাকুর বলেছেন। আশ্চর্য্য স্বপ্নটা হাতে হাতে ফোল্ল।"

বৌদিদি বিস্মিতভাবে বলিলেন "তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ ?"

"আমি স্বপ্ন দেখছি মা ফিরে এসেছেন। দেখ স্বপ্নটা হাতে হাতে ফোল্ল।"

"কি করে হাতে হাতে ফোল্ল ?"

"বাঃ রে এইমাত্র বল্লে সুসংবাদ আছে। মার ফিরে আসা ছাড়া আর কি সুসংবাদ হতে পারে ? হুঁ চালাকি করে সন্দেশ আদায় কত্তে চেয়েছিলে ? হুঁ ভারি চালাক তুমি। ভেবেছিলে 'সুসংবাদ আছে' বল্লে আমি কিছু বুঝতেই পার্ব্ব না।"

"তুমি মোটেই বুঝ্‌তে পারনি, ঠাকুরপো। এ অন্য বিষয়ের সুখবর, কিন্তু খবরটা তোমার পক্ষে বড়ই সু। তুমি টাকা বের কর।" শশধর নিরাশ হইয়া পড়িল, মাতা ফিরিতেছেন ভাবিয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়াছিল। হতাশকণ্ঠে বলিল "তবে কিসের খবর ?"

বৌদি তাহার ভাব লক্ষ্য না করিয়া উৎসাহভরে বলিলেন —"মায়ের চিঠি এসেছে।" "মার চিঠি ! কৈ দেখি। তিনি কি লিখেছেন।"

"উঁহু তা হচ্ছে না। আগে সন্দেশ বের কর।"

শশধর অস্থির হইয়া বলিল "আচ্ছা তুমি যত সন্দেশ খেতে পার খাওয়াব। এখন সংবাদটা বলে নিশ্চিন্ত কর।"

বৌদি আসিয়া বলিলেন "মা তোমার জন্য একটি রাঙা টুকটুকে বৌ আনতে বলেছেন। জ্ঞান ঘোষের মেয়ে নাকি ভারি সুন্দরী। মা তাকে কাশীতে দেখেচেন, তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছে। তিনি এ সম্বন্ধ স্থির কর্ত্তে বলেছেন। কাশী থেকে ফিরেই তোমার বিয়ে দেবেন।" শশধর মুখ ভেংচাইয়া বলিল "ইঃ ভারি একটা খবর। এর জন্য এতক্ষণ আমাকে এত ব্যস্তকরে তুলেছিলে। আমি ভেবেছিলেম না জানি কি খবর।"

বৌদিদি। "কেন এ সংবাদটা বুঝি পছন্দ হল না ?"

শশধর। "আমি বিয়ে কর্ব্বো না জানইত।"

বৌদিদি। "হা তা হলেই মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবে। মা নিজে

দেখে বৌ পছন্দ করেছেন, এ সম্বন্ধ কর্ব্বার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন,—আর তুমি কিনা নিজের জেদ বজায় রাখবে,--মাকে সুখী কর্ব্বে না ?"

শশধর। "বৌ এসে যদি গৃহ বিচ্ছেদ ঘটায়।"

বৌদিদি। "ভয় নেই। গৃহ-বিচ্ছেদ যাতে না ঘটে সে ভার আমার উপর। তোমার ভুল বিশ্বাস। দেখ ঘোড়া যত উচ্ছৃঙ্খল হোক্ না কেন, চালক পাকা হলে ঘোড়া ঠিক পথেই চলে। বাঙ্গালীর ঘরে গৃহ-বিচ্ছেদের মূল কারণ বধূ নহে; বধূর স্বামী। স্বামী যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধীর স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিবেচক হয়, তবে বধূর সাধ্য কি যে সে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। স্বামীরা বিয়ের রেতেই স্ত্রীর পদানত হয়ে পড়েন, তার কৃতদাস হন, স্ত্রীকে না চালিয়ে উল্টো স্ত্রীর দ্বারাই চালিত হন। অল্পবুদ্ধি অবলাকে এরূপ প্রশ্রয় দিলে সে বিগ্‌ড়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি ? কেন আমরা কি ঘরের বৌ নই,—আমরা কি গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছি ?"

শশধর। "এ বিষয়ে তর্ক করে তোমাকে বুঝাতে পার্ব্ব না।"

বৌদিদি। "আমি তোমার কাছে কিছু বুঝ্‌তেও চাই না। এখন তোমার ইচ্ছা,—মাকে সুখী বা অসুখী যাহা ইচ্ছা কর। এই দেখ মায়ের চিঠি।" শশধর চিঠিটি পাঠ করিয়া দেখিল, মাতা লিখিয়াছেন এ বিবাহে স্বীকৃত না হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। শশধর ভাবিতে লাগিল এখন কি করা যায়। মায়ের অবাধ্য সে কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু মাতা এখন বুঝিতেছেন না, পরে বুঝিয়া হয়ত অনুতপ্ত হইবেন।

(৫)

পরদিন বৌদিদি শশধরের পড়ার ঘরে আসিয়া, একটু কুটিল হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি স্থির করিলে ঠাকুরপো ?"

শশধর পুস্তকের পাতায় চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে বলিল "কি আর স্থির করব ?"

বৌদিদি। "তা হলে মাকে লিখেদি তুমি বিবাহে অসম্মত"

শশধর। "আচ্ছা মা কি তাতে বড় দুঃখিত হবেন ?"

বৌদিদি। "ওমা তা আর হবেন না। তুমি পুরুষ মানুষ, মেয়েদের সাধ আকাঙ্ক্ষার বিষয় কি বুঝ্‌বে। বুড়োবয়সে স্ত্রীলোকদের ইচ্ছে হয় ঘরে বৌ আসুক, এসে ঘরখানি আলো করে বসুক। খাবার সময় কাছে বসে 'এটা খান, ওটা খান' বল্‌বে, খাওয়া হলে অমনি পান সেজে এনে দিবে, পাকা চুল

ভুলবে, বিছানায় শুইয়ে পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াবে। তা যে ছেলে মাকে এ সব সুখভোগ থেকে বঞ্চিত করে সে নিতান্ত হতভাগা। সে মাতৃভক্ত নয়। কেবল মুখে 'মা মা' বল্লেই হয় না, মায়ের সুখ স্বচ্ছন্দের দিকেও দেখতে হয়। আমার যা বল্‌বার বল্লুম, এখন তুমি যা ইচ্ছা কর তাই।"

শশধর বহুক্ষণ নীরবে ভাবিয়া বলিল "তবে তাই হোক।"

"কি হবে, মাকে লিখে দেব তুমি বিয়ে কর্ত্তে স্বীকৃত নও।"

"না, তা আর কি করে লিখবে। লিখ এই যে—"

দুষ্ট বৌদিদ বলিল "তা তুমি ভেঙ্গে না বল্লে কি করে তোমার মনের ভাব বুঝব ?"

শশধর ঢোক গিলিয়া বহুকষ্টে বলিল "লিখে দাও এই যে স্বীকৃত।" বলিয়া তাহার গণ্ডদ্বয় রাঙা হইয়া উঠিল।

বৌদিদি হাসি চাপিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন "আর একটি কথা।"

শশধর নত নেত্রে বলিল "কি"

বৌদিদি। মা লিখেছেন তোমাকে মেয়ে দেখতে।

শশধর বলিল "যাও সে আমি পার্ব্ব না।"

বৌদিদি। "এখন তোমার ইচ্ছে। ইচ্ছে হয় মার কথা রাখ, ইচ্ছে না হয় রেখ না।"

(৬)

শনিবার বৈকালে বৌদিদি শশধরকে বলিলেন "তা হলে কাল মেয়ে দেখতে যাচ্ছ ঠাকুরপো ? জ্ঞানঘোষের বাড়ী খবর পাঠাচ্ছি।"

শশধর বিস্মিতভাবে বলিল "কে বলে আমি মেয়ে দেখতে যাব ?"

বৌদিদি। "তুমি যাবে না ? তুমি না গেলে পছন্দ কর্ব্বে কে ?"

শশধর। দাদা গেলেই হয়। আর মা যখন পছন্দ করেছেন তখন আর দেখবার প্রয়োজন কি ?

বৌদিদি। তবু ঘরে ঘরে একটা আদর্শ আছে ত। মায়ের আদর্শের সঙ্গে তোমার আদর্শ যদি খাপ না খায় ? মা সেকেলে লোক, আর তুমি কলেজ পড়া মানুষ!"

শশধর। আমি মাকে সুখী করবার জন্যই বিয়ে কর্ত্তে সম্মত হয়েছি। স্ত্রীসম্বন্ধে আমার কোন আদর্শই নেই। মার সেবার জন্য একজন দাসী এনে দিচ্ছি, তার চেহারা ধুয়ে কি জল খাব ?"

বৌদিদি। "তবু তোমার যাওয়া উচিত। মায়ের আদেশ, এই দেখ চিঠি।

শশধর চিঠীখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, সত্যই মাতা লিখিয়াছেন,—শশধর যেন নিজে যাইয়া মেয়ে দেখিয়া আসে। মেয়ে তাহার পছন্দ হইল কি না আমাকে শীঘ্র জানাইবে।" শশধর মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে না। চিঠী পড়িয়া সে রবিবার মেয়ে দেখিতে যাইতে স্বীকৃত হইল। বৌদিদি রাত্রিবেলা জ্ঞানঘোষের স্ত্রীর নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

পরদিন শশধর জ্ঞানঘোষের কন্যা দেখিতে গেল। জ্ঞানবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, তাহার পুত্র চারু মহাসমাদরে তাহাকে বৈঠকখানায় বসাইল। কক্ষটী সুসজ্জিত। দেওয়ালের গাত্রে নানারূপ রূপসী তরুণীর আলেখ্য বিলম্বিত। কোনও সুন্দরী চম্পকগণ্ডে চম্পকাঙ্গুলি স্থাপন করিয়া ঈষৎ হাসিতেছে,—গণ্ড, ওষ্ঠ, বক্ষ বহিয়া নিবিড় কৃষ্ণকুন্তলরাজি সর্পশিশুর মত নাবিয়াছে,—কোনও সুন্দরী নদীজলে স্নান করিতেছেন, সিক্তবসনের ভিতর হইতে দেহের কাঞ্চনবর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চক্ষু কেমন মনভুলান, তাহাতে কজ্জলরেখা টানিয়া চিত্রকর তাহা মন্মথের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করিয়াছে। শশধর একবার ছবিগুলি দেখিয়াই নতনেত্রে চেয়ারে বসিল। এমন সময় বাহিরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি শশধরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘরের সজ্জা দেখিতে লাগিল। শশধর লজ্জায় হেটমুণ্ডে বসিয়া রহিল। এক একবার আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটীর পানে চাহিতে লাগিল। মেয়েটীর বর্ণ মসীনিন্দিত, চক্ষু দুটি ছোট ছোট সুগোল, একেবারে পেচকের চক্ষুর মত। ঠোট দুটি পুরু, কালো। কপাল উচ্চ, নাসা চেপ্টা, দন্ত ও ওষ্ঠের অবগুণ্ঠনে থাকিতে নারাজ হইয়া লজ্জাহীনা নারীর ন্যায় বাহিরে উঁকি দিতেছে। তাহার পরিধান একটি রক্তবর্ণ স্যাড়ি। মাথায় চুল নাই বলিলেই হয়, ভ্রূও তদ্রূপ। মুখ হইতে চিবুক বহিয়া লালা নির্গত হইতেছে।

চারু বলিল,—ভাল করিয়া দেখুন, শশধরবাবু! লজ্জা কি? একেই আপনার মাতা কাশীতে দেখেছেন। "মেয়েটীকে বলিল,—"তোমার নাম বল,—আর কি কি বই পড় বল।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকশিত করিয়া বলিল,—আ-আ-মা-আ-ল্ না-আ-ম্ ছি-লি-ম-তি গঙ্গ-এ-ন্-দ-র-ব-দ-না।"

চারু বুঝাইয়া বলিল,—"ওর নাম গজেন্দ্রবদনা। আচ্ছা তুমি কি কি কাজ করিতে পার বল ?"

মেয়েটীর মুখ হইতে ক্রমাগত লালা নিঃসৃত হইতেছিল। সে উভয়হাতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল,—"আ-আ মি গো-ও-লু-উ-ল জা-আ-ব ক-রি-তে আ-আ-ল গো-ও-লু-উ-ল গো-ও-ব-অ-লে-এল ঘুঁ-উ-টে দি-ই-তে পা-আ-লি।"

শশধর নীরবে বসিয়া রহিল। একবার বিলম্বিত ছবির দিকে আর একবার মেয়েটীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চাহিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ঝি বলিল –"আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি ?

শশধর বলিল—"না, যেতে পার।" ঝি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অতঃপর জলযোগ শেষ করিয়া শশধর বাটী রওনা হইল। চারু জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়ে পছন্দ হয়েছে।"

অন্যমনস্কভাবে "হু" বলিয়া শশধর গাড়ীতে উঠিল।

(৭)

বাটী পৌঁছিলে বৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "মেয়ে পছন্দ হ'ল ঠাকুরপো।" শশধর অন্যমনস্কভাবে বলিল—"হয়েছে।" "উহু হয়নি বুঝি ? কেন মেয়েটী সুন্দরী নয় ?"

শশধর নীরবে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বৌদিদি বলিলেন "মেয়েটীর নাম কি ?"

অপ্রসন্নমুখে শশধর বলিল "গজেন্দ্রবদনা, না কি।"

বৌদিদি যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তা নামটা না হয় বদ্‌লে নেওয়া যাবে। কিন্তু চেহারা যদি কুৎসিৎ হয়ে থাকে, তা হলে—। কিন্তু মা এ মেয়েটীকে পছন্দ করেছেন, এখন কি করা যায় ?"

শশধর একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল "না আমার অপছন্দ হয়নি। চেহারা এক রকম হলেই হয়। তবে ঐ যে মুখ দিয়ে লালা পড়ে তাতেই একটু বা হ'য়ে—"

"আঃ মুখ দিয়ে লালা পড়ে! আরও দোষ টোষ আছে নাকি ?

"একটু তোত্‌লা।"

"না, না, ঠাকুরপো, এ সম্বন্ধ হতেই পারে না। মা সেকেলে মানুষ,

তাঁদের কি কোনও পছন্দ টছন্দ আছে? ভাগ্যি তোমাকে মেয়ে দেখ্‌তে পাঠিয়েছিলুম।"

"না আমার অপছন্দ কিছু নয়। তবে কিনা, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, খাবার সময়ে বড় ঘেন্না কর্ব্বে, আর—"

বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া বৌদি বলিলেন—"হঁ্যা তা ত বটেই। বল ত সম্বন্ধ ভেঙ্গে দি। প্রতুল মিত্রির ভগ্নি খুব সুন্দরী, বল ত তাঁর সঙ্গে—"

শশধর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "না তাকি হয়। মা পছন্দ করেছেন।"

বৌদি বলিলেন "কিন্তু তা বলে এ সম্বন্ধ হতেই পারে না। রাম, রাম কালো, কুৎসিৎ, তোত্‌লা আবার মুখ দিয়ে লাল পড়ে!"

(৮)

সন্ধ্যাকালে শশধর গবাক্ষসান্নিধ্যে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়া স্বর্ণজ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিল। শশধর ভাবিতে লাগিল "মেয়েটা যদি আর একটু সুন্দরী হইত। বেশী সুন্দর সে চাহে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি অমন কুৎসিৎ মেয়েটাকে বিয়ে করা যায়? আত্মীয় অনাত্মীয়ের মেয়ে দেখিলেই আজকাল সে চাহিয়া দেখে। কিন্তু গজেন্দ্রবদনার মত কুৎসিৎ মেয়ে আজিও তাহার চোখে পড়ে না। হায় এমন কুৎসিৎটার স্বামী সে হইবে! কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালন করিতেই হইবে।

এমন সময় তাহার বৌদি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "ঠাকুরপো।"

শশধর ফিরিয়া দেখিল বৌদি একটী বালিকার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বালিকাটীর মুখ ঠিক বাহিরের চাঁদের মতই সুন্দর। মস্তকে ভুজঙ্গতুল্য নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলরাশি, তাহা চম্পকগণ্ড, চিবুক, বক্ষ, পৃষ্ঠ বহিয়া নাচিতেছে। চক্ষু দুটি আকর্ণবিস্তৃত, তাহার কটাক্ষ চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। গোলাপের পাপড়ির মত রাঙ্গা অধরের পার্শ্বে জ্যোৎস্নাতুল্য হাসি,—তাহা দেখিলে যোগীর মন ভুলে। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগের মাঝখানে একটী খয়েরের টিপ। পরিধানে আকাশরঙ্গের সাড়ি হাতে সোণার অলঙ্কার কেমন মানাইয়াছে!

শশধর তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিল। গজেন্দ্রবদনার মুখের কাছে এ মুখখানি অমাবস্যার পাশে পূর্ণিমার চাঁদের মত!

বৌদিদি তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কি ঠাকুরপো, পছন্দ হয় ?" বালিকা আরক্তমুখে হেটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিল।

শশধর বিস্মিতভাবে বলিল,—"এ কে ?"

"প্রতুল মিত্রির ভাগ্নি নির্ম্মলা। বল ত একে জায়ের আসনে বসাই।"

বালিকার নত মস্তক আরও নত হইল, আরক্তগণ্ড আরও রাঙ্গা হইল।

শশধর আকাশের দিকে তাকাইয়া নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বৌদিদি বলিলেন,—"অমত করো না ; এই ফাল্গুনেই তা হ'লে হোক। মায়ের মত আমি করাব, ভেব না।"

(৯)

রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া শশধর কত কথাই ভাবিতে লাগিল। গজেন্দ্রবদনার ও নির্ম্মলার মুখ তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিল। একটী অমাবস্যা আর একটী পূর্ণিমা,—একটী স্বর্গ আর একটী নরক। সে কি করিবে। কিন্তু মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা পাপ। ইহকালের সুখের জন্য সে কি পরকাল হারাইবে! সমস্ত রাত্রি সে মনের সহিত যুঝিল। একবার স্থির করিল, মাকে ধরিয়া পড়িয়া মায়ের মত ফিরাইবে,—কিন্তু তাহা হইলে সকলে কি ভাবিবে, বৌদি আজীবন জ্বালাতন করিবেন। যাক্ সে মাতৃআজ্ঞাই পালন করিবে। ধ্রুব, রাম প্রভৃতির কথা তাহার মনে জাগিল। হাঁ সে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

পরদিন ভোর বেলা বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি স্থির কল্লে ঠাকুরপো ?

"কি আবার স্থির কর্ব্ব ?"

"তা হলে নির্ম্মলার সঙ্গেই বিয়ে স্থির করি ?"

"না।"

"তবে গজেন্দ্রবদনাকেই বিয়ে কর্ব্বে ? তাকে এতই পছন্দ হয়েছে ?"

শশধর গম্ভীরভাবে বলিল—"মাতৃ আজ্ঞা পালন কর্ব্ব।"

বৌদিদি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"তা কর। জ্ঞানবাবু তোমার মত জান্‌তে চেয়েছেন। তা হলে ব'লে পাঠাই তোমার পছন্দ হয়েছে।"

শশধর বলিল,—"আচ্ছা।" কিন্তু তাহার মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। শশধর বিদ্রোহী মনটাকে স্থির রাখিবার জন্য ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে আপনাকে ডুবাইয়া দিল। কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ

লইয়া বসিলে কি হইবে, প্রতিপাতায় কেবল নির্ম্মলার সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইত, আর গালে হাত দিয়া ভাবিত, 'আহা এই মেয়েটিকে যদি বিবাহ করা যাইত। নায়ের কি পছন্দ, হায়! আমার জীবনটা ব্যর্থ হইল।'

বিবাহের দু'দিন পূর্ব্বে তাহার মাতা কাশী হইতে আসিলেন। শশধরকে নিকটে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন,—"বাবা, এতদিনে যে তোর বিয়ের মত হয়েছে। মা কি কারুর চিরকাল থাকে। আমি বুড়ো হয়েছি কবে মরে যাব ঠিক কি? এখন একটী বৌ এনে তার হাতে তোর ভার দিতে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কাশী যাব। আহা, স্থানটি কি মিষ্টি লাগে। শেষ জীবনটা বাবা বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌তে চাই। জ্ঞানঘোষের মেয়েটী বেশ সুন্দরী, আর বেশ লক্ষ্মী।"

শশধর বোধ হয় মনে মনে বলিল,—"খাসা পছন্দ তোমার।"

ক্রমে ফাল্গুনের ১৬ই তারিখ আসিল। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ছাগশিশুর মনের অবস্থা যেরূপ হয়, বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হইবার সময় শশীধরের মনের অবস্থাও সেরূপ হইল। কিন্তু দুঃখের ভিতরেও একটু শান্তি জন্মিল, মাকে সে সন্তুষ্ট করিতেছে।

ক্রমে স্ত্রী আচারের সময় আসিল, চতুর্দ্দিকে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল, শুভদৃষ্টিও হইল, কিন্তু শশধর সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মৃত্তিকাতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা কে বুঝিবে?

(১০)

বিবাহের পর সে বধূসহ বাসরঘরে নীত হইল। আলোকোজ্জ্বল গৃহে সহসা পার্শ্বোপবিষ্টা বধূর প্রতি চাহিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। বধূর মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল, কিন্তু তাহার অনাবৃত বাহুযুগল দেখিয়া সে অবাক হইল,—তাহা ফুলের মত কোমল এবং চাঁপাফুলের মত তাহার বর্ণ। তাহার মনে হইল ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। চক্ষু ভাল করিয়া রগড়াইয়া আবার চাহিল। দেখিল সত্যই বধূর বর্ণ জ্যোৎস্নার মত। আশ্চর্য্য! একি প্রহেলিকা! সে কিছুতেই প্রহেলিকার আবরণ ভেদ করিতে পারিল না।

গভীর রাত্রিতে যখন বাসরগৃহ শূন্য হইল তখন সে সন্তর্পণে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বধূর জমাট করা জ্যোৎস্নার মত সুন্দর অপরিস্ফুট প্রফুল্ল পদ্ম কলিকার মত তাহার আয়তলোচন দুটি মুদিত,—বধূ নিদ্রিত ছিল। এই বধূ নির্ম্মলা। গভীর রাত্রি,—কক্ষে আর কেহই নাই। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে বাহিরের রজতজ্যোৎস্না বধূর অবগুণ্ঠন মুক্ত বদনকমলে পতিত হইয়া হাসিতেছে;—নহবৎখানা হইতে রসন চৌকির করুণ সুর নৈশ সমীরণের সহিত ভাসিয়া আসিয়া প্রাণে এক অব্যক্ত আবেশ জাগাইতেছিল। শশধর,—শাস্ত্র পরায়ণ, সংযমশীল, শশধর দুইহাতে নিদ্রিতা পত্নীর, কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল,—তারপর—তারপর পত্নীর মহুয়া ফুলের মত রসে ভরা, রাঙ্গা অধর যুগলে একটি—একটি—মুদ্রিত করিয়া দিল।— * *

' ১১ '

সহসা বধূ জাগিয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া, মুখ ফিরাইল।

শশধর আবেগ ভরে বলিল "এ কি প্রহেলিকা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।"

বধূ ঈষৎ হাসিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল "কি প্রহেলকি।!"

শশধর। "সমস্ত ঘটনা যেন স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। আমার ত জ্ঞানবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিল।"

বধূ। "আমার বাবার নামইত জ্ঞানবাবু।"

শশধর। "তোমার নাম কি?"

নববধূ নেহাৎ নির্লজ্জার ন্যায় হাসিয়া বলিল "শ্রীমতী গজেন্দ্রবদনা।"

শশধর অপ্রতিভ ভাবে বলিল "তোমার নাম নির্ম্মলা নয় কি? তুমিই ত সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী এসেছিলে।"

বধূ। "হাঁ দিদি আমাকে এনেছিলেন।"

শশ। "দিদি কে?"

বধূ। "কেন তোমার বৌদি।" শশধর বলিল "ওঃ। তবে গজেন্দ্রবদনা কে?"

বধূ হাসিয়া বলিল "সে আমাদের প্রজা রাম মণ্ডলের মেয়ে। তোমার বৌদি তোমার মাতৃভক্তি পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য ওরূপ করেছিলেন। অবশ্য আমার মাকে লিখে তিনি পূর্ব্বেই সব ঠিক ঠাক করে রেখেছেন।"

শশধর। "তবে কাশী থেকে মা গজেন্দ্রবদনার কথা লিখিয়াছিলেন কেন?"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল "ওসব মিথ্যে। দিদি ও রকম জাল চিঠি সংগ্রহ করেছিলেন। কাশী থেকে মা দিদিকে তোমার একটা সম্বন্ধ স্থির কত্তে লিখেছিলেন। দিদি একটু মজা কর্ব্বার জন্য এরূপ করেছেন।" শশধর অবাক হইয়া বলিল "বৌদির পেটে এত বিদ্যা তা ত জান্‌তেম না।" * *

পরদিন ভোরবেলা বৌ দিদি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর পো পরীক্ষায় পাশ্ করেছ। এই নাও তার পুরস্কার।" বলিয়া নির্ম্মলাকে তাহার কোলে বসাইয়া দিলেন। শশধর হাসিয়া বলিল "পরীক্ষক মশায় বড় শক্ত প্রশ্ন করেছিলেন।" বৌ দিদি বলিলেন "ভাল ছেলেরা শক্ত পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়, তুমি ও হয়েছ।—"
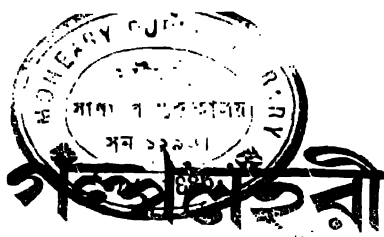
৪র্থ বর্ষ, { কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৩ } ৭ম, ৮ম সংখ্যা

মধু-চক্র

লেখক—শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্রলাল যদিও পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তথাপি ছেলে বেলা হইতে কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়া কলিকাতাটাই তাহার কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; এইজন্য লেখাপড়া শেষ করিয়া যখন নিজের একটা স্থায়ী আশ্রয় স্থানের কথা মনে উঠিল, তখন কলিকাতাকেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল! তাহার উপর এ ভাবটা তাহার মনে সর্ব্বদা জাগিত, কলিকাতার এই সহস্র কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে প্রতিভা বিস্তারের পথ যতটা সহজ—দেশে ততটা নয়!

তাহার জন্য একখানা বাড়ীও ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি শিক্ষিত বান্ধবের অনুরোধে ও মায়ের একান্ত উপরোধে তাহাকে দেশে ফিরিতে হইল!

বান্ধবেরা কহিল, ভায়া হে, পল্লীগুলা উৎসন্নে যেতে বসেছে, শিক্ষিত ধনী যারা, তাঁরা সুবিধে পেয়ে রাজধানীতেই রয়ে যাচ্ছেন। দেশের অন্তঃস্থল যাহা, যাহাদের লইয়া দেশ, সেই পল্লী-সমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইতেছে, ইত্যাদি—

মহেন্দ্র গ্রামে প্রবেশ করিয়াই দেখিল এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া গ্রামের লোক রাস্তা চলাচল করিতেছে; একটু চেষ্টা করিলেই ইহার প্রতিবিধান হইতে পারিত, কিন্তু পল্লী-বৃদ্ধেরা নিশ্চিন্তে তাম্রকূট ধূমে চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন

করিতেছেন এবং বারোয়ারী, দলাদলির ঘোঁট লইয়া আছেন, এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় নাই!

মহেন্দ্র কহিল ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। মা মহামায়া মহেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "পল্লী-বৃদ্ধদের কথা মানিয়া চলিবে। কাহারও উপরে উঠিবার প্রয়োজন নাই!"

মহেন্দ্র কহিল! না মা আমি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়াই চলিব! কিন্তু তাহাদিগকে মানুষ করিয়া লইয়া—

গ্রামের মধ্যে তখন উদ্ধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়। তাঁহার অতীত জীবন নানাপ্রকার অকার্য্য কু-কার্য্যে দূষিত হইলেও বর্ত্তমানে কিছু পয়সা ও হরিনামের মালার জোরে প্রধান হইয়া আছেন এবং যৌবনে এক পরিত্যক্তা পতিতা তন্তুবায় রমণীকে পত্নী স্থানীয়া করিয়া লইয়া তাহারই হস্তে শেষের দিন কয়টার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

ইহার সম্বন্ধে লোক কখনও কাণাকাণি করিলে বলিতেন। "আমি কি আর তাঁতীর মেয়ের হাতের ভাত খাচ্চি? বাসনটা মাজতে, ফুলটা তুল্‌তে চাই একজনাকে—ত তাই এক অনাথাকে স্থান দিয়েছি"

সমাজও নিশ্চিন্তে এই পয়সাওয়ালা ব্রাহ্মণের মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলিয়া যাইত। কখনও ঘাঁটাঘাঁটি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করে নাই। সামাজিক, সংসারিক ও মাম্‌লা মোকর্দ্দমার সকল প্রকার ব্যাপারেই গ্রামের লোক আসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়।

এমন অবস্থায় মহেন্দ্র যতই লেখাপড়া শিখুক, উদ্ধবের বিনা পরামর্শে গ্রামের কোন কাজ করিতে সে অক্ষম। কলিকাতার কায়দা অনুসারে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে মহেন্দ্র উদ্ধবের দরবারে উপস্থিত হইল। দরবার গৃহ তখন শূন্য। রথী মহারথী কেহই নাই। শুধু চণ্ডী মণ্ডপের সুপ্রশস্থ চত্বরে বিছানো একখানা সতরঞ্চির এক পার্শ্বে কেলে চাকরটা ও তাহারই পায়ের তলায় ভুলো কুকুরটা শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল।

মহেন্দ্র, কেলো ওরফে কালীচরণকে ডাকিয়া তুলিয়া বাড়ীর মধ্যে আপনার আগমন সংবাদটা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু কালীচরণ চোক রগড়াইতে রগড়াইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল। বাড়ীতে বল্লে যে ঠাকুর মশায় এখন খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম কচ্চেন, উঠলেই আসবেন। আসল কথা বাড়ীতে

কেহই কিছু বলে নাই।' স্বয়ং ঠাকুর মশায়ই আরাম শয্যায় নিদ্রালস চক্ষে চাকরকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আহারান্তে একটু না গড়াইয়া কাহারও সহিত দেখা করিবার ফুরসৎ তাঁহার নাই। অগত্যা মহেন্দুকে একটা ভাঙ্গা মোড়া লইয়া বসিয়া থাকিতে হইল! কিন্তু তাহার ভারি বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কখন উঠিয়া আসিবেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। ইত্যবসরে ভৃত্য কালীচরণ এক কলিকা তামুক সাজিয়া আনিয়া মহেন্দুর কাছে নামাইয়া দিল। এবং একটা তামা বাঁধা হুকা দেখাইয়া কহিল। "ঐ হুকোটি আপনাদের—নেবেন। আমি দিতে পারবো না বাবু?" মহেন্দু কহিল "কেন হুকোর নলচেটী ছুঁতে দোষ কি?" কালীচরণ দুই হাত পিছাইয়া কহিল। "ছোট লোকের কি হুকই ছুঁতে আছে বাবু!"

মহেন্দু একটু আহত হইয়া কহিল "যাও কালীচরণ, আমার ও হুকোর বালাই আদৌ নাই।" এমন সময় বাহিরে খড়মের শব্দ শোনা গেল। মহেন্দু বুঝিল যে উদ্ধব আসিতেছেন। উদ্ধব আসিয়া মহা সমাদরের সহিত মহেন্দুকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন "অনেকক্ষণ এসেছো শোনলাম, যাই হোক, দিনের বেলায় ঘুমটা কেমন বদ্ অভ্যেস কি না, কেউ জাগায়নি! বেশ ভাল ছিলে ত? মহেন্দু!"

মহেন্দু কহিল "আজ্ঞা হাঁ!"

উদ্ধব চাকরের হাত হইতে কলিকাটি লইয়া কহিল, "বেশ ভাল অম্বুরী তামাক একটু বাবুর জন্য সেজে আন্ দেখি, আর বাড়ী থেকে অমনি পান নিয়ে আস্‌বি!"

মহেন্দু ব্যস্ত হইয়া কহিল "না না ও সবের কিছুই দরকার নাই। আর আমি তামাকও খাই না।

"তামাক খাও না?" একবারেই না?"

"আজ্ঞে না!"

উদ্ধব মহা খুসী হইয়া কহিলেন বেশ! "বেশ বাবা! এমন নইলে কি শিক্ষিত ছেলে? বাজে খরচ যত কম করা যায় ততই ভাল! তোমার বাবা একটা আদ্লার জন্য একটা খড়ের পালা নড়িয়েছিলেন!"

মহেন্দু সে সব কথার দিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া কহিল "দেখুন আপনার কাছে একটা কাজের কথা আছে।"

উদ্ধব মনে করিল মহেন্দু বুঝিবা কোন মামলা মোকদ্দমা সম্বন্ধেরই কথা আনিয়াছে। শিকারী বিড়াল শিকার দেখিলে যেমন গোঁপগুলা তাহার চাড়া দিয়া উঠে। উদ্ধবেরও শিরা উপশিরা গুলা পর্য্যন্ত তেমনি মহেন্দুর কথাটি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তিনি ভুঁড়িটিতে একটু হাত বুলাইয়া, হাতে একটা তুড়ি দিয়া কহিলেন।

"যা বলবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারো বাবা, তোমার বাবাও মাঝে মাঝে আমার কাছে কত পরামর্শ নিতে আস্‌তেন, আমিও তখন তাঁহার আদেশে তাঁর হয়ে কত মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এসেছি। যে সব বাজে মিথ্যে বলেছি, উকীলের বাবারও সাধ্যনাই একটু নড়াতে পারে। আমাদের একবারে হরি-হর আত্মা ছিলরে বাবা", বলিয়া গলায় হরিনামের মালার সহিত ঝোলানো ঝোলাটি একবার ঝাকাইয়া লইলেন।

মহেন্দু ভণ্ডামির সূচনা পাইয়া কহিল, "না ওসব কিছু না। আমাদের এই গ্রাম সম্বন্ধেরই দুটো কথা আপনার কাছে বলবার আছে।"

উদ্ধব তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "বলতে পার। অবিশ্যি বলবার কথা যে। গ্রামের লোক তোমায় ফুঁড়ে কেউ বেড়ে উঠবে? আমরা থাকতে তাই বা কেমন করে সহ্য কর্ব্বো? কোন ব্যাটা তোমার ধান কড়ি নিয়ে দিতে চাচ্চে না, না কি? মহেন্দু কিছু জানে না বলে গ্রামের ছোট লোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা দেখছি খুব বেড়েই উঠেছে।"

মহেন্দু হাসিয়া কহিল। আমার নিজের সম্বন্ধে ওসব কিছুই না। পিতা যেমন যার বন্দোবস্ত করে গেছেন, তেম্‌নি সব চল্‌ছে। এখন কথা হচ্চে এই, গ্রামের রাস্তা ঘাট গুলোর এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, মানুষ চলাচলের সাধ্য নাই, বর্ষাকাল একগলা জল ভাঙ্গতে হয়। ছেলেদের লেখাপড়া শেখবারও তেমন স্কুলের বন্দোবস্ত নাই।"

উদ্ধব যেন এক মুহূর্ত্তে আকাশ হইতে মাটিতে নামিয়া গেলেন। কোথায় মোকর্দ্দমা সম্বন্ধের কথা লইয়া দু-পয়সা পাবার পিত্যেসা—না একবারে গ্রামের কথা! মুখটী ফিরাইয়া কহিলেন—"ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে অনেক দরখাস্ত করে দেখা গেছে বাবা, গরমেণ্ট শেসের বেলায় ঠিক আছেন, কাজের বেলায় দেখাই নাই।" বলিয়া বোর্ডের লোকদের নানারকম গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মহেন্দু কহিল "শুধু বোর্ডে লোকদেরই বা দোষ দেন কেন, আপনাদের

হাতেও ত যথেষ্ট উপায় ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করবার কথাও কারও মনে হয় নাই, এইত বৎসর বৎসর দোকানী পশারী ছোট বড় সকলের কাছে চাঁদা আদায় করে বারোয়ারী, যাত্রা নাচ গানে ৮।১০ হাজার উড়িয়ে দিচ্চেন। এই টাকায় গ্রামের কত না উন্নতি হতে পার্ত্তো। রাস্তা বাঁধিয়ে স্কুল চিকিৎসালয় সব হতে পার্ত্তো।"

তুমি যেমন বাবা, "এ গাঁয়ে তা আর কখনও হচ্চে না। এ কি গাঁ? ঈর্ষা বিদ্বেষ ছাড়া একটা মানুষ নাই।" একটা বিজ্ঞের হাসিতে মহেন্দুর সব কল্পনা উড়াইয়া দিবার যোগাড় করিলেন। মহেন্দু এদিকে নাছোড় বান্দা।

কিন্তু অনেকক্ষণ কচলা কচলি করিয়াও যখন বৃদ্ধকে এ সম্বন্ধের অবশ্যকতা উপলব্ধি করাইতে পারিল না, তখন উঠিয়া গেল। কিন্তু ভাবে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখিয়া গেল, যে সে যাহা ধরিয়াছে তাহা শেষ করিবেই।

উদ্ধবকে পর্য্যন্ত তাহাতে ক্ষণেকের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতে হইয়া ছিল। কিন্তু একটি কথা এই যে, উদ্ধবকে ঠেলিয়া চলে গ্রামে এমন সাধ্য কাহারও যখন ছিলনা, সব রথী মহারথী গুলিই তাহার হাতের মুঠার মধ্যে? মনে মনে হাসিয়া কহিলেন বটে, তোমার বাবা গ্রামের লোকের হ'রে অম্বুরে, বড় লোক হয়েছেন। আর তুমি কি না সেই বাপের ব্যাটা হয়ে লুটপাটের জায়গায় উল্টে কিছু দেবার ফিকির বের করেছো। আমাদের ফাঁকি দেবার মতলব্?

হাঁসিতে হাঁসিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "দেখ তাঁতী বউ, আজকালকার দিনে ছেলেপিলেকে লেখা পড়া শিখোনো ভারি দোষ। বিগ্‌ড়ে গ্যাছে, বলে কথা—বাপ পিতামহ ধারাত রাখবেই নাই—উপরন্তু যারা রাখ্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে—তাদের শুদ্ধ নিয়ে জড়িয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে?"

তাঁতি-বউ তখন উদ্ধবেরই বৈকালের আহারের নিমিত্ত ঘন করিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিল। কহিল "হলো কি?"

উদ্ধব কহিলেন, "হয় নাই কিছু; ঐ পিতাম্বরের ব্যাটা মহেন্দু আমার কাছে এসেছিল কিনা? ভাবে ভঙ্গিমায় বোঝা গেল, সব ম্লেচ্ছ আচার, ম্লেচ্ছ ব্যবহার যার তার হুকো টানছে, একটু বাছবিচের নাই, আমি দু'কথা বেশ শুনিয়ে দেওয়াতে ভারি লজ্জিত হ'লো।"

তাঁতি-বউ সবিস্ময়ে কহিল, "ওমা সেকি কথা, আমি শুনেছি যে মহেন্দু বড় ভাল ছেলে, মাছ খায় না, মাংস খায় না ঈশ্বরে ভক্তি কতো। আমাদের মত মুখ্যুসুখ্যু মেয়েমানুষকেই কত সমীহ করে!"

উদ্ধব কহিলেন "সব ভণ্ডামি। মানুষকে কি চেনবার যো আছে? তাতে আবার শুনেছ ত পরমহংসদের দলে গিয়েছিল, হিন্দুয়ানী নিজেও রাখবে না, গাঁয়ের লোককেও রাখতে দেবে না।"

তাঁতি-বউ আর উদ্ধবের কোন কথার উত্তর না দিয়া কড়া হইতে দুধটুকু বাটীতে ঢালিয়া ফেলিল।

উদ্ধবও নিশ্চিন্তে তামাক টানিতে লাগিলেন।

দূরে তেঁতুলগাছে একটী অপরাহ্নের কোকিল কেবলি একসুরে ডাকিতেছিল কুহু!—কুহু!—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধবের রীতি-নীতি বুঝিয়া মহেন্দু গ্রামের সাধারণ জন সাধারণের কাছে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিল। ভাবিল যদি কিছু করিতে পারা যায় তাহা ইহাদের লইয়াই হইবে!

কারণ ইহারা যতটা নিজেদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ বুঝিবে, স্বার্থপর উদ্ধবের দল কখনই তাহা বুঝিবে না। তাহারা যে পরকে নষ্ট করিয়াই বড় হইতে চাহে, পরকে বড় করিয়া বড় হইবার বাসনা ত তাহাদের নাই!

মহেন্দু প্রথমেই গ্রামবাসীদের ডাকাইয়া বলিল, "এবৎসর আর তোমাদের বারোয়ারীতে চাঁদা দিবার প্রয়োজন নাই। যে টাকাটা বারোয়ারীতে আমোদের জন্য দিবে, সেই টাকাটা গ্রামের রাস্তাঘাট ও স্কুল প্রতিষ্ঠাতে দাও। দেখ কত ভাল হবে!"

গ্রামবাসীরা এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে লাগিল। উদ্ধবের দল বারোয়ারীর জন্য চাঁদা আদায় করিতে আসিলে তাহারা কহিল "আমরা আর বারোয়ারীতে নাই। চাঁদার টাকা গ্রামের রাস্তা ঘাট ও স্কুলের জন্য মহেন্দুবাবুকে দিব বলিয়াছি।"

উদ্ধবের দল বুঝিতে পারিল আর কিছুই নয়; ভণ্ড মহেন্দুই আড়ি করিয়া গ্রামের এত বড় একটা সখের উৎসবকে ভাঙিতে বসিয়াছে। তাহারা উদ্ধবকে খবর দিল।

খবর শুনিয়া উদ্ধব একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন কহিলেন "বল কি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

শীঘ্রই ধর্ম্মরাজের মন্দির সম্মুখে বটবৃক্ষচ্ছায়ায় এক সভা বসিয়া গেল। উদ্ধব কহিলেন ডাকো—শীঘ্র মধু ভায়াকে ডাকো, সে বন্ধু বিনা এ দুস্তর সমুদ্রে আর কেহ নাই।

মধু তাঁহারই মত দেব অবতার মহাশয় ব্যক্তি—পাটোয়ারী কাজে ডিক্রী লইয়া, এখন গ্রামের মণ্ডলী ও বারোয়ারীর কর্ত্তৃত্ব লইয়া আছেন।

মধু আসিতেই সকলের শরীর রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। সে যে ইহার জন্য যাই হোক একটা করিবে ও বলিবে তাহার জন্য সকলে সতৃষ্ণনয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু মধু কোন কথা না কহিয়া একবারে গম্ভীরভাবে সভামধ্যে মাদুরের উপর উপবেশন করিল।

উদ্ধব দুইহাত বিস্তার করিয়া কহিলেন।—ভায়া হে, পৃথিবী উল্টে গেল। ধর্ম্ম সমাজ কিছু থাক্‌লো না। জমীদারবাবু টাকার গরমে প্রজাদের হুকুম দিয়ে দিয়েছেন বারোয়ারীর চাঁদা পত্র কেউ দিও না। গরীব প্রজা হুজুর যা বলছেন তাই শুনে চুপ করে আছে, ভায়া তুমিই বলো, টাকার জোর কি বাবা ধর্ম্মরাজকেও ছাপিয়ে উঠ্‌বে? এ সত্যকালের বারোয়ারী বন্ধ হবে? মধু গম্ভীর স্বরে কহিল "যারা চাঁদা দিতে অস্বীকৃত, তাদের কি একবার ডেকে বলা হয়েছিল?"

উদ্ধব কহিলেন একবারের জায়গায় দশবার! ব্যাটারা সব বলে কি জানো? যেমন শিক্ষা পেয়েছে, বলে দুদিনের বারোয়ারী আমোদে কি দরকার? তার চেয়ে গ্রামে রাস্তাঘাট হোক। স্কুল হোক্, ডাক্তারখানা হোক্, হাতী হোক! ঘোড়া হোক্! ভায়া হে কলিকাল আর কাকে বলে? এতদিন এই রাস্তাঘাটে এক গলা জল ভেঙ্গেও লোকে যাতায়াত করেছে, তাতে কারু কষ্ট হয় নাই এইবার যত কষ্ট। স্কুল কলেজ ছিল না, ছেলেরা আর নষ্ট হ'তে পারে নাই। আমরাই এই গ্রামে লেখা পড়া শিখে কত হাকিমি কত ওকালতি করেছি, আর আজ স্কুল চাই ডাক্তারখানা চাই। ধন্বন্তরী এসে চিকিৎসা না ক'রলে আর মানুষের বাঁচা হবে না।

সকলে পরম পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিল; মধু তখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বজ্রনিনাদে কহিলেন, "ককৃখনই না, আমাদের জান্' থাক্‌তে বাবাস্ বাটীর বারোয়ারী বন্ধ করে এমন সাধ্য কারু নাই। আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে বারোয়ারী বজায় কর্ব্বো, তাতে যত লাট্ বেলাট এসে যত

বাধাই দিতে পারে। কেউ না চাঁদা দেয়, আমাদের দলের টাকা হতেই এবারকার বারোয়ারী হয়ে যাবে।"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। মহেন্দু শুনিল যে, তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড চক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, গ্রামের যে সমস্ত লোক আগে তাহার কথায় সম্মত ছিল, এখন তাহাদের সব মত বৈপরিত্য ঘটিয়াছে।

মহেন্দু গ্রামবাসী সাধারণ সম্প্রদায়কে আর একবার ডাকিয়া কহিয়া দিল। "তোমরা আর যাই করো, চাঁদার টাকা কদাচ বাইনাচ আর বারোয়ারীর গানে দিওনা, তার চেয়ে আমার হাতে দিও, যদি রাস্তা ঘাট্‌টাও তৈয়ার করে দিতে পারি। নিদেন্ একটা খাবার জলের পুকুরও। তাহারা কহিল "বাবু দরকার কি নাচগানে আমাদের, যাদের ঘরে ভাত নাই। তবে মুকুয্যে মশায় পাছে নাপিত বামুন বন্ধ করে দেন, এই ভয়ে ধার ধোর করেও বারোয়ারীর চাঁদাটা দিতে হয়। আপনি যখন মাথা দিলেন তখন আর কি? আমরা একপাও নড়বো না!"

গ্রামবাসীরা যখন কিছুতে এ ব্যাপারে আসিল না, তখন উদ্ধবের দলকে অগত্যা জেদ বজায় রাখিবার জন্য একদল খেমটাওয়ালীকে আনিয়া বরোয়ারীর সখ মিটাইতে হইল। ঝাড় লণ্ঠনের পরিবর্ত্তে ডিট্‌মারের দশবাতী জ্বালাইতে হইল। নহবৎখানাও তেমন সগর্ব্বে আকাশ স্পর্শ করিল না, কিন্তু উদ্ধবের দলের এ ব্যাপারের একটা সান্ত্বনা ছিল "এ্যাসা দিন নাহি রহে গা" আবার বাঘাসবাটী তাহার দেশ বিখ্যাত বরোয়ারীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেই। এবং কালুদে বেনের যাত্রাও হইবে, সংও নাচিবে, তবে এবারটা গায়ের জোরে যাই করুক মহেন্দু!

গায়ের জালা কিন্তু তবু কিছুতে গেল না। আবার রাহুর মত যে দুর্গ্রহ তাহাদের অদৃষ্টাকাশে জলিয়া উঠিয়াছিল; হোমানলে তাহার শেষ করিতে না পারিলে যেন কিছুতে সোয়াস্তি নাই।

একদিন উদ্ধব মধুকে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলেন, ভায়া উপায় করো, আর যে পারা যায় না। আমাদের টেক্কা দিয়ে ওরা যে স্কুল রাস্তা বাট সব করে ফেল্লে।

মধু সাধকের ন্যায় উদাস কণ্ঠে কহিল "দাদাঠাকুর মধু যখন চক্র ফেঁদেছে তখন ডাকিনী যোগিনীদের রক্ত খাইবেই, এখন শুধু সবুর—থোড়া সবুর। উদ্ধব মধুর ভরসাতেই রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের রাস্তা ঘাট সব ঠিকাদারদের হাতেদিয়া মহেন্দু দিন কতকের জন্য কলিকাতা যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আজ ভোরে যাইবে। এমন সময় হঠাৎ শুনিল নব নির্ম্মিত স্কুল ঘরটিতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। দূরে ময়দানের মধ্যে স্কুল ঘর। লাগানো আগুন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ছুটিয়া লোকজন লইয়া আগুন নিভাইতে, ঘরের চালখানা মাটীতে পড়িয়া গেল।

মহেন্দু ক্ষুণ্ণচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ইহার পর হইতে প্রায় রোজ শুনিতে পায়, আজ ঠিকাদারদের ঝুড়ি চুরি গিয়াছে, কাল কোদাল চুরি গিয়াছে; নিত্য নূতন অভিযোগ। মহেন্দু অস্থির হইয়া পড়িল। কিছুতে বুঝিতে পারিল না, এমন একটা সাধারণ হিতকর কার্য্যে মানুষ কি করিয়া পিশাচের অধম হইতে পারে? আবার একদিন শুনিল তাহার বাগানের কলাগাছগুলি কে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। মহেন্দু দেখিল আর শত্রুকে ক্ষমা করা উচিৎ নয়। ক্রমেই দোষের বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। তোড়ে জোড়ে তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিল। টেবো মহেন্দুর জনৈক ভৃত্য, বমালশুদ্ধ একদিন চোর ধরিয়া ফেলিল।

মহেন্দু কহিল, থানা পাঠাও। এই বজ্জাতদের হতেই এতগুলো কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু চোর দুটাকে দেখিয়া কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না; এই সমস্ত নিরীহ প্রকৃতির নির্ব্বোধদের দ্বারাই এত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই তলে কোন বুদ্ধিমান তাহার বিরাট বুদ্ধি লইয়া বিরাজ করিতেছেন।

গয়লার ছেলে দুটা কাঁদিতে লাগিল। উদ্ধব আসিয়া মহেন্দুর কাছে কহিলেন। থাক্ বাবা মুখ্যু বেটারা একটা অকাজ করেই ফেলেছে, কিছু জরিমানা আদায় করিয়া ক্ষমা দাও। মহেন্দু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "না পাজীর দণ্ড হওয়া উচিত। আমি ওদের থানা পাঠাবোই। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া উদ্ধব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে যা খুসি বাবা তাই করো; গাঁয়ের লোকের একটা কথা ত তুমি শুনবে না। তবে ব'লছিলাম কি ছেড়ে দিলেই ভাল হ'তো। তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন!

গয়লার পো দুটো ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া জোড়হাত করিয়া কহিল। দোহাই মুকুর্য্যে মশায়, গাছে তুলে দিয়ে মই নিয়ে পালাবেন না। উদ্ধব

তীব্র রোষে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন কি বলিস্ ব্যাটারা, পাপ করেছিস্ ফল্ ভোগ করবি না? জানিস্ না ওরে, ধর্ম্ম আছে।

মহেন্দুর বুঝিতে বাকী রহিল না; সে কি ভণ্ড দলের মাঝখানেই আপনার কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া উদ্ধবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"এরা কি বলে মুকুয্যে মশায়।"

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উদ্ধব কহিলেন মারো ব্যাটাদের। বাঁধো ব্যাটাদের। আমি শুদ্ধ সাক্ষী দেব, বলিয়া চটিটা খুলিয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত চোর দুটাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঘা কতক খাইয়াই ঘোষের পো দুটী একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। অবশেষে মহেন্দু উদ্ধবকে ক্ষান্ত করিয়া তাহাদের বিচার করিতে লাগিলেন, মহেন্দু বুঝিল যে হতভাগারা পরের দমে ভুলিয়া এ কাণ্ডটা করিয়া ফেলিয়াছে: তাহার জন্য আর থানা না পাঠাইয়া মধু ও উদ্ধবকেই তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন!

মধু ও উদ্ধব সমস্বরে কহিল, পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই এদের উপযুক্ত দণ্ড। মধু ঘোষের পো দুটোর পানে চাহিয়া কহিল, কিরে ব্যাটারা টাকা আমানত করতে পারবি? না থানা যাবি? অপরাধী দুটো করুণা নয়নে সকলের পানে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দু বলিল "যাক! ওরা যা পারবে তাই দিয়ে দেবে, আট দশ টাকাও দিতে পারবে না? মধু কহিল অবশ্য! ওর খুড়ি ত আমাকে দশ টাকা দিয়েই দিয়েছে, বলিয়া ঝনাৎ করিয়া টাকা কয়েকটা মহেন্দুর কাছে ফেলিয়া দিল। মহেন্দু কহিল, থাক এটা আপনাদের হাতেই থাকুক না?"

মধু কহিল সে কি কথা হলো, বাবু ওটা রাস্তার কাজেই লাগাইয়া দেবেন। যারে ব্যাটারা ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছিলি বলে সহজে ছাড়ান পেয়ে গেলি!

উদ্ধব কহিল "আহা কেমন লোকের ছেলে দেখ্‌তে হবে! পীতাম্বর দাদা যে ছিল সাদাশিব বল্লেই হয়—তার ছেলে। আহা এই মতি তোমার থাকুক বাবা, বলিয়া গলা হইতে হরিনামের ঝোলাটি তিনবার মহেন্দুর মাথায় স্পর্শ করিয়া দিলেন। মহেন্দুর মুখ দিয়াও সে সময় আর কোন কথা বাহির হইল না। শুধু আবিল সুন্দর এই মধুচক্র!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র এবার বিশেষভাবে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিল; গোমস্তাকে আদেশ দিল তুমি রোজ দুবেলা তদারক করে আসবে। চাকরদেরও ঐরূপ আদেশ দিল।

রেলে চাপিয়া তাহার কত কথাই মনে হইতে লাগিল, এই এত বড় একটা দেশ, সে কেবল ঈর্ষা বিদ্বেষেই পরিপূর্ণ হয়ে আছে; তাদের শিক্ষা দিতে পাল্লে "তারা প্রত্যেকে দেব মন্দিরের পাথর হ'তে পার্ত্তো, কিন্তু শিক্ষার অভাবে নর্দ্দমায় পড়ে পচ্চে।" তাদের মধ্যে এমন বোধ কারও নাই, তারা কি এবং এখন কত নগণ্য হইয়াই জগতের এক প্রান্তে পড়ে রয়েছে! ফলে যে দেশে শিক্ষার একান্ত অভাব, সেইটেই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া বাজিল। কলিকাতায় আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের কাছেও প্রকাশ করিল। আমাদের দেশের জন্য সব পরিশ্রম উদ্যম মিথ্যা, যদি দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কিছুমাত্র না হয়; বন্ধুরা কহিল নিশ্চয়ই। তুমি এখানে থাকো, আমরা খবরের কাগজে এমন আন্দোলন তুলিব যাতে দেশের লোকেই যেন বলে ওঠে, শিক্ষা ব্যতীত তাদের আর মুক্তির দ্বিতীয় ক্ষেত্র নাই।

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না।

এদিকে উদ্ধবের দলও নিশ্চিন্ত ছিল না, মহেন্দ্রর কলিকাতা রওনার খবর—পাইয়া মধু কয়েকবার থানার দারোগা বাবুর কাছ হইতে ঘুরিয়া আসিল। তারপর যাহা হইয়াছিল খবরের কাগজের পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই। তবু একটু লিখিয়া দেওয়া উচিত। মহেন্দ্র লাল বাড়ী পৌঁছিতেই দুই দফা গুরু অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইল। প্রথম অভিযোগে বিপ্লববাদীর দলভুক্ত বলিয়া তাহার বাড়ী খানা তল্লাসী হইল। এবং যদিও একমাত্র গীতা ভিন্ন আর কিছু বাহির হইল না, তথাপি বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতেই থাকিতে হইল। দ্বিতীয় অভিযোগও সামান্য ছিলনা, আইন অমান্য করিয়া জোর করিয়া জরিমানা আদায়ের আজুহাত।

মোকর্দ্দমার দিনের দিন মা মহামায়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহেন্দ্রর নিষেধ স্বত্বেও উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইলেন।

প্রথমে প্রথম সাক্ষী রামধন গোপকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকা হইল।

রামধন সত্য পাঠ করিয়াই আপনার কুলুজী আওড়াইয়া গেল। কহিল

আমার পিতার নাম হিরু গোপ। পিতামহের নাম দয়াল গোপ। হাল সাং বাবাসবাটী; আদি বাটী হরিণঝোলা, হাকিম ধমক দিয়া কহিলেন তোমায় যা জিজ্ঞেসা করা হবে, তারই উত্তর দাও।

রামধন চুপ করিয়া রহিল।

ব্যারিষ্টার। তোমায় মহেন্দু বাবু কখনো জবরদস্তী করে জরিমানা আদায় করেছিলেন?

রামধন। করে ছিলেন।

ব্যারিষ্টার। কিজন্য জরিমানা করে ছিলেন।

রামধন। আজ্ঞে সেটী ঠিক মনে হ'চ্চেনা!

ব্যারিষ্টার। তুমি কখনো ঠিকাদারদের কোদাল ঝুড়ী চুরি করে ছিলে?

রামধন চুপ করিয়া রহিল।

হাকিম লিখিতে লিখিতে কহিলেন "বলো।"

রামধন জোড় হাত করিয়া কহিল। ওটাত বলতে পারবো না হুজুর। আমি গয়লার ছেলে, চাষ করে খাই। চুরি বিদ্যে জানি না, যা মণ্ডল মশায় বলে ছিলেন—তাই। হাকিম কহিলেন মণ্ডল মশায় কে?—

রামধন। তিনি এইখানেই আছেন। নাম মধু মণ্ডল মহাশয়।

ব্যারিষ্টার চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া মুছিয়া কহিলেন, আমি জানি তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তদ্বির কচ্চেন। হাকিম রামধনকে এজলাস হইতে নামিয়া যাইতে বলিলেন। রামধন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল! তখন প্রধান সাক্ষী উদ্ধব মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হইল।

উদ্ধব হরিনামের ঝোলাটা গলায় বাঁধিয়া, নামাবলিখানি বেশ করিয়া গায়ে দিয়া, নদীয়ার গোরাচাঁদেরই একদফা সংস্করণের মত বেশ ভঙ্গীর সহিত কাঠ গড়ায় দাঁড়াইয়া সত্য পাঠ করিলেন।

ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসিলেন। আপনারই নাম উদ্ধব মুখোপাধ্যায়?

উদ্ধব হাসিয়া কহিল "আজ্ঞে হাঁ হুজুর।"

বারিষ্টার। আপনার স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন?

উদ্ধব চমকাইয়া উঠিলেন। একবারেই স্ত্রীর নাম? এমন বারিষ্টার ত দেখা যায় নাই,' খানিকটা ভাবিয়া তারপর জোরের সহিত কহিলেন, আছেন বৈকি, অবশ্য আছেন!

বারিষ্টার কহিল, "তাঁর নাম?"

কথাটা এতক্ষণে উদ্ধব তলাইয়া বুঝিলেন। উত্তর দিতে ইতঃস্তত করিতেছেন। এমন সময় সরকারী বারিষ্টার বাধা দিয়া কহিলেন, একথা প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসা করা যে কোন হিন্দু ভদ্রলোকের পক্ষে অপমানজনক হইতে পারে।

মহেন্দুর ব্যারিষ্টার কহিলেন, যখন এর দ্বারা লোকটার একদিক্‌কার চরিত্র বোঝা যাবে, তখন আদালত এ বিষয়ে আমার জেরা করিবার অধিকার দেবেনই।

হাকিম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ব্যারিষ্টার উদ্ধবের প্রতি কহিলেন, "বলুন আপনার স্ত্রীর নাম?"

উদ্ধব দেখিলেন, যখন ধরিয়া ফেলিয়াছে তখন কথাটা না বাহির করিয়া ছাড়িবে না। তার অপেক্ষা সত্য বলাই ভাল। কহিলেন, "সৌদামিনী।"

ব্যারিষ্টার কহিল, "তাঁর জাতি?"

উদ্ধবের গলদঘর্ম্ম হইবার উপক্রম হইল। তিনি এতদিন ধরিয়া কত সাক্ষ্য-মঞ্চ উজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছেন, এমনতর প্রশ্ন ত কোথাও উঠে নাই। জোচ্চুরি বাটপাড়ির খবর লইয়া অনেকে ঘাঁটাঘাটি করিয়াছেন। তাঁহার জাতি, তাঁহার স্ত্রীর জাতির কথা কেহ ত জিজ্ঞাসা করেন নাই। উত্তর দিতে ইতঃস্তত দেখিয়া হাকিমই কহিলেন, "বলুন কি জাতি?"

উদ্ধব হঠাৎ থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তন্তুবায়" বলিয়াই কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সারিয়া লইবার সে পথও আর ছিল না।

ব্যারিষ্টার পুনরায় কহিলেন, "আপনার জাতি?"

উদ্ধব অবাধে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ।" ব্যারিষ্টার 'অলরাইট' বলিয়া চশমাটা খুলিয়া রুমালে মুছিয়া পুনরায় নাকে দিলেন এবং উদ্ধবের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আপ্‌নি বোমা দেখেছেন কখনো?

উদ্ধব ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দেখিনি যদিও, শোনা আছে।

ব্যারিষ্টার। কোথায় শোনা আছে?

উদ্ধব। ঐ একবার, কে একবার ব'লছিল, মহেন্দুবাবু বোমা গড়েছেন!

ব্যারিষ্টার। লোকটা। লোকটা কে? এবং কে বলেছিল মনে আছে?

উদ্ধব খানিক ভাবিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে তা বল্‌তে পারি না। সে স্মরণ নাই।"

ব্যারিষ্টার। তবু বোমার আকারটা কিরূপ জানা আছে?

উদ্ধব। শুনেছি, একটা জালার মত, তাতে আগুন দিলেই পৃথিবী উড়ে যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে একটা তৈরি হয়েছিল, আর মহেন্দুবাবু একটা করেছেন, তবে তাতে এখনও আগুন ধরান হয় নাই।

হাকিম হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "যান এজলাস হ'তে নেমে গিয়ে জলপান করুন গে।"

উদ্ধব এজলাস হইতে নামিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামধনকে কহিলেন, তু ব্যাটা কি সাক্ষী দিয়েছিস্, সাক্ষী কেমন করে দিতে হয় শিক্ষা কর্। উকীল ব্যারিষ্টার সব থ হয়ে যাবে না? মধুকে কহিলেন, এমন নির্ঘাত সাক্ষী দিয়েছি ভায়া যে অনিবার্য্য মহেন্দুর দীপান্তর।

কিন্তু রায় প্রকাশের দিনে শোনা গেল, মহেন্দু প্রথম বিপ্লববাদীর অভিযোগে আদৌ দোষী সাব্যস্ত হয় নাই। দ্বিতীয় অভিযোগে জরিমানা আদায়ের অজুহাতে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মহেন্দুকে দীপান্তরে পাঠাইয়া মধু ও উদ্ধবে মিলিয়া কল্পনার যে একটা সুখস্বর্গ গড়িতেছিলেন যে সুখ শুদ্ধ গ্রামবাসীর দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলে সুখহীন হইয়া উঠিতে পারিত। মহেন্দুর মাত্র এই পঞ্চাশটাকা জরিমানা শুনিয়া সে স্বর্গের প্রায় সব টুকুই উড়িয়া গেল। মহেন্দু গ্রামে থাকিলে তাঁহাদের আর জারিজুরি খাটিবে কি প্রকারে? কিন্তু মহেন্দু আর দেশে ফিরিল না। আদালতে জরিমানার টাকা জমা দিয়াই কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। মা মহামায়া অশ্রুজড়িতস্বরে কহিলেন, কি বাবা! দেশের উপর অভিমান করেই যাচ্ছিস নাকি?

মহেন্দু মায়ের চরণ ধূলি মাথায় লইয়া কহিল, না মা, দেশকে কি সহজে ভোলা যায়? তার উপরে তুমি মা আছো যেখানে! তবে কি জানো মা, পশুর মধ্যে আর বাস ক'রতে ইচ্ছা নাই। যদি কখনও দেশের মধ্যে মানুষ তৈরি করতে পারি, তবেই এসে তাদের সঙ্গে মিশবো, নচেৎ এই শেষ, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

গ্রামে এবার ভারি যাত্রা বারোয়ারীর ধুম পড়িয়া গেল। মধু ও উদ্ধব ঢোলসহরৎ করিয়া গ্রামের লোককে জানাইলেন, এবার দুই বৎসরের চাঁদার টাকা এক বৎসরেই দিতে হইবে। একমাস থাকিতে নহবৎ বসিয়া গেল। শুধু মহেন্দুর পক্ষের কয়েকজন, যাহারা শেষ পর্য্যন্ত মহেন্দুর পক্ষে ছিল, তাহারাই বারোয়ারী মণ্ডপে হুকা হাতে ঘুরিতে পাইল না। নহিলে

দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া যাত্রা ও সং দেখিয়া যাইতে লাগিল। মধু ও উদ্ধবের একদণ্ড বিশ্রাম নাই। ৪।৫টী দলের পাঁচ ছয় শো লোকের আহার বাসস্থানের ভার তাঁহাদের উপর। গ্রামের ছোকরারদলও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সকলেই এক একটা চুরুট মুখে দিয়া সর্ব্বদাই যাত্রার গোল থামাইতে ব্যতিব্যস্ত। বিশেষ স্ত্রী মহলের কাছে কয়েকটী টেরিওয়ালা বাবু কয়েকদিন ধরিয়া কিছুতেই গোল আর থামাইতে পারিতেছেন না। এমন সময় একদিন দেখা গেল, মহেন্দুর নবনির্ম্মিত বাগান বাড়ীটীর উপর রক্ত নিশান উড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। মধু ও উদ্ধব শুনিয়া ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, বাবুরা পাল্টাই বারোয়ারী কর্ব্বেন বোধ হয়।

কিন্তু পরদিন সদর হইতে সপারিষদ জেলা মাজিষ্ট্রেট আসিয়া গ্রামবাসীর এ সন্দেহের নিরাসন করিয়া দিয়া গেলেন। তিনি জানাইয়া গেলেন, মহেন্দুবাবু তাঁহার জমিদারীর প্রধান অংশ বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী, গ্রামের মধ্যে একটা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাগান বাড়ীটী শুদ্ধ বিদ্যালয় গৃহের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বারোয়ারীর রঙ্গ উৎসবটা সহসা কি যেন একটা কিসের আঘাতে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। ভিতরে যাহাদের একটু বোধ ছিল, তাহারাই মহেন্দুর এই দানে আপনাদিগকে হেয় ধিক্কৃত ও ভাগ্যবান বলিয়া অনুভব করিল।

শুধু মধু ও উদ্ধবই বারম্বার মস্তিস্ক সঞ্চালন করিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না! পীতাম্বরের পুত্রের এ মতি কোথা হইতে আসিল?

একজন আবার তাঁহাদের সমক্ষেই শুনাইয়া দিল। মহেন্দুবাবুর এই দানের ফল দশবৎসর পর হইতে ফলিতে আরম্ভ হইবে। তখন হয়ত এই মধু উদ্ধবই স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিবেন, গ্রামের মাটীর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কৃত্রিম রক্ত চঞ্চল জীবনের উপর দিয়া শাশ্বত আনন্দের অমৃত আলোকে উৎসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তখন আর সে মধুও নাই, মধুচক্রও নাই। লোকে আর এক মধুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।'

যাত্রার গানের হো হো চীৎকারটা ভাঙা কাঁসরের আওয়াজের মত খাঁই খাঁই করিয়া মধু ও উদ্ধবের কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

পুষ্পহার

শ্রীমতী ননীবালা দেবী—লিখিত

(১)

প্রভা দত্তগৃহে পা দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার এ সংসার সুখের হইবে না; কেন না তাহার শ্বশ্রুমাতা তাহার উপর আদৌও সন্তুষ্ট নহেন। গৃহিণী ঠাকুরাণীর রাগের একটি কারণ ছিল, তিনি আশা করিয়াছিলেন, স্বামীর ধন-সম্পত্তি থাকাস্বত্বেও একমাত্র পুত্র চারুকে কোন ধনীর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়া, তাঁহার দশমাস দশদিন পেটে ধরিয়া প্রসবের যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা সুদসমেত কড়া ক্রান্তি হিসাবে বুঝিয়া লইবেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইল না। চারু মাতার নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে নিজগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক মধ্যবিত্ত অবস্থার একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে দুরুহ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছে। মেয়েও দেখিতে বিশেষ সুন্দরী নহে। ইহা ছাড়া আর একটি কারণ ছিল, যখন গহনা দেওয়ার কথা হয়, তখন তিনি তাঁহার ভাবি বৈবাহিককে বলিয়া ছিলেন যে, তাঁহার বধূর গলায় "পুষ্পহার" দিতে হইবে। কেন না, আজ কালকার নব্যসমাজে "পুষ্পহারটাই" বেশী পছন্দ করে।

আজকালকার বাজারে মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের কন্যাদায় কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। প্রভাসবাবু, প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তাঁহার বৈবাহিকার এই আব্দার পূরণ করিতে পারেন নাই। গৃহিণী ঠাকুরাণী বধূ বরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, বধূর গলায় তাঁহার প্রার্থীত হার উঠে নাই, তৎপরিবর্ত্তে সিকলী প্যাটার্ণের সরু একগাছি হার উঠিয়াছে। দেখিয়াই তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। এবং সর্ব্বজন-সমক্ষে বধূর পিতৃকুলোদ্দেশে অজস্র সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভাগিনী প্রভা পিতৃনিন্দা শুনিয়া নীরবে অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

(২)

বিবাহের হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে যখন প্রভাস বাবু মেয়েকে নিতে আসিলেন, তখন গৃহিনী ঠাকুরাণী পুনরায় সেই পুষ্পহারের কথা পাড়িলেন। প্রভাস বাবু বৈবাহিকার নিকট অনেক বলিয়া কহিয়া কন্যাকে লইয়া গেলেন ও মেয়ে আসিবার সময় "হার" দিয়া দিব. এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া সেবারের মত নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ মেয়ে শ্বশুর বাড়ী আসার সময় উক্ত "হার" দিতে পারিলেন না।

বৈবাহিকা মহাশয়া বধুর গলায় এবারও "হার" দেখিতে না পাইয়া তাঁহার জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। আপাততঃ বৈবাহিকের কিছু করিতে না পারায় সমস্ত ক্রোধটা বেচারা বধুর উপরই নিপতিত হইল।

তিনি উঠিতে বসিতে বধুর চৌদ্দপুরুষান্ত না করিয়া কোন দিন জল গ্রহণ করিতেন না। এবং বধুকে আর কখনও পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না এবম্বিধ প্রতিজ্ঞা দিনে শতবার করিতেন, চারু পত্নির উপর মাতার অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া প্রথম প্রথম দুই একটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া বরং বিপরিত ফল ফলে দেখিয়া অবশেষে রণে ভঙ্গ দেওয়াই সৎপরামর্শ বলিয়া স্থির করিল। চারু স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিল; মানুষের চিরদিন সমান ভাবে যায় না; মা একদিন অবশ্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। আগে আমার পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাক্, তারপর একটা চাকুরীর যোগাড় করে তোমায় নিয়ে গেলেই সব লেঠা চুকে যাবে। আপাততঃ এ কয়েকটা দিন চোকবুজে সহ্য কর। প্রভা স্বামীর এই আশ্বাসবাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

(৩)

যখন মানুষের দুঃখ আসিয়া ঘাড়ে চাপে, তখন বুঝি প্রত্যেক কাজেই একটা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। প্রভার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। চারু এবার বি, এ, পাশ্ করিতে পারিল না; নানারূপ মানষিক দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার আগেই তাহার জ্বর হয়; বেচারা সেই জ্বর লইয়াই পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে পাশ করিতে পারিল,না।

চারুর মাতা যখন শুনিলেন যে পুত্র পাশ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার ক্রোধ বধুর উপর দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কি অলুক্ষণে মেয়ে ঘরে এনেছি গা, ছেলেটাকে

পাশ করিতে দিল না। চারু আমার প্রতিবার পরীক্ষায় পাশ করিয়া জলপানী পেত, এবার ঐ "ডাইনি বেটি তা হতে দিল না, ও না জানি ছেলেকে কি গুণ করেছে। দেখ্‌ছ না ছেলে আমার দিন দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে।" প্রভা শাশুড়ীর তীব্র বাক্যযন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া শয়ন কক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; গিন্নি কিন্তু তার এতটা বাড়াবাড়ী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সজোরে কপাটে ধাক্কা দিয়া বলিলেন "বলি হাঁগা ভাল মানুষের মেয়ে, আজ কি কোন কাজ কত্তে হবে না? দিন রাত ঘরে দোর দিয়া শুয়ে শুয়ে নভেল পড়লে কি করে চল্‌বে বাপু! যদি তুমি এমন করে দিন রাত শুয়ে থাক্‌তে চাও, তবে বাপের বাড়ী থেকে দুইজন ঝি চাকর আন্‌লেই পার্‌তে।" প্রভা তাড়াতাড়ি সভয়ে দরজা খুলিয়া রান্না ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

রাত্রিতে প্রভা স্বামীর কাছে অনেক কাঁদিল, বলিল তুমি তো জান যে তোমায় আমি ফেল করি নাই। চারু বস্ত্রাঞ্চলে প্রভার মুখ মুছাইয়া বলিল তোমার কোন দোষ নাই; আমি নিজের দোষে ফেল হইয়াছি; তা যাক্ এবার পাশ না করিয়া আর বাড়ী আসিব না।

(৪)

আশ্বিন মাস। শারদীয়া পূজা নিকটবর্ত্তী, প্রভাস বাবুর স্ত্রী স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন যে এবার পূজোর সময় প্রভাকে আনিতে হইবে। দেড় বছর হলো বাছা আমার শ্বশুর ঘরে গেছে, আর কতদিন তাকে না দেখে থাক্‌ব?

প্রভাসবাবু পত্নীর এই অন্যায় আব্দার সহ্য করিতে না পেরে পরদিন বেলা ৪ চারিটার সময়, নবমী পূজার যুপ-কাষ্ঠাবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যেয়ে আনিতে চলিলেন। যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে দিলেন। এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাসবাবু একটু ইতঃস্তত করিয়া বলিলেন আমি প্রভাকে নিতে এসেছি। আপনার বেয়ান বল্‌ছেন, এবার পূজোর সময় জামাই মেয়ে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন। বিয়ে হয়েছে পর্য্যন্ত আর তাহা ঘটে নাই।

গৃহিণী। এ আর বেশী কথা কি? আপনারা মেয়ে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করবেন, এতো সুখের বিষয়; আজ তো আর হবে না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে; আর একদিন এসে নিয়ে যাবেন। তারপর বেই আপনার সঙ্গে যে একটা কথা ছিল?

প্র—কি বলুন, কি কথা? "কি আর বলব, সেই হার ছড়াটা। দেখুন অনেকদিন হয়ে গেল, কুটম্বের ঘরে দেনা পাওনা না থাকাই ভাল।"

প্রভাস। দেখুন এ সময়ে আমার হাতে টাকা নাই, হলেই আপনার ঋণ থেকে মুক্তিলাভ করব। "আমি ঋণের কথা বলছিনে, তবে কিনা বৌমা শুধু গলায় থাকে দেখে বড় কষ্ট হয়। বের সময় যে হার ছড়াটা দিয়েছিলেন, সেদিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে তা হারিয়ে ফেলেছে; আমার হাতে টাকা নেই, তাই আপনাকে বলছি; নইলে আমিই গড়িয়া দিতুম। এখন পূজোর সময় সকলেই গহনা পরবে; তাই বলছি আপনি আসার সময় নিয়ে আসবেন, দেখবেন যেন হারটা আনতে ভুল না হয়।" প্রভাস বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়ে অগত্যা স্বীকার করিলেন, যাওয়ার সময় প্রভাকে বলিয়া গেলেন, যে প্রকারেই পারি হার লইয়া আসিব।

(৫)

ক্রমে পূজার দিন আরও নিকটবর্ত্তী হইল; প্রভা বড় আশা করিয়া ছিল, যে পিতা নিশ্চয়ই তাহাকে নিতে আসিবেন, অভাগিনী এই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিল, কিন্তু দিন ক্রমেই গত হইতে লাগিল, পিতা আর নিতে আসিলেন না। আজ ষষ্ঠি; আনন্দময়ীর আগমনে সমগ্র বাঙ্গলা আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছে; তাই আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মার আবাহন ধ্বনিতে মুখরিত। নানা প্রকার মানসিক চিন্তায় প্রভার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। সহসা সন্ধ্যা বেলায় কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

সে সমস্ত রাত্রি জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল। পরদিন গৃহিণী ঠাকুরাণী বধুর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ ভিতা হইলেন এবং অবিলম্বে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন বোধ করিলেন; ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিয়া বলিয়া গেলেন পীড়া অতি সাংঘাতিক (ইংরাজিতে যাহাকে টায়ফয়েড্, ফিবার বলে) আপনারা খুব সাবধান মত থাকিবেন, কি হয় বলা যায় না

সন্ধ্যার সময় চারিদিকে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল; এখন প্রভার অবস্থা অতিশয় খারাপ, তাহার আর জ্ঞান নাই, বিকারের ঘোরে সে কত কি প্রলাপ বকিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া যেন কাহারও অনুসন্ধান করিতেছে। এই সময়ে প্রভাসবাবু পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রভার শয্যা প্রান্তে বসিয়া প'ড়িলেন এবং স্নেহোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন, মা তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ, আমি তোমার জন্য বহু কষ্টে পুষ্পহার গড়িয়ে এনেছি, একবার উঠে হারছড়া গলায় পর দেখি মা! প্রভা চকিতে একবার পিতার মুখের দিকে তাকাইল, তাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু হায়! ইহা ক্ষণিক মাত্র, পরক্ষণেই চক্ষু দুটী স্তিমিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঘাম আসিয়া দেখা দিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইল, উষারাণী চারু-অঙ্গ নিলবস্ত্রাচ্ছাদনে ও সীমন্তে বালার্ক সিন্দুররাগে রঞ্জিত করিয়া সুবিমল হাস্য-জ্যোতিতে দিকমণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তাঁহার সঞ্জিবনীশক্তি প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া জাগিয়া উঠিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভার চির দুখময় জীবনের অবসান হইল; তাহার প্রাণপাখি মরজগতের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া কোন এক সুদূর অজানিত রাজ্যে চলিয়া গেল।

প্রভাসবাবু চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, সহসা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিলেন, "প্রভা, মা আমার, একবার আয় তোর সাধের 'পুষ্পহার' নিয়ে যা।"

প্রবন্ধের মূল্য

[শ্রীপাঁচকড়ি দে—সঙ্কলিত]

আমি এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলাম এবং ব্রাহ্ম বিবাহ করিব স্থির করিয়া ছিলাম। আমি আমার সহপাঠী করুণাকান্তের ভগিনী সুলেখাকে বিবাহ করিব, ইহা একরূপ স্থির,—সুলেখাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম, সেও আমাকে বড় ভালবাসিত। এত দিন আমাদের বিবাহ হইয়া যাইত, কেবল বন্ধু করুণাকান্তের জন্য হয় নাই; সেই নানা অজুহাতে বিলম্ব করিতেছিল।

তাহার একটা কারণও ছিল। আমি একটু আধটু সুরাপান করিতাম,—তাহা করুণাকান্ত ব্যতীত আর কেহ জানিত না। সে আমাকে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্ব্বদা পীড়াপীড়ি করিত।

এক দিন আমরা উভয়ে একজন বিলাত ফেরত বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতে ছিলাম। পথে যাইতে যাইতে করুণাকান্ত বলিল, "লোকেন্দ্র, তুমি বলিতেছ যে তোমার অবস্থায় তুমি ঋষির মত থাকিতে পার না; যে লোক নিজে ভাল না হয়, সেই কেবল অবস্থার দোহাই দেয়। এটা ঠিক, আমি তোমায় কখনও মাতাল হইতে দেখি নাই, তবে এটাও ঠিক যে, তোমার এ অভ্যাস দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি যে ভবিষ্যতে খুব সাবধানে চলিবে বলিতেছ, তাহাও আমি খুব বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার ভগিনীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি এ অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।"

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "করুণা, তোমার সে ভয় বিন্দুমাত্র নাই।—যদি ইহা আমার পক্ষে নূতন হইত, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা হইত; কিন্তু আমি অনেকদিন হইতেই একটু একটু সুরাপান করিতেছি। আমি জানি কখন কতটুকুতে আরম্ভ করিতে হয়, আর কখন তাহা বন্ধ করিতে হয়।

করুণাকান্ত বলিল, "লোকেন,—আমি তোমাকে যে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতেছি, ইহার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমি জান, সুরার ন্যায় ভয়ানক জিনিস এ সংসারে আর কিছুই নাই। কত শত পুত্র কন্যা অনাহার রহিয়াছে, আর তাহাদের পিতা অনায়াসে সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এ দেশে যত লোক এক বৎসরে বিসূচীকা রোগে মরে, সুরায় এক বৎসরে তাহাপেক্ষা বোধ হয় অধিক মরিয়া থাকে। এ সবই তুমি জান, তোমাকে আমার বলা বৃথা। তবে এটা ঠিক, এ অভ্যাস ক্রমে তোমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তোমায় ভালবাসি, তাই বলি। প্রতিজ্ঞা কর, আর মদ স্পর্শ করিবে না।"

আমি একটু রুষ্টস্বরে বলিলাম, "যে সকল ক্ষীণচিত্ত গর্দ্দভ, তাহারাই শপথ করে বা অঙ্গীকার করে। যাহাদের মনের বল আছে, তাহারা কখনও এরূপ করে না। কখনও কি তুমি আমায় মাতাল হইতে দেখিয়াছ? তুমি যেরূপভাবে কথা কহিতেছ, তাহাতে রাগ করিবার কথা। যাক, এ সব

কথা ! এখন আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে আসিয়াছি, এ বৃথা বাদানুবাদ ত্যাগ কর।

বন্ধুর বাড়ীতে একটু সুরার বন্দোবস্তও ছিল ;—আমি কত পান করি, করুণা আড়চক্ষে তাহা দেখিতেছে দেখিয়া, আমার মনে মনে অতিশয় রাগ হইল। অন্য সময় হইলে আমি যে পরিমাণে পান করিতাম, আজ তাহার উপর রাগ করিয়া অধিক পান করিলাম। কেবল তাহারই জন্য এরূপ ঘটিল,—আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে সে আমার উপরে বক্তৃতা চালায় !

ক্রমে আমার কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠিল ;—অন্যান্যের কণ্ঠস্বর ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিল ; আমি বুঝিলাম সকলেই আমার দিকে চাহিতেছে। আমি সকলের কথার উপর কথা কহিতে লাগিলাম ;—ক্রমে সকলের কথা বন্ধ হইয়া গেল ; আমি অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার বন্ধু আসিয়া আমার কানে কানে বলিলেন, "করিতেছ কি,—সকলে বিরক্ত হইতেছে।"

আমার চৈতন্য হইল,—আমি সত্বর বিদায় হইলাম। মনে মনে বুঝিলাম, আজ জীবনে প্রথম দিন আমি মাতাল হইয়াছি। যে পরিমাণ পান করা উচিত ছিল, যাহার অধিক কখনও পান করি নাই, আজ সে মাত্রা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রথম আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি! আজ প্রথম আমি আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়াছি! আজ প্রথম আমি সভ্য সমাজের বহির্ভূত হইয়াছি।

ইহাতে আমার নিজের উপরেই নিজের রাগ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া যত রাগ হইল সেই করুণার উপর। সে আমাকে এরূপ সুদীর্ঘ বক্তৃতা না দিলে, তাহার উপর আমার রাগ করিবার কোন কারণ থাকিত না, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিয়া এত সুরা পানও করতাম না। আমি মনে মনে তাহাকে যথেষ্ট গালি দিলাম। তাহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিল।

কি বলিব সে সুলেখার ভ্রাতা, নতুবা এ জীবনে তাহার মুখ দেখিতাম না। ভদ্র সমাজে দশজনের মধ্যে সেই বিশ্রি রকম লাঞ্ছিত করিল।

সুলেখার সহিত দেখা করিতে গেলে, সে যদি এ কথার উত্থাপন করে, তাহা হইলে তাহাকেও দুকথা স্পষ্ট শুনাইয়া দিব। আর সে যদি আমার

অধঃপতনের কথা ভগিনীকে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যাহা করা উচিত তাহাও করিব।

পরদিবস তাহাদের বাড়ী উপস্থিত হইলে দেখিলাম, করুণাকান্ত বাড়ীতে নাই;—সুলেখা এ সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিল না। সে আমাকে বরং অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর আদর করিল। আমি যখন বাড়ীতে ফিরিলাম, তখন বুঝিলাম, আমি তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিয়াছি।

আমি এতদিন বিবাহের দিন স্থিরের জন্য তত ব্যস্ত হই নাই, এ সম্বন্ধে করুণার দিকেও যেমন একটা কারণ ছিল, আমার দিকেও তেমনই ছিল। আমার একখানি পুস্তক ছাপা হইতেছিল। পুস্তকখানি প্রকাশ হইলে কেমন দাঁড়ায়, আমি তাহাই দেখিবার প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।

এতদিনে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। যাহা আমি কখনও ভাবি নাই,—তাহাই ঘটিল। যাহাকে বলে একদিকে প্রকাণ্ড বড়লোক, আমি তাহাই হইলাম। একদিনে আমি জগদ্বিখ্যাত হইলাম। আমার পুস্তক লইয়া লোকে পাগল হইল,—হাজার হাজার কাপি বিক্রয় হইতে লাগিল। হাজার হাজার লোকে আমায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

এত দিন আমি যে করুণার বক্তৃতার জন্যই সুরা অধিক পান করি নাই, তাহা নহে। আমি মনে মনে নিজেই লজ্জিত হইয়া ছিলাম। সেই জন্য বিশেষ সাবধান হইয়াছিলাম। একেবারে যে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বা সুরা স্পর্শ করি নাই, তাহা নহে। অল্প পরিমাণে সুরা পান না করিলে আমার লেখা আসিত না,—মন খুলিত না।—প্রধানতঃ এই কারণেই পান করিতাম; এ কথা অপর কেহ জানিত না। কাহাকেও কখনও বলি নাই।

সহসা এইরূপে হঠাৎ বড়লোক হইয়া পড়ায়, আমার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। বুকটা সপ্তহস্ত পরিমিত হইল, এবং পৃথিবীটাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপরিসর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমার ক্ষমতা যে প্রকৃত কতখানি ছিল, তাহা আমার মনের এই ভাব দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যাহার যথার্থ ক্ষমতা আছে, সে অজ্ঞাত, অখ্যাত অবস্থায় থাকিয়া অসীম পরিশ্রম করিতে থাকে,—সামান্য প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে না।

যে সকল সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে আমার পুস্তকের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা সমূহ প্রকাশিত হইল, সমস্ত আমি সংগ্রহ করিয়া সমালোচনাটুকু

কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়া খাতায় আঁটীয়া রাখিলাম। ইহাতেই আমার কত অর্থ জলের ন্যায় বাহির হইয়া গেল! নিজের প্রশংসা নিজে শুনিতে প্রাণে যে কি আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহা যে মহাত্মা উপভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন।

প্রশংসা নিন্দা কিছুই নহে; এ সকল ক্ষণিক, যাঁহারা এ সকল বলেন, তাহাদের উপর আমার রাগ হইল, কিন্তু শীঘ্রই এ রাগ যাহারা আমাকে প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া ছিল, তাহাদের উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে লোকে আমার পুস্তকের আলোচনা হইতে বিরত হইল; অন্য হুজুগে মনোযোগ দিল; ক্রমে আমার চোখের উপর লোকে আমার বই ভুলিতে আরম্ভ করিল। তখন যাহারা আমার প্রশংসা করিয়াছিল, তাহাদের উপরই আমার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ জন্মিল। আমার মনে হইল এখন তাহারা আমার হিংসা করিয়াই আমার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত করা বন্ধ করিয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে আমার নাম উল্লেখ করে নাই, সেই সকল সম্পাদকের উপর যত না রাগিয়াছিলাম, তাহাদের উপর এক্ষণে তাহাপেক্ষা শত গুণ রুষ্ট হইলাম।

(৩)

এখনও আমার প্রশংসাবাদ বেশ চলিতেছে,— এখনও আমি জগতে মহা বড় লোক,—চারিদিক হইতে সাময়িক পত্রাদির সম্পাদকগণ আমাকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে;—কেহ কেহ টাকা লইয়া আসিয়া আমার বাড়ীতে হটাহাটি করিতেছে;—আমি গম্ভীর, মহা গম্ভীর,- সময় নাই—সময় নাই।

প্রধান মাসিক পত্রিকার,—নামের প্রয়োজন নাই,—সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধাতিশয্যে তাঁহার জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম। তিনি এক খানা নোট আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি লিখিতে বসিলাম।

পার্শ্বস্থ আলমারির মধ্য হইতে হুইস্কির বোতল ও সোডা বাহির করিয়া সামান্য পরিমাণ সুরা ঢালিয়া পান করিলাম; খানিকটা গেলাসে সম্মুখে রাখিলাম; তৎপরে লিখিতে বসিলাম।

যতক্ষণ প্রবন্ধ শেষ না হইল, ততক্ষণ আমি একবারও উঠিলাম না।

ক্লান্তি বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে এক একবার একটু সুরা পান করিলাম। দেখিলাম, আমি যাহা আশা করি নাই—আমি যাহা কখনও ভাবি নাই—সেইরূপ ওজস্বিনী ভাষায় মনোমদ ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ যে এরূপ ভাবে লিখিতে সক্ষম হইব, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই। এরূপ ভাব যে আমার মনে কখনও বিদ্যমান ছিল, তাহা আমি জানিতাম না। প্রকৃতই লেখকদিগের ভাব লেখকদিগের নিজের নহে। ইহা যে কোথা হইতে কে তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে নীত করে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার,—কেহ বলিতে পারে না।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, আবার আমার নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আবার আমি অধিকতর বড় লোক হইয়া উঠিলাম।

প্রবন্ধ শেষ করিয়া আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সেই দিন করুণা আমাকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল; তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাত্রা করিয়া পথে আসিবামাত্র, আমার মনে তাহার পূর্ব্ব কথা উদিত হইল।

সে আমাকে বক্তৃতা দেয়! যাহার নামে জগত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, যাহার দর্শনাকাঙ্খায় সহস্র সহস্র লোকে লালায়িত; তাহাকে কিনা করুণার মত লোক বক্তৃতা দিতে সাহস করে! কি বলিব, সুলেখা তাহার ভগিনী,—তাহাই তাহার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া যাইতেছি! না হইলে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা বিধান না করিয়া ছাড়িতাম না।

পথে যাইতে যাইতে আমি মনে মনে এই সকল আলোচনা করিয়া নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। হোটেলে করুণা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমাকে সমাদরে লইয়া বসাইল। কিন্তু আমি এমন দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলাম যে এক পেগ না খাইয়া কথাই কহিতে পারিলাম না।

সে দিন রাত্রে কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমার বিন্দু মাত্র মনে নাই। পরদিন শুনিলাম, হোটেলে আমি ভয়ানক উপদ্রব করিয়াছি! যাহাকে তাহাকে গালাগালি দিয়াছি,—গেলাস বাসন অনেক ভাঙ্গিয়াছি। আমার এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে করুণা আমার হাত ধরিয়া রাস্তায় আনিয়া এক খানা গাড়ীতে তুলিয়াছি,—তাহার পর আর কিছুই মনে নাই।

(৫)

পর দিবস চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, আমি আমার বিছানায় শুইয়া আছি। সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল,—মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে,—জল তৃষ্ণায় বুক ফাটিতেছে—চারিদিক যেন ঘুরিতেছে।

কাল রাত্রের কথা কতকটা মনে পড়িল। বুঝিলাম যে আমি অতিশয় মাতাল হইয়াছিলাম। মাতাল হইয়া কি করিয়াছি, তাহা কিছুই মনে নাই। নাজানি কতই কেলেঙ্কারি করিয়াছি! লজ্জায় ঘৃণায় যেন মর্ম্মে মর্ম্মে মৃত্যু অনুভব করিতে লাগিলাম। কেন এরূপ করিলাম,—কেন এরূপ হইল,—কখনওতো এরূপ হয় না,—মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা হইতে লাগিল। অনুতাপের যাতনা বড় যাতনা! সেই অসহ্য যাতনায় আমি মনের ভিতরে ঘোরতর ছটফট করিতে লাগিলাম।

এই বারে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমার আত্মসংযমের ক্ষমতা নাই,—মদ খাইলেই আরও খাইতে হয়,—তখন আর জীবনে মদ স্পর্শ করিব না।

আমি সত্বর উঠিয়া হাত মুখ ধুইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, কণ্ঠ তালু শুকাইয়া যাইতেছিল। করুণার নিকট কাল রাত্রের ঘটনার জন্য মাপ চাহিয়া পত্র লিখিব বলিয়া বসিলাম, কিন্তু হাত এতই কাঁপিতে লাগিল যে লেখা অসাধ্য।

আলমারিতে বোতল ছিল! না প্রাণ যায়,—আর নহে।

কিন্তু পত্র লেখা হয় না, অসহ্য যাতনায় প্রাণ যায়। কাল রাত্রের অত্যাধিক মদের জন্য এইরূপ হইয়াছে,—যদি মদ আর কখনও স্পর্শ না করি তাহা হইলে এ অবস্থা আর আমার কখনও হইবে না, সুতরাং এখন ঔষধের হিসাবে একটু খাইলে কোন দোষ নাই। মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া একটু পান করিলাম।

করুণাকে অনেক মিনতি করিয়া পত্র লিখিলাম। সুলেখা যদি শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি ভাবিয়াছে? তাহাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসি,—কি বলিয়া তাহাকে মুখ দেখাইব। মানুষ এমন পশুও হয়! যখন মদে এই অনুভব আসে, তখন আর আমি এ জীবনে ইহা কখন স্পর্শও করিব না। আমি শতবার ভগবানের নামে শপথ করিলাম।

করুণা আমার পত্রের উত্তর দিল। সে পত্রে তাহার রাগের কোন ভাব দেখিলাম না। সে কেবল মাত্র একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, "গত রাত্রের ঘটনায় যদি তোমার চৈতন্য হইয়া থাকে, আর সেই জন্য যদি তুমি এই ভয়াবহ দ্রব্য এ জীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া থাক, যদি ভগবানের ইচ্ছায় তাহাই ঘটে, তবে কাল রাত্রের ঘটনায় আমি দুঃখিত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইব।"

করুণার পত্র পাঠ করিয়া আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। আমি ভগবানের নামে সেই মুহূর্ত্তে শতবার শপথ করিলাম যে আর এ জীবনে কখনও এ বিষ স্পর্শ করিব না!

এই সময়ে সেই প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত হইয়া আমাকে একটী পূর্ব্বের ন্যায় ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বীকৃত হইলাম।

কিন্তু সে দিন কেন? পর পর কয়দিন আমার মন কেমন অবসন্ন হইয়া রহিল, আমি একটা লাইনও লিখিতে পারিলাম না।

দুই একবার কাগজ কলম লইয়া বসিলাম, কিন্তু লেখা বাহির হইল না, যদিও বা হয়, মনের মত হয় না, ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

বিরক্ত হইয়া দুই দিন আর কলম স্পর্শ করিলাম না। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পুনঃ পুনঃ তাগিদ পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

আমি কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম, সেই ব্যাপার,—আমার মাথাটা যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে, আমার লিখিবার ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। যাহা লিখি, তাহা জঘন্য, অপাঠ্য, ছাপিবার উপযুক্ত নহে।

সঙ্গে সঙ্গে সুরা পানের তৃষ্ণা অতি বলবতী হইয়া উঠিল, আমি তখন বুঝিলাম সুরা পান বন্ধ করা অবধি আমার মন স্থির নাই, হৃদয়ে শান্তি ধীরতা নাই, আমার যেন অসীম ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এত দূর যে হইয়াছে, মদে যে আমাকে এতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা আমি এত দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই, এখন ভাবিলাম এত শীঘ্র যে ইহা বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। যাহা হউক প্রাণ থাকিতে আর সুরা স্পর্শ করিতেছি না। প্রাণ যায় ইহাও স্বীকার, এ কার্য্য আর নয়!

রাত্রে নিদ্রা নাই,—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকি, আহার করিতে পারি না। মন স্থির করিয়া লেখা অসম্ভব, যেন অসাধ্য ব্যাপার। তখন কে যেন আমার কানে কানে বলিতে লাগিল, "একেবারে এত দিনের অভ্যাস ছাড়া তোমার ভাল হয় নাই ;—কু অভ্যাস ক্রমে ক্রমে ছাড়িতে হয়,—এক দিনে ছাড়া যায় না! তোমার সে বল নাই, ইহাতে দেহের ও মনের অনিষ্ট হইতেছে। তোমার লেখা পড়িয়া সহস্র সহস্র লোক মুগ্ধ, আর সেই তুমি এখন এক লাইন লিখিতে পারিতেছ না! বুঝিয়া দেখ ভাল করিতেছ না!"

এই রূপ চিন্তা একবার নহে, বারংবার আমার মনে উদিত হইতে লাগিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ মন হইতে এ প্রলোভন আমি দূর করিলাম। না কিছুতেই নয়, অন্ততঃ সুলেখার জন্যও নয়, প্রাণ দিয়া তাহাকে ভাল বাসি, তাহাকে না পাইলে আমার জীবন মরণ সমান হইবে,—সংসার শ্মশানে পরিণত হইবে!

এদিকে শত চেষ্টায়ও আমি মন স্থির করিয়া এক লাইনও লিখিতে পারিলাম না, যাহা লিখি, তাহা পাঠের উপযুক্ত হয় না, সুতরাং ছিঁড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হই!

লেখাই আমার পেশা,—লেখা হইতে আমার গ্রাসাচ্ছদন। লিখিবার ক্ষমতা নষ্ট হইলে অনাহারে মরিতে হইবে। কি করি,—সর্ব্বনাশ হয় তাহাও স্বীকার, আর সুরা স্পর্শ করিব না।

লিখিতে আরম্ভ করিলাম, লেখা বাহির হয় না, তখন এই মহা শঙ্কটে যাহা আমি প্রায় কেন, কখনও করিতাম না,—তাহাই করিলাম, জানুপাতিয়া বসিয়া প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিলাম, এ বিপদে তিনি ভিন্ন আমাকে আর কেহ রক্ষা করিতে পারেনা, তিনিই আমার এক মাত্র গতি। যাহা কখনও হয় নাই,—তাহাই হইল। আমার চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি উঠিলাম। হৃদয়েও যেন কতক বল পাই-লাম। লিখিতে বসিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর প্রবন্ধ শেষ হইল, আমি সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিলাম।

পর দিবস সম্পাদকের নিকট হইতে প্রবন্ধ ফেরত আসিল, সঙ্গে এক পত্রও তিনি লিখিয়াছেন, "সহসা কি আপনার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল? আমার জন্য এ কি পাঠাইয়াছেন? ইহা প্রকাশ হইলে আপনার যশঃ মান সকলেই নষ্ট হইবে, আমিও জনসমাজে হাস্যস্পদ হইব! আপনার প্রবন্ধ প্রকাশ

হইবে প্রচার করিয়াছি, উপায় নাই। কাগজ আপনার জন্য প্রকাশ করা স্থগিত রাখিলাম, কি করিব, না হয় বিলম্বে বাহির হইবে। তিন দিনের ভিতর একটু কষ্ট করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়া পাঠাইবেন, এবার আর বেগার দিবেন না,—দোহাই আপনার।"

আমার জীবনের শঙ্কটাপন্ন সন্ধিস্থলে আসিয়াছি। যদি প্রবন্ধ আমার পূর্ব্বভাবে ও তেজে না লিখিতে পারি তাহা হইলে যে মান সম্ভ্রম হইয়াছে তাহা সমূলে নষ্ট হয়। আমারও উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়, উপায় কি—কি বিষম-বিভ্রাটেই পড়িলাম।

এই পত্র পাঠ করিয়া আমি বুঝিলাম অদৃষ্ট দেবতা এবার আমার প্রতি অপ্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। আর উপায় নাই! এক মাত্র উপায় মদ।

ভাবিলাম এই প্রবন্ধ লিখিবার পর আমার আর বহুদিন না লিখিলেও চলিবে, আমার হস্তে যথেষ্ট অর্থ আছে। এই প্রবন্ধ লিখিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে অভ্যাস পরিত্যাগ করিব, যখন বুঝিব এই পাপ অভ্যাস সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিনা সুরা পানেও আমি পূর্ব্বের মত লিখিতে পারি, তখন আবার কলম ধরিব, নতুবা আর ধরিব না। কিন্তু আপাততঃ মদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ প্রবন্ধ আর লেখা হয় না।

মনে মনে ইহা স্থির করিয়া ভৃত্যকে এক বোতল মদ আনিতে পাঠাইলাম। মনে মনে বলিলাম, মদ না হইলে যে আমার চলে না, তাহা নহে,—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এতদিন মদ স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই। যে এক দিনে এরূপ করিতে পারে, সে আবারও পারিবে। সকলই ইহা দেখিতে পাইবে, আমরা বলা বৃথা।

আমি সুরা পান করিলাম। এই শেষ—এই এক বারের মত, আর কখনও নহে। আমি লিখিতে বসিলাম।

আমার মনও মস্তিষ্কের যে অবস্থা ছিল, তাহা যেন নিমিষের মধ্যে কোন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমার লেখনিতে সেই অসীম তেজ দেখা দিল। আমি প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিলাম। পড়িয়া দেখিয়া ভাবিলাম, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে এরূপ সুন্দর লিখিতে পারি, ইহা আমার নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। এত দিন আমার হইয়াছিল কি?"

সম্পাদক মহাশয়ও প্রবন্ধ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লিখিয়া পাঠাইলেন, "চমৎকার, এই তো আপনার কলমের মত, আপনার হইয়াছিল কি?"

যাহাই হউক আমি আর সুরা স্পর্শ করিতেছি না, তবে অল্পে অল্পে ত্যাগ করিতে হইবে, একেবারে করা উচিত নহে। একেবারে ত্যাগ করিয়া শরীর মন দুই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আমার প্রবন্ধের প্রশংসা পাইয়া আমার মন এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, আমি সেই পূর্ণ আনন্দিত অবস্থায় আর এক গেলাস পান করিলাম।

আর নয়,—আর অধিক কিছুতেই নয়, মনে মনে বারংবার এ প্রতিজ্ঞা করিলাম কিন্তু ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে আরও পানের ইচ্ছা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে তাহার বর্ণনা হয় না,—সে ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই। কতক্ষণ আমি হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না,—পর দিন প্রাতে দেখি ভূমিতলে পড়িয়া আছি,—মুখে মাছি বসিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

ভৃত্য বলিল, "কাল আপনাকে তুলিয়া শোওয়াইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তুলিতে পারি নাই,—সকালে করুণা বাবু আসিয়াও অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়াছেন।"

তখন করুণা বাবু কি বলিয়াছেন শুনিবার আমার অবস্থা ছিল না। তাহার নামে সর্ব্বাঙ্গ আরও জ্বলিয়া গেল, আমি ভৃত্যকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। তখনও পার্শ্বস্থ বোতলে মদ ছিল, কষ্টে উঠিয়া আবার পূর্ণ এক পাত্র পান করিলাম।

তখন শরীরে বল পাইয়া উঠিয়া বসিলাম। অনুতাপ লজ্জা ঘৃণা প্রাণে উদিত হইবার উপক্রম করিল,—সে যন্ত্রণা সহ্য হইবে না,—তাহাদিগকে প্রাণ হইতে দূর করিবার জন্য আবার পান করিলাম, আবার পান করিলাম, —আবার—"

সন্ধ্যার সময় করুণার পত্র পাইলাম সে লিখিয়াছে, "আমার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাহ হওয়া অসম্ভব। তাহাদের গৃহে গেলে অপমানিত হইতে হইবে।" আমি হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম।

(৭)

আমার জীবনের এ গল্প সুখের নয়। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণনা করিয়াছি, —তাহা এরূপ বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন ছিল না; তবে সকল কথা না বলিলে আমার জীবনের শেষাংশ সকলে বুঝিতে পারিবেন না,—তাহাই এরূপ বিস্তৃত ভাবে লিখিতে হইয়াছে।

সতের বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সতের বৎসরের বর্ণনা আর করিব না। এই পর্য্যন্ত বলি আমি এখন পরের জন্য যাহা তাহা লিখিয়া যৎসামান্য যাহা পারিশ্রমিক পাই, তাহাই মদে ব্যয় করিয়া থাকি। এই সহরের এক জঘন্য গৃহে মলিন ছিন্ন বিছানায় পড়িয়া থাকি,—কোন দিন আহার হয়, কোন দিন হয় না,—আহারে আদৌ ইচ্ছা বা আকর্ষণ নাই,—মদ পাইলেই আমি সন্তুষ্ট।

যে দিন যথেষ্ট সুরাপান করিতে পারি, সে দিন উহারই মধ্যে ভাল কিছু লিখিতে সক্ষম হই,—তাহার দরুণ কিছু অধিক মূল্যও পাই,—পাইলেই অধিক সুরাপান করি।

সম্প্রতি এক দিন এইরূপ একটা সুযোগ মিলিয়াছিল। আমি এক ব্যক্তির একটা প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়া একখানা দশ টাকার নোট পাইলাম! নোটখানি হাতে পাইবামাত্র আমি ব্যগ্র ও ব্যাকুল ভাবে বাহির হইলাম।

বলা বাহুল্য এক্ষণে মদের দোকান আমার পক্ষে এক রূপ ঘর বাড়ী হইয়া গিয়াছিল। আমি একটা দোকানে বসিয়া আধ বোতল মদ পান করিয়া বাহির হইলাম।

বর্ষাকাল। টিপ্ টিপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথ কাদায় ঢাকিয়া গিয়াছে, আমার পরিধান ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মস্তকে ছাতা নাই—বগলে মদের বোতল, আমি গৃহের দিকে চলিলাম। বোধ হয় অনায়াসেই গৃহে উপস্থিত হইতে পারিতাম, কিন্তু আমায় দেখিবামাত্র কতকগুলি দুষ্ট বালক আমার গায় কাদা ছুড়িয়া মারিতে লাগিল, তাহারা আমাকে পাগল স্থির করিয়াছিল।

যদি আমি তাহাদের একটাকেও ধরিতে পারিতাম তাহা হইলে বিনা দ্বিধায় তাহার গলা মোচড়াইয়া হত্যা করিতাম। ইহাতে আমার ফাঁসি হইলেও দুঃখিত হইতাম না। রাগে বিরক্তিতে আমি উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলাম। ছুটিয়া তাহাদের একটাকে ধরিতে গেলাম, তাহারা পলাইয়া দূরে গিয়া আরও অধিকতর কাদা ছুঁড়িতে লাগিল। আমি আরও অধিক উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম।

আমি সেই কাদায় বৃষ্টিতে একবার তাহাদের ধরিবার জন্য এ দিকে ছুটিতেছি, আবার পাগলের মত ওদিকে ছুটিতেছি, তাহারাও তত অধিক হাসিতেছে, তত অধিক আমার গায় কাদা ছুড়িতেছে। এই রূপ সময়ে আমি পা

পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম, ফুটপাতের পাথরে মাথা লাগিয়া রক্ত বহিল, বগল হইতে বোতল দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল, আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

এই সময়ে পার্শ্বস্থ বাড়ী হইতে একটী স্ত্রীলোক সত্বর পদে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন, আমি কম্পিত পদে তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দুষ্ট বালকদিগের দিকে ফিরিয়া কঠোর ভৎর্সনা করিলেন,—তাহারা পালাইল।

তখন আমি তাঁহার মুখ দেখিলাম, দেখিবামাত্র চিনিলাম। সে কে? সে যে সুলেখা।

সতের বৎসর পরে এই পুনর্ব্বার দেখা। এই সতের বৎসরের মধ্যে সুলেখার সহিত আমার একবারও দেখা হয় নাই। শুনিয়াছিলাম আমার সঙ্গে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে, সুলেখা কোন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রী হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই, পর উপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গিকৃত করিয়াছিল।

তাহার সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য আর নাই! তাহার কণ্ঠস্বর না শুনিলে বোধ হয় আমিও তাহাকে চিনিতে পারিতাম না। সতের বৎসরে তাহার ও আমার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

সতের বৎসর পরে উভয়ের মিলন,—কি অবস্থায়? কেহ এরূপ কি আর কখনও দেখিয়াছেন?

সেই সুলেখার সহিত সুখে হাস্যালাপ, সেই আমি খ্যাতনামা লেখক,—সেই শত সহস্র লোক আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সেই কত আশা, কত ভরসা? সুলেখাকে লইয়া সুখে বড় লোক হইয়া বাস করিবার সেই কি আগ্রহ,—আর আজ?

আজ আমি পথের মাতাল, জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন মলিন বসন পরিধান মাতাল—ঘোরতর মাতাল,—সেই এক দিন,—আজ আর এক দিন?

বোধ হয় আমার উচিত ছিল যে তাহাকে বলা যে আমার ন্যায় হেয় অধম মদ্যপায়ী পথের ঘৃণিত মাতালকে স্পর্শ করা তাহার ন্যায় পবিত্রাত্মা বিশুদ্ধ পুণ্য-প্রাণা দেবীর কর্ত্তব্য নহে,—বোধ হয় তাহার সম্মুখে আমার হেয় নীচ দশার জন্য অনুতাপ করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

তোমরা কি মনে কর আমি তাহাই করিয়াছিলাম,—না—না—তাহা নহে।

সুলেখা আমাকে চিনিতে পারিল, আমাকে আদরে সস্নেহে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য হাত ধরিয়া টানিল, আর আমি!

আমি রাক্ষসের ন্যায় তাহার দিকে ফিরিলাম। কুৎসিত ভাবে তাহাকে গালি দিয়া বলিলাম, "ডাকিনী, শয়তানি, শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে যাও, না হইলে তোমার রক্ষা নাই!"

(৯)

এইবার শেষ দুই একটা কথা। যাহারা আমার এই জীবন কাহিনী পাঠ করিবে, হয়তো তাহাদের মধ্যে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কেহ বলিবে, "হায় এমন সুবিধা থাকিতেও লোকটার এই দশা হইল।" কেহ বলিবে, "হায়, হায়, এমন লোকেও এমন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করে?"

হয়তো তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে পারিবে, আমি কে! জানিয়া প্রাণে বেদনা অনুভব করিবে। আশা করি তোমাদের কৃপা, তোমাদের কাতরতা তোমাদের নিজের কাছেই রাখিবে, আমার প্রতি ব্যয় করিবে, না। তোমাদের করুণা তোমাদের কাছেই থাক, আমি ইহাকে ঘৃণার সহিত পদাঘাত করি। জানি তোমরা সদাই পরের জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতে বড়ই পটু।

জানি মাতালের কোন বন্ধু ত্রিসংসারে কেহ নাই—সে কোন বন্ধুও চাহে না। কেবল এক বন্ধু, এক সখা,—যে তাহার নিকট তোমাদের দেবতা ভগবানের অপেক্ষা সহস্র গুণ বড়,—অতীব সুন্দর।

আমি আমার জীবনের কাহিনী লিখিলাম, কিন্তু কেন লিখিলাম, তাহা তোমাদের এখনও বলি নাই। বলিব কি?

হাঁ বলিব; নতুবা তোমরা ভাবিবে যে আমার অনুতাপ হইয়াছে, সেই অনুতাপের তাড়নায় এই বৃহৎ কাহিনী লিখিলাম। না না—অনুতাপের লোক আমি নই।

আমার সম্মুখে শত শত লোক যদি মদ খাইয়া অধঃপাতে যায়, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে একবারও চেষ্টা করি না। বরং যাহাতে তাহারা আরও অধঃপাতে যায় তাহার জন্য চেষ্টা পাইব। যাহাতে তাহাদের অধঃ-

পাতের পথ আরও পরিষ্কার হয়, তাহার জন্য চেষ্টা পাইব। সুতরাং তোমরা নিমেষের জন্য ভাবিও না যে আমি "অনুতাপের বশবর্ত্তী হইয়া এ কাহিনী লিখিয়াছি। আমার এ জীবনের কাহিনী পড়িয়া লোকে মদের নিকট না যাউক, মদ্য স্পর্শ না করুক, মদের বিষময় ফল জানিতে পারুক, এ উদ্দেশ্য আমার বিন্দুমাত্রও নাই। মদে হাজার হাজার লোক অধঃপাতে গেলেও আমি দুঃখিত হইব না।

তবে কি জন্য আমি এ কাহিনী লিখিলাম। শুনিবে? অনুমান করিতে পার না কি? অনুমান না করাও আশ্চর্য্য।

তবে শোন, কি জন্য এ কাহিনী লিখিলাম। ইহা বিক্রয় করিব,—এই প্রবন্ধ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইব,—তাহাতে কিনিব হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী সুরা। লেখার জন্য এখনও লোকে পয়সা দেয়,—এই কাহিনীর জন্যও অবশ্য কিছু দিবে,—যাহা পাইব, তাহাতে কিনিব—যতটুকু হয়—মদ।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীমতি প্রমিলাবালা মিত্র

(১)

পিতৃমাতৃহীন পঞ্চম বৎসরের বালক মহম্মদ যেদিন তাহার পালক, বাদসাহের প্রিয় গায়ক বৃদ্ধ এনায়েৎ আলীর সহিত ঝকমকে রংচঙে পোষাক পরিয়া "আনন্দ বাগে" প্রবেশ করিল, সেইদিন তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী অলক্ষ্যে তাহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

সেদিন একটা যুদ্ধে জয়লাভ হেতু আনন্দবাগে স্ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। নাচ গান চলিয়াছে। প্রধান নর্ত্তকী ফিরোজা গাইতেছে; বাদ্যকর সারেঙ্গের সুরে প্রাণের সুর মিশাইয়া রাগিণী বাজাইতেছে। বাঁয়া ও তবলায় সঙ্গত দিতে দিতে বাজিয়ে যুবা নর্ত্তনশীলা গায়িকার পানে একদৃষ্টে চাহিতেছে; শত সহস্র চক্ষু কর্ণ মুগ্ধকারিণী ফিরোজা নৃত্য করিতে করিতে, কখনও বা বাদশাহের সিংহাসন প্রান্তে যাইয়া জানুপাতিয়া বসিয়া বাদসাহের চরণ চুম্বন,

করিতেছে, আবার ললিত পদবিক্ষেপে তখনি যাইয়া শ্রোতার সম্মুখে হস্ত বিস্তার করিয়া গাইতেছে,—

"কোয়েলিয়া কোক শুনাবেহা,
　　সখিরী মৈতো বিরহা সতাবে,
পিয়াবিন কহুনাশোহাবে
　　নিশি আঁধিয়া কারি বিজরি
চমকে জীয়ারা মোরা ডর পাবে হা,—

সোমের মাথায় শ্রোতা বাদ্যকর, বাদসাহ, গায়িকার মস্তক একসঙ্গে হেলিয়া উঠিতেছে। সুসজ্জিত কক্ষের প্রত্যেক মুকুর আলেখ্য প্রভৃতি সরঞ্জাম গুলি উজ্জ্বলালোকে একটা সজীবতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপরে বহুমূল্য ঝাড় দীপ্তি ছড়াইয়া বায়ুভরে ঠুন ঠুন শব্দ করিতেছে।

এমন সময়ে সঙ্গীসহ মহম্মদের হাত ধরিয়া এনায়েৎ আলী সাহেব প্রবেশ করিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিলেন। নর্ত্তকী সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পাত্রমিত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান দেখাইল।

আলী সাহেবও যথাসাধ্য সম্ভাষণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এনায়েৎ আলীর মত ওস্তাদ গায়ক এ মুল্লুকে আর নাই, কাজেই ইঁহার সম্মান বড় বেশী।

আলী সাহেব তানপুরার কাণ মুচড়াইয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন। বাঁয়া তবলা বাদ্যকর বাদ্যের আবরণ খুলিতে তৎপর হইল। বালক মহম্মদ মন্দিরা হস্তে ওস্তাদের মুখপানে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

গৃহ নীরব। আলী সাহেবের কসরৎ দেখিবার ও শুনিবার জন্য সে দিন অনেক বিদেশী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ওস্তাদ সুর বাঁধিয়া বাগেশ্রী আলাপ করিলেন। তাহার পর গান চলিল। বালক মন্দিরা ধরিয়া মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া তালে তালে বাজাইতেছে। বাদশাহের দৃষ্টি সেই অনিন্দ্যসুন্দর বালকটীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমে শ্রোতৃবর্গেরও মুগ্ধ দৃষ্টি বালক মহম্মদের উপর পতিত হইল।

বালকের সে সকলে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপনমনে বাজাইতেছে। বাজাইতে বাজাইতে তন্ময় হইয়া গেল।

আলী সাহেবের গান আজ যেরূপ সুন্দর শুনাইতেছিল, এমনটী আর

কখনও শুনায় নাই। তানপুরার সুর, বাঁয়া তবলা ও গীতের সুর, এক সঙ্গে মিশিয়া একটা গাম্ভীর্য্য ভরা কারুণ্য সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। মহম্মদের মন্দিরা, নভোদিত তারকা মণ্ডলী প্রতিফলিত চিত্রবৎ সেই সুর-সমুদ্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্, ইত্যবসরে এক একটা শব্দে সেই সভাস্থ জন সভ্য সঙ্গীত সুরে হত চৈতন্য প্রাণকে সজীবতায় জাগাইয়া তুলিয়াছে।

গান থামিল। বাঁদী সরাব আনিল। আলী সাহেব সরাব পানে শ্রান্তি দুর করিলেন। বাদশাহ পানপাত্র দাসীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "আলী সাহেব আর একখানা গাও।"

আলী সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন "খোদাবন্দের হুকুম পালন করিতে দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত" তাহার পর নর্ত্তকীর পানে চাহিয়া ওস্তাদ বলিলেন, "ফিরোজা বিবির আজ সরাবে অরুচি কেন?"

নর্ত্তকী পূর্ণ পানপাত্র ফিরাইয়া দিয়াছিল।

ফিরোজা বলিল,

"নেশা হইলে জনাবের গীত ভাল বুঝিতে পারিব না তাই। আর ঐ বালকের বাজাইবার কায়দাও আমার দেখিবার ইচ্ছা আছে।"

ওস্তাদ বলিলেন "মহম্মদের সঙ্গীতের ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকমের! ও পরে খুব উৎকৃষ্ট গায়ক হবে বলে অনুমান করা যায়। রাগ রাগিণী, সুর তাল লয় বুঝিবার ক্ষমতাও আশ্চর্য্য রকমের।"

নর্ত্তকী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "জনাবের সঙ্গই মহম্মদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবে।"

বাদশাহ বলিলেন "আলী সাহেব ও বালকটী কোথায় পাইলে?—

"দুনিয়ার মালিক,—মহম্মদ পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালক। একদিন আমার গানের সঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে করতালি বাজাইতেছিল, বাজাইবার ক্ষমতা দেখিয়া আমি যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট উহাকে স্থান দিয়াছি।"

তাহার পর আবার গান বাজনা আরম্ভ হইল। এবার ওস্তাদ ঝিঁঝিঁটে ঝঙ্কার দিলেন। মহম্মদ আবার মন্দিরা হাতে তুলিয়া লইল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীত চলিল। ক্রমে সভাগৃহের আলোক ম্লান হইয়া আসিল। দুই একটা আলো জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিভিয়া গেল।

সঙ্গীতসুর গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর শুনাইল।

শ্রোতৃবর্গ তন্দ্রাঘোরে ঢুলিতে লাগিল। বাজাইতে বাজাইতে বালক মহম্মদের হস্তস্থিত মন্দিরা পড়িয়া গেল। মাত্র চারিজন সে সভায় সম্পুর্ণ জাগ্রত ছিলেন ; স্বয়ং বাদশাহ, নর্ত্তকী, এনায়েৎ আলী এবং বাঁয়া তবলা বাদ্যকর। গান শেষ হইল।

মহম্মদ ওস্তাদের ঠেলাঠেলিতে জাগিয়া দেখিল, সম্মুখে পুষ্পমালা হস্তে বাদশাহ দণ্ডায়মান! সে তিনবার পাছুহটিয়া ও অগ্রসর হইয়া ভূমি স্পর্শে বাদশাহকে অভিবাদন করিল। তাহার ঘুম তখনও সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই।

বাদশাহ সেই পুষ্পহার মহম্মদের কণ্ঠে, তাঁহার পরিতৃপ্তির নিদর্শন স্বরূপ অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ ওস্তাদ হর্ষে গর্ব্বে বাদশাহের বস্ত্র প্রান্ত চুম্বন করিলেন। কারণ মহম্মদকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। অবলম্বন হীন জীবনে বৃদ্ধ বয়সে আলীসাহেব এই বালককে অবশিষ্ট জীবনের অবলম্বম স্বরূপ পাইয়া অগাধস্নেহ তাহার প্রতি ঢালিয়া দিয়াছেন। আর জ্ঞানী মাত্রেই গুণের আদর দেখিলে আনন্দিত হয়েন।

কিন্তু নর্ত্তকী ফিরোজা ঈর্ষাভরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

সে মহম্মদের বাদ্যের প্রশংসা করে বটে ; কিন্তু ফিরোজা বর্ত্তমানে একটা পাঁচবৎসরের বালক বাদশাহ প্রদত্ত পুষ্পমালা গ্রহণ করে, ইহা সহ্য করিতে পারেনা।

তাই সে আর বাদশাহের আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

তাহার পর সভা ভঙ্গ হইল।

২

মহম্মদের সৌভাগ্যের কথা শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বাইজি ফিরোজা বিবি ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল। মহম্মদের কচি প্রাণটুকু দেহচ্যুত করিতে গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত হইতেও বিলম্ব হইল না। সৌভাগ্য বশতঃ আলীসাহেব সে রহস্য জানিতে পারায় বালক বাঁচিয়া গেল। তিনি সেইদিন প্রাতে উঠিয়া তানপুরাটি স্কন্ধে লইয়া এবং মহম্মদের হাত ধরিয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই দুনিয়ার মালিক ব্যতীত এ রহস্য আর কেহ জানিল না। আলী-সাহেবের অন্তর্ধ্যানে বাদশাহ দুঃখিত হইলেন।

তাহার পর বিংশ বৎসর অতীতে মিশিয়া গিয়াছে।

আজ বাদশাজাদী পঞ্চদশ বর্ষীয়া রূপরাণী গুলজানের জন্মদিন উপলক্ষে নগরে মহাধুম। চতুর্দ্দিকে দোকান পসার বসিয়াছে। নানাবর্ণের পতাকা

শ্রেণী পত্‌পত্‌ শব্দে বায়ুভরে দুলিতেছে, তাহার উপর পুষ্পমালা সকল দুলিয়া দুলিয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। নাচগানের অভাব নাই, শরতের স্নিগ্ধ আবেশময় প্রভাতে বাদশাহী নহবৎখানায় বাঁশী প্রভাতী বন্দনা গাহিতেছে।

আপন সুসজ্জিত হর্ম্ম্যতলে গবাক্ষ সন্নিধানে দাঁড়াইয়া গুলজান সঙ্গিনী সহ গুলাব পিচ্‌কারী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহার বিকচ-কমল সদৃশ মুখখানি ফিরোজা ওড়না দ্বারা লতাকারে বেষ্টিয়া আছে।

নকিব ফুকারিল। বাদশাহ সভাসীন হইলেন। আজ গুলজান বিবির শুভ উদ্দেশে রচিত গীত সকল গীত হইবে। ওস্তাদ কালোয়াতের অভাব নাই। দুই একজন তখনকার প্রথিত-যশা গায়িকাও উপস্থিত আছে। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বশতঃ ফিরোজা বিবি দেওয়ানা হইয়া সংসার হইতে অপসৃতা হইয়াছিল।

সঙ্গীত আরম্ভ হইল। অন্তপুরচারিনীগণ সম্মুখস্থ নীলপর্দ্দার অন্তরালে জমায়েৎ হইলেন। সঙ্গীতের পর অন্যান্য ক্রিয়ানুষ্ঠান ও হইবে।

আলী-সাহেবকে স্মরণ করিয়া বাদশাহ একবিন্দু অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন।

আলী-সাহেব বাদশাহের বড় প্রিয়গায়ক ছিলেন। সর্ব্বোপরি সেই একদিন রাত্রের একখানি কচিমুখ বাদশাহের মনে জাগিয়া উঠিল। তাহা বালক মহম্মদের। হায়, সে কি আজও জীবিত আছে? আর একবিন্দু অশ্রু বাদশাহের নয়ন উছলিয়া পড়িল।

তিনি বলিলেন "ওস্তাদজী, বাজ্‌না মিঠা লাগ্‌ছে না, গান বন্ধ করুন।" ওস্তাদ ফেল্‌ ফেল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার গলাটা একটু বাজখাঁই গোছের ছিল বটে, কিন্তু কেহ বলিতে সাহস করিত না। বাদশাহ বলিয়াই ওস্তাদজী নীরবে সহ্য করিয়া ভৈরবী আলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল, পথে এক গায়ক গুলজান সাহেবার উদ্দেশে গীত গাহিয়া গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল, তাহাকে তাহারা ধরিয়া আনিয়াছে, হুকুম হইলে সভায় আনয়ন করে; গায়ক বড় উম্‌দা কস্‌রত জানে।

বাদশাহের আদেশে ছিন্ন পায়জামা ও অঙ্গরাখা পরিহিত, মস্তকে মলিন পাগ্‌ড়ীধারী, একটী পুরাতন জীর্ণ তানপুরা স্কন্ধে গায়ক বাদসাহের সভায় আগমন করিল। কি জানি কোন অতীতের স্মৃতিস্নাত কোন সুদূরের মধুময়

কি একটা কথা ছায়ার মত হৃদয়ে ফলিত হইয়া গায়কের চরণ কম্পিত হইল। তাহার পর শিরনত করিয়া আগুপাছু হটিয়া সে বাদসাহকে অভিবাদন করিল।

বাদশাহ চমকিয়া উঠিলেন, এমনি একখানি অনিন্দ-সুন্দর মুখ, তিনি বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছিলেন। তাহার দেহের বর্ণাভাও এমনি তপ্ত কাঞ্চনবৎ দীপ্তিমান ছিল।

বাদশাহের আদেশে গায়ক তানপুরায় সুর চড়াইল। তাহার পর আশাবরী রাগিনীতে গুলজান সাহেবের শুভ উদ্দেশে রচিত গীত গায়কের ললিত কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া সভা মুখরিত করিয়া ফেলিল। তানপুরার সুরে গায়কের প্রাণের সুর মিশিয়া গেল। অন্যান্য ওস্তাদ গায়কগণ মূকের মত নবীন আগন্তুক গায়কের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

জীর্ণ তানপুরার ঝঙ্কারে বাদশাহের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন পুরাতন কথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতসুরে সভা গম্ গম্ করিতে লাগিল।

গায়ক বঙ্কিমভাবে বসিয়া একহস্তে তানপুরা বেষ্টন করিয়া দক্ষিণহস্তে তানপুরার তার চালনা করিতেছে। গায়ক গীতের অন্তরা ধরিয়াছে,—আশবরী রাগিনী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বাদশাহের সভায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। গায়কের গানে সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ; কি একটা আবেশে ঈষৎ কম্পিত। এমন সময় বেগমদিগের বসিবার সম্মুখের নীলপর্দ্দা দুলিয়া উঠিল। সেই পর্দ্দার অভ্যন্তর হইতে বিদ্যুল্লতার মত কম্পিত চরণে সুন্দরী গুলজান হীরকহার হস্তে বাহিরে আসিলেন।

গুলজান নতজানু হইয়া গায়কের সম্মুখে বসিয়া সেই হীরক হার তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। গায়ক গীত বন্ধ করিয়া নীরবে বাদসাজাদীর মুখ পানে চাহিল। গুলজান বলিল "প্রিয়তম, আমি তোমায় বরণ করিলাম। আমারই উদ্দেশে আজ এত উৎসব, আমিই বাদসাহ নন্দিনী গুলজান। আমি তোমার সঙ্গীতে ও রূপে মুগ্ধ। আমার পিতা যদি ইহাতে তাঁহার মর্য্যাদার হানি বিবেচনা করেন আমার প্রাণদণ্ড করুন;—তথাপি আমি ধন্যা,—কারণ তোমার কণ্ঠে হার পরাইতে পারিয়াছি। গুলজান তাহাতেই পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে।"

গায়ক বলিল "বাদসাহ-নন্দিনী বংশ মর্য্যাদায় দীন হীন না হইলেও এ অধম বাদসাইজাদী গুলজান সাহেবার অমূল্য হৃদয় লাভের যোগ্য, একথা আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?" গুলজান বলিল "কোরাণ;

সরিফের শপথ, তুমি ভিন্ন আর কেহ গুলজানের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না।"

গুলজান ফিরিয়া দেখিল সম্মুখে পিতা দণ্ডায়মান! সে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বাদসাহ বলিলেন "গুলজান, তুমি গুণের আদর করিতে বুঝিয়াছ, এজন্য আমি আন্তরিক সুখী। এ গায়ক আর কেহ নহে, এ নিশ্চয় আমার প্রিয়মিত্র আলী সাহেবের পালকপুত্র মহম্মদ। একদিন আমি ইহাকে ফুলহারে পুরস্কৃত করিয়া ছিলাম, আজ আবার আমার সাম্রাজ্যের অমূল্যরত্ন স্নেহে ফুটিত গুলজান সহ এই সাম্রাজ্যের ভার ইহাকে অর্পণ করিলাম। গুলজান! সঙ্গীতের মত সামগ্রী দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই, আর মহম্মদ সেই সঙ্গীতে সুদক্ষ পণ্ডিত। আমরা উহার গুণমুগ্ধ। এ বৃদ্ধ মস্তকে আর মুকুট শোভা পায় না।"

তাহার পর বাদশাহ গায়কের মস্তকে নিজ হীরক মুকুট পরাইয়া দিয়া সভাসদের পানে চাহিয়া বলিলেন "আজ হইতে আপনারা এই গায়ককে আমার মত মনে করিবেন। গুলজানের হস্ত ধরিয়া গায়কের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "গুল্ এ রত্নের সম্মান রাখিস্। খোদার আজ্ঞায় আজ এ মিলন হইল। হে অজ্ঞাত কুলশীল যুবক তুমিও এই সাম্রাজ্য ও আমার স্নেহের গুলজানের মর্য্যাদা রক্ষা করিও। যুবক! আমার অনুমান কি সত্য? তুমি কি আলীসাহেবকে চিনিতে?" "যুবক মাথা নত করিয়া বলিল "হাঁ খোদাবন্দ, আমিই সেই মহম্মদ, আলীসাহেব আর এজগতে নাই! এই তানপুরাটি তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। আমি প্রত্যহ ইহাকে পূজা করি।"

"এই দেখুন দেব; আপনার প্রদত্ত আমার সেই অমূল্য ফুলহার।" মহম্মদ একছড়া শুষ্ক ফুলের মালা দেখাইল। তারপর সেই হার উন্মোচন করিয়া গুলজানের গলায় পরাইয়া বলিল "গুলজান! এই অমূল্য হার আজ তোমার গলায় দিলাম, এ দরিদ্রের আর কিছুই নাই। আর এই হারের সহিত দিলাম অকপট প্রেমভরা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়।"

বাদশাহ করযোড়ে উর্দ্ধে চাহিয়া বলিলেন, "খোদা তোমার কৃপায় এ মিলন অচ্ছেদ্য হউক্।"

দূরে বাঁশরীর সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া গুলজানের সঙ্গিনীগণ তখন শোহেলা গাহিতেছিল।

*　*　*　*　*　*　*　*

নবীন বাদসাহ মহম্মদসাহ যে দিন প্রথম পুত্রের জন্মোপলক্ষে দান ধ্যান উৎসবাদি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত; সেই সময় দূত গিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল, "খোদাবন্দ, এক ফকিরণী বলে যে সে আমাদের নূতন বাদসাজাদাকে দেখিবে, তাহার হাতে একখানি সুন্দর মণি আছে, সে মণির প্রভা বড় মনোহর। সেই মণি ফকিরণী বাদসাজাদার কণ্ঠে পরাইতে চাহে।"

বাদসাহ বলিলেন, "ফকিরণী! আচ্ছা, তারে আমার কাছে নিয়ে এস।"

কিয়ৎক্ষণ পরে দূত একা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ফকিরণী বলে, সে জঁহাপনার চরণে বড় অপরাধিনী। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই সে দেওয়ানা লইয়াছে। আর আজীবন পাপ করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সেই সকলের বিনিময়ে সে এক অমূল্য মণি কিনেছে; সে মণি বাদসাহপুত্রের কণ্ঠে পরাইতে পারিলে ফকিরণী যেমন তৃপ্তি পাইবে, অমন আর কিছুতেই নহে; জঁাহাপনার সঙ্গে দেখা করিতে সে সম্মত নহে।"

"আমার অজ্ঞাতে আমার নিকট অপরাধিনী!—আচ্ছা তাহাকে অন্তঃপুরে যেতে দাও। আমার আজ্ঞা।"

বাদসাহ-পুত্রের কণ্ঠে মণি পরাইয়া ফকিরণী যখন চলিয়া যায়, একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দেখিয়া বলিয়াছিল, ফকিরণী নাকি বাইজি ফিরোজাবিবি।

[হী]রা সিং।

লেখক—শ্রীফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

(১)

আম্বালা নগরীর এক প্রান্তে এক বাগানবাটী। তথায় এক সুসজ্জিত কক্ষে জানালার নিকট বসিয়া এক বৃদ্ধ উদ্যানের দিকে শূন্যমনে চাহিয়াছিলেন।

তখন বড় বড় গাছের মাথায় যে সূর্য্যালোকটুকু ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে।

সেই সময়ে এক কিশোরী বালিকা নিজের ওড়না দিয়া মুখের হাসি

চাপিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া বৃদ্ধের পশ্চাতে আসিল। যদিও বালিকা মুখের হাসি বস্ত্র দ্বারা লুকাইল, কিন্তু সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটির হাসি লুকাইতে পারে নাই।

বালিকা বৃদ্ধের পশ্চাতে আসিল, এবং মুখের কাপড় ফেলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিল। পরে তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধের মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া সহসা থামিয়া গেল।

বৃদ্ধ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, আদুরে মেয়ে ?"

বালিকা বলিল, "তুমি আজ বেড়াতে গেলে না, ঠাকুরদা ?"

"না, আজ আর গেলাম না। আজ এখনি হীরা পান্নার আসবার কথা আছে কিনা, তাই। শোন্ লছমী, তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

বালিকা জিজ্ঞাসুনয়নে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা লছমী, তোর মাকে মনে পড়ে ?"

লছমী বলিল, "একটু একটু পড়ে বই কি ? মনে আছে একদিন বিকেলে আমি একটা বড় বিলাতি মেম-পুতুল নেব বলে আবদার করেছিলাম, মা কত বকলে।—আমিও রাগ করে না খেয়ে শুয়ে রইলুম। তখন, আমি ঘুমিয়ে গেছি ভেবে, মা আমায় আদর করে চুমু খেয়ে বল্লে।" "আহা।" তার পর আমায় উঠিয়ে কথায় কথায় ভুলিয়ে, কি করে যে খাইয়ে দিলে, তা আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝতে পারি নি।"

"আহা, গুণবতী পুত্রবধু আমার! সতী যেদিন স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনলে, সেই দিনই বিছানা নিল এবং তিনদিনে মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চলে গেল! অমন পুত্র, অমন পুত্রবধু বড় ভাগ্যে পেয়েছিলাম—"

বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। লছমী উঠিয়া পিতামহের নিকট যাইয়া, সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, এবং তাহার শুভ্র কেশ লইয়া খেলা করিতে বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে লছমী বলিল, "আজ এ সব কথা মনে করচ কেন, ঠাকুর দা ?"

বৃদ্ধ যেন নিজ মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "সেই অবধি আমি কেবল তোকেই অবলম্বন করে সংসারে আছি—"

"আর আমি না বুঝে সুঝে কত শত উৎপাত করে তোমায় জ্বালাতন করি—"

যেমন আজকে এখুনি করলি ? ওরে, ওগুলো কি আমি উৎপাত মনে করি রে—"

"মনে কর না বলেই ত আমার আব্দার ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।"

"তা বাড়ুক। আচ্ছা লছমী, তুই আমাকে ভালবাসিস্ ?"

"একটু একটু বাসি বই কি।"

"আমি তোকে বাসি ?"

"মোটেই না।"

"সত্যি ? আমি তোর প্রতি ভালবাসা এক দিনও প্রকাশ করি না বলে ?"

লছমী আবেগ ভরে বলিল, "তুমি মুখে প্রকাশ কর, আর নাই কর, আমি তোমার প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে আমার প্রতি অসীম ভালবাসা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করি—"

বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। বৃদ্ধ বলিল, "যা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, তা ত ভুলেই গেলাম। বলছিলাম যে তুই বড় সড় হয়েছিস্—"

"সেটা ভগবানের দোষ। আমি ত চিরকালই ছোট্টটি থাকতে চাই—"

"তা থাকিস্, ভগবান তাতে মানা করবে না। আমি বল্‌ছিলাম—কিন্তু তুই কেবলি বাধাদিস্। আমি বল্‌ছিলাম যে হীরা পান্না ছেলে দুটি বেশ। আমি ওদের দুজনেকেই ছেলের মত ভালবাসি, ওরাও আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আজ ৫।৬ বছর হল ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমি ওদের লক্ষ্য করে আস্‌ছি। একদিন দেখিস্ ওরা দুজনেই নামী, বড় লোক হবে।"

"ছাই হবে ! একদিন কোন যুদ্ধে যেয়ে কেটে মরবে।"

"যুদ্ধে গেলেই কি লোক মরে, পাগলী ? এই দেখ না আমিই কত যুদ্ধে গিয়েছি, বেঁচে এসেছি ত ! আর, আমরা শিখ, যুদ্ধই আমাদের ব্যবসায়। না ওসব কিছু নয়—মরা বাঁচা ভগবানের হাত। আমি বেশ জানি, হীরা পান্না দুজনেই তোকে খুব স্নেহ করে। আমার ইচ্ছা হয় যে ওদের একজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দিই। তুই কি বলিস্ ?"

"আমি বলি, দুজনেরই সঙ্গে বিয়ে দাও না কেন ?"

"তা পারিস্ ত করিস্। এখন বল দেখি ওদের মধ্যে তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্।"

"যাও, যাও, আজ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঐ, ওরা আসছে।"

(২)

দুইটি প্রিয় দর্শন যুবক বুটজুতা মশ্ মশ্ করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ইহারাই হীরা সিং ও পান্না সিং। দুজনেরই মস্তকে বৃহৎ পাগড়ী, দুজনেই দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ট। পান্না সিং অপেক্ষা হীরা সিং কয়েক বৎসরের বড়। সে একটু গম্ভীর, কিন্তু শান্ত প্রকৃতির লোক, পান্না সদা-প্রফুল্ল, যৌবনের উৎসাহে পরিপূর্ণ।

দুজনে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। পান্না অভিবাদন করিয়াই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "সর্দার জী আমাদের যুদ্ধের যাইবার হুকুম আসিয়াছে। লছমী, কাল আমরা যুদ্ধে যাব।"

লছমীর মুখ সহসা সাদা হইয়া গেল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "যুদ্ধে !"

পান্না বলিল, "হাঁ, যুদ্ধে। জার্ম্মাণীর সহিত আমাদের সরকারের যুদ্ধ বেধেছে, আমরা সেই যুদ্ধে যাব। কালই যাত্রা করতে হবে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তুই কেঁপে উঠলি যে লছমী! কোন ভয় নেই। দেখিস্ এই যুদ্ধে আমাদের হীরা পান্না অক্ষয় যশ লাভ করবে।"

হীরা বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ কখনও বৃথা যাবে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমরা কালই যাচ্ছ যখন, তখন আজ রাত্রে এখানেই খেয়ে দেয়ে যাওনা ?"

পান্না বলিল, "তা হয় কি করে ? দেরী হয়ে যাবে যে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তা হলে কিছু জল খেয়ে যাও। যা ত লছমী, কিছু জল খাবারের যোগাড় দেখ ত।"

লছমী চলিয়া গেল। তখন তিন সৈনিকে বসিয়া যুদ্ধের গল্প করিতে লাগিল। বৃদ্ধ সর্দ্দার বলধাম সিং যৌবনে সাহসী যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে গিয়াছেন, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া পদক পাইয়া ছিলেন। আজ যুদ্ধের কথা শুনিয়া সেই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের নয়ন জলিয়া উঠিল।

যুদ্ধের বিষয় গল্পগুজব করিয়া বলরাম সিং অবশেষে বলিলেন, "দেখ, তোমাদের আস্‌বার আগে লছমীর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল কি, যে আমি ছাড়া লছমীর ত এ জগতে কেহ নাই—"

পান্না বলিয়া উঠিল, "কেন, আমি—আমারা আছি।"

বলিয়াই পান্না লজ্জায় মাথা নিচু করিল।

বলরাম আবার বলিলেন, "লছমীও বড় হয়েচে। আমি চাই যে আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাকে একটি ভাল পাত্রের হাতে সমর্পণ করে যাই। তোমরা লছমীকে ছেলে বেলা থেকেই দেখে আসছ—অমন মেয়ে হয় না। ও তোমাদের খুব স্নেহ করে, তোমরাও ওকে ভালবাস, জানি। তোমরা দুজনেই সৎপাত্র। আমার ইচ্ছা হয় যে আমি লছমীকে তোমাদের এক জনের হাতে দিই। তা হলে আমি মরে নিশ্চিন্ত থাকব। আর একটা কথা তোমারা রাগ করতে পাবে না। লছমীরও পছন্দটা আমার দেখা উচিত। কেমন ঠিক কিনা ?"

পান্না বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি আজ লছমীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা সে কিছু বল্লে না, আমিও কিছু ঠিক করতে পারছি না। এ বিষয়ে তোমাদের উপর ভার। তোমাদের আমি ভাল করে জানি বলেই এই ভার দিলাম—"

এই সময়ে লছমী আসিয়া বলিল, "খাবার তোয়ের—খাবে এস।"

বৃদ্ধ সর্দ্দার বলিলেন, "যাও, তোমরা খেয়ে এস, আমি এখানেই আছি। খেয়ে দেয়ে এখানেই এস।"

হীরা ও পান্না যাইয়া খাইতে বসিল, লছমী, পরিবেশন করিতে লাগিল। আজ লছমী 'এটা খেতে হবে, 'ওটা খেতে হবে' বলিয়া আবদার করিল না, পান্না 'এটা খাব না, ওটা খাব না, বলিয়া লছমীর সহিত কলহ করিল না, হীরা মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিবাদ মিটাইবার সুখ উপভোগ করিতে পারিল না। আজ তিন জনেই একটু চঞ্চল, একটু অন্যমনস্ক, একটু গম্ভীর। খানিকক্ষণ কেহ কথা বলিল না। একবার হীরা মুখ উত্তোলন করিয়া সস্নেহে লছমীর দিকে চাহিল। দেখিল যে লছমীর সপ্রেম করুণ, সোদ্বেগ দৃষ্টি পান্নার উপর নিবদ্ধ। হীরা মুখ নিচু করিল।

সেই সময়ে পান্না বলিয়া উঠিল, "বাঃ, কেউ কথা কইবে না দেখছি। লছমী, আমরা"—

লছমী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হাঁ, তুমি—তোমরা ত নাচতে ২ যুদ্ধে চললে—আমি—আমরা এদিকে সবে বসে২ কি করে দিন কাটাব, তা ভগবানই জানেন। পুরুষ কি কঠিন!"

পুরুষ কঠিন কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া লছমী ও পান্নার মত ভেদ হইল। লছমী হীরাকে মধ্যস্থ মানিল। হীরা দুইদিক বজায় রাখিবার একটা মিমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। লছমী বলিল, হীরা পান্নার পক্ষপাত করিতেছে, পান্না বলিল যে সে লছমীর পক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে কথা চাপা দিবার জন্য হীরা বলিল, "আমাদের কি অন্যায়! সর্দারজীকে একা ফেলে রেখে আমরা এখানে মিথ্যা কলহ করছি!"

"অন্যায়ইত!" এই বলিয়া পান্না চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

পান্না চলিয়া গেলে হীরাও তাহার অনুসরণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে লছমী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও, একটা কথা আছে।"

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

হীরার তখন বোধ হইতেছিল যেন তাহার বুকের সমস্ত রক্ত তাহার মুখে ও মাথায় উঠিয়াছে। লছমীর দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহারও গণ্ডদ্বয়, মুখ, কপাল লাল হইয়া উঠিয়াছ।

লছমী বলিল, "হীরা দাদা,—আমি তোমায়—দাদার মত ভক্তি করি; ভাইর মত ভালবাসি"—

হীরার মুখ সহসা শবের মত শাদা হইয়া গেল—হৃদয় স্পন্দন যেন থামিয়া গেল।

লছমী বলিল, "আজ হতে তুমি আমার দাদা—আজ হতে আমি তোমায় দাদা বলে ডাকব। হীরা দাদা,—দাদার কাছে আবার লজ্জা কি?—দাদা, তোমরা যুদ্ধে যাচ্ছ। ওর—তোমার বন্ধুর উদ্দাম প্রকৃতি ত তুমি জান। হয়ত কামানের মুখেই ছুটে যাবে। তুমি—তুমি ওর উপর একটু দৃষ্টি রেখো—"

হীরা বলিল, "আচ্ছা।"

এই বলিয়াই সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সর্দারজীর কক্ষের দিকে যাইতে যাইতে এক গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মনে মনে বলিল, "এত আমার অনেক দিন হতেই বোঝা উচিত ছিল। যাক্! লছমী ত সুখী হবে। পান্নাও সুখী হবে। আমি ওদের সুখে বিঘ্ন হব না।"

(৩)

হীরা পান্না দুই বন্ধু সর্দ্দার বলরাম সিংএর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছাউনীর দিকে চলিল।

কিয়ৎক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। অবশেষে হীরা বলিল, "পান্না, বড় যে চুপ করে ?"

পান্না বলিয়া উঠিল, "দেখ হীরা, লছমীর দুজন স্বামী হতে পারে না"—

হীরা হাসিয়া বলিল, "তা ত পারে না।"

"কিন্তু একজন ভাই, একজন স্বামী হতে পারে।"

"হাঁ, তা পারে"।

"তবে তাই হোক্—একজন স্বামী হবে, আর একজন তাই হবে। লছমীর উপর সমস্ত ছেড়ে দেওয়া যাক্। কেমন ?"

"বেশ।"

"এ নিয়ে আমরা কখনও কলহ করব না।"

হীরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "না।"

* * * * * *

(৪)

আট মাস পরে ফ্রান্সের সীমান্তে একদিনপ্রাতঃকালে জার্ম্মাণ সৈন্য শিখ ও ইংরাজ সংরক্ষিত 'পরিখা' ভীষণ বেগে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গোলা ভয়ঙ্কর রবে আসিয়া ফাটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীন লইয়া জার্ম্মানদের আক্রমণ।

* * * * *

হীরা দেখিল আটজন জার্ম্মাণ পান্নাকে আক্রমণ করিয়াছ। দেখিয়া হীরা নিজ অসি নিষ্কাসিত করিয়া তাহার সাহায্যার্থ বেগে ধাবিত হইল। এক হুঙ্কার ছাড়িয়া দুই তিন লম্ফে সে পান্নার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "পান্না, ভয় নাই—আমি এসেছি।"

পান্না হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কিসের ভয় ! এস, আমরা দুজনে—এ কটাকে শেষ করি।"

দুইজনের বিপক্ষে আটজন। পান্না তিনজনকে হতাহত করিয়া সহসা ভূমিতে পড়িয়া গেল। দেখিয়া হীরা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "পান্না! পান্না !"

কোন উত্তর নাই।

হীরা ভাবিল, পান্না নাই! আমি লছমীকে যে কথা দিয়েছিলাম, তা রাখতে পারলাম না। আমি আর কোন্ মুখে, কিজন্য বেঁচে থাকি"—

হীরা অবশিষ্ট পঞ্চ জার্ম্মাণ-সৈনিককে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। তাহারা হীরাকে ঘিরিয়া ফেলিল। হীরা দুইজনকে পাতিত করিল। সহসা পশ্চাত হইতে এক জর্ম্মাণ তাহার পৃষ্ঠে সঙ্গীন আমুল বিদ্ধ করিয়া দিল। হীরা চীৎকার করিয়া উঠিল, "কাপুরুষ!" তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, হস্ত হইতে অসি খসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * * * *

পান্না চক্ষু মেলিয়া ডাকিল, "হীরা!"

এক সৈনিক বলিল, "তিনি আপনাকে বাঁচাতে যেয়ে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েছেন!"

পান্না বলিল, "বল কি! সাংঘাতিকরূপে আহত! চল, চল, আমায় এখনি তার কাছে নিয়ে চল।"

সৈনিক বলিল, আপনিও আহত হয়েছেন। আপনার ক্ষত বেঁধে দেওয়া হয়েছে—উঠিলে বেশী রক্ত বাহির হতে পারে।

"চুলোয় যাক্ তোমার রক্ত! আমায় এখনি হীরার কাছে নিয়ে চল।"

সৈনিক পান্নাকে হীরার নিকট লইয়া গেল। হীরাকে দেখিয়া পান্না শিহরিয়া উঠিল। হীরার শরীরে যে এক বিন্দুও রক্ত আছে, তাহা বোধ হইল না।

অনতিবিলম্বে হীরা চোখ মেলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "পান্না।"

পান্না বলিল, "এই যে আমি ভাই!"

"ওঃ তুমি বেঁচে আছ! ধন্য ভগবান্! পান্না, শত্রু?"

"শত্রু হটে গেছে, ভাই।"

"পান্না, আমি ভেবেছিলাম—তুমি মরে গেছ। তোমায় জীবিত দেখে—আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হচ্চে—তা বলতে পারি না। আমি ত চল্লাম, পান্না—"

পান্না কঁদিতে লাগিল। হীরা বলিল, "পান্না, ভাই, কেঁদ না। আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছি। যখন দেশে ফিরে যাবে—তখন লছমীকে বলো

যে তোমার মত আমিও—আমি—না, না, আমি তার দাদা—আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি—"

হীরার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হীরা আবার বলিল, "ভাই পান্না, আমার কোটের বোতামগুলো একবার খুলে দাও ত।"

পান্না বোতাম খুলিয়া দিল। জামা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল।

হীরা বলিল, "আমার বুকের উপর—একটা ফটো আছে বের কর ত।"

গলা হইতে সোনার চেনে ঝোলান, সোনার ফ্রেমে আঁটা, এক খানা ক্ষুদ্র ফটো বাহির করিয়া, পান্না দেখিল লছমীর ফটো!

হীরা মৃদু হাসিয়া বলিল, "পান্না, আমি এখন লছমীর দাদা। ওটি আমি তোমায় দিলাম—যত্নে রেখো। আমি ঐ ঊর্দ্ধ থেকে—তোমাদের সুখে সুখী হব—"

হীরা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

* * * * *

(৫)

পান্না সিং আম্বালায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে হীরা সিং নাই! বৃদ্ধ বলরাম সিং যখন মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন তিনি এক গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "হাঁ, অক্ষয় যশই লাভ করিয়াছে বটে। হীরা আমায় আবার পুত্রশোক দিয়া গেল।"

লছমী কাঁদিয়া আকুল হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে নাই।

তিন মাসে পান্নার ক্ষত আরোগ্য হইল। শুভদিনে তাহার সহিত লছমীর বিবাহ হইল।

পান্না ও লছমীর মধ্যে প্রায়ই হীরার কথা হইত। পান্না বলিত, "যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সময়ে অসময়ে যখনি দেখি, হীরা আমার নিকটে। এখন তার কারণ বুঝ্‌তে পারছি। সে তিনবার আমার প্রাণ বাঁচিয়ে, চতুর্থবারে নিজের প্রাণ দিল। তার অভাবে আমার জীবনের একদিক শূন্য হয়ে রইল। মনে হয় আমার ডান হাতটা কেউ কেটে নিয়েছে।"

"হীরা দাদা স্বর্গের জীব, স্বর্গে গেছে।"

নভেলী প্রেম

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি, এস্ সি।

(১)

ব্রহ্মাণ্ডপুরের জমিদার মৃগাঙ্কনারায়ণ চৌধুরী। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে এবং কর্ম্মচারী প্রভৃতির আকৃতিটা বেশ দস্তুরমত স্থূল ছিল। কিন্তু আকৃতি স্থূল ছিল বলিয়া যে সকলের প্রকৃতিও স্থূল ছিল তাহা নহে; কারণ বিধাতাপুরুষ সকল বিষয়েরই একটা সামঞ্জস্য রাখেন, নতুবা তাঁহার সৃষ্টি শৃঙ্খলা সুশৃঙ্খল ভাবে বহিবে কেন?

কথাটি ভাঙ্গিয়াই বলি। মৃগাঙ্কনারায়ণের বংশের দুলালী শরদিন্দুনিভাননীর বাহিরের চেহারাটা যতই স্থূল থাকুক না কেন, ভিতরের বুদ্ধিটা ঠিক সূচের মত তীক্ষ্ণ ছিল। অর্থাৎ এগার বৎসর বয়সে খানকতক উপন্যাস গিলিয়া সে অমনি ধাঁ করিয়া ধরাখানাকে সরার মত আন্দাজ করিয়া লইল;— যথা, পৃথিবী একটা বিশাল প্রেমের রাজ্য, সে নায়িকা, নায়ক কল্পনায় গড়া কোনও রাজপুত্র। সর্ব্বদা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পড়িয়া প্রেমের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে, জ্যোৎস্নাকিরণে মূর্চ্ছা যাইবে, কোকিলের উদাসকরা তান শুনিতে শুনিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে, আর তটিনীর মৃদু কল্লোলের সহিত সুর মিলাইয়া বিরহগীত গাহিবে, গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিবে! বাস্, পৃথিবীতে ইহাই চরম সুখ!

বয়স যত বাড়িতে লাগিল বুদ্ধিও ততই সুতীক্ষ্ণ হইল,—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা বুদ্ধি আরও ভোঁতা হয় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ হয়। অবশেষে একদিন বাসন্তী রজনীতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানস্থ পুকুরের প্রস্তরসোপানে উপবিষ্টা ইন্দুর বুকের ঠিক মাঝখানটায় আম্রশাখাবাসী একটা কোকিলের ডাকে কেমন একটু বেদনা বাজিল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে চাঁদের শোভা দেখিয়া বিভোর হইয়াছিল, কিন্তু এখন মনে হইল সব শূন্য, সব ফাঁকা। ঐ চাঁদ জ্যোতিহীন, সুরভিত মলয়ানিল সৌরভহীন, সুখপূর্ণ সংসার দুঃখময়, বেদনাময়,—আহা! ইন্দুর পদ্মপলাশলোচন হইতে খুব বড় বড় ৩।৪ ফোঁটা

অশ্রুজল নামিয়া রাঙা গণ্ড বাহিয়া সোপানের উপর পড়িল। আর কেহ তাহা দেখিল না, আর কেহ তাহা বুঝিল না। সংসারে কে কাহার বেদনা বোঝে ?—

(২)

যথানুরূপ ভাবে ইন্দুর অন্তরের সহিত বাহিরেও প্রেমের লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পাইল ;—যথা, চোখে জল, বদনে কাতরতা, আহারে অরুচি ও মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস!

বুদ্ধিমতী জননী বুঝিতে পারিলেন এবং যথাসময়ে ব্যাপারটা কর্ত্তার কর্ণগোচর করিলেন। কর্ত্তা বিষম রাগিয়া গেলেন, গিন্নির উপন্যাসের আলমারী পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম করিলেন, এবং বলিলেন, "এজন্য শাস্ত্রকারগণ গৌরীদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ছিলেন,—তাঁহাদের সকল কার্য্যেরই একটা নিগূঢ় অর্থ আছে।"

গিন্নি ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলেন, "তা মেয়ের দোষ কি ? কালিকালে লোকের পঞ্চাশ বৎসর পরমায়ু ; মেয়েরা ত কুড়ি বৎসরে বুড়ি হয়,—তবে বার বছরে মেয়েরা বিবাহের জন্য লালায়িত হইবে আশ্চর্য্য কি ? তুমিই ত নিশ্চিন্ত ছিলে। আমি তাগিদ দিলে বলিতে—ইন্দু এখনও বালিকা।"

কর্ত্তা স্বহস্তে নাক কান মলিয়া বলিলেন "এবার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে,—আজই মেয়ের সম্বন্ধের খোঁজে লোক পাঠাইব।"

কর্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘটক পাঠাইলেন,—গৃহিণী কন্যাকে পুকুরের সিঁড়িতে ফেলিয়া গায়ে সোডা ও ঝিঙের খোসা ঘসিতে লাগিলেন। সারাদিন মুখে ও গায়ে দুধের সর মাখাইলেন ; আলতার রঙে গাল দুটা রাঙা করিয়া দিলেন,—তারপর বেনারসী সাড়ী ও সোণার গহনায় সাজাইয়া ঘরের কোণে বসাইয়া রাখিলেন।

অনেক লোক ইন্দুকে দেখিতে আসিল। কেহ কেহ ইন্দুর রূপ দেখিয়া পিছু হটিল, কিন্তু টাকার লোভে অনেকেই মৌমাছির মত জমিদার বাটী ঘিরিয়া রহিল। জমিদারের সাক্ষাতে বলিত "আহা-হা মেয়েটী সাক্ষাৎ ভগবতী, এমন চেহারা আর হয় না।" অসাক্ষাতে বলিত "বাবারে! একটা ছোটখাট হাতী,—ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলে পাঠাইলে মন্দ হয় না।" কিন্তু টাকার বড় মোহ! একটি মেয়ে,—জমিদার যদি পোষ্যপুত্র না রাখেন তবে ত বাজিমাৎ! অনেকে এই আশায় রহিল।

কিন্তু জমিদার গৃহিনীর পছন্দসই সম্বন্ধ সহজে মিলিল না। রূপে, গুণে, ধনে তেমন বর জুটিল না। অবশেষে অনেক বাছাবাছি ও গৃহিণীর অনেক খুঁৎখুতির পর একটি সম্বন্ধ ঠিক হইল। ছেলেটী এম্ এ পাশ, পি আর এস্ পরীক্ষা দিবে; কিন্তু চেহারা ও অবস্থা রাজপুত্রের মত আদৌ নহে। গিন্নি মত দিলেন, কারণ বরের বাজার যাচাই করিয়া ইহা অপেক্ষা ভাল আর মিলিল না। গিন্নি স্থির করিলেন, জামাতাকে কিছু জমিদারী লিখিয়া দিলে মেয়ের আর কষ্ট হইবে না।

(৩)

যথাসময়ে ইন্দু শুনিল বাপ মা তাহার মস্তক চর্ব্বণের ব্যবহা করিয়াছেন, অর্থাৎ অস্থিচর্ম্মসার, দুর্ভিক্ষপীড়িত এক কালো কুৎসিত পাত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। শুনিয়া তাহার প্রেমের রাজ্যে এক বিরাট ভূমিকম্প উপস্থিত হইল,— কারুকার্য্য খচিত কল্পনার প্রাসাদটা নিমেষের ভিতর ভূমিসাৎ হইল। হায়! ঐ পাত্র কি তাহার প্রেমের রাজ্যের অধিশ্বর হইবার যোগ্য? তাহার কি প্রেমিকের মত রূপ আছে,—না হৃদয় আছে? থাকিবে কোথা হইতে? আজীবন দুঃখ ও দৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, দারুণ দগ্ধোদরের জন্য যে 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া ঘুরিয়াছে তাহার হৃদয়ে কি এক ফোঁটা প্রেম থাকিতে পারে, অভাবের অগ্নিতেও সমস্ত প্রেম বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। হায়! এই কাঙাল কি তাহার হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারে?—অসম্ভব।

উপন্যাসে সে পড়িয়াছে,—প্রেমিকেরা রাজপুত্রের মত সুন্দর হয়,— কল্পনার মত দৈহিক সৌন্দর্য্য, বর্ষার সলিলপুষ্ট তটিনীর মত সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যৌবন উছলিয়া পড়িবে,—প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় সে বাস করিবে,— অট্টালিকার ভিতরে স্বচ্ছসলিলা তড়াগ থাকিবে, মনোরম পুষ্পোদ্যান থাকিবে, তাহাতে নানারকম ফুল ফুটিবে, পুষ্পবৃক্ষে বসিয়া নানাজাতীয় পাখী গান করিবে, আর লতাকুঞ্জের ভিতর সবুজ ঘাসের গদীতে প্রেমিকের কোলে শুইয়া প্রেমের কথা শুনিতে শুনিতে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে। প্রেমিক হাসিলে মুক্তা ঝরিবে, কথা কহিলে বীণার ঝঙ্কার হইবে। এইরূপ প্রেমিকের সহিত সমস্ত জীবন সে একটা প্রেম সাগরের অতল গর্ভে ডুবিয়া থাকিবে,—আর উভয়ের হৃদিতন্ত্রী হইতে একটা প্রাণমাতান সুর জাগিয়া উভয়কে পাগল করিয়া তুলিবে! * * *

কিন্তু হায়! হায়! পিতামাতা একি করিতেছেন! তাহার—এত বড় জমিদার কন্যার বিবাহ, একটা কুরূপ দরিদ্রের সঙ্গে;—যাহার একমুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই, চাকুরীই যাহার ভবিষ্যৎ ক্ষুন্নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তাহাদের বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও ইহাপেক্ষা ধনী। বাপ মা কেন তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিতেছেন! ছি! ছি! কি অপমানের কথা, কি ক্ষোভের কথা,—কি লজ্জার কথা। বাপ মাকে কেমন করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইব? প্রণয় সমানে সমানে হয়, এ সামান্য কথাটাও কি তাঁহারা বুঝেন না?"

ইন্দু যাতনায় দুই হাতে মাথার এক গোছা চুল ছিঁড়িয়া ফেলিল—ইহা স্বাভাবিক!

(৪)

কোনও কোনও প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন—কচি বয়সে হৃদয় নামক ক্ষেত্রটা অত্যন্ত উর্ব্বরা থাকে। এ সময়ে কোনও ক্রমে হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রণয়ের বীজ বপন করিলে উহা দেখিতে দেখিতে বৃহৎ প্রণয়-পাদপে পরিণত হয়। প্রণয়-পাদপ দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং উহা যখন হৃদয়ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন ক্ষেত্রের অধিপতির হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে। কিন্তু ক্ষোভের কথা এই যে, এই বৃক্ষের ফলগুলি প্রায়ই তিক্ত, টক এবং কেবল ক্বচিৎ দু এক স্থানে মিষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই ফল খাইয়া লোকে আজীবন হা হুতাশ করিয়া মরে। তথাপি প্রত্যেক নর নারী কচি বয়সে হৃদয়ক্ষেত্রে এই বৃক্ষের চাষ করিয়া থাকে। এই পাদপ হইতে ভবিষ্যতে কোনও প্রকার সুমিষ্টফল লভিবার আশা তাহারা নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু Botanist গণ research করিয়া দেখিয়াছেন প্রায়শঃই সুমিষ্টফল জন্মে না। * * অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে ঐ পাপবৃক্ষের অঙ্কুর ঔপন্যাসিকগণই অপক্ক বালক বালিকার কচি-হৃদয়ে বপন করেন। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোক শীঘ্রই ইহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ করিবেন শুনিতেছি। যাক্ সে সব কথা।

ইন্দু আলুথালু বেশে জননী সকাশে যাইয়া বলিল "মা একি শুনিতেছি?"

মাতা আহ্নিক করিতেছিলেন, শিবের মাথায় বিল্বপত্র দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কি শুনিতেছিস্?"

"এ সব কিসের আয়োজন হইতেছে?"

"তোর বিয়ের"

ইন্দু মুখ ভেংচাইয়া বলিল "বিবাহের না শ্রাদ্ধের। একটা কালো, কুৎসিৎ ভিক্ষুক ধরিয়া আনিয়া 'বিবাহ' দেওয়া। তা না করে আমার গলা টিপে মেরে ফেল—তোমাদের আপদ্ যাক্।"

মাতার মুখ গম্ভীর হইল। কোশাকুশী রাখিয়া গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন —"তোর ভাল মন্দ কি আমরা বুঝি না? আমি কি তোর সৎ মা?"

"হাঁ, হাঁ আর বোঝা বোঝিতে কাজ নাই। কেন এরূপ করিতেছ! আমি বিবাহ করিব না।"

মাতা কঠোর কণ্ঠে বলিলেন "তোকে বিবাহ করিতেই হবে। হিন্দুমেয়ের আইবুড়ো থাকিবার উপায় নাই।"

"কুলীনের মেয়েরা থাকে।"

"উপায় নাই বলিয়া। আর আমরাত কুলীন ব্রাহ্মণ নই। এমন পাত্র, এম্ এতে প্রথম হইয়াছে, চমৎকার স্বভাব চরিত্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী,—আর শীঘ্রই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবে। একটা ধনী মাতাল জামতা আনিলে ইহাপেক্ষা কি ভাল হইত?"

"তা জানি না, কিন্তু আমি বিবাহ করিব না।"

"উপন্যাস পড়িয়া তোর মাথা বিগড়াইয়াছে। আমোদের কথা শোন্, শীঘ্রই মাথা ঠাণ্ডা হইবে।"

ইন্দু গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মাতা গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন "ঘোর কলিকাল, নতুবা মেয়ে মায়ের কাছে নিজের বিয়ে সম্বন্ধে এমন নির্লজ্জার মত বলিতে পারে! কালে কালে আরও কত কি হইবে।"

(৫)

মহা সমারোহে ইন্দুর সহিত বিষ্ণুচরণের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ আসরে যাইবার পূর্ব্বে ইন্দু দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া, নায়িকার মত রুদ্ধ কণ্ঠে কাল্পনিক প্রেমিকের উদ্দেশে কাঁদিয়া লইল। আসরে যাইয়া একটিবারও স্বামীর দিকে তাকাইল না।

বাসর ঘরে ইন্দু সারারাত্রি বিছানার এক প্রান্তে পড়িয়া রহিল, দুজনার কাপড়ে 'গাঁটছড়া' বাঁধা ছিল, তাই নীচে নামিবার উপায় ছিল না। নবীনা, যাহারা আড়িপাতিয়াছিল তাহারা শুধু অন্ধকারে মশার কামড় খাইয়া ক্ষুণ্ণমনে রাত্রিপ্রভাতে ফিরিয়া গেল।

বিষ্ণুচরণের প্রকৃতিটা আদৌ উপন্যাসের নায়কের উপযুক্ত ছিল না। সে পি আর এস্ ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত,—সে কোনও প্রকার রসাল সম্বোধন দ্বারা নবোঢ়া পত্নীর হৃদয়ক্ষেত্র রসাল করিবার জন্য চেষ্টা করিল না, দিব্য পাশ ফিরিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ইন্দু ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাহার সহিত আলাপ করিবে না। প্রথম রজনী নীরবে কাটিল। তৃতীয় রজনীতে বিষ্ণুচরণ ইন্দুকে সংক্ষেপে নিজ গৃহের কথা বলিল। কিরূপে শ্বশ্রূ শাশুড়ীর সেবা করিবে, কিরূপ ভাবে চলিবে। ইন্দু এই সকল উপন্যাসের বহির্ভূত নীরস কথা শুনিয়া আর একবার গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। হায়! সে কি অভাগিনী!

চতুর্থ দিন বিষ্ণু চলিয়া গেল, ইন্দু কান্নাকাটি করিয়া নিজের যাওয়া স্থগিত করিল। মাতা ভাবিলেন প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে যাইতে কষ্ট হয়—ইহা স্বাভাবিক। কয়েকমাস ইন্দুর বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। কিন্তু সময় সময় চাঁদের জ্যোৎস্নায়, জ্যোৎস্না-স্নাত তড়াগে ও মুকুলিত পুষ্পে সে ঐ কাল্পনিক মূর্ত্তি দেখিতে পাইত,—সে একা একা বসিয়া কাঁদিত,—এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরক্তি জন্মিলে দাস দাসীকে ভৎর্সনা করিত। মাতা তাহাকে এইরূপ কোপন স্বভাবের জন্য তিরস্কার করিতেন,—বিবাহ হইয়াছে,—এরূপ করিলে শ্বশুর ঘর করিবে কি করিয়া?

ইন্দু ছাদে যাইয়া অঞ্চল পাতিয়া শুইয়া থাকিত।

ক'মাস পরে বিষ্ণুর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সে P. R. S. বৃত্তি পাইয়াছে। শ্বশুরালয়ে ধূমধাম লাগিয়া গেল। পাড়ায় মেয়েরা জমীদার বাড়ী মজলিশ্ জমাইয়া শতমুখে জামতার প্রশংসা করিতে লাগিল। ইন্দুর মাতা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। কিন্তু ইন্দু কাঁদিতে লাগিল, শ্বশুর গৃহ হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছে।

ইন্দু মাকে বলিল "সেখানে বামন নাই, পাক আমাকেই করিতে হইবে। কোনও দিন পাক করি নাই, হাতে গরম ফেন পড়িয়া যাইবে, কাপড়ে আগুণ লাগিয়া অনলে জীবন্ত সমাধি হইবে। ঘর ঝাটাইতে হইবে—তাহাতে হাতে ফোস্কা পড়িতে পারে।—ইত্যাদি।"

মাতা বলিলেন "ভয় নাই আমি বামন চাকর সঙ্গে দিব।"

নিরুপায় ইন্দু বলিল "আমি সেখানে যাব না।"

"স্ত্রীলোকের শ্বশুর বাড়ীই সব,—উহাই তীর্থ, উহাই স্বর্গ। বাল্যকালে

বাপের বাড়ী আপনার, কিন্তু বড় হইলে স্ত্রীলোকের শ্বশুর বাড়ী আপনার ঘর, বাপের বাড়ীই পর হয়। তুই যা, প্রথম প্রথম কষ্ট হয়, কিন্তু দুদিন পরে সব ঠিক হইয়া যাইবে,—তখন আর এখানে আসিতে চাইবি না।"

ইন্দুর আপত্তি আর টিকিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুর বাড়ী গেল।

(৬)

শ্বশুর বাড়ী যাইয়া ইন্দুর পায়ে গরম ফেন পড়িল না, হাতে ফোস্কা হইল না, কাপড়ে আগুনও লাগিল না,—তাহার শ্বশুর বড় মানুষ না হইলেও মধ্যবিৎ গৃহস্থ, গৃহে বামন চাকর ছিল।

কিন্তু তথাপি ইন্দুর বিদ্রোহী মনটা শান্ত হইল না, উপন্যাসের প্রভাব তাহার মস্তিষ্কে বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রেমিকের জ্যোৎস্নার মত রূপ, স্বপ্ন-রাজ্যের ভিতর মণিমাণিক্যের প্রাসাদ, ইত্যাদি। শাশুড়ী বধূর ভাব দেখিয়া বিস্মিতা ও শঙ্কান্বিতা হইলেন। বড় সাধ করিয়া তিনি জমিদার গৃহ হইতে বধূ আনিয়াছিলেন, কিন্তু এখন মনে হইল সমানে সমানে কাজ না হইলে সুখের হয় না।

তিনি নানাপ্রকারে বধূকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্ক বধূকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। বধূকে গৃহকর্ম্ম করিতে দিতেন না, নানাপ্রকার সুস্বাদু আহার্য্য তৈয়ার করিয়া দিতেন, কিন্তু বধূ তাহাতে সন্তুষ্ট হইত না।

বিষ্ণু বিষম রাগিয়া গেল। বুঝিল ধনিকন্যা অহঙ্কার বশতঃ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছে।

শ্বশুরকে সংবাদ দিয়া পত্নীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিল। শাশুড়ীকে লিখিল "আপনার কন্যা যদি কোনও দিন শ্বশুরবাড়ী বাসের উপযুক্ত হয় তবে তাহাকে গ্রহণ করিব, নতুবা এই শেষ। শ্বশুর গৃহ আর তাহার পিতার কর্ম্মচারীর গৃহ এক নহে, অনেক চণ্ডালেরও যথেষ্ট অর্থ থাকে। হৃদয়ের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বই লোককে প্রকৃত বড়লোক করে। ঈশ্বরানুগ্রহে আমি অর্থের জন্য লালায়িত নহি, শ্বশুরের বিপুল বিভব দেখিয়া আমি পত্নীর আজ্ঞাবহ হইব না। মাই আমার সব, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। তিনি বলিয়াছেন এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন, ইহার ভিতর বধূর যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে গ্রহণ করিবেন, নতুবা এই শেষ।"

ইন্দুর মাতা ইন্দুকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা বলিলেন এমন

কন্যাকে দূর করিয়া দাও। এরূপ কুলকলঙ্কিনী কন্যা থাকিলেই বা কি, মরিলেই বা কি ?”

ইন্দু নীরবে কাঁদিতে লাগিল।—

বৈকালে কর্ত্তা ও গিন্নি অনেক পরামর্শ আঁটিলেন। বাড়ীর উপন্যাস ও বাজে গল্পের বহি সব পোড়াইয়া ফেলা হইল। তৎস্থলে একটি কক্ষের আলমারী পৌরাণিক গ্রন্থ, সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, বেহুলা পদ্মিনী ইত্যাদি আদর্শ নারীচরিত্র গ্রন্থে ভরিয়া ফেলা হইল। কক্ষের দেওয়ালও ঐ সকল পৌরাণিক মূর্ত্তিতে পূর্ণ করা হইল।

সন্ধ্যার সময় ইন্দুকে সেই ঘরে পোরা হইল। পাড়ার সমবয়স্কাদিগের সহিত তাহাকে মিশিতে দেওয়া হইত না,—একটি প্রাণীও তাহার সহিত দেখা করিতে পাইত না। কেবল মাতা দুবেলা তাহার আহার্য্য দিয়া আসিতেন।

কক্ষের জানালা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—সুতরাং বাহিরের কোনও দৃশ্য ইন্দু দেখিতে পাইত না। ক'দিন সে ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিয়া কাটাইল।

মাতা বলিলেন—“পাজী মেয়ে তুই, লোককে মুখ দেখাতে চাস্ কি করে, লজ্জা করে না ? তোর ব্যবহারে শাশুড়ী তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে,—তোর কি মুখ দেখাবার যো আছে ? আমাদেরও নাক কান কাটলি। বংশের কলঙ্ক তুই। যখন পাড়ার লোক এসে বল্‌বে ইন্দু এখানে কেন, তখন কি জবাব দেব। বাপের বাড়ী থাক্‌তে চাও, বেশ থাক,—মজা করে ঘরে বন্ধ হয়ে থাক। তুমি ত লোকের কাছে মুখ দেখাবার জো রাখ নাই। বেশ ত কোনও কাজ কর্ম্ম নাই,—পাক করিতে হইবে না, হাতে গড়ম ফেন পড়িবে না, কাপড়ে আগুন ধরিবে না,—মজা করিয়া বসিয়া খাও। আলমারীতে বই আছে পড়। বাস্, বেশ দিন যাইবে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে আমার, বেশ সুখে থাক।”

মাতা দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দু ঘরের মেঝে কাঁদিতে বসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া আলমারী খুলিল,—ছেলেবেলা হইতে উপন্যাস গিলিয়া সে বহির পোকা হইয়াছিল, উপন্যাস পাইলে খুব দুঃখের সময়ও যে সে শান্তিলাভ করিত।

(৭)

ইন্দু চক্ষু মুছিয়া বহি লইয়া বসিল। এরূপ নিঃসঙ্গজীবন ক'দিন বহন

করা যায়। আজ কয়েক দিন সে এই গৃহে আবদ্ধ, একটী প্রাণীর মুখ দেখিতে পায় নাই। সময় আর কাটিতে চায় না,—তদুপরি জননী এক একবার চামুণ্ডার মত আসিয়া তাহাকে হতভাগিনী, কুলকলঙ্কিনী কালামুখী বলিয়া তিরস্কার করিয়া যান,—স্নেহময় পিতা একবারও দেখিতে আসেন না।

প্রাণধারণোপযোগী যৎসামান্য আহার মাতা দুবেলা দিয়া যান মাত্র!

দিনের বেলায় এই কক্ষ অন্ধকার। ইন্দু বাতি জ্বালিয়া বহি পড়িতে লাগিল। সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতির অত্যাশ্চর্য্য স্বামিভক্তির কথা পড়িয়া মনে যেন কেমন একটু ভাল লাগিল। কৈ তাহারা ত পুষ্পকুঞ্জে বসিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে প্রেমের স্বপ্ন দেখিত না, কল্পনায় মন গড়া প্রেমিক করিয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া থাকিত না,—রাজার মেয়ে দরিদ্র স্বামীর জন্য কত না কষ্ট স্বীকার! অপূর্ব্ব সতীত্ববলে মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়াছে। বেহুলা মৃত গলিত স্বামী লইয়া নদীতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইয়া অবশেষে তাঁহাকে বাচাইয়াছে,—আশ্চর্য্য—সতীর এমন প্রভাব! সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী, পদ্মিনী আশ্চর্য্য ইহাদের জীবন. ধন্য ইঁহারা, ইহাদের কথা পড়িলে আপনা আপনি মনের ভিতর কেমন ভাব জাগে। এরূপ কাহিনী ত আগে পড়ি নাই। আগে কি ছাই ভস্ম পড়িয়াছি। হায় হায়! অমৃত ফেলিয়া আমি গরল পান করিয়াছি, আমার উপায় কি হবে? * * *

ইন্দুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাব জাগিল। স্বামী হইতে এতদিন দূরে দূরে থাকিতে চাহিত, স্বামীকে ঘৃণা করিত—কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি যেন আজ তাহার সমস্ত হৃদয়টা উলট পালট করিয়া দিয়াছিল।

ইন্দু আজ বুঝিল, নারীর স্বামীই সব, স্বামীই দেবতা, ইহ পরকালের সর্ব্বস্ব। উপন্যাস অলীক,—গাজাখুরি গল্প, কতকগুলি লোকমজান মনগড়ান কাহিনী। হায়! এমন দেব তুল্য স্বামী পাইয়া সে চিনিতে পারে নাই। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়া অমন দরিদ্রকে পতিরূপে গ্রহণ করিল, আর সে কি করিল?— ইন্দুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্তরাত্রি সে বহি পড়িল, আর কাঁদিল। রাত্রিশেষে হঠাৎ একটা বহির ভিতর স্বামীর একটা ফটো পাইল। ভিক্ষুক যেমন বহুমূল্য মণি পাইলে অতীব ব্যস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া কুড়াইয়া লয়, ইন্দুও তেমনি

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া স্বামীর ফটোখানি হাতে লইল। আলোর কাছে ধরিয়া তাহা কতবার দেখিল, কতবার তাহা মাথায় স্পর্শ করাইল, কতবার বক্ষে ধরিল, কত কাঁদিল। হায় বুদ্ধির দোষে সেকি করিতে কি করিয়াছে,—তাহার গতি কি হইবে? স্বামী কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? যদি না করেন? ইন্দুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শেষরাত্রিতে সে স্বামীর ফটো বুকে ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলা যখন মাতা আসিলেন, ইন্দু বলিল "মা, আমাকে ডাক কাগজ এন্‌ভেলাপ দাও।" মাতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহি ও ইন্দুর মুখ দেখিয়া সমস্ত বুঝিলেন। তিনি হাসি লুকাইয়া কাগজ, এন্‌ভেলাপ আনিয়া দিলেন।

ইন্দু জীবনে প্রথম স্বামীসম্ভাষণ করিতে বসিল। হৃদয়ের আবেগে কত কি লিখিল, কতবার চোখের জলে দৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিল, কতবার অশ্রুজলে অক্ষর মুছিয়া গেল। নিজের জীবনের কাহিনী অকপটে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর নিকট লিখিল,—অমন প্রাণস্পর্শী ভাব, অমন হৃদয় ঢালা প্রেম ইন্দু কোথায় পাইল কে জানে? লিখিয়া, কাঁদিয়া, এন্‌ভেলাপে পুরিয়া ইন্দু চিঠিখানা মায়ের হাতে দিল,—তাহার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ইন্দুর মাতাও জামাতাকে একবার আসিতে লিখিলেন।—

দুদিন পর বিষ্ণু আসিল,—আসিয়া শ্বশুর শাশুড়ার পদধূলি গ্রহণ করিল,—শাশুড়ী তাহাকে ইন্দুর ঘরে দিয়া আসিলেন।—

ইন্দু স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া নয়নজলে তাহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিল। বিষ্ণু তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল।

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১৮)

সেদিন স্বামী সহ গাড়ী হইতে নামিয়া পিতৃভবনে প্রবেশের পথে ললিতমোহনকে দেখিয়া সরসীর হাসিভরা মুখখানা হর্ষভরে দ্বিগুণ হাসিয়া উঠিতে না উঠিতেই সম্মুখের দরজার উপরে একটা আদালতের পিয়াদা দেখিয়া একেবারে ছাই-সাদা হইয়া গেল। ললিতমোহনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গোড়ায় উৎসাহরূপ জল সেচনে সরসী নিজেই যে বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ সেই অঙ্কুর মহামহীরুহে পরিণত হইয়া বিষবৃক্ষের মত তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যেন একটা তীব্র বিষের হল্কা ঢালিয়া দিল। একমুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরক্ষণেই দ্রুতপদে সাম্‌নের ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হস্তেঙ্গিতে ললিতমোহনকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি একটা নোটের তাড়া হাতে দিতে গিয়া ভীতিকম্পিতস্বরে বলিল—"নিন্, এ দিয়ে বিধবার ঋণটা শোধ করে দেবেন।"

ললিতমোহন এক পা সরিয়া দাঁড়াইল, স্পর্শমাত্রে দগ্ধ হইবার ভয়েই যেন হাতখানা টানিয়া লইয়া সঙ্কুচিত চাহনিতে চাহিতেই সরসী সহজ-স্বরে বলিল—"এতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, আপনার কাজ আপনি কচ্ছেন, বাপমার জন্যে আমাদেরও ত একটা কর্ত্তব্য রয়েছে।"

"আগে থেকেই এ তোমার বোঝা উচিত ছিল সরসী।" বলিয়া ললিত-মোহন মুখ নত করিতেই সরসী দুঃখিতভাবে বলিল—"আপনি কিন্তু বৃথাই দুঃখ কচ্ছেন ললিতবাবু!"

"আর এ তিরস্কারই বুঝি তোমার উপযুক্ত হচ্ছে?"

সরসী আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, স্বর খাট করিয়া এবার সে কহিল

—"ললিতবাবু, আপনি ভুল বুঝ্ছেন, তিরস্কারের কথা ত এর মধ্যে কিছু নেই; পিতার ঋণ, মেয়েই কি শোধ কত্তে পারে না।"

"সেত আগেও পাত্তে, এত ঝঞ্ঝাটেই কি দরকার ছিল; আর আমিও যে এ টাকাটা দিয়ে দিতে পারি না, এমনত নয়?"

"তবে তাই, আপনিই দিয়ে দেবেন, আমরা মেয়েমানুষ,—দুর্ব্বল, মুখে যাই বলি, চোখের ওপর বাপ মার এত নিগ্রহ ত সহ্য হয় না।" বলিয়া নোটের তাড়াটা যথাস্থানে রাখিতে যাইতেই নিখিলেশ ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"না ললিত, সে ত হবে না, ভালবাসার ওসব হেঁয়ালী আর খাট্ছে না, নিয়ে নাও টাকা। তোমার বড় আপনার বিধবা সে, সরসীর টাকা দিয়েই তার ঋণ শোধ কত্তে হবে।"

ললিতমোহনের চোখের দুইকোণ ভিজিয়া জল বাহির হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা রোধ করিয়া সে নিখিলেশের হাতখানা টানিয়া আনিয়া বলিল—"অন্যায় যদি হয়েই থাকেত মাপ্ কর্‌িস ভাই?"

নিখিলেশ কথা বলিল না, তাহার অপমানাহত বিবর্ণ মুখ ক্রমেই যেন পাংশু হইয়া পড়িতেছিল। সে আস্তে আস্তে হাতখানা টানিয়া লইতেই দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ললিতমোহনের চোক বাহিয়া ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িল। স্নেহপ্রবণস্বরে সরসী বলিল—"আমি বল্‌ছি, ললিতবাবু, টাকাটা আপনিই দিয়ে দেবেন।"

ঝঙ্কার দিয়া নিখিলেশ দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—"সাবধান সরসী, সব কথায় কথা কৈতে এস না। যা নয় তাই বল্‌ছ।"

"অন্যায় করে থাকি আমায় গালমন্দ কত্তে পারিস্, সরসীকে কেন?" বলিয়া ললিতমোহন আবারও নিখিলেশের হাত ধরিতে যাইতেই নিখিলেশ হাত সরাইয়া লইল। ললিতমোহন কোঁচার কাপড়ে চোক মুছিয়া বলিল—"তবে যাই সরসী?"

নিখিলেশ উত্তেজিতস্বরে বলিল—"না সেত হবে না, নে যাও টাকা।"

সরসী স্বামীর কাছ ঘেসিয়া বিনীতভাবে বলিল—"এত জেদই বা কেন? এতে ললিতবাবু কি কষ্টটা পাচ্ছেন—"

নিখিলেশ এবার দ্বিগুণ চটিয়া উঠিয়া গায়ের জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল—"আবারও নেকামি কচ্ছ, লাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছ দেখ্‌ছি।"

কালমুখে সরসী সাম্‌নের চৌকীটার উপর অবশের মত বসিয়া পড়িল। ললিতমোহনেরও অসহ্য হইয়া‌ উঠিয়াছিল, নিখিলেশের এই অতিরিক্ত অনুরক্তিটা চিরদিনই সে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। তবু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"হ্যারে ওবেলা যাস্‌নি ত আমার ওখানে। দোষ হয়েই থাকেত, তার জন্যে যা তোর বল্‌বার তাকে বল্‌বি, অমন মুখ কাল করে থাকিস্‌নি কিন্তু?"

"না এবার আর তোমার ওখানে যাবার সময় হবে না।" বলিয়া নিখিলেশ হন্‌ হন্‌ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

সরসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—"এবার আপনি বাসায় যান, জানেন ত কাজ কত্তে হলে এমন অনেক ঘাড় পেতে নিতেই হয়।" বলিয়া সেও উপরে উঠিতেই কে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"বড় না, আপনার লোক তোদের ললিতবাবু, তাই বুঝি এ ভাবে আপনার পরিচয় দিচ্ছে।"

(১৯)

নিখিলেশের আচরণটা ললিতমোহনকে একেবারে পথহারা করিয়া ফেলিল, জীবনে সে অনেক সহ্য করিয়াছে, নিখিলেশের আচরণে অত্যাচারে একবার টলিয়াছে ত আবার [illegible] করিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে। আজ আর যেন সে পারে না, সেও ত মানুষ, ভাবনাভরা মনের রাশ ছাড়িয়া দিয়া [illegible] মুখ গুজিয়া পড়িয়া সে কেবলই ভাবিতেছিল, [illegible]? সবাই যদি একবার মানুষ বলিয়া একটা অনুকূল কটাক্ষ [illegible] করিতেও কৃপণতা করিল, তবে আমিই বা কেন ভিখারীর [illegible]রের দোরে ঘুরিয়া বেড়াই, পৃথিবীর লোক ত দিতে জানে না, [illegible] আশা পূর্ণ হইবে না, ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া রিক্ত হস্তে [illegible]ও হাত পাতিবে, ইহাতে অপবর্গ আছে কি না তাহা সে জানিত না, যশ, মান, খ্যাতি বা ভালবাসার যে লেশও নাই, তাহা আগাগোড়া ঘটনার উপর নিখিলেশের সেদিনের ব্যবহারটাই জলন্ত প্রমাণ লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতটা ভাবিয়াও দিন দুই যাইতে না যাইতেই কিন্তু দারুণ অশান্তিতে সে আবার কেমন হইয়া পড়িল, দুইদিন পরেই ললিতমোহন আবার নিখিলেশের কথা, সরসীর কথা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল। এত অভিমান এত অশান্তির মধ্যেও নিখিলেশ তাহার উপর রাগ করিয়া

থাকিতে পারিবে না, এই ভরসা আরও দুই তিনটা দিন তাহাকে কোনমতে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিল। হায় আশা, নিখিলেশ ত আসিল না, তাহার স্নেহসান্নিধ্যে ললিতমোহনও আর বাচে না। জল ছাড়িয়া মাছ যেমন বাঁচিতে পারে না, হাঁড়ি ফেলিয়া দিলে ভাত যেমন পচিয়া যায়, ললিতমোহনও তেমনই হইয়া উঠিল। অভিমানের উপর ঘা দিয়া কে যেন তাহাকে ক্রমেই কাতর করিয়া তুলিল, পূর্ব্বস্মৃতিগুলির জ্বালায় অস্থির হইয়াও মান অভিমান সমস্ত ভুলিয়া ললিতমোহন প্রাণের দায়ে নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ী গিয়া হাজির হইল। নীচ হইতে নাম ধরিয়া ডাকিতেই কে একজন কর্কশ কণ্ঠে উত্তর করিল—"জামাইবাবু ঘুমিয়েছেন, তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না, অমনি চেচিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গাবেন না যেন।"

হায় ললিত, কণ্টকাকীর্ণ কূপ দেখিয়া শীতল জলের আশায় যাও ত, ফলত মিলিবেই না, বরং রক্তের প্রবাহ বহিবে। ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর অঙ্কুরিত অভিমান বেদনাভরে অবজ্ঞার ডালি উপহার লইয়া প্রবল আঘাত করিল! এই অভাবনীয় উত্তর আকাশপাতাল ব্যাপী একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা করিয়া দিল, ললিতমোহনের হৃদয় নিখিলেশের বিরুদ্ধে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে নিখিলেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে, ইহা নিশ্চয় মনে করিয়া অগ্নিদগ্ধ মানুষের মত সে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আবারও বাসায় আসিয়াই পড়িয়া রহিল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তবু সে আর নিখিলেশের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিবে না, প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে কিন্তু সত্যই প্রাণান্ত হইয়া উঠিতেছিল, অবশেষে যখন আর পারেই না, তখন সরসীকে একখানা চিঠি লিখিয়া দশ পনর দিন হা করিয়া জবাবের জন্য পথপানে চাহিয়া থাকিয়াও যখন কিছুই মিলিল না, না জল না ফেন, না একবিন্দু মেঘের সঞ্চার, না অমৃত না বিষ কেবল একটা খালি পাত্র, যাহা, তাহার ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা না করিয়া সে তল্পীতল্পা বাঁধিয়া রাত্রির ট্রেনে বাড়ীতে রওনা হইয়া পড়িল। নিখিলেশের অবজ্ঞাটা কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ভার বোঝা হইয়া তাহার সঙ্গেই চলিল, তবু তাহাকে সে ভুলিবে, তাহাতে সংসার ত্যাগ করিতে হয়, সেও স্বীকার প্রাণের দাবদাহ আশ্রয়ের সহিত দগ্ধকরে সেও আচ্ছা। জল না পাইয়া মনে মনে সে ঘোলের সন্ধানে প্রিয়ম্বদার নিকট শুষ্ককণ্ঠ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

বেলা ৩টা বাজিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহন দেখিল, প্রিয়ম্বদা

উপাধানহীন মস্তকে শয্যার এক পাশে অসাড়ের মত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ রুক্ষ চুলের রাশি আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িয়া দুরদৃষ্টের পরিচয় দিতেছিল, শরীর কেমন নিষ্প্রভ ম্লান, বেদনাভার মুখের উপর জানালা গলাইয়া দিনের আলোটা যেন উপহাস করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অনুতাপদগ্ধ ললিতমোহনের হৃদয় আজ এই অসহায়া চিরঅবজ্ঞাতা প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়া ক্রন্দনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঘর ছাড়িয়া পরের দোরে দোরে ঘুরিয়া অমৃতের জন্যে হাত বাড়াইয়া সে যে শুধু বিষই লাভ করিয়াছে, একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া মাথার গোড়ায় হাত দিতেই ললিতমোহন শিহরিয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদার চক্ষুজলে শিক্ত শয্যা মনের উপর একটা ভার—কলঙ্কের দাগ দিয়া দিল, অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রিয়ম্বদার বিরহক্ষীণ দেহযষ্টি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কপোলে কবোষ্ণ চুম্বন করিতেই প্রিয়স্পর্শে সুপ্তোত্থিতা প্রিয়ম্বদা মনের উপর একটা নব-বসন্তের পরিপূর্ণ সম্ভারের শিহরণ অনুভব করিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দুঃখজড়িতস্বরে বলিল—"তবু ভাল, এদ্দিন পরে মনে পড়েছে। কেন আর কি কোন কাজও ছিল না!"

সময়ে একের একটা সাধারণ আঘাতেও মানুষের মনের উপর এমনই একটা ভাব, এমনই একটা ভাবনা, অব্যক্ত বেদনার পসরা লইয়া চাপিয়া বসে, যাহার জোরে মানুষ আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া কাছের গোড়ায় কিছুই পায় না, না শূন্য, না ধূলিকণা, না তৃণখণ্ড, কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে চাহে না, শূন্যে অনন্ত শূন্য, মর্ত্তে অগণ্য অভাব—অপরিমিত হাহাকার যেন তাহাকে জড়াইয়া ধরে। অভাবের মধ্যে হাহাকারের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া সে যখন দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত অবজ্ঞা বা অপমানদিগ্ধ অন্ধ চক্ষু লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন, তাহার কাছে যেই আসুক, যাহাই উপস্থিত হউক, তাহাকেই সে সজোরে জড়াইয়া ধরে, যেন কেহ ছিনাইয়া কাড়িয়া না লয়, তাহারই মধ্যে প্রাণের বেদনা ঢালিয়া দিয়া একবিন্দু সুখেরও প্রত্যাশা করে। তাই জীবনের বন্ধন, প্রাণের আধার, পৃথিবীর সার নিখিলেশ ও সরসীর নিকট হইতে এতবড় আঘাতটা পাইয়া ললিত-মোহন চিরশুষ্ক কণ্ঠ লইয়া প্রিয়ম্বদাকেই মহামূল্য রত্ন মনে করিয়া পূর্ণ উচ্ছ্বাসে প্রেমের ডালি, ভালবাসার পসরা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, গাঢ় আলিঙ্গনে মনের ব্যথা ঢালিয়া দিতে গিয়া ললিতমোহন অব্যক্ত কণ্ঠে

বলিল—"না, আর ত আমি কাজ কাজ করে ঘুরে বেড়াব না প্রিয়ম্বদা, ওষে কল্লে আর ফুরোতে চায় না।"

"সে আমার বরাত" বলিয়া বিষাদখিন্ন চাহনীতে একবার চাহিয়া উঠিতে যাইতেই ললিতমোহন আবারও তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া মূকের মত সেই কাল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"চল, হাত পা ধোবে।"

প্রিয়ম্বদার মাথা ক্রোড়ে টানিয়া আনিয়া ললিতমোহন বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিল—"সে হবে'খন।"

প্রিয়ম্বদা স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"নিখিলবাবু কেমন আছেন?"

প্রদীপ্ত অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিল, হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ললিতমোহনের হৃদয় দাউ দাউ করিতেছিল, সে মুহূর্ত্তের জন্য প্রিয়ম্বদাকে ভুলিল, জগৎ ভুলিল, সংসার তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল, কেবল নৃত্য করিতে লাগিল, নিখিলেশের অবজ্ঞাভরা মুখখানা। প্রিয়ম্বদা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি অত ভাব্‌ছ, তাঁরা ভাল আছেন ত? সরসীর খবর কি?"

"সে কথা আর কেন প্রিয়ম্বদা, আমিত তাদের ভুল্‌তে বসেছি?" বলিয়া ললিতমোহন নিজের বুকটায় হাত দিয়া জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল।

প্রিয়ম্বদা বিস্মিত হইয়া গেল, বলিল—"তার মানে?"

"মানে আবার কি, তারা যদি আমার বাড়ী মাড়াতেও অপমান মনে কল্লে, আমিই বা এমন কি দায়ে পড়েছি, যে হাত কচ্‌লাতে যাব।"

প্রিয়ম্বদা দেখিল, ললিতমোহন কাঁদিয়া ফেলিতেছে, বুঝিল, ইহা অভিমান নহে, অন্তর্দাহ, সে ঠাণ্ডা করিবার জন্য গোছাইয়া লইয়া বলিল—"দোষত তোমারও কম নয়, একেবারে ক্রোক নিয়ে হাজির।"

ললিতমোহন আগুন হইয়া উঠিল। বলিল,—"দোষ আমার, কেন, সরসী ত তখন জোর করে বলেছিল, যেক'রে হয় টাকাটা আদায় কত্তেই হবে।" বলিয়া একবার থামিয়া, আবার দ্বিগুণ উত্তেজনার সহিত বলিল—"ও সব ন্যাকামি, আমি আর জানি না, ও শ্বশুরবাড়ীর গোলাম, তাদের পান থেকে চূণ সরে গেছে কি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌বেন আমি বলেই না এতকাল সহ্য করে নিয়েছি।" বলিয়াই ললিতমোহন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবারও বলিল—"এদ্দিনে জেনেছি, পর কখনও আপন হয় না, নৈলে ও-বারে এক দিনের জ্বরে নিখিল কিনা আমার বাসা ছেড়ে চলে গেল।"

প্রিয়ম্বদা দেখিল, আগুন ধরিয়াছে, ইহার মুখে যাহা দিতে যাইবে, তাহাই দগ্ধ হইবে ; সে এতগুলি কথার উত্তরে সাহস করিয়া একটা কথাও বলিতে পারিল না, ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বলিল—“নয় ত করেছিই একটা দোষ, তা বলে আমার ছায়া মাড়ালেও কি প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হত ? দেনা ও না পাওনা সম্বন্ধে আমায় দু'ট মন্দ কথা কইতে কে তাকে বারণ করেছিল ? শেষটা মান অভিমান সব ভাসিয়ে দিয়ে নিজে গেলুম, দেখাটা কল্লে না, সরসীকে চিঠী লিখ্‌লুম, একবার একটা জবাব ও দিলে না।”

প্রিয়ম্বদা অন্য প্রসঙ্গ উঠাইতে গিয়া বলিল—“লীলা কেমন আছে ?”

লীলা তখন দরিয়ায় ভাসিতে ছিল, ললিতমোহন অসম্বন্ধ ভাবে বলিতে লাগিল—“আচ্ছা ধরই না, ওবার জ্বরের সময় ও যখন চলে যায়, তখন কি আমায় একবার জিজ্ঞেসা কল্লে, না, তাতে ওর কোন দোষ হল না, আমারও কোন কষ্ট হয় নি ! কেমন ? আর যারা নিয়ে গেল, তাদের আক্কেলটা একবার দেখ, আমায় একেবার জিজ্ঞেস কল্লে না, যেন তারাই সব, আমি কেউ নৈ। আরে কোথায় ছিলি তোরা, তোরা কি জানিস্ আমি এদের জন্যে কি করেছি !”

“করেছ বেশ হয়েছে, করে নাকি আবার নিজের মুখে মানুষ তা বলে।” বলিয়া প্রিয়ম্বদা থামিতেই ললিতমোহন হতাশ হইয়া বলিল—“আমিই এমন কি বলেছি, আর যা করেছি ওদের, তা কি কেউ বল্‌তেই পারে, আমি না থাক্‌লে কোথায় থাকত ওর এত সুখ, সরসীর অসুখ দেখে ওর বাপমাত ওকে বে দেবে বলেছিল, আমি ছাড়া কেউ পেরেছিল, তা রোধ কত্তে, তার পর সেবার ওর ভাই মারা গেল, রোগের নাম শুনে কাছে কেউ ঘেস্‌লে ? ওর শালা, ঐ বিভূতিবাবু, যে এখন বড় আত্মীয় হয়েছে, সেত কাজের নাম করে কল্‌কাতা ছেড়ে সটান দৌড়।”

প্রিয়ম্বদা এবার ললিতমোহনের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—“নাও, আর ও কথায় কাজ নেই, সারাটা দিন গেছে, মুখে জলটুকু দাও নি, চল চান্ করবে।”

ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া বলিল—“তুমিও ত জান না প্রিয়ম্বদা, নিখিল আমার কে, সে আমার কতখানি।” বলিয়া অবশের মত প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

[২০]

"দিন দিন তুই একি হয়ে যাচ্ছিস বল্ দিকি ?"

"কেন মা ?"

মাতা করুণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"এই তিন তিনটা ,মাস তোর খাওয়া নেই, পড়া নেই, যেন মুষ্ড়ে যাচ্ছিস, গলার হাড় উঠে পড়েছে, চোখ বসে গেছে। রাতে বাড়ী মাড়াস না, এ কেমন ধারা বাপু!"

সুবোধ মনে মনে বলিল—"আমি যে কি হয়ে গেছি, সেত আমিই জানি, আর এর জন্যে ত কাউকে অনুযোগও কত্তে পার্‌ব না। নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছি, তার ওষুধ আর কে যোগাবে, বিষ যখন খেয়েছি, তখন বিষে বিষেই আমার শেষ হতে হবে।"

সুবোধকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধা মাতা এবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—গৃহস্থ ঘরে এমন ঝগড়া বিবাদ সেত হয়েই থাকে, তারি জন্যে একেবারে বাড়ী ছেড়েছিস্, লোকে যাতা বল্‌ছে, শুনে আমার রাতে ঘুম হয় না, প্রাণ চম্‌কে ওঠে, আমার বংশের একছেলে তুই, তোর কেন এমন মতি হল বাপ!"

সুবোধ আবারও ভাবিতে ছিল, ঘরে ঘরে বিবাদবিসম্বাদ সেত হয়, সেও এমন অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু সেখানেত সপত্নীদ্বেষের পূর্ণতা নাই, বিষ উদ্গীরণ করে এমনও কেউ নাই, সুবোধ হয়ত সে ঝগড়া বিবাদ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত, এ যে সহ্যের বাহিরে। ললিতা ঝঙ্কার দিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল—"ওগো রাজরাণী, মায়ে পোয়ে দাঁড়িয়ে গল্প কল্লেত ভাত জুট্‌বে না, রেঁধে খেতে পারত যাও, আমিত কারু রাঁধুনী গিরি কত্তে পার্‌ব না, বড় গিন্নীত অসুখের নাম করে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন।"

বৃদ্ধা মাতা পুত্রবধূর প্রতি কটাক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"না বৌমা, তোমায় রাঁধ্‌তে হবে না, আমি রাধ্‌ব'খন ?"

সুবোধ আবারও মনে মনে বলিল—"সাধ করে কি আমি আর গোল্লায় গেছি, মানুষ হয়ে আর কেউ পারৃত, আমার মত সহ্য করে বেচে থাকৃতে ? মদ ধরেছি, বেশ করেছি, সেত তবু অনেকটা ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে। বেশ্যা সেওত আমায় এর চেয়ে আদর করে, মান্য করে। তবে আর কি, কোন মতে ক'টা দিন কেটে গেলেই হল।" তার পর মাতার দিকে চাহিয়া কহিল—"যাও মা, যদ্দিন বেঁচে আছ, ঝীচাকৃরাণীর কাজ করে নাও, আমার জন্যে

ভেব না, আমি বেশ আছি, মনে ক'র তোমার ছেলে সুবোধ মরে গেছে।" বলিয়াই সে আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

পাঁচ সাত দিন সুবোধের আর কোন খোজ খবরই ছিল না, লীলা রোগক্ষীণ দেহে শয্যায় পড়িয়া ভাবিতেছিল, তাইত কেন আমি এখানে আসিলাম। আমার উপস্থিতিতেই ত স্বামী এতকষ্ট পাইতেছেন, কষ্টে কষ্টে নিজের চরিত্র পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়া একেবারে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছেন। হায় আমি মরি না কেন? আমি মরিলেই ত সব গোল, সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাইত; ইহারা যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল, তেমনই থাকিতে পারি ত; সহসা তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা, একবার একটু উঠে বস, সন্ধ্যে হয়েছে।"

লীলা অতিকষ্টে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল—"মা একেবারেই যে কোন খবর নেই, কাউকে দিয়ে একটা খবর যদি করাতে পাত্তে। আমি যে পড়ে পড়ে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি।"

মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"সে চেষ্টাই কি আমি কম কচ্ছি, কৈ কোন খোজ ত পাচ্ছি না।"

সহসা পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সুবোধ বাড়ী ঢুকিয়া ললিতার গৃহে প্রবেশ করিল।

ললিতা শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল, অনেক দিন পরে সুবোধকে দেখিয়া সে গায়ের ঝাল তুলিয়া লইবার জন্য তীব্রস্বরে বলিল—"মা যেতে লিখেছেন, আমায় রেখে এস, এখানে আমিত আর তিষ্ঠাতে পাচ্ছি না।"

সুবোধ জামা ছাড়িতে ছাড়িতে রুক্ষ স্বরে উত্তর করিল—"কে তোমায় এখানে থাকতে অনুরোধ কচ্ছে ললিতা, যাও না, তা বলে আমি কিন্তু রেখে আস্‌তে পার্‌ব না।

ললিতা কান্নার সুরে সুবোধের মনের উপর তীব্র আঘাত করিয়া বলিল—"সেত আমি জানি, আমিই তোমাদের যত আপদ।

সুবোধ ধীর স্বরে বলিল—"সুখ আমার বরাতে নেই ললিতা, যদি থাকৃতই তবে বুঝি আমি তোমায় ভালবাসতাম না, আর এমন গোল্লায়ও যেতে হত না, তোমার ভালবাসা যে আমায় দগ্ধ না করে ছাড়ে না।' দেখ, আমায় ত বাড়ী ছাড়া করেছ, তবে আর কেন, থাকই না, যদি কখনও এ মুখ

হই ত তোমাদের দেখেও আমার মনে হবে, আমিও একদিন মানুষ ছিলাম।"

সুযোগ পাইয়া ললিতা এবার একবারে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"আমিই তোমায় বাড়ী ছাড়া করেছি, না? তা কাজ নেই আমার এখানে থেকে, যারা ভালমানুষ, তাদের নিয়েই তুমি সুখে থাক।"

"কেন জানি তা হয় না, সত্যি বলতে কি ললিতা, তুমি যেন কি গুণ জান, দোষ সে ত লীলার কোন দিন আমি দেখতে পাইনি, তোমার মুখেই যা শুনেছি, তবু কেমন আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না, তুমি তাপও দাও, আকর্ষণও কর, এই টানাহেচড়ার মধ্যে পড়েই ত আমায় গোল্লায় যেতে হয়েছে। জানত লীলা আসা থেকে তুমি কি ব্যাভারটা করেছিলে, যদি অতটা বাড়াবাড়ী না কত্তে, তবু বুঝি এতটা অধঃপাতে যেতাম না।"

ললিতা আস্তে আস্তে সুবোধের হাত ধরিয়া বলিল—"সব দোষই আমার, আমি স্বীকার কচ্ছি, আচ্ছা একবার চেয়েই দেখ, ভাল মানুষটির কাজ, এই দুধের ছেলে, ওকে মেরে ত হাড় গুঁড় করছে, তার-পর একটা ইট ছুড়ে বুকটা একেবারে বসিয়ে দিয়েছে।" বলিয়া দিন তিনেক আগের আছাড়ের ঘাটা সুবোধকে দেখাইয়া দিল।

সুবোধ আর সহ্য করিতে পারিল না, দুষ্টা লীলা যে তাহার সাক্ষাতে ভালমানুষটি সাজিয়া অবসর পাইলেই এসব নানা অন্যায় কাজ করে, ললিতার নিকট নানাভাবে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও সে মায়ের প্রতিকূলতায় আজ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিতে পারে নাই, এবার সে একেবারে ক্ষিপ্তের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া মধ্য পথে বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মাতা স্নেহপ্রবণস্বরে বলিলেন—"সুবোধ, আজ কিন্তু তোকে বাড়ী থাকতে হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুবোধ উত্তর করিল—"মা, তোমরা কি আমায় বাড়ী থাকতে দেবে, না সে ইচ্ছা তোমাদের আছে, এই দুধের ছেলেটাকে খুন কল্লে, এতে কি তুমিই কিছু বলেছ, না আমায় কিছু বলতে দেবে।"

বিস্ময়ে আকাশ হইতে পড়িয়া মাতা বলিলেন—"সে কি বাছা, খোকাকে আবার কে মাল্লে রে।"

"কে মেরেছে, তুমি যেন কিছুই জান না, ইট মেরে যে বুকে ঘা করে দিয়েছে, তার দাগটাত এখনও যায় নি।"

"ওঃ হরি" বলিয়া মাতা একবার থামিয়া আবার বলিলেন—"কেউ ত মারে নি রে, খোকা নিজেই যে আছাড় পড়ে ঘা করেছে।"

"রাক্ষসীর কথাটা একবার শোন" বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার বলিল—"এমন ডাইনিই এসে হাজির হয়েছে, বাছাকে না খেয়ে আর বেরুবে না।"

সুবোধ তটস্থ হইয়া উঠিল। আর যেন সে শুনিতে পারিল না, কেবলই ভাবিতে লাগিল, সে ললিতাকে কোনপ্রকারেই ভুলিতে পারে না কেন, মদের নেশার উপরও যে তাহার প্রতিকৃতি সুবোধের হৃদয়ের উপর ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। ললিতা যতই অত্যাচার করুক, কেহইত তাহাকে ভুলাইতে পারিতেছে না। হায় দুর্ব্বল মন, তোমার অকার্য্যত জগতে নাই। ভাবিয়া কূলকিনারা না পাইয়া সুবোধ নিজের মনে নিজের গন্তব্যপথেই বাহির হইয়া পড়িল।

(১১)

লীলা যখন রহিয়াই গেল, তখন ললিতা ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া দিন রাত্রি কথার ঝড়ের মধ্যে নিজের কূটবুদ্ধির প্ররোচনায় এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া উঠাইল যে, তাহার দাপটে লীলা তটস্থ হইয়া পড়িল, সুবোধও দুই তিন মাস কোনপ্রকারে চোক মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া যখন একেবারে সহ্যের বাহির হইল, তখন দুর্ব্বল আত্মসুখ-পরায়ণ মন লইয়া একেবারেই মানুষের বাহির হইয়া পড়িল, আত্মচরিত্র, বা মর্য্যাদা কোন দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সে উচ্ছন্নের পথ বরণ করিয়া লইল। এক দিকে ললিতা, অন্যদিকে মা, মধ্যস্থানে লীলা ও সুবোধ যেন জাতায় পেষিত হইতেছিল! লীলা সে পেষণ কোন রকমে সহ্য করিল, সুবোধ পারিল না, তত ধৈর্য্য তাহার ছিল না, বিশেষ ঘরে থাকিতে হইলে ললিতাকে ছাড়িয়া কেন যেন সে তিষ্ঠিতেই পারিত না। অথচ ললিতার ব্যবহার যে ক্রূর সর্পের অপেক্ষাও খল। সে ভাবিয়া পাইল না, এই আকর্ষণের বাহিরে গিয়া কি করিয়া সে ললিতার ব্যবহারের হাত এড়াইবে। তার পরে যখন মানমর্য্যাদা লোপ পাইল, মুখ দেখান ভার হইল! তখন সে আর ভাবিল না, শক্তি হারা হইয়াই যেন ধাতুদ্রব্যের মত ছড়াইয়া পড়িয়া একেবারে কাজের বাহির হইয়া গেল।

ললিতার উপস্থিতির দিন পনর পরে সে দিন সন্ধ্যাবেলায় সুবোধ সারা

দিন খাটিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ঝগড়া বিবাদ সেত অনবরতই হইতেছিল, তাহার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না, সে আশাও সে করিত না! কিন্তু এতদিনের মধ্যে, এত কাণ্ডের মধ্যেও কৈ ললিতাকে ত সে পরাস্ত দেখে নাই, শত অনুনয় বিনয় করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তবে আজ এ কান্না কেন? সুবোধ ললিতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত; শত সহস্র অপরাধেরমধ্যেও তাহার দুঃখ দেখিলে সে উন্মাদ হইয়া উঠিত। সেই প্রাণপ্রিয়া ললিতার চোখে জল দেখিয়া সে পৃথিবী অন্ধকার দেখিল, তাড়াতাড়ি ললিতাকে ধরিয়া তুলিয়া দীন বচনে একটু ব্যঙ্গস্বরেই জিজ্ঞাসা করিল—"একি ললিতে? তুমি যে বড় কাঁদছ?

ললিতা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ, আজ যদি এর ব্যবস্থা না করত আমি বিষ খেয়ে মর্‌ব, তা তোমায় বলে রাখ্‌ছি।"

সুবোধ অবাক্ হইয়া গেল, একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিল—"কিসের ব্যবস্থা ললিতে, তোমরা ত সমান লড়্‌ছ, কেউত আর আমার কথা শুন্‌বে না, তবে আবার আমায় কেন?"

ললিতা গর্জ্জিয়া বলিল—"কিছু যদি নাই কর ত আজই আমি মাথা খুড়ে মর্‌ব। ও মাগী যে আমায় যা তা বল্‌বে, ঐ বেশ্যা মাগীর পাতের এঁটো পর্য্যন্ত খেতে দেবে, তা'ত আমি সইতে পার্‌ব না।"

সুবোধ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—"ছিঃ ললিতা, তিনি যে আমার মা, তোমার গুরুজন, তাঁকে কি এভাবে কোন কথা বল্‌তে আছে।"

"না আমিত আর কোন কথা বল্‌তেও চাইনি, আমায় বিষ এনে দাও, খেয়ে মরি।" বলিয়া আবারও কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সুবোধ গলিয়া গেল, সে ললিতার ব্যবহার যতই দেখিতেছিল, ততই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেও সে জানে না, কেন সে একমুহূর্ত্ত ললিতার কথা ভুলিতে পারে না,, তাহার চোখে জল দেখিলে প্রাণ হাহাকার করিয়া ওঠে, পৃথিবী অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। ললিতা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা পাথরের খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া বলিল—"বল এই সন্ধ্যে বেলা, তোমায় জিজ্ঞেস কচ্ছি; এদের তুমি তাড়াবে কি না? নৈলে এখনই নিজের মাথায় নিজে পাথর বসিয়ে দেব।"

সুবোধ তাড়াতাড়ি ললিতার হাত ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিল—"ললিতে,

আজকের মত মাপ কর, আমি মাকে বুঝিয়ে বলে দেখি, তিনি যদি নাই শোনেনত তখন যা হয় করব।"

পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। সেদিন রাত্রিতে সুবোধ পাঁচ সাত জন বন্ধু লইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার মুখ চূণ হইয়া গেল। ললিতা রণরঙ্গিণীবেশে একটা ঝাঁটা লইয়া শ্বশ্রূকে মারিতে যাইতেছিল। সুবোধ আর দেখিতে পারিল না, আত্মসংযম রক্ষারও উপায় ছিল না। সহসা দৌড়িয়া হাতের ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইয়া সপাং সপাং করিয়া ললিতার পিঠে ঘা কত বসাইয়া দিতেই তাহার এক বন্ধু আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল "আহা কি কচ্ছ সুবোধ বাবু, ছিঃ, মেয়ে মানুষের গায়ে নাকি হাত তুল্‌তে আছে ?"

সুবোধ আর দাঁড়াইল না, কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না, এক দৌড়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সটান গঙ্গার পথ ধরিল। কিন্তু গঙ্গায় ত সে যাইতে পারিল না, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যও তাহার সিদ্ধ হইল না। সে যে আপনাকে বড় ভালবাসিত, মরিলে ছিল ভাল, কিন্তু সে সাহস তাহার নাই, সুবোধ পথের পার্শ্বে একটা গাছতলায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। সহসা সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর গাঢ়তা কাটিয়া দিয়া গবাক্ষপথে বামাকণ্ঠনিঃসৃত ললিত-গীতধ্বনি বাহির হইল, অমৃতের মত সুবোধের প্রাণের উপর অনেকদিন পরে আজ একটা তৃপ্তি আনিয়া দিল, সে আর ভাবিল না, ভাবিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না, ধীর গতিতে সেই দোতলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুধাভ্রমে গরলের আশ্রয় লইল। ক্রমে সুবোধ বাড়ী আসা বন্ধ করিল। ললিতার জন্য মন যখন পাগল হইত, তখন সে মদ খাইত। তাহারই জোরে বিস্মৃত থাকিতে চেষ্টা করিত, যেদিন নিতান্ত পারিয়া উঠিত না, সেদিন সে মুহুর্ত্তের জন্য একবার ললিতাকে দেখিতে আসিত, কিন্তু হায় যেখানে সে শীতল সুপেয় জলের আশায় আসিত, সেখানে আসিয়া কেবল অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে যে সে আর তিষ্ঠিতে পারিত না, আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িত ; এমনই অবস্থার মধ্যে যেদিন সে ছেলের বুকের ঘা দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িল, তাহার দুইমাস পরে সেদিন সে দুপুরে বাড়ীতে ঢুকিল, সেদিন মদে সে বেশ জমাট হইয়া আসিয়াছিল, তবু যেন বাড়ীর চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভীত হইল, প্রলয়ের পূর্ব্বেকার প্রকৃতি যেন নিথর নিশ্চল হইয়া তাহাকে আক্রমণ

করিতে আসিল। সুবোধ ধীরে ধীরে ললিতার ঘরের দরজায় ঘা দিতেই ভিতর হইতে ললিতা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো আমি কোথায় যাব গো, আমার বাছাকে যে খুন কর্ত্তে আসছে।"

সুবোধ বিস্মিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—"কি বল্‌ছ ললিতা, আমি সুবোধ ?"

ঝনাৎ করিয়া দোরটা খুলিয়া গেল, ললিতা যেন ভয় পাইয়া কাঁপিতে-ছিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"কে তুমি এসেছ, দেখ তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাছাকে বাচাও।"

"সেকি ললিতা, খোকার কি হয়েছে, মা কোথায়।"

"তোমার মা তাঁর বোনের বাড়ী গেছেন। ওগো ঐ ডাইনি যে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ আমার ছেলেকে কাট্‌বে, তবে ছাড়্‌বে, পাঁচ সাতবার একটা দা নিয়ে ধেয়ে এসেছিল, দোর বন্ধ করে কোন মতে আমি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি।"

সুবোধ আজ নেশার ঘোরে ললিতার কান্নামিশ্রিত প্রতি কথাটি ইষ্টমন্ত্রের মত মনে মনে গ্রহণ করিয়া লইল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না। দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে লীলার ঘরে গিয়া তাহার চুলের মুঠা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিল—"তবে রে হারামজাদি, এত নষ্টামি তোর, বের হ তুই আমার বাড়ী থেকে।"

আকাশের কোণে যে এক ক্ষুদ্র মেঘ খানা উঠিয়াছিল, তাহা এখন বৃহদাকার হইয়া ঠাণ্ডাবাতাস দিতেছিল, লীলার শরীর ভাল ছিল না, সে একটা লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল. এতকাণ্ড সে কিছুই জানিত না, এখানে আসিয়া অবধি সে চোখের জলের সহিতই দিন কাটানই তাহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শাশুড়ীর অনুকুলতায় এতদিন এমনটা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ তাহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছিল, সহসা সুবোধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সে বুঝিতে পারিল না, কি বলিবে, সুবোধ লীলাকে নীরুত্তর দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া চুল ধরিয়া তাহাকে একেবারে দাঁড় করিয়া লইয়া টানিতে টানিতে বাটীর বাহিরে আনিয়া নিজে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল। লীলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, তাহার দুর্ব্বল শরীর এই আঘাতে একেবারে চেতনা হারাইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

ঘরের লক্ষ্মী।

লেখক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১২)

প্রত্যূষের চা পান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রফুল্লনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া আর একখানা চেয়ারে পা তুলিয়া দিয়া গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থিত মারবেল টেবিলের উপর রক্ষিত অর্দ্ধ-পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালা হইতে বিন্দু বিন্দু ধুঁয়া বহির্গত হইয়া তাহা যে এখনও সম্পূর্ণ শীতল হইয়া যায় নাই তাহারাই প্রমাণ দিতেছিল। আজ প্রফুল্লনাথের সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উপর চিন্তার একটা মসীরেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ বাবুর সহিত তাঁহার মাতার গত রাত্রে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে সে সংবাদ তিনি রাত্রেই পাইয়াছেন, হরিচরণ বাবু যে শোভার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছেন, সে কথাটাও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি সেই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। কথাগুলা যতই তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন; ততই তাঁহার অনুশোচনায় সমস্ত প্রাণটা যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল শুধু একটুখানি তাঁহারই ভুলে, কাল তাঁহার মাতাকে এমনভাবে অপদস্থ হইতে হইয়াছে। তিনি তো জানিতেন শোভার সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের উত্তাপ মাত্র সাধারণ বন্ধুত্বের রেখা ছাড়িয়া কত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। শুধু একটুখানি লজ্জার জন্য, সেটুকু পূর্ব্বে প্রকাশ না করিয়া তিনি যে তাঁহার সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিনী মাতার সহিত; এমন কি নিজের সহিত পর্য্যন্ত কপটতা করিয়াছেন। পূর্ব্বে সেইটুকু প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তো আজ এরূপ অপদস্থ হইতে হইত না। এইত কাল পর্য্যন্ত প্রফুল্লনাথ হরিচরণের পরিবারের বাহিরে ছিল, আজ সেই বাহিরেই রহিয়াছে। শুধু একটুখানি মেলামেশা,—শুধু গলাগলি আপসের জন্য একটুখানি বন্ধুত্ব, তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনিই

রহিয়াছে। কিন্তু তবু একি প্রভেদ! সেই বাহির আজ এমন শূন্য কেন? তাঁহার পূর্ব্বের জীবনেরতো কোন ক্ষতিই হয় নাই। তাঁহার চির আদরিণী ভগ্নি নীহার, তাঁহার চিরস্নেহময়ী মাতা বিন্দুবাসিনী সকলেই তা আছে। তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মাছকে যেন ডাঙ্গায় টানিয়া তোলা হইয়াছে। সে যেদিকে চাহিতেছে সব শূন্য, কোথাও যেন তাহার জীবনের অবলম্বন নাই। এই রাশি রাশি সৌধ্য-শিখর পরিবেষ্টিত জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্রই প্রফুল্লনাথ নিজের জীবনের একটা ছায়াময় পাণ্ডুর বর্ণ সর্ব্বনাশের চেহারা দেখিতে লাগিলেন। এই বিশ্বব্যাপী গুরুভার, শূন্যতায় তিনি যেন নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কেন এমন হইল, কি করিয়া এমন হইতে পারে, কিসে ইহা সম্ভব হইল, সেই কথাটাই তিনি একটা হৃদয় হীন নিরুত্তর শূন্যের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ইতি মধ্যে ভৃত্য আসিয়া কখন যে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা তিনি মোটেই জানিতে পারেন নাই, সহসা তাঁহার স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি একেবারে চমকিত হইয়া ফিরিয়া বসিলেন। বাবুকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়া সে বলিল, "বাবু বিশ্বনাথ বাবু এসেছেন?"

"বিশ্বনাথ বাবু" প্রফুল্লনাথের দেহের সমস্ত রক্ত যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "যা, বলগে যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রফুল্লনাথ চায়ের পেয়ালার বাকি চা টুকু শেষ করিবার জন্য মহাব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মানুষের প্রাণের রহস্য অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন, বিশ্বনাথের নাম শুনিবা মাত্র প্রফুল্লনাথের হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বনাথ শোভা সম্বন্ধেই যে কিছু বলিতে আসিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে কি জানিবার জন্য প্রফুল্লনাথ মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কোন ক্রমেই চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বিশ্বনাথ বাহিরের ঘরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া প্রফুল্লনাথের অপেক্ষায় মহা উদ্‌গ্রীব ভাবে বসিয়াছিল। প্রফুল্লনাথকে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহাব্যস্তভাবে একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে প্রফুল্লনাথ ভায়া, আমি একবার তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই?"

প্রফুল্লনাথ অতি বিনীতভাবে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বসুন বসুন, উঠে দাঁড়ালেন কেন? আপনি মার সঙ্গে দেখা করবেন, তার আমায় বলবার কি আছে! বসুন আমি এখনি মাকে খবর দিচ্ছি?"

চেয়ার ছাড়িয়া যে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন সেটা বিশ্বনাথের মোটেই খেয়াল ছিল না। প্রফুল্লনাথের কথায় সে একবারে ধপাস করিয়া চেয়ার খানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথ যেন জোর করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? হঠাৎ মার কাছে আপনার আসার কি দরকার হ'লো। সত্যই কি আমার মার সঙ্গে আপনার কোন দরকার আছে?"

বিশ্বনাথ সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সজোরে একটা আঘাত করিয়া বলিলেন, "অতি অবশ্য আছে। একজন নিজের হাতে দড়ি পাকিয়ে নিজের গলায় দিতে চায়। আমি সেইটেই জোর করে বাধা দিতে চাই।"

প্রফুল্লনাথ একটু বিস্মিত ভাবে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি রকম, তাতে আমার মা কি কর্ব্বেন?"

"অতি অবশ্যই কিছু একটা কর্ব্বেন।" বিশ্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন সেটাকে আর কিছুতেই কণ্ঠের ভিতর আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। মহাব্যস্তভাবে একেবারে প্রফুল্লনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভায়া, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি সে সব বুঝবে না। তুমি ভায়া একটু শিগ্‌গির তোমার মাকে একবার খবর দাও। আমার যা বক্তব্য আমি তার কাছে নিবেদন করি। আমার আর কিছুতেই সবুর সইছে না।"

বিশ্বনাথের ব্যস্ততা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আবার তাহাকে কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথ বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আর কোন কথায় কাজ নেই। এই যে বল্লুম ভায়া তুমি সে সব বুঝিবে না। যাও যাও একবার চটকরে তোমার মাকে একটু সংবাদ দাও।"

কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "তাহ'লে চলুন উপরে?"

প্রফুল্লনাথ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বনাথ মহাব্যস্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একেবারে আসিয়া প্রফুল্লনাথের শয়নকক্ষে উপস্থিত

হইলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তাহ'লে আপনি এইখানে একটু বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।"

বিশ্বনাথ একখানা গদি আটা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিল, খুব ভালো। হাঁ ভায়া তুমি যাও, আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই, তোমার বাড়ী, এ যে আমার নিজের বাড়ী। "তোমার মা, তিনি যে আমারও মা!"

(১৩)

বিন্দুবাসিনী পূজায় বসিয়াছিলেন; প্রফুল্লনাথ পূজার ঘরের দরজায় চৌকাটের বাহিরে চটিজুতা খুলিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "মা বিশ্বনাথ বাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

বিন্দুবাসিনী কথা কহিলেন না, ইঙ্গিতে পুত্রকে বসিতে বলিলেন। পূজার ঘরটী সমস্ত আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধান। ঘরখানা প্রশস্ত, বিন্দুবাসিনীর স্বহস্তে ধৌত হওয়ায় পাথরগুলা দর্পণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। প্রফুল্লনাথ সেই মেজের উপর তাঁহার মাতার নিকট হইতে নিজেকে বেশ একটু পৃথক রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিন্দুবাসিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেবীর জপ করিতে লাগিলেন, অস্থির চিত্তে প্রফুল্লনাথ মায়ের অপেক্ষায়, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুত্রকে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধ হয় বিন্দুবাসিনী তাঁহার নিত্য পূজা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছিলেন। অঞ্চলে গলবেষ্টন করিয়া সেই মেজের উপর তিন চার বার মাথা ঠুকিয়া শেষ প্রণামটা শেষ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাতাকে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিতে দেখিয়া প্রফুল্লনাথ আবার বলিলেন "মা, তোমার পূজো শেষ হয়েছেত, এখন চল একবার বিশ্বনাথ বাবু একবার তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

বিশ্বনাথকে না দেখিলেও শোভার মুখে তাহার নাম বিন্দুবাসিনী বহুবার শুনিয়াছিলেন। সেই বিশ্বনাথ সহসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় কেন? বিন্দুবাসিনী এ 'কেন'র ভাল মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে বিশ্বনাথ, এই আমাদের হরিচরণের বন্ধু?"

প্রফুল্লনাথ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "আমার সঙ্গে তাঁর কি দরকার? তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান কেন?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "কেন যে তা আমি বল্‌তে পারি নি মা। সেই 'কেন' যে কি, সেইটাই তো তোমায় বলবেন বলেই ডাকছেন।"

"চল।" বিন্দুবাসিনী পূজার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাতাকে উঠিতে দেখিয়া প্রফুল্লনাথও তাড়াতাড়ি পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া চটি জোড়াটা পায়ে দিলেন।

কাল রাত্রি ইহতে বিশ্বনাথের প্রাণের ভিতর মহীরাবণের যুদ্ধ চলিতেছিল, "কথা দিয়ে ফেলেছি কি করে ফেরাই বল" এই কথাটা হরিচরণের মুখ হইতে ঘুচাইতে না পারিয়া রাগের ধমকে কাল রাত্রে সে হরিচরণের মুখের উপর যা তা বলিয়া, তাহার বাড়ীতে আর জীবনে কখন আসিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে রাত্রে স্থির করিয়াছিল পরের জন্য আমার এত মাথা ব্যথার প্রয়োজন কি? আমি আর হরিচরণের কোন কথায়ই থাকিব না। কিন্তু করিব না বলিলেই যদি মানুষ না করিয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখই ঘুচিয়া যাইত। তাহা হইলে মানুষকে আর পদে পদে দুঃখ ডাকিয়া আনিতে হইত না। বিশ্বনাথের কথাও ঠিক তাহাই হইল। ক্রোধের মাত্রাটা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেটাই মনে হইতে লাগিল, এক রত্তি মেয়ে শোভার অপরাধ কি? সে তাহার রাগের, শুধু একটা নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কেন কষ্ট পাইবে? তাহার সহিত তো তাহার কোন বিদ্বেষ নাই। সে যে শোভাকে নিজের খোকার চেয়েও অধিক স্নেহ করে। না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, সে কিছুতেই দুর্লভ বাবুর পুত্রের সহিত শোভার বিবাহ দিতে দিবে না। যে উপায়ে হউক প্রফুল্ল নাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতেই হইবে। নানা চিন্তায় প্রবল তাড়নায় অনিদ্রায় কোন ক্রমে সে রাত্তিরটা অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষেই প্রফুল্ল নাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেমন করিয়া হউক বিন্দুবাসিনীর হাতে পায়ে ধরিয়া শোভার বিবাহের একটা কিনারা করিবে। একটা হেস্ত নেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ তাহার চঞ্চল প্রাণটাকে আর কিছুতেই সুস্থির করিতে পারিতেছিল না। একাকী বিন্দুবাসিনীর অপেক্ষায় শূন্য গৃহে চেয়ারের উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে গৃহের ভিতর পায়চারী আরম্ভ করিয়া দিল।

জননীকে লইয়া প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ বাবু মা এসেছেন?"

বৈদ্যুতিক কলে যেন বিশ্বনাথের দেহটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের সম্মুখে বিন্দুবাসিনী। তিনি পূজার ঘর হইতে বরাবরই একেবারে পুত্রের সহিত পুত্রের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে তখনও সেই পূজার গরদের কাপড়, কণ্ঠে ফটিক ও তুলসীর মালা। বস্ত্রের অঞ্চল মস্তক ঢাকিয়া কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছে। কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা। এই বয়সের এই বাঙ্গালীর পবিত্র মাতৃমূর্ত্তির প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের যেন মনে হইল যেন আদ্যাশক্তির মায়ের এক সেবিকা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। আনন্দে ও ভক্তিতে বিশ্বনাথের প্রাণটা যেন একেবারে পবিত্র হইয়া গেল। সে কিছুতেই আর তাহার নিজের মাথাটাকে খাড়া রাখিতে পারিল না; সেটা যেন মায়ামন্ত্রে একেবারে মাটিতে নুইয়া পড়িল। সে সেইখানেই মেজের উপর মাথা ঠেকাইয়া বিন্দুবাসিনীকে একটা প্রকাণ্ড প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "মা, হরিচরণের কথায় একেবারেই কাণ দেবেন না। আমি শোভার সঙ্গে প্রফুল্লনাথের বিয়ে দেব, দেখি হরিচরণ কি করে তা আটকায়। কথা দিয়ে ফেলেছি বল্লেই অমনি কথা দেওয়া হ'লো। একি ছেলেখেলা। না তা কিছুতেই হবে না। এতে যা হবার হক। আমি শুধু এই কথাটাই আপনাকে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ বিয়ে আমি দেবই। শুনুন্ মা আপনি যদি সহায় থাকেন আপনার যদি উৎসাহ পাই তবে আমি দুর্লভ ফুর্লভ মিত্তিরকে গ্রাহের মধ্যেই আনি না। এখন শুধু আপনার একটু অভয়বাণী শুনলেই আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক কর্ত্তে পারি।"

বিশ্বনাথের কথায় প্রফুল্লনাথের প্রাণের সমস্ত তার গুলা একেবারে এক সঙ্গে অভিমানের জ্বালায় তীব্র কশাঘাতে হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠিল। জননীকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তিনি উত্তর দিলেন, "সে কি করে হবে। হরিচরণ বাবু যখন কথা দিয়াছেন তখন আর সে কথা আমাদের তোলাই উচিত নয়—"

উত্তেজনার ধমকে বিশ্বনাথের কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল, "ভায়া তুমি চুপ কর। আমার যা কর্ত্তব্য আমি আমার মার কাছে নিবেদন করেছি। আমি তাঁর কাছে উত্তর শুন্‌তে চাই। মা অভিমান করো না, দুঃখীর উপর অভিমান করে দেখ যেন অভিমানের মর্য্যাদা নষ্ট না হয়।"

বিশ্বনাথ আর কথা কহিতে পারিল না, আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ়

হইয়া আসিল। সে কেবল একটা মিনতি পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দুবাসিনী ঘরের সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, মা কখন মেয়ের উপর অভিমান করে! হরিচরণ যে আমার নিজের ঠাকুরপোর চেয়েও বেশী; তার উপর কি আমার অভিমান সাজে? আমার ঘরে শোভার আসন চিরকালই শূন্য থাকবে। সে যখনই আসতে চাইবে আমি তখনই যে তাকে কোলে ক'রে তুলে নেব! কিন্তু তাব'লে সে যে তার বাপের সমস্ত অভিসম্পাৎ মাথায় করে নিয়ে আসবে, তা আমি কেমন করে সহ্য করবো। বাবা ভগবানের উপর তো জোর চলে না। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হক; নিশ্চয়ই তাতে মঙ্গল হবে। আমার গলায় তুলসীর মালা রয়েছে, আমি ঠিক কথা বলিছি অন্তর্য্যামি জানেন এতে আমার কোন অভিমান নেই।

বিশ্বনাথ মহা উদ্‌গ্রীব ভাবে বিন্দুবাসিনীর কথাগুলা শুনিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে, হিন্দু গৃহ যাহাদের পুণ্যে, সৌন্দর্য্যে, প্রেমে মধুর ও পবিত্র হইয়া উঠে, সেই নারী প্রকৃতি বিন্দুবাসিনীর মূর্ত্তিতে পরিস্ফুটই হইয়া তাহাকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

গল্পলহরী

৪র্থ বর্ষ, { পৌষ ও মাঘ ১৩২৩ } ৯ম, ১০ম সংখ্যা

লক্ষ্যহীন

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(২২)

নিখিলেশের তীব্র আঘাতটা অভিমানের রূপ ধরিয়া শল্যের মত প্রতি দিন প্রতিসন্ধ্যায়ই যে ললিতমোহনের হৃদয়ের উপর সবল আক্রমণ করিতেছিল, তাহার হাত এড়াইতে গিয়া ঝড়ের পূর্ব্বের স্তব্ধ প্রকৃতির মত সে আর বেশী দিন মুখ বুজিয়া হাতপা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না, একটা কিছু কাজ ত তাহার চাই, যাহার ব্যস্ততায় অন্ততঃ দু'টা দিনও সে ভুলিয়া থাকিতে পারে। তাই সেদিন ভোর বেলায় রৌদ্রের মৃদু-স্নিগ্ধ-স্পর্শে প্রকৃতি যখন হাসিতেছিল, মন্দবায়ু যখন জানালাপথে প্রবেশ করিয়া শরীর মন পবিত্র ও শীতল করিয়া দিতেছিল, তখন প্রিয়ম্বদাকে আপন অঙ্কে টানিয়া আনিয়া সে বলিল—"আমি আজগে কৃষ্ণগঞ্জে যাচ্ছি প্রিয়ম্বদা, জান ত সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলুম।"

একয় দিনের ব্যবহারে প্রিয়ম্বদাও বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, নিখিলেশ ও সরসীকে ভুলিয়া তাহার স্বামীকে যদি বাচিতেই হয় ত এমন একটা অবলম্বনই দরকার, যাহা তাহাকে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে রাখিতে পারে। নিখিলেশের চিন্তায় ললিতমোহন যে দিন দিনই একে-

বারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, হাহাকার দীর্ঘশ্বাসেই তাহার দিনরাত্রি অতিবাহিত হইতেছে, কত দিন ধরিয়া প্রিয়ম্বদার সুখশান্তির জন্য ললিতমোহন ব্যগ্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেও প্রিয়ম্বদা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, প্রিয়ম্বদাকে দিয়া ললিত-মোহনের বিন্দুমাত্র শান্তি বা শোয়াস্তি নাই, তাহার হৃদয়ের আগুন নিবাইতে সাহায্য করিবে এমন একবিন্দু জলও যেন সে প্রিয়ম্বদার নিকট হইতে লাভ করিতে পারে না। এতটা বুঝিয়াও প্রিয়ম্বদা মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"সে নয় দশদিন পরেই হবে, আর কটা দিন বাড়ীতেই থাক না, এমন ভাগ্য ত আমার আর হয় নি?"

চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন বলিল—"বাড়ীতে ত এখন কোন কাজও নেই প্রিয়ম্বদা, এ অবসরে ঐ কাজটাই সেরে আসি।"

মাথা নীচু করিয়া স্মিত হাস্যে প্রিয়ম্বদা বলিল—"মোটের মাথায় একটা কিছু চাই, ঘরে ত আর মন টেকে না।"

"এতে ত না বল্‌বার যো নেই, সত্যকে যদি ঢাকতেই হয় ত সেখানে যে একটার যায়গায় সহস্র মিথ্যাকে দাঁড় করিয়ে নিতে হবে। নিখিলেশকে ত কোন রকমেই ভুল্‌তে পাচ্ছি না।"

প্রিয়ম্বদা মৌন হইয়া রহিল, তাহার দুরদৃষ্ট যেন উপহাস করিয়া বলিল—"অধিকারের দাবীতে ত কিছুই জোটে না, দাবীকে প্রমাণ কত্তে পাল্লে তবেই জানি মহাজন।" ললিতমোহন কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে প্রিয়ম্বদাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিল—"সেখানে আমিত আর বেশী দেরি কচ্ছি না, দু'চার দিনেই কাজ সেরে চলে আস্‌ছি।"

প্রিয়ম্বদা ম্লান মুখে যেন ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া উত্তর করিল—"আশাকে যেন কেউ আর বিশ্বাস করে না, সে যে বিশ্বস্তের গলায়ই ছুরি বসিয়ে দেয়।" বলিয়া স্বামীর পা, মাথায় ও বুকে ঠেকাইয়া সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

•

পাঁচ সাত দিন পরে দুপুরে বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া প্রিয়ম্বদা ললিত-মোহনের কথাই ভাবিতেছিল, এবার কয়েকদিনের জন্যে যে আশাকে বিন্দুমাত্রও সে বিশ্বাস করিয়াছিল, এ কয় দিনে তাহা যে একেবারেই অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে, সে কি করিবে, কি করিলে ললিতমোহনকে সুখী করিতে পারিবে, তাহা তাহাকে ত কেহই বলিয়া দিতে পারে না, হায় সে যে বড় অভাগিনী, রমণী হইয়া যদি স্বামীকেই সে সুখী করিতে

না পারিল, তবে ত তাহার জন্ম এবং জীবন সবই বৃথা। সহসা একটা শব্দ শুনিয়া যে বাহিরে আসিতেই একখানা পাল্কী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, পেছনে বিশ্বস্ত ভৃত্য রমানাথ যেন অতিকষ্টে পথ বহিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রিয়ম্বদা আর সহ্য করিতে পারিল না. চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিরে রমানাথ, পাল্কীতে কে এল, বাবু ভাল আছেন ত।"

রমানাথ বসিয়া একেবারে মাথায় হাত দিয়া বলিল—"মা সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবু বুঝি আর বাঁচে না?"

প্রিয়ম্বদা আর শুনিতে পারিল না, তাহার সমস্ত শরীর ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া পাল্‌কীর দোর খুলিয়া একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ ভৃত্য রমানাথ প্রিয়ম্বদাকে ধরিয়া মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিতেই প্রিয়ম্বদা চোক মেলিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমার এ সর্ব্বনাশ কে কল্লেরে রমানাথ, এমন করেও নাকি মানুষ মানুষকে কুপিয়ে কাট্‌তে পারে।"

"সে অনেক কথা, পরে শুন্‌বে মা, চল এবার বাবুকে ধরে ঘরে নে যাই।"

অনেক ক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অসহ্য গরম, ঘরের ভিতর মানুষগুলিকে যেন দম বন্ধ করিয়া ফেলিতেছে, অত রাত্রিতেও দিনের তপ্ত বায়ু যেন ঘরের মধ্যে গুমট পাকাইয়া রহিয়াছিল। স্তিমিতপ্রায় একটা আলো জ্বালিয়া নিখিলেশ আর প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের চেতনার প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। সহসা গভীর নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া প্রিয়ম্বদা বলিল—"আচ্ছা এমন শত্রুতাও মানুষে করে, বিভূতি বাবু ত এমনটা না করে মামলা মোকদ্দমাও কত্তে পাত্তেন!"

নিখিলেশ বিভূতির দিক্ টানিয়া উত্তর করিল—"দোষ ত কারুর কম নয়, জান ত তুমি ললিত যা ধর্‌বে, তাতে আর না কর্‌বার যোটি নেই, জোঁকের মত গায়ের রক্ত টেনে বার কর্‌বে, তবে ছাড়্‌বে।"

"তা বলে এমন করে মুখ বেঁধে দিয়ে কোপাতে ত আমি আর কাউকে দেখিনি নিখিলবাবু!"

"সেই যে করেছে, তারওত কোন প্রমাণ নেই।" বলিয়া নিখিলেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রিয়ম্বদা বাধা দিয়া বলিল—"আপনি কোথাও যাবেন না, হয় ত এখুনি আবার জ্ঞান হলে আপনার কথাই বল্‌বেন।"

"এই ত আস্‌ছি, আর তুমি ত এখানেই রয়েছ।"

বুকের উপর একটা কিসের বেদনা অনুভব করিয়া প্রিয়ম্বদা হাত দিয়া বুকটা ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আপনার কাজ ত আমাকে দিয়ে হবে না নিখিলবাবু, এই আজই দুপুরে যখন একবার জ্ঞান হয়েছিল, তখন প্রথমেই কেঁদে উঠে বল্লেন। 'হায় আমি যে নিখিলকে হারালুম' আপনার স্মৃতি যেন এর পরে পরে গাথা রয়েছে।"

নিখিলেশ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল—"হারাবার ভয়ই যদি ওর থাকৃত, তবে আর এ সব কাজে যেত না, ওটা তোমাদের একটা মস্ত ভুল।"

"ভুল, আমার ভুল নিখিলবাবু, তারপর শুনুন, আবার বল্লেন, 'প্রিয়ম্বদা, যদিও আমি ঠিক জানি না, তবু এতে ভুল নেই যে বিভূতি তার লোক লাগিয়েই আমার এ অবস্থা করেছে। আমি ত আর বাচ্‌ব না, তাতে আমার কোন দুঃখও ছিল না, কিন্তু বড় দুঃখ রৈল, নিখিল বৃথাই আমার ও'পর রাগ কর্‌বে, আর মর্‌বার আগে একটিবার আমি তাদের দেখ্‌তেও পেলাম না।"

নিখিলেশ শুনিয়া যাইতেছিল, প্রিয়ম্বদা হাত দিয়া চোখটা রগ্‌ড়াইয়া লইয়া আবার বলিল—"আমি শান্ত কত্তে যেতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌-লেন, যার মুখ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুল, আবার বল্লেন—'তুমি ত জান না নিখি-লেশ, জেনে শুনেও আমায়ই অপরাধী কর্‌বে, আর এটা ঠিক যে, এতেই আমি জীবনের জন্য তাদের হারিয়েছি, যদি আর একবারের জন্যে দেখাও পেতাম, তবুও বলে যেতাম, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, এতে ত আমার কোন অপরাধ নেই রে।" বলিতে বলিতে প্রিয়ম্বদা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

(২৩)

রেলিঙ্গের পাশে পাশে টবের মধ্যে যূইফুলের চারাগাছগুলি ফুল ও পাতার ভরে হেলিয়া রহিয়াছে। রজনীর শ্বেত চন্দ্রকর অতি সাবধানে আপন কুসুম-কোমল বাহুটি সহোদরের মত ফুলের মাথায় মাখাইয়া দিতেছিল, ফুলের গায়ে যেন ফুল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মৃদু বায়ু সদ্যঃসিক্ত টবের মধ্যে আছাড় খাইয়া সারা গায়ে কাদা মাখিয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য সরসীর ধব্‌ধবে সাদা কাপড়ের কোণা লইয়া খেলা করিতেছিল, সরসী রেলিঙ্গে ভর করিয়া আকাশের পানে হা করিয়া চাহিয়া যেন নবোদিত নক্ষত্রগুলি গণনা করিতেছিল, সহসা পায়ের শব্দ পাইয়া পেছনে ফিরিয়া চাইতেই তাহার

মুখ হইতে চিন্তার রেখাটা অন্তর্হিত হইয়া গেল, হাসি মুখে নিখিলেশের হাত ধরিয়া আনিয়া সম্মুখের খোলাছাদে পাতা মাদুরটার উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে ললিতবাবু একবারে সেরে উঠেছেন।"

"না একেবারেত এখনও সে সার্‌তে পারে নি, সার্‌তে তার আরও দুতিন-মাস ধরে সময় লাগ্‌বে।"

সরসীর হাসিটা সহসা যেন সেই হাসিভরা আকাশের কোলে লুকাইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে বলিল—"তা হলে তাকে ফেলে তুমি যে বড় চলে এলে।"

নিখিলেশ একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—"আমি আর ত সেখানে বছর ভরে বসে থাক্‌তে পারি না। সে ত এবার একটু একটু করে ভাল হচ্ছে।"

সরসী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা কে এমনটা কল্লে তার কি কোন খোঁজ হল।"

"কেন? এবার আবার ললিতকে একটা মোকদ্দমা পাকাতে বল্‌ছ না কি?"

সরসী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"সে হলেও ত বড় দোষ দেখিছ না।"

"ভাল, কিন্তু তোমাদের ললিতবাবুত বল্‌ছেন, তোমার দাদা বিভূতিবাবুই এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।"

সরসীর সমস্ত শরীরটা যেন কাঁটা দিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল—"সত্যি কি বড়দা এর ভেতর রয়েছেন!"

থাকলেও থাক্‌তে পারেন, তা বলে এমন কালি হয়ে উঠ্‌লে ত আর চল্‌ছে না।"

সরসী এবার আরও সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"দেখ, কদ্দিন থেকেই দেখে আস্‌ছি ললিতবাবুর পক্ষ হয়ে কোন কথা কৈলে তুমি কেমন চটে ওঠ, এর মানেটা কিন্তু আমি আজও ঠাহর কত্তে পাচ্ছি না। আমার ত ভয় হয়, তিনি তোমাদের জন্যে যা করেছেন, তাতে ত তার প্রতি এ আচ-রণ ভাল নয়!"

নিখিলেশ অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—"তুমি দেখ্‌ছি আমাদেরও ছাড়িয়ে তাকে আপন করে তুলেছ?"

"কাউকে ছাড়িয়ে কি না তা'ত জানি না, এইমাত্র জানি যে, আপন আমি তাকে সাধ করে করিনি, তোমায় তিনি যে ভাবে দেখেন, আর যা তোমার জন্যে করেছেন, এতে তাঁকে আপন না ভেবে পার পাবারত যো নেই।"

নিখিলেশ সরসীর সেই পবিত্র নির্ম্মল মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সরসী এবার নিখিলেশের কপোলে কপোল রাখিয়া সুখস্বপ্নের মত ধীরে ধীরে বলিল—"তোমায় অত ভালবাসেন বলেই যে, তিনি দাবী করে আমার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে নিচ্ছেন প্রিয়তম! আমি ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভাল না বেসে পারি না।"

নিখিলেশ কথাটি বলিল না, সরসীর কথা ও সেই শুভ্র জ্যোৎস্না মিলিয়া তাহাকে যেন মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। সে সরসীর লজ্জারক্ত কপোলে ক্ষুদ্র চুম্বন করিতেই সরসী আবার বলিল—"আহা ললিতবাবুর দুঃখ দেখ্‌লে যে আমার বুকটা কেমন করে ওঠে, সংসারে এসে ত একটি দিন তিনি সুখী হতে পারেন নি, আমাদের মুখ চেয়েই প্রাণ ধরে আছেন, আর তোমার জন্যে ত প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন না, ওবার নিজের সম্পত্তি খুইয়ে তোমার সম্পত্তি রক্ষা কল্লেন, বল্‌তে গেলে তাতেই তিনি পথে বসেছেন, তবু যেন কোন ক্ষেদ নেই, তুমি যে সুখে আছ, এতেই কত সুখী! সেবার তোমার বসন্ত উঠ্‌লে কি করেছিলেন? যা মা-বাপ পারে না, আমিও যতটা পারি নি, তাই করেছেন। তারপর ওবার আমার অসুখ হলে সবাই যখন হৈচৈ করে উঠ্‌ল, তখন দিন নেই, রাত্রি নেই ছায়ার মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরে আমর এই সুখ এই সৌভাগ্য বজায় রেখেছেন, আমিত সাধ করে তাঁর পক্ষপাত করি না।" বলিতে বলিতে সরসীর কৃতজ্ঞ হৃদয় একেবারে নত হইয়া পড়িল, দুই বিন্দু অশ্রু যেন ললিতমোহনের উদ্দেশে সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনমনে ঝরিয়া পড়িল। সরসী আকাশের পানে চাহিয়া নিখিলেশের মাথা ক্রোড় হইতে উঠাইয়া দিয়া বলিল—"চল, নীচে যাই।"

(২৪)

ক্ষুদ্র মেঘখানা শূন্যবাতাসে জমাট পাকাইয়া বৃষ্টি লইয়া নামিয়া আসিতেই জলের ফোঁটা গায়ে পড়িতে অভাগিনী লীলা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সে পথের পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিল সম্মুখে তাহার স্বামীর বাড়ী।

মনে পড়িল, সে বাড়ীতে আর প্রবেশের পথ নাই, দ্বার যে অর্গল বন্ধ, সপত্নীর কথায় বিনা দোষে বিনা অপরাধে কিছু পূর্ব্বেই যে স্বামী তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া স্বহস্তে অর্গল বন্ধ করিয়াছেন, সহসা লীলার মনে হইল, কেবল ত এ দ্বার নয়, তার মত অভাগিনীর জন্যে ভগবান্ যেন পৃথিবীর সমস্ত দ্বারই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তবে লীলা দাঁড়াইবে কোথায় ? সে যে যুবতী, রূপ যে তাহার এই রুগ্নদেহকেও ছাড়িতে চাহে না, লীলার কি উপায় হইবে, কোথায় যাইবে, কাহাকে আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করিবে, ধমনীপ্রবাহিত রক্তগুলি যেন লীলার মাথায় গিয়া উঠিল ; চক্ষু গাঢ় লাল হইয়া পড়িল, সহসা সে একটা পুরুষ সম্মুখে দেখিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মনে করিল, 'স্বামী যাহাই করুন, তাঁহার নিকট ভিন্ন ত স্ত্রীলোকের আর আশ্রয় নাই।' লীলা ধীরে ধীরে গিয়া দোরের কড়া নাড়া দিল, কেহ সাড়া দিল না, একটু শব্দমাত্র হইল না, লীলা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, পূর্ণ মেঘ, জল পড়িতেছিল, কৈ তাহাতে ত লীলাকে ভাসাইয়া লইতে পারিতেছে না, হতভাগিনীর জন্য কি এই মেঘের কোণে বজ্রও নাই, ঐ বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, এইবার পড়িবে, লীলা হতাশ হইল, একটা মড়মড় শব্দে আবার তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে ললিতার গৃহের জানালা ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিতেই ললিতা রুখিয়া উঠিয়া বলিল—"পোড়ারমুখী, এখানে আবার কেন, যা তোর যেসব ভালবাসার লোক রয়েছে তাদের কাছে।"

লীলা থমকিয়া দাঁড়াইল, সুবোধ কি ভাবিয়া উঠিতে যাইতেই ললিতা তাহাকে একেবারে বুকের উপর আনিয়া সজলনয়নে বলিল—"আবার কোথায় যাচ্ছ, ও-মাগী ওখানেই পড়ে থাক্ না, ওদের আবার ভয় কি ?"

সুবোধ উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল —"না ললিতা,. সে ত ভাল হয় না, হাজার হ'ক আমার ত স্ত্রী।"

ললিতা সুবোধকে জোর করিয়া ধরিল, উঠিতে দিল না, উচ্চ গলায় বলিল—"যা বলছি এখান থেকে, আর যেন স্বামীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌তে আসিস্ না।"

লীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে কষ্ট দিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া হাটিয়া মধ্যপথে আসিয়া লীলা আবার থম্‌কিয়া গেল, কোথায় সে দাঁড়াইবে, জাতি

গোপে ত রক্ষা করিবার কেহ নাই। আবার ফিরিল, আবার কি ভাবিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল একখানা ঘোড়ার গাড়ী। দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—"গাড়োয়ান তুমি যে হও, আজ আমার জাত রক্ষা কর বাপ। আমি তোমায় ভাড়া দেব; আমায় পৌঁছে দাও।"

সে কাতরস্বরে গাড়োয়ানের প্রাণেও যেন করুণার উদয় হইল, সে নামিয়া গাড়ীর দোর খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাবে মা ?"

লীলা ললিতমোহনের ঠিকানা বলিয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে সুবোধ যখন ব্যাপারটার আদ্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিল। তখন বাহির হইয়া সে আর লীলাকে খুজিয়া পাইল না, ললিতা পেছন হইতে বলিল—"ওর আবার থাকবার যায়গার অভাব, এখনই কত বড়লোক তাকে টেনে বুকে করে রাখ্‌বে।"

নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গাড়ী আসিতেই লীলা নামিয়া পড়িল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই একটা খোট্টা দারোয়ান তাহাকে গালি দিয়া উঠিয়া বলিল—"দুপুর রাতে কে তুই, কোন খারাপ মত্‌লব নিয়ে ত আসিস্ নি, যা বল্‌ছি এখান থেকে।"

তখন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়াছিল। আকাশের গায়ে থরে থরে সজ্জিত তারাগুলি যেন লীলার দিকে মুখ বাঁকাইয়া হাসিয়া উঠিল, পাশের গ্যাসের আলোগুলি যেন তীব্র হইয়া লীলাকে দূর দূর করিতে লাগিল। লীলা কাতরকণ্ঠে বলিল—"ললিতবাবুকে ডেকে দাওত ?"

দারোয়ান ধমক দিয়া বলিল—"ললিতবাবু এ বাড়ীতে কেউ নেই রে মাগি, এখানে তোর ওসব নষ্টামি খাট্‌ছে না, এ যে ভদ্রলোকের বাড়ী।"

লীলা একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রাত্রির জোৎস্না যেন তাহাকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছিল। গাড়োয়ান ডাকিয়া বলিল—"ভাড়া দেবে মা ?"

লীলা সাড়া দিল না, পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, সেত জানে না, ললিত যে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, এ বাড়ী যে আর কেহ ভাড়া লইয়াছে, গাড়োয়ান যেন একমুহূর্ত্তে সমস্ত বুঝিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমি ভাড়া চাই না মা, তুমি আর কোথাও যাবে ত এস, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।"

লীলা জবাব করিল না, সে কোথায় যাইবে, আর যে তাহার স্থান নাই।

মনে মনে ভাবিল, 'হেটে যাব না বলে ত কোন দিন গঙ্গায় যেতে পারিনি, আজ তাঁর কোলেই আমার স্থান হবে।" '

সহসা পাশের বাড়ীর একটা দরজা খুলিয়া গেল। একটি সুন্দরী যুবতী আসিয়া লীলার হাত ধরিয়া বলিল—"আমি যেন বুঝ্‌ছি, তুমি ঘোর বিপদে পড়েছ, চল আজ রাতের মত আমার কাছে থাকবে, তার পর তোমার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করে দেব!" জড় পুতুলের মত লীলা যুবতীর হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

(২৫)

"নিখিল কৈ রে" নীচে হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেই নিখিলেশ নামিয়া আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ললিত, তুই এর মধ্যে এখানে এসে হাজির?"

দুর্ব্বল ললিতমোহন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সিঁড়ির গোড়াটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল—"বড় বিপদে পড়েছি, লীলা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, তাকে ত খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

নিখিলেশও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি, বাড়ীর সবাই কি বল্‌ছে।"

"বাড়ীতে ত আর কেউ নেই রে, লীলার শাশুড়ী বাড়ী চলে গেছেন, ললিতাও তার বাপের বাড়ী, সুবোধটা ত গোল্লায় গেছে, তিন দিন খুজে তবে কাল তাকে ধরেছিলুম, সে ত কথা কইতেই চায় না, অনেক করে জিজ্ঞেস কত্তে মুখ বাঁকা করে বল্লে, 'সে বেরিয়ে গেছে' কিন্তু এত আমি কিছুতেই বিশ্বাস কত্তে পারি না, তাকে যে আমি তিন বছর বয়েস থেকে দেখে আস্‌ছি।" বলিয়া ললিতমোহন থামিতেই নিখিলেশ চিন্তিতের মত বলিল—"এখন উপায়।"

"চল বেড়িয়ে পড়ি, থানায় থানায় খবর দিয়ে রাখি, আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছে, গঙ্গায় ডুবে না মরে। সে যে সহ্য কত্তে না পেরেই বাড়ীর বার হয়েছে, তাতে ত কোন সন্দেহ নেই।" বলিয়া ললিতমোহন বাহিরে যাইতেছিল, নিখিলেশও পাশের ঘর হইতে একটা জামা গায়ে ফেলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। দোরের গোড়ায় আসিয়া ললিতমোহন একবার থামিল, একবার উপরের দিকে দৃষ্টি করিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িল, এ সময়েও তাহার মনে সরসীকে দেখিবার জন্যে যেন একটা প্রবল ইচ্ছা মাথা

উঁচু করিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখ খুলিয়া সে আর সে কথা বলিতে পারিল না, পিপাসিতের মত একবার নিখিলেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, নিখিলেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, ললিতমোহনও আর কোন কথা না বলিয়া একটা গাড়ী ডাকিয়া উঠিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সরসী কেমন আছেরে, শুনলুম, তোর ছেলে হয়েছে, খোকা ভাল আছে ত ?"

নিখিলেশ মাথা গুজিয়া বলিল—"না, সবারই এক আধটু অসুখ রয়েছে, ছেলেটা হয়ে অবধি কেবলি ভুগ্‌ছে।"

সারাদিন এপথ ওপথ এগলি সেগলি ঘুরিয়া বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিল, সকলের বাড়ীতে খোজ করিয়া লীলার কোন সন্ধানই না পাইয়া উদ্যম ও আশাহীন ললিলমোহন রাত্রি আটটা বাজিতে নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ীর দরজায় গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল—"সারাদিন ত কিছু খেতে পাইনি রে, আর ত শীরর বৈছে না।"

নিখিলেশ ব্যস্ত হইয়া বলিল—"এখন আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, বরাবর বাসায় যা, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করগে, কাল যা হয় আবার খোজ করে দেখা যাবে।"

ললিতমোহন মনে মনে বলিল—"অসময়ে নিখিল আমায় একাটি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছে।" মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া শেষটা প্রকাশ্যে বলিল—"খোকাকে একবার দেখে যাব নারে—সরসী ?"

বাধা দিয়া নিখিলেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"রাত অনেক হয়েছে, এখন তারা শোবার ঘরে গিয়ে শুয়েছে, আজ আরত খোকাকে দেখ্‌বার সুবিধে হবে না।"

ললিতমোহন আর কথাটি বলিল না, একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া কাত হইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, সরসীর সঙ্গে হয়ত তাহার দেখা করিবার অধিকারও নাই। গাড়ীখানা তখন কলিকাতার পথ বাহিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, ললিতমোহন চিন্তার হাত এড়াইবার আশায় সেই অগণ্য পণ্য-সম্ভার সজ্জিত বিপনীশ্রেণী, পথিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে জ্বালা উজ্জ্বল গ্যাসের আলোগুলি, আর লোকবহুল পথের প্রতি একবার দৃষ্টি করিয়া নিজের মনে নিজেই জড়সড় হইয়া পড়িল, সমস্ত পৃথিবীই যেন হাসিতেছিল, আর তাহার মুখের হাসি কে কাড়িয়া লইল, তাহারও ত কোন অভাব ছিল না, ভাবিবার বিষয় দিয়া ত ভগবান্ তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান নাই, নিজের হাতেই যে সে

মৃত্যুযন্ত্র গড়িয়া লইয়াছে। কে যেন তাহাকে তপ্ত বালির উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। পৃথিবীতে একটা সহানুভূতি বা একবিন্দু দয়ামায়াওত সে খুজিয়া পাইতেছে না, তাহার জন্য যেন সকলই শুষ্ক নীরস হইয়া যাইতেছে। সহসা গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবু, নামুন গাড়ী থেকে ?"

চমক ভাঙ্গিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া ললিতমোহন আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, ক্ষুধায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল, তিনদিন সে এখানে আসিয়াছে, ইহার মধ্যে ত কোন বন্দোবস্তই সে করিতে পারে নাই, এখন যে না রাঁধিলে তাহার ভাত জুটিবে না।

কেন কি ভাবিয়া পরদিন হইতে সে আর নিখিলেশের নিকট যায় নাই, নিজেই যতটা পারিয়াছে, লীলার অনুসন্ধান করিয়াছে। কোন কিছুই করিতে না পারিয়া আজ দুপুরে সে কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় একটা বালিসে ভর করিয়া পড়িয়াছিল। সময়গুলি যেন আর কাটিতে চাহে না, কোন চিন্তাই যেন তাহার আরামপ্রদ হয় না, এক একবার নিখিলেশের কথা মনে হইতেই বুকটা কাপিয়া ওঠে, মনটা বসিয়া যায়, চোখ জ্বালা করিয়া ভিজিয়া উঠে, সহসা নিখিলেশের ছেলের কথা মনে হইতে সে কল্পনারাজ্যের ছায়া দেখিয়া বালকের সেই সহাস্যমুখ হৃদয়ে আকিয়া লইল, আর তিষ্টিতে না পারিয়া ললিতমোহন বরাবর বাহির হইয়া গিয়া নিখিলেশের শ্বশুরবাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল—"নিখিল।"

নিখিলেশ উপর হইতে মাথা বাড়াইয়া বলিল—"বৈঠকখানা-ঘরে বোস, যাচ্ছি।"

ললিতমোহন টলিতে টলিতে কোন মতে গিয়া বৈঠকখানার মধ্যে বসিয়া পড়িল, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, নিখিল আসিয়া হাসিয়া বলিল—"কৈ তোর ত আর কোন খোজই নেই, লীলার কোন সন্ধান পেলি।"

ললিতমোহন মনে মনে বলিল—"আমার রোগা শরীর, আমি খোজ কত্তে পারি নি, তোরা কিন্তু আমার অনেক খোজ করেছিস্।" প্রকাশ্যে বলিল—"নারে তার ত কোন সন্ধানই পাই নি।"

"তবে আর এখানে বসে থেকে কি করবি, শরীরও ভাল নেই, বাড়ীতেই চলে যা।"

একটা খোঁচা দিতে চেষ্টা করিয়া ললিতমোহন বলিল—"খোকাকে একবার নিয়ে আয় না, একটিবার দেখে যাই।"

নিখিলেশ কোন কথাই ভাবিল না, সে হাসিমুখে উপরে উঠিয়া গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া আনিয়া ললিতমোহনের কোলে দিতেই তাহাকে চুম্বন করিয়া ললিতমোহন বলিল—"হ্যারে সরসী।"

নিখিলেশ ক্ষণ কাল মাথা নীচু করিয়া অন্য কথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহলে কবে যাচ্ছিস?" ললিতমোহন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নিখিলেশের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

(২৬)

দিন যেন আর কাটিতে চাহে না, সরসী লীলা, নিখিলেশকে ছাড়িয়া ললিতমোহন যে পৃথিবীই শূন্য দেখিতেছিল। নানাচিন্তার মধ্যে সরসীর সেই হাসি মুখের পূর্ণ সহানুভূতির কথা মনে করিয়া ললিতমোহন কেবলই ভাবে, সেই সরসী এমনই একটা নিদারুণ ঘটনার পর একটিবার তাহার খোজ না করিয়া পারিল কি করিয়া, আবার নিজের মনেই সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, পর কখনও আপন হয় না, তখন প্রিয়ম্বদার কথা তাহার মনের কোণে উকি মারিয়া ওঠে, সে ভাল হক, মন্দ হক, সেইত তাহার, লীলা আসিয়া মাঝখানে বধা দেয়, সেত অকৃতজ্ঞ নহে, তবে সে ললিতমোহনের স্নেহ হারা হইবে কেন, সরসী যেন হাসিমুখে উকি দিয়া বলে 'আমিই কি করেছি,। মেয়ে মানুষ আমরা, পরাধীন, যা বল্‌বে তাইত কত্তে হবে।' তবে নিখিলেশতই যত কাণ্ডের গোড়া, কিন্তু সে যে ললিতমোহনের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের। সরসীও ত একবার একটা খোজ নেয় না। ভিতরে ভিতরে একটা যেন কি কাণ্ড ঘটিয়াছে। ললিতমোহন পথে বাহির হইয়া একমনে এই চিন্তা করিতেছিল, আর একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সহসা নিখিলেশের শ্বশুর-বাড়ীর সোজা পথটা তাহার সম্মুখে পড়িল, সে চিন্তা ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে আজ একেবারে উপরে উঠিয়া যে ঘরে সরসী থাকিত, সেই চিরপরিচিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"নিখিল।"

খোকা এক পাশে শুইয়াছিল, সরসী বসিয়া স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সহসা ললিতমোহনকে দেখিয়া সে লম্বা ঘুমটা টানিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ললিতমোহন যেন অতর্কিত আক্রমণে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া আগুনে আগুন ঢাকিয়া নিজকে সাম্‌লাইয়া লইতে গিয়া সেই দুই মাসের শিশুটিকে ক্রোড়ের মধ্যে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই নিখিলেশ বলিল—"দে ওকে, রেখে আসি।"

ললিতমোহন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সে সোজাসুজি একটা বুঝিয়া যাইতে চাহে, যে উদ্বেগ তাহাকে বিদলিত করিতেছিল, সে যদি একেবারে দ্বিখণ্ড করিয়া দেয় ত মন্দ কি? মোহবিরহিত বিকল শরীর সে যে আর বহন করিতে পারে না, কর্কশ কণ্ঠে ললিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"তুই দিয়ে আস্‌বি, কেন, সরসী কি ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না!"

নিখিলেশের আর জবাব করিতে হইল না, ঝী আসিয়া বলিল—"দিন ত খোকাকে, দিদিমণি নে যেতে বল্লেন।"

ললিতমোহন আর কি আশা করে, তাহার ত যথেষ্ট হইয়াছে, তবু যেন সে সম্মুখে তপ্ত রক্ত নদী দেখিয়া সাতরিয়া পার হইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল—"বলগে তোমার দিদিমণিকে, সেই নেবে'খন।"

"নারে না, ঝীই নিয়ে যাক।" বলিয়া নিখিলেশ খোকাকে ললিতমোহনের ক্রোড় হইতে লইয়া ঝীর কোলে তুলিয়া দিল। ললিতমোহন আর কোন দিকে না চাহিয়া নিখিলেশের হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে টানিতে নীচে নামিয়া আসিল।

গঙ্গার জেটীর উপর নিখিলেশের কোলে মাথা রাখিয়া অনেক দিন পর আজ ললিতমোহন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে যখন প্রাণের ভারটা অনেক লাঘব হইয়া পড়িল, তখন সে পরপারের নিস্প্রভ আলোগুলির দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল—"হ্যারে এমনই কি অপরাধ হয়েছে যে, তোরা আমায় একেবারে প্রাণে মার্‌তে বসেছিস্।

নিখিলেশ ধীরে ধীরে বলিল—"দেখ ললিত, যা রয়সয় তাই ভাল, আমিত এ বাড়ী থেকে এদের অমতে কোন কাজ কত্তে পারি না।"

"এদের অমতে, কেন এরা কি আগেকার সব কথাই ভুলে গেছেন।"

"সে আমি জানিনি, যা এরা ভালর জন্যে কর্‌বেন, সেত আমাদের শুন্‌তেই হবে তুই সে বারে নাকি সরসীর অসুখের সময় তার সঙ্গে দেখা কত্তে গেছিলি, তাতে সরসীর বাপ তাকে বড্ড গালিগালাজ করেছেন, আর বিভূতি বাবুত এ সব পসন্দই করেন না।"

বিভূতির নামে ললিতমোহন একবার কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল—"তোরা আছিস্, তাই ত এবাড়ী মাড়াতে হয়, আর গাঁলিগালাজ করেছে তার মানে।"

অপমান শত অবহেলাকে ভাসাইয়া দিয়া নিখিলেশের মধ্যেই মজিয়া থাকিতে চাহে।

কয়দিন পরে সেদিন ললিতমোহন সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তবু তাহার কাজ ফুরায় নাই, ভাবিল আজ নিখিলেশকে দিয়া এই জরুড়ি কাজটা করাইয়া লইবে। সে দ্রুতপদে নিখিলেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—"নিখিল, ভাই আমার একটা কাজ যে আজ তোকে না কল্লে নয়।"

নিখিলেশ বিভূতিবাবুর সহিত তাস খেলিতে ছিল, মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া একটু তীব্র স্বরেই চটিয়া উঠিয়া বলিল—"আমি পারব না, এখন কোনও কাজ কত্তে।"

ললিতমোহনের মুখ শুকাইয়া গেল, সে আর সে দিকে তাকাইতে পারিল না, দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। ইহার কয়েকদিন পরে এমনই একটা ঘটনা ঘটিল যে, সেদিন ললিতমোহন নিখিলেশকে হাতে পাইয়া একেবারে বাড়ী লইয়া আসিল, সে যেন টিকিতেই পারিতেছিল না, কোন রকমে নিখিলেশকে ছাড়িল না, সারাটা রাত তাহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি ভোর করিল। ভোরে নিখিলেশ চলিয়া গেল, রাত্রিতে সে তাহাকে ধরিয়া আবার সেই জেটীর উপর গিয়া বলিল।

তখন পূর্ণিমার রাত হাসিতেছিল, বাতাসের মৃদুমন্দ আঘাতে বীচিভঙ্গ-মুখরিত কল্‌কল্ শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য ললিতমোহনের মনের কোণের কালিমাটুকু ধুইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। পরপারের গ্যাসগুলি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে, তাহার ছায়ায় পাড়ের গোড়ার জলগুলি নাচিয়া নাচিয়া গায়ে সোণার রঙ্গ মাখিয়া লইতেছে, পরপারে অসংখ্য আলো, দিনের মত আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ললিতমোহন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যারে সরসী কিছু বল্লে।"

"না কিছু ত বলেনি রে।" বলিয়া নিখিলেশ আকাশের দিকে চাহিল। ললিতমোহন লজ্জার বাঁধ একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই তাকে বলেছিলি আমার সে সব কথা।"

"তোর এ পাগ্‌লাম, আবার তাকে কি বল্‌ব, সখ করে কেঁদে মরিস্, তার ত সেও কিছু কত্তে পার্‌বে না। শুনে বৃথাই কষ্ট পাবে।" বলিয়া নিখিলেশ আবার বলিল,—"চল এবার উঠে পড়ি।"

ললিতমোহন একবার সেই নীল আকাশের দিকে চাহিল, দেখিল নক্ষত্র

রাজি-শোভিত আকাশ অতি সুন্দর, পরপারে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্তিমিতপ্রায় নিষ্প্রভ আলোকগুলি আরও সুন্দর, গঙ্গাবক্ষে বায়ুর মৃদু শিহরণ সে ত অনন্ত সুষমার আশ্রয়, জগতে সবই সুন্দর, কেবল কুৎসিৎ এই স্বার্থপর মানবনগুলীর নীচ মন, সেখানে পরের জন্য ত কোন ভাবনা নাই, সে যে আপনার ভাবে আপনি বিভোর, উন্মত্ত ; নিজেকে সে বুকের কোণে এমনই ভাবে রাখিতে চাহে, যাহাতে নামমাত্র বাতাস বা বিন্দুমাত্র জলের সংস্পর্শও ঘটিতে না পারে। সূর্য্যের তাপ ত লাগিতে দিতে চাহেই না, চন্দ্রের স্নিগ্ধালোকে কি জানি যদি ঠাণ্ডা লাগে, তাই ভয়ে ভয়ে উপাধানের তলে মাথা গুজিয়া থাকিতে চাহে। হায় স্বার্থপর সংসার, এখানে কোন্ লোভে মানুষ আপনার লইয়া এত ব্যস্ত, এত জড়সড়, যেন কেহ তাহাকে স্পর্শ না করে, গায়ে গা ঘেসিয়া কেহ না যায়, হয়ত কুসুমসুকুমার অঙ্গে বেদনা বাজিবে, হৃদয় কণ্টকিত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে যেন সমস্ত বাঁধ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তীব্র স্বরে ললিতমোহন বলিয়া উঠিল—"স্বার্থপর, সে আমার বেদনার কথা শুনে দুঃখ পাবে, এজন্যে তুই তাকে কোন কথা বল্‌তে পারিস্ নি, আর তোদের জন্যে যে আমি মরে যাচ্ছি, এটা একটা কথার কথা, না ?" বলিয়াই সে নিমেষহীন শূন্য দৃষ্টিতে পূতসলিলা জাহ্নবীর দিকে করুণনয়নে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"কোলে স্থান দে মা, বুকের গ্রন্থিগুলি যে ছিঁড়ে গেল।"

রাত্রি দশটায় বাসায় আসিয়া পা দিতেই একটি অপরিচিত ভদ্র লোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"মশায়, আপনার জন্যে আমি অনেকক্ষণ বসে রয়েছি। সুবোধবাবু আমায় আপনার কাছে পাঠালেন, তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, তাকে হাজতে ধরে নে গেছে।"

জ্বলিত অঙ্গার যাহা ছিল, তাহা যেন এবার ভস্মে পরিণত হইয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল, চিহ্নমাত্র রহিল না। যাহাও একটু আশা ভরসা ছিল, তাহাও গেল, তবে আর রহিল কি ? ললিতমোহন মনে মনে ভাবিল, লীলাকে সুখীকরার আশা যে এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগে ত সুবোধকে রক্ষার চেষ্টা না কল্লে হচ্ছে না, সেই ত লীলার সব, যদি কখনও তাহাকে পাই, তবে ত এ সংবাদ শুনিয়াই সে আত্মহত্যা করিবে। কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"হাজতে নে গেল, কারণ ?"

"জানেন ত সে কেমন বদ্ হয়ে পড়েছে, সে দিন আফিসের ক্যাস থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে মদ খেয়েছিল।"

বসিয়া পড়িয়া লোলিতমোহন জিজ্ঞাসা করিল—"এখন উপায় ?"

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল—"উপায় টাকা, টাকা ঢাল্‌তে পাল্লে না হয় এমন কোন কাজ্ত দুনিয়ার নেই।"

পিতৃ স্নেহ

(শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল্)

(১)

হরি ও শ্যাম দুজনেই কাপড়ের কারবার করিত। পাশাপাশি তাদের দোকান ছিল। হরি বড়ই হিংসুক। শ্যামের কারবারের উন্নতিতে হরির যারপরনাই ঈর্ষা হইল।

তার অনুগত যদুকে পাঁচশত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া শ্যামের দোকানে আগুন লাগাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত করিল। যদু অসৎপ্রকৃতির লোক। অর্থের লোভে সে সকলপ্রকার দুষ্কার্য্যই করিতে প্রস্তুত। একদিন রাত্রে হরির প্ররোচনায় যদু শ্যামের দোকানে অগুন লাগাইয়া দিল। অগ্নি দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামের দোকান পসার কাপড় চোপড় যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। পাড়ার লোকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী আরও দু'এক জনের দোকান ও হরির জীর্ণ দোকান ঘরখানিও পুড়িয়া গেল। দোকানের ভিতর জিনিস পত্র যাহা কিছু ছিল, সে পূর্ব্বেই গোপনে সরাইয়া লইয়াছিল। হিংসায় তাহার বুক এতই জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে, শ্যামের বড় অনিষ্ট সাধিবার জন্য নিজের ছোট ক্ষতি সে অনায়াসে সহ্য করিল।

ইহাতেও শ্যামের বিপদ শেষ হইল না। মহাজনদের কাছে অনেক টাকা তাহার দেনা ছিল। হরির প্ররোচনায় মহাজনেরা তাহার নামে নালিশ

করিল। বিচারে প্রমাণ হইল যে, মহাজনদের ফাঁকি দিবার জন্য শ্যাম স্বেচ্ছায় দোকানে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল,—তাহাতে পাশের আরও লোকের দোকান পুড়িয়াছে। শ্যামের দীর্ঘকাল কারাদণ্ডের আদেশ হইল। বেচারী ধনে প্রাণে মরিতে বসিল!

শ্যামের সংসারের মধ্যে ছিল কেবল এক তিন বছরের ক্ষুদ্র কন্যা। এই কন্যাটিকে রাখিয়া তাহার স্ত্রী মারা যায়। তারপর সে আর বিবাহ করে নাই। নিকট আত্মীয়ও তাহার তেমন কেহই ছিল না। শ্যাম কারারুদ্ধ হইল, তাহার যথাসর্ব্বস্ব গেল; অন্য সম্পত্তি যাহাকিছু ছিল, মহাজনেরা সব বিক্রয় করাইয়া লইল। একজন সহৃদয় প্রতিবেশী দয়াপরবশ হইয়া অনাথ শিশুকন্যাটিকে তাহার গৃহে আশ্রয় দিল।

বিধাতার ইচ্ছা বুঝা ভার। এই ঘটনার পর হইতেই হরির ব্যবসায়ে উন্নতি আরম্ভ হইল। আর্থিক সুখ স্বচ্ছন্দতা যথেষ্ট বাড়িল বটে, কিন্তু মনে তাহার শান্তি রহিল না। অনুশোচনায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল! পাপের যতপ্রকার শাস্তি আছে, আত্মগ্লানিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য! হরির আট বছরের একটি ছেলে ছিল,—নাম সুধীর। একদিন সে তাহার ছেলেকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া শ্যামের কন্যাকে অনাথিনী অবস্থায় রাস্তায় দেখিতে পাইল। শোকে ও অনুতাপে তাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল; সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীর নিকট মেয়েটির সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। ইহাতে তাহার পাপের ভার অনেকটা লাঘব হইল বলিয়া সে অনুভব করিল। ভাবিল, শ্যামের প্রতি সে যে ঘোর অত্যাচার করিয়াছে, তার কিছু পরিশোধ এবার সে করিবে!

শ্যামের মেয়ের নাম মায়া। হরি তাহাকে নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিল। মায়া সুধীরের ছোট খেলার সাথী হইল। সুধীর মায়াকে আপনার ছোট বোনটির ন্যায় আদর যত্ন করিতে লাগিল। এদিকে ব্যবসায়ের দ্রুত উন্নতিতে হরি ক্রমে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিল।

(২)

শ্যাম আজ দশবৎসর কারারুদ্ধ আছে। জেলের ভিতরে যে ঘরে সে থাকে সেই ঘরের দেওয়ালে এই দীর্ঘ দশবৎসর ধরিয়া একটু একটু করিয়া সে একটি বড় ছিদ্র করিতেছে। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে, সে এই ছিদ্র করে এবং আবার

ইটগুলি ঠিক সাজাইয়া রাখিয়া দেয়। বাহির হইতে দেখিলে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে ছিদ্রটি ক্রমে এত বড় হইল যে, তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসেই একজন মানুষ গলিয়া আসিতে পারে।

একদিন রাত্রে প্রহরীগণ ঘুমাইলে, শ্যাম ইট সরাইয়া গর্ত্তের ভিতর দিয়া দড়ির সাহায্যে পলাইয়া গেল। পরে বৃদ্ধ এক সাধুর বেশ ধরিয়া সে এক পোড়ো বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেটী যদুর বসত বাটী। শ্যামের দোকানে আগুন লাগাইয়া যদু যে পাঁচশত টাকা পাইয়াছিল, তাহার সাহায্যে স্ফূর্ত্তিতেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এখন তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছে। সকলে মিলিয়া কেবল মদ খাইতেছে এবং কাহার সর্ব্বনাশ করিবে তাহারই ফন্দি আঁটিতেছে। শ্যামের দোকানে আগুন লাগাইবার জন্য হরি যদুকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, তাহা যদু খুব যত্নেই তাহার কাছে রাখিয়া দিয়াছিল। যখনই তাহার অর্থের দরকার হইত, তখনই যদু সেই পত্রখানি হরির নিকট লইয়া যাইত এবং সকলকে আসল ঘটনা বলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া হরির নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত। হরিকেও বাধ্য হইয়া টাকা দিতে হইত।

ছদ্মবেশধারী শ্যামকে যদু ও তাহার বন্ধুরা কেহই চিনিতে পারিল না। তাহাকে বাড়ীতে একটু আশ্রয় দিবার জন্য শ্যাম যদুকে অনুরোধ করিল। যদু তাহাতে প্রথম কিছুতেই রাজি হইল না পরে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর বাড়ীর এক কোণে শ্যাম থাকিবার একটু স্থান করিয়া লইল। মেয়ের অন্বেষণ করাই এখন তাহার প্রথম কাজ। পরদিনই মেয়ের খোঁজে সে বাহির হইয়া পাড়ায় গিয়া, পাড়ায় লোকের কথায় কথায় সে জানিতে পারিল যে, মায়া হরির বাড়ীতেই আদর যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে। মায়াকে হরি নিজের সন্তানের ন্যায় ভালবাসে। এমন কি শ্যাম একজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিল যে, হরি তাহার একমাত্র পুত্রের সহিত মায়ার বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছে। হরির অবস্থার উন্নতি দেখিয়া শ্যাম বিস্মিত হইল। কন্যা যে এরূপ সম্পন্ন গৃহস্থের বধূ হইতেছে, ইহাতে সে বড়ই আনন্দিত হইল। অথচ হরির শত্রুতা হইতেই যে তাহার এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, শ্যাম তাহা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নাই!

একদিন যদু অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া হরির নিকট অর্থ চাহিতে আসিল। এবং তাহার অসময়ের একমাত্র সহায় সেই পত্রখানি হরিকে দেখাইয়া ষড়যন্ত্র

প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইল। হরি স্থির করিল এবার প্রচুর অর্থদানের লোভ দেখাইয়া কাগজখানি সে হস্তগত করিবে। কারণ এখানি যদুর নিকট থাকা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার দ্বারা কোন দিন সব ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। ধূর্ত্ত যদু হরির অভিসন্ধি বুঝিল। সে একবারে নগত হাজার টাকা পাইলে পত্রখানি ফেরত দিতে সম্মত হইল। হরিও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাজার টাকা দিল। কিন্তু যদু টাকা পাইবামাত্র একদৌড়ে পলাইয়া গেল। হরি বলপূর্ব্বক পত্রখানি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। এবং পাছে এ বিষয় জানাজানি হইয়া পড়ে, এই ভয়ে হরি একেবারে গুম খাইয়া গেল। অর্থনষ্ট ও উদ্দেশ্য বিফল হইল দেখিয়া তাহার দুঃখের সীমা রহিল না।

যদু বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, শ্যাম বিমর্ষ হইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া রহিয়াছে। ভাবিল, অর্থের অভাবেই শ্যামের এত কষ্ট! নেশার ঝোঁকে সে শ্যামের মুখের নিকট একতাড়া নোট ধরিয়া বলিল, "কি ভাবছো? টাকার কথা। এই দেখ কত টাকা! কিছু চাই?" শ্যাম তাহার হাতে অতটাকার নোট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যদুকে জিজ্ঞাসা করিল —"এ যে বিস্তর টাকা দেখ্‌ছি, এত টাকা কোথায় পেলে?"

নেশার ঝোঁকে যদুর চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সে হরির পত্রখানি শ্যামের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"বাবা, এই কাগজ! কত মন্ত্রই জানে। দেখালেই টাকা!" এই বলিয়া সে কাগজখানি শ্যামের দিকে ছুড়িয়া দিল। শ্যাম মাতালের খেয়াল ভাবিয়া প্রথম ইহা আদৌ লক্ষ্য করিল না। কিন্তু পরেই কাগজখানির উপর তাহার নজর পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! পত্রখানি পড়িয়া শ্যাম স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আজ দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা হইলেও, সে রাত্রের ঘটনা যে এখনও তাহার চোখের সম্মুখে ছবির মতন ভাসিতেছে। সেই দিনই তাহার দোকানঘর পুড়িয়া যায়, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইয়াছিল। তাহারই ফলে সংসারের একমাত্র অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি একমাত্র কন্যাকে ছাড়িয়া দশবৎসর তাহাকে কারাগারে কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে।

পত্রের নীচে হরির নাম সহি দেখিয়া তাহার বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। হায়! তারই প্রতিবেশী, সমব্যবসায়ী হরি, এমনি করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! সে যদুর অলক্ষিতে পত্রখানি কুড়াইয়া লইল

এবং সেখানি পকেটে করিয়া তৎক্ষণাৎ হরির বাড়ীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। যদু নেশায় উন্মত্ত, কিছুই টের পাইল না।

(৩)

শ্যাম একেবারে হরির বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। বৃদ্ধ সাধুকে গৃহে সমাগত দেখিয়া হরি আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিল এবং সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বৈঠকখানাঘরে গিয়া বসাইল। সাধু বসিলে হরি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বলুন, আমি আপনার কি করতে পারি? আপনার পদধূলিস্পর্শে আজ আমার বাড়ী পবিত্র হ'লো।"

শ্যাম উত্তর করিল,—"হরি, আমাকে চিনিতে পার?" হরির কৌতুহল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ-সাধুকে চিনিতে পারিল না। তখন শ্যাম ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া হরির দিকে চাহিয়া বলিল,—"হরি! এবার আমাকে চিনিতে পার?"

হরি ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথম তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, শ্যাম বলিতে লাগিল,—"এবার বোধ হয় শ্যামকে চিনতে পেরেছো। তোমা হ'তেই আমার ত সর্ব্বনাশ; সেই জানতে পেরেই তোমার কাছে এসেছি।" পাপী হইলেও নিজের প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। হরিও প্রথম নিজমুখে পাপ স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। বলিল,—"মিথ্যাকথা! তোমাকে ও কথা কে বল্লে? বাড়ী হতে বেরিয়ে যাও, নচেৎ পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব। তুমি জেলের পলাতক আসামী।"

শ্যাম তখন ধীরে ধীরে পকেট হইতে হরির সেই পত্রখানি বাহির করিল। কাগজ দেখিয়াই হরি সব ব্যপার বুঝিতে পারিল এবং ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। হরির মনে হইল, এতদিন পরে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় হইয়াছে—শ্যাম আজ তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে উদ্যত। ভয়ের প্রথম আবেগে সে শ্যামের হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হরি তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

শ্যাম প্রথম তাহাকে ক্ষমা করিতে অস্বীকার করিল। বলিল,—"যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া পথে বসাইয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই, দীর্ঘ দশবৎসরের কারাযন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা হইতে আমাকে

পৃথক করিয়া দিয়াছে, সে পাষণ্ডকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিব না। দশবৎসর পরে আজ জেল হইতে পলাইয়া আসিয়াছি,—ছদ্মবেশে ভয়ে ভয়ে ফিরিতেছি। আজ এই পত্রখানির বলে আমি মুক্ত হইতে পারি, আর আমার সেই জেলে তোমার স্থান হয়!" বলিতে বলিতে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া রাগে ও দুঃখে শ্যামের সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। রৌদ্র ও বৃষ্টির একত্র সমাবেশের ন্যায় তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অশ্রুকণা দুই একসময়ে নির্গত হইতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্যাম আবার বলিল,—"শুনিয়াছি, মায়াকে তুমি কন্যার ন্যায় পালন করিতেছ, তারই সঙ্গে তোমার সুধীরের বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছ।"

অনুতপ্ত হরিরও চোখ দিয়া টস্ টস্ জল পড়িতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তুমি জেলে যাবার পর হইতেই আমার মনে অনুতাপের আগুন জ্বলিতে থাকে। নিজের পাপ ব্যক্ত করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব, এত সাহস হইল না। তাই তোমার কন্যাকে আমার বাড়ীতে আনিয়া নিজের মেয়ের মত পালন করিয়াছি। তাতে মনের অশান্তি অনেকটা দূর হইয়াছিল। মায়া বড় হইল, আমারও মমতা বাড়িল। তখন ভাবিলাম, মায়াকেই পুত্রবধূ করিব। সুধীর আমার এক ছেলে, তোমার ও আমার সন্তনেরাই উত্তরকালে আমার বিপুল বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিবে। ভেবেছিলাম, ইহাতে আমার পাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। কিন্তু বুঝিলাম, বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, এত সহজে আমার এই গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

শ্যামও লোকের নিকট এই বিবাহের গুজব শুনিয়াছিল। এখন হরির মুখে সে কথা শুনিয়া বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল। হরির অবস্থা দেখিয়াও তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। হরিকে বলিল,—"হরি! কাঁদিও না, ভয় নাই, ওঠ। তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। আমি বুড়া হইয়াছি,—মায়া সুখে আছে জানিতে পারিলে, ভগবানকে ডাকিয়া বাকী জীবনটুকু সুখে আমার কাটিবে। বিধাতা আজ সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্তি দিন,—এই দেখ!"

এই বলিয়া শ্যাম পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিল। তারপর হরিকে তুলিয়া প্রীতি-আলিঙ্গনে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হরি বলিল,—"শ্যাম, আমাকেত

ক্ষমা করিলে,—কিন্তু তোমার কি হইবে ভাই ? তুমি যে পলাতক কয়েদী। তোমাকে যে ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া থাকিয়া জীবন কাটাইতে হইবে।"

শ্যাম উত্তর করিল,—"তা হউক ! ক্ষতি কি ? মায়া ত সুখে থাকিবে। সাধুর বেশ ধরিয়াছি, এই বেশই আমার সার্থক হউক ! ভগবানের পায়ে মন রাখিয়া নির্জ্জন জনশূন্যস্থানে তাঁহার নাম ধরিয়াই যেন বাকী জীবন আমি কাটাইতে পারি।"

হরি একটু ভাবিল,—ভাবিয়া কহিল,—"না শ্যাম, আমার পাপের ফলে তুমি বনবাসী হইবে, আর আমি সুখে সম্মানে সংসারে থাকিব ? না, তা হতেই পারে না। শোন, আমি সব ঘটনা পুলিসে জানাইয়া ধরা দিব। আমার সম্পত্তি তোমার, আমার সুধীর তোমার, মায়া ত তোমারই—তাদের লইয়া সুখে থাক !"

শ্যাম কহিল,—"ছি হরি ! কেন আমাকে আর ওকথা বলিয়া লজ্জা দিতেছ ? তোমার আর আমার দু'জনেরই দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। আমাদের সুখ-দুঃখের আর চিন্তা কেন ? সুধীর আর মায়া এদেরই ভবিষ্যতের সুখ, দুঃখ, মান, অপমান আমাদের ভাবিতে হইবে। আমাকে তারা জানে না, আমি কেউ নই, তুমিই তাদের সব। তোমার এই কলঙ্কে তাদের মুখ ছোট হইবে,—সম্পদভোগেও তারা সুখে থাকিবে না। আমি গিয়াছি, একেবারেই যাই। আমার হইয়া তুমি তাদের সুখের ও মান-মর্য্যাদার অভিভাবক হইয়া থাক। আর কোন আপত্তি করিও না। কেবল মায়াকে একবার দেখিব, পরিচয় দিব না, সুধু একবার দেখিব। তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জীবনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তোমার কোন আপত্তি আমি শুনিব না,—ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প।"

হরি মায়াকে ডাকিয়া আনিল। পিতাকে দেখিয়া মায়া আদৌ চিনিতে পারিল না। মায়াকেত শ্যাম আজ দশবৎসর দেখে নাই, প্রথম চিনিতে একটু কষ্ট হইল। মায়া পিতার সম্মুখে অপরিচিতের ন্যায় একটু জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল। আজ দশবৎসর উপরে প্রাণপুত্তলীকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে বক্ষে ধরিতে শ্যামের বড়ই ইচ্ছা হইল। অনেক কষ্টে তাহার মনকে সে সংযত করিল। নিজের ক্ষণিক সুখের উত্তেজনায় কন্যার সারাজীবন যে দুঃখময় হইয়া যাইবে ! পিতার পরিচয় পাইলে, মায়া কি আর শ্বশুর স্বামী লইয়া মনের সুখে দিন যাপন করিতে পারিবে ?

শ্যাম তারপর ঊর্দ্ধে তাকাইয়া বিড় বিড় করিয়া মায়াকে কি আশীর্ব্বাদ করিল। পরে মায়ার নিকট যেন কোন প্রকারে তাহার পরিচয় দেওয়া না হয়, গোপনে হরিকে বারংবার এই অনুরোধ করিয়া জলভরাক্রান্ত চক্ষে তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মায়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামের মনের ভাব অনুভব করিয়া হরির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হায়, সেই যত অনর্থের মূল! পাছে মায়া কিছু টের পায়, এই ভয়ে অনেক কষ্টে অশ্রুজল সম্বরণ করিল।

(৪)

এদিকে যদুর নেশা কাটিয়া গেল, সে সেই কাগজের খোঁজ করিল। কিন্তু ঘর, বাহির, রাস্তা সব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন পাইল না, তখন স্থির করিল এ নিশ্চয়ই হরির কাজ। সেই কোন রকমে কাগজখানি চুরি করিয়াছে যদু রাগে কাঁপিতে লাগিল এবং ইহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিল। সেই রাত্রেই সে হরির ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে স্থির করিল। যে উপায়ে হরি তাহাকে শ্যামের সর্ব্বনাশ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, সেই কৌশলেই গুরুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল। নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য, বা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এ সব লোকের অসাধ্য কিছুই নাই!

মধ্যরাত্রিতে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া যদু স্বকার্য্য সাধনে বাহির হইল। হরির বাড়ীর নিকট আসিয়া সে চারিদিক বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, বাড়ীর সবাই ঘুমাইয়াছে, রাস্তায় জন মানব নাই। তখন সে রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া হরির রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। রান্নাঘরের পাশেই কাঠ ও কয়লা রাখিবার স্থান। সে সেইখানে গিয়া কাঠে আগুন লাগাইয়া দিল। শুষ্ক কাঠ, সহজেই আগুন ধরিয়া উঠিল। আগুন যতই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, যদু ততই হাত তুলিয়া নাচিতে থাকে, আর বলে, —"জ্বল্ জ্বল্; সবাইকে পুড়িয়ে মার!"

অল্প সময়ের মধ্যেই বৃহৎ অট্টালিকার নানা অংশেই আগুন লাগিয়া গেল। এক এক অংশ আগুনের উত্তাপে খসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীর কেহই সতর্ক ছিল না। সকলেই প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করিতেছে; কিন্তু চতুর্দ্দিকেই আগুন; কোন দিকে যাইবে ঠিক করিতে পারিল না। তার উপর আবার ঘর বারাণ্ডা আলিসা সব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

যদুর স্ফূর্ত্তি দেখে কে? আগুনের মধ্যে সে যেন খেলা করিতেছে!

আগুন ক্রমেই তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সে দিকে তাহার আদৌ ভ্রুক্ষেপ নাই। সে আগুনের তালে তালে পিশাচের ন্যায় ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিল। সুরার ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় হতভাগ্যের হিতাহিত জ্ঞান একেবারে লোপ পাইয়াছিল। সে এতই বাহ্য জ্ঞান শূন্য যে, পলাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করে, এ বুদ্ধি তাহার যোগাইল না। বাড়ীর সবাই পুড়িয়া মরিবে, তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এই ভাবিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। চারিদিক হইতে আগুন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। স্বহস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যেই তাহার পাপদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

(৫)

রাত্রি তখন ১টা বাজে। শ্যাম শয্যা ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে বাহিরে আসিল। আজ তাহাকে না চিরদিনের জন্য স্বদেশ ও প্রিয়তম কন্যার মায়া ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। স্বহস্তে চন্দন তরু আজ সে ছেদন করিতে উদ্যত। স্নেহ, মায়া, মমতা বিসর্জ্জন দিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ মঙ্গল আশায় এ জীবনের জন্য দেশ ছাড়িয়া সে চলিল। যাহার সুখবিধানের জন্য তাহার এই আত্মবিসর্জ্জন, তাহার মঙ্গলকামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল। পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দূর হইতে একবার হরির বাড়ীর দিকে তাকাইল। কিন্তু ওকি? হরির বাড়ীতে যে আগুন লাগিয়াছে!

শ্যাম কি আর স্থির থাকিতে পারে? ওখানে যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ধন রহিয়াছে! সে দ্রুত পদ চালনা করিয়া হরির বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ী ঢুকিয়াই প্রথম হরির শয়ন কক্ষে সে প্রবেশ করিল। দেখিল হরি আধ পোড়া অবস্থায় উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরের ভিতর অগ্নি দাউ দাউ জ্বলিতেছে। সকলেই পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কিন্তু কেহই ঘরের ভিতর ঢুকিতে সাহস করিতেছে না। শ্যাম তৎক্ষণাৎ নিজের প্রাণকে বিপদাপন্ন করিয়া আগুণের ভিতর হইতে হরিকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল।

ইতি মধ্যে পাড়ার যুবকবৃন্দ সমবেত হইয়া অসীম সাহস সহকারে অগ্নির সহিত যুদ্ধ করিয়া আগুন নিভাইয়া দিল। মায়া ও সুধীরের দু'এক যায়গায় সামান্য একটু আধটু পুড়িয়া গিয়াছিল; কিন্তু হরি সাঙ্ঘাতিক ভাবে পুড়িয়া

গিয়াছে। তাহার প্রাণসংশয় হইয়া দাঁড়াইল। মায়া, সুধীর ও বাড়ীর সকলেই সাধুবেশী শ্যামকে ধন্যধন্য করিতে লাগিল।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু নিশ্চিত। তাহার সময় ফুরিয়া আসিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলকে সম্মুখে দেখিয়া সে বড়ই সুখী হইল। পরে শ্যামের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"ভাই, নিজেকেও বিপদাপন্ন করে, আমাকে বাঁচাতে পারলে না। আর আমিই তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছিলাম। বিধাতা আমার উপযুক্ত শাস্তিই বিধান করেছেন। সুধীর আর মায়াকে একেবারে পিতৃহীন করিও না। আমি গেলাম, তুমি তাদের পিতা হয়ে থাক। আর যাবার সময় একবার বল যে, আমায় তুমি ক্ষমা করেছ। তাহলে শান্তিতে মরিতে পারিব।" হরির অবস্থা দেখিয়া শ্যাম কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"ভাই সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই। ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা, কিন্তু বড় দুঃখ রয়ে গেল যে তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না।"

এমন সময় পাড়ার লোকেরা একটি অর্দ্ধ দগ্ধ মৃতদেহ রান্নাঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রাখিল। হরি অনেক কষ্টে যদুকে চিনিতে পারিল। তখন বুঝিতে পারিল যে আগুন লাগান যদুরই কাজ। কিন্তু যদুর উপর তাহার বিন্দুমাত্র রাগ হইল না। তাহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ভাবিয়া হরি অনেকটা শান্ত হইল। কেবল ধীরে ধীরে বলিল,—"যদু! ওঃ! দুজনের পাপের শাস্তি একভাবে এক সঙ্গেই হইল! ধন্য বিধাতা! ধন্য তোমার ন্যায়ের বিধান! ওগো! তোমরা সকলে শোন—শোন। আমার পাপের কাহিনী শোন! নির্দ্দোষ আজ কলঙ্ক মুক্ত হউক। আমি সজ্ঞানে স্বীকার করিতেছি যে, আমারই কুমন্ত্রণায় যদু শ্যামের দোকানে আগুন লাগাইয়াছিল আমরা দুজনেই আজ পাপের ফল ভোগ করিয়া বিচারার্থ ভগবানের নিকট প্রেরিত হইতেছি। জানি না, আমাদের পাপের মাত্রা শেষ হইয়াছে কি না! আমার সমস্ত বিষয় আমি আমার পুত্র সুধীর ও শ্যামের কন্যা মায়াকে দিয়া গেলাম এবং আমার বাসনা সুধীরের সহিত মায়ার বিবাহ—আশা করি পুত্র আমার সে বাসনা সময়ে পূর্ণ করিবে!"

হরির ইচ্ছামত একজন প্রতিবেশী এই সব কথা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া লইল। হরি অতিকষ্টে তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর করিল। পরে সুধীরকে

ডাকিয়া বলিল, "বাবা, চলিলাম পাপী বলে এখন আর আমাকে ঘৃণা করিও না। সদা সৎপথে চলিও, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করিবেন। আমাকে হারালে বটে, কিন্তু আজ থেকে আমার স্থানে আর একজন অধিকার করবে!" এই বলিয়া হরি সাধুকে দেখাইয়া দিল। তার পর মায়াকে কাছে ডাকিয়া বলিল,—"মা, তোর কাছেই আমি সব চেয়ে বেশী দোষী। পিতার পরম শত্রুর দোষ ক্ষমা করিয়া অধম সন্তান বলিয়া মনে রাখিস্। আর এই সাধুই তোর পিতা!" বলিতে বলিতে হরি যাতনায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই বিস্মিত নয়নে শ্যামের মুখের দিকে তাকাইল। মায়া তখন পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মধুর স্বরে ডাকিল,—"বাবা!" শ্যামের কর্ণে যেন সুধাধারা বর্ষণ করিল। সে উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"মা আমার! আবার ঐ রকম করে ডাক। আজ দশবৎসর তোমার কণ্ঠস্বর শুনিনি!" দশবৎসর পরে পিতা ও কন্যার এই পবিত্র মিলনে বাধা দিয়া হরির প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গেল। সুধীর "বাবা গো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। শ্যাম তাহার দুইবাহু বাড়াইয়া সুধীরকে বক্ষে টানিয়া বলিল,—"আজ থেকে আমিই তোমার পিতার স্থান অধিকার করবো। বাবা, শান্ত হও, জন্মমৃত্যুই সংসারের নিয়ম!" *

আশ্চর্য্য অন্তর্দ্ধান

(লেখক—শ্রীপাঁচকড়ি দে)

(১)

গোবিন্দরামের বাড়ীতে নানাবিধ রং বেরংয়ের লোকের সমাগম হইত;—সুতরাং দেখিয়া দেখিয়া আমি এ সমস্ত বিষয়ে এতই অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বড় কিছুতেই একটা বিস্মিত হইতাম না।

একদিন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বড় লোকের ছেলেরা কি স্কুলে পড়ে—"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মাণিকতলার ওয়ার্ডের স্কুলে! কি হইয়াছে তাহার?"

---

* একটী ইংরাজী গল্পের ছায়া ভাবলম্বনে।

"তারই বড় মাষ্টারবাবু এসেছেন,—দেখা কর্ত্তে চান ।"

"তাঁকে এইখানে নিয়ে আয় ।"

এক অতি স্থূলকায় খর্ব্ব বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—পরমুহূর্ত্তেই আমরা দুইজনেই লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। সহসা বৃদ্ধ ভূপতিত হইলেন ;—আমরা ছুটিয়া গিয়া দেখি, ভদ্রলোক মূর্চ্ছিত হইয়াছেন।

গোবিন্দরাম তাহার মাথা তুলিয়া ধরিলেন, আমি তাড়াতাড়ি আলমারি হইতে একটা ঔষধ লইয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলাম ;—দেখিলাম তাহার মুখ পাংশুবর্ণ,—বেশ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় তিনি অনেক দূর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন।

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার, ব্যাপারটা কি ?"

আমি বলিলাম, "কোন ভয়ের কারণ নাই, অনেক দূর হইতে ছুটিয়া আসায় এইরূপ হইয়াছে,—এখনই জ্ঞান হইবে।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন,—তাহার পর উঠিয়া বসিলেন ; লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "গোবিন্দরামবাবু আমার দুর্ব্বলতায় বড়ই লজ্জিত হইলাম,—ছুটিয়া আসার জন্যই বোধ হয় এ রকম হইয়াছিল। পত্রে কাজ হইবে না বলিয়া আমি নিজেই আসিয়াছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনি সুস্থির হউন তখন—"

তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না—আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি ;—আর কোন অসুখ নাই। আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে মাণিকতলায় যাইতে হইবে।"

আমার বন্ধু ঘাড় নাড়িলেন,—বলিলেন, "এখন একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি,—নূতন কিছুতে হাত দিবার সময় নাই।"

রাম অক্ষয়বাবু ওয়ার্ডের স্কুলের হেডমাষ্টার,—যে সকল বড় লোকের নাবালক পুত্রের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিত,—তাহারাই কেবল এই স্কুলে পড়িতেন,—রাম অক্ষয়বাবু—এই স্কুলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।

রাম অক্ষয়বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বলেন কি,—রামপুরের মহারাজার ছেলে হারাইয়া গিয়াছে,—চুরি গিয়াছে ; ইহাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?"

"রামপূরের মহারাজার নাম শুনিয়াছি।"

"পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার ন্যায় বড় লোক কেহ নাই—তাঁহার আয় বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার উপর।"

"কিন্তু তাঁহার সম্পত্তিতো গভর্ণমেণ্টের হাতে আসে নাই,—তবে তাঁহার ছেলে আপনাদের স্কুলে কেন ?"

"ভালো লেখাপড়া হইবে বলিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের হুকুম লইয়া—এই স্কুলে ছেলেকে দিয়াছেন। তিনিও বেলেঘাটায় একটা বাগান বাড়ীতে আছেন। যে তাহার ছেলের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে তিনি পাঁচহাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন, আর যদি কেহ তাঁহার ছেলে চোরকে ধরিয়া দিতে পারে,—তাহা হইলে তিনি তাহাকে আরও পাঁচ হাজার টাকা দিবেন।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন মন্দ কথা নহে, কি বল ডাক্তার ? রাম অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমাদের যাইতে হইবে দেখিতেছি। এখন শুনি কি ঘটিয়াছে,—কিরূপে ঘটিল, আর তাহার পরই বা কতদূর কি হইয়াছে,—সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলুন,—তাহার পর কি করা যায় বিবেচনা করা যাইবে।"

রাম অক্ষয়বাবু বলিলেন, "প্রায় একমাস হইল রামপুরের মহারাজা তাঁহার দেওয়ান বিমলাকান্তবাবুকে গভর্ণমেণ্টের এক পত্রের সহিত আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। এত বড় লোকের ছেলে আমার ছাত্র হইবে, তাহার পর সরকারি চিঠি, আমি কুমার বাহাদুরকে অবিলম্বে স্কুলে আনিতে বলিলাম।"

"গত ১লা মে তারিখে কুমার বাহাদুর স্কুলে আসিলেন। কুমারের বয়স চোদ্দ পনোর বৎসর, অতি সুন্দর চেহারা,—দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়,—তাহার উপর স্বভাব অতি কোমল;—বুদ্ধিও অতিশয় তীক্ষ্ণ। অতি শীঘ্রই কুমার অন্যান্য ছাত্রদের সহিত মিশিয়া পড়িলেন।

"বোধ হয় আমার কোন কথাই আপনার কাছে গোপন করা উচিত নহে। আমি শুনিলাম যে কুমার বাড়ীতে বড় সুখেছিলেন না,—তাহার কারণ তাঁহার জননীর সহিত পিতার বড় সদ্ভাব ছিল না। এমন কি মহারাজা ও মহারাণীতে মুখ দেখাদেখি ছিল না,—তিনি দেশে থাকিতেন, মহারাজা—এইখানেই থাকিতেন—প্রায়ই দেশে যাইতেন না। বলা বাহুল্য ছেলের মার দিকেই অধিক টান ছিল,—কিন্তু মহারাজা কুমারকে তাহার জননীর কাছে যাইতে দিতেন না। এই সকল কারণেই মহারাজ, কুমারকে আমাদের স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,—ভাবিয়াছিলেন যে, কুমার অন্যান্য সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত থাকিলে মার জন্য তত ব্যস্ত হইবে না।

"কেবল তের দিন মাত্র কুমার স্কুলে আসিয়াছেন, অর্থাৎ ১৩ই মে গত সোমবার রাত্রে তাহাকে স্কুলে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহারপর তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

"তিনি যে ঘরে শয়ন করিতেন,—তাহাতে যাইতে হইলে আর একটী ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়,—এতদ্ব্যতীত আর কোন উপায়ে সে ঘরে যাইতে পারা যায় না। বাগানের দিকে একটা জানালা আছে বটে,—কিন্তু সে জানালা ভূমিতল হইতে প্রায় বিশ হাত উচ্চে অবস্থিত।

"সম্মুখের ঘরে দুইটী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক শয়ন করিত,—তাহারা রাত্রে কোন সাড়া শব্দ পায় নাই,—জানালার নীচের মাটীতে আমরা কাহারও পায়ের দাগ বা অন্য কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই।

"মঙ্গলবার সকালে আমরা জানিলাম যে, কুমার নিরুদ্দেশ হইয়াছেন,—দেখিলাম তিনি বিছানায় নিদ্রা গিয়াছিলেন,—বিছানা দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার কোচান কাপড়, জামা, কোট, জুতা নাই,—সুতরাং বোঝা যায় যে এ সব তিনি পরিয়া গিয়াছেন।

"কুমারকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিবামাত্রই আমি তখনই সমস্ত ছাত্র ও মাষ্টারদিগকে একত্র করিলাম;—তখন জানিতে পারিলাম, কুমার একাকী যান নাই—রাধাবিনোদ বলিয়া একজন মাষ্টারও তাহার সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। এই মাষ্টারের বিছানা দেখিলে বোঝা যায় সেও রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়াছিল,—তবে খুব সম্ভব সে খালি পায় গিয়াছে, তাহার কাপড় জামা সমস্তই—তাহার ঘরে রহিয়াছে।

"তাহার ঘর নীচেয়,—সে দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায় নাই—জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে,—কারণ জানলার ধারে স্পষ্ট তাহার পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। তাহার একখানা বাইসিকেল ছিল,—সেখানা বাগানের একটা ছোট ঘরে থাকিত,—বাইসিকেলখানিও আর নাই।

"রাধাবিনোদবাবু দুই বৎসরের উপর এই স্কুলে কাজ করিতেছে,ন—আমি যত দূর দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি,—সে অতি ভদ্রলোক, নিজের বই লইয়াই চব্বিশ প্রহর থাকিত,—লোকজনের সহিত বড় একটা মিশিত না।

"বলা বাহুল্য মহারাজাকে তখনই বেলেঘাটায় সম্বাদ দেওয়া হইয়াছিল,—

তিনি ছেলের জন্মে বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। এই ঘটনায় আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছে তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন,—এখন আপনিই একমাত্র উপায়।"

গোবিন্দরাম নীরবে রাম অক্ষয়বাবুর কথা শুনিতে ছিলেন,—আমি তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন,—মনে মনে বিশেষ চিন্তা করিতেছেন,—রাম অক্ষয়বাবুর কথা শেষ হইলে তিনি কয়েকটি বিষয় নিজ নোট বইতে লিখিয়া লইয়া বলিলেন,—"এত দেরী করিয়া আসিয়া অন্যায় করিয়াছেন। ইহাতে অনুসন্ধান সম্বন্ধে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে,—আগে হইলে হয় তো জানালার নিম্নস্থ ভূমিতে কোন না কোন সূত্র দেখিতে পাইতাম।"

"এ জন্য আমার তত দোষ নাই। মহারাজার ইচ্ছা নহে যে, এ বিষয় লইয়া একটা গোলযোগ হয়, তাঁহার স্ত্রীর কথা প্রকাশ পায়,—ইহা তিনি কিছুতেই ইচ্ছা করেন না।"

"পুলিশে নিশ্চয়ই সম্বাদ দেওয়া হইয়াছিল ?"

"হাঁ—না দিলে নয়, তাহাই দেওয়া হইয়াছিল,—কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

"তাহারা সন্ধান পাইয়াছিল যে, সেই দিন ভোরের গাড়ীতে সেয়ালদহ হইতে এইরূপ একজন বয়স্থ লোক ও একজন বালক গোয়ালন্দে গিয়াছিল। তাহারা এই দুই জনেরই সন্ধান লইতেছিল। কাল রাত্রে সন্ধান পাইলাম যে, পুলিশ ইহাদের দুইজনকে ফরিদপুর গিয়া ধরে,—কিন্তু তাহারা রাধাবিনোদ বা কুমার নহেন। কাজেই সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া আজ সকালেই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "যখন পুলিশ এই দুই জনার সন্ধান লইতে ছিল, তখন নিশ্চয়ই আপনার স্কুলে আর কিছু অনুসন্ধান করে নাই ?"

"না—কিছুমাত্র না।"

"তিনদিন অনর্থক নষ্ট হইয়াছে। এরূপ ব্যাপারে এক দিনও নষ্ট করা উচিত নয়।"

"আমি তাহা স্বীকার করিতেছি,—তার আর উপায় নাই।"

"যাহাই হউক,—দেখা যা'ক কতদূর কি করিতে পারি। এই রাধাবিনোদ মাষ্টারের সঙ্গে কুমারের কি ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল ?"

"কিছুমাত্র না।"

"তাহার কাছে কি কুমার পড়িতেন ?"

"না—আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, কুমার রাধাবিনোদের সহিত কোন দিন কথা পর্য্যন্ত কন নাই।"

"আশ্চর্য্য বটে! কুমারের কি সাইকেল ছিল ?"

"না—তিনি বাইসিকেল সঙ্গে আনেন নাই।"

"আর কাহারও বাইসিকেল কি হারাইয়াছে ?"

"না—কাহারও না।"

"এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইয়াছেন কি ?"

"বিশেষ সন্ধান লইয়াছি।"

"তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন যে, রাধাবিনোদ গভীর রাত্রে কুমারকে কাঁদে বসাইয়া বাইসিকেল্ হাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছে ?"

"ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"তাহা হইলে আপনি এই বাইসিকেল্ সম্বন্ধে কি মনে করেন ?"

"হয় তো আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্যই খানিক দূর বাইসিকেল খানা লইয়া গিয়াছে,—তাহারপর হয় তো সেখানে কোনখানে লুকাইয়া রাখিয়া দুইজনে হাটিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"তবে দুইখানা বাইসিকেল লইয়া যাইত—নিশ্চয় সেখানে আরও বাই-সিকেল ছিল ?"

"হা—আরও তিন চারখানা ছিল।"

"যাহাই হউক—এই বাইসিকেল হইতেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে —বাইসিকেল লুকাইয়া রাখা বা নষ্ট করা বড় সহজ কাজ নয়। আর একটা কথা,—কুমারের সঙ্গে সে দিন কেহ দেখা করিতে আসিয়াছিল ?"

"না—কেহ না।"

"কোন চিঠি আসিয়াছিল ?"

"হাঁ—একখানা চিঠি আসিয়াছিল।"

"রাজার নিকট হইতে ?"

"হা—মহারাজ লিখিয়াছিলেন!

"আপনি কি ছেলেদের চিঠি খুলিয়া দেখেন ?"

"না—এ নিয়ম নাই।"

"তাহা হইলে কিরূপে জানিলেন যে, সেখানা মহারাজার চিঠি ?"

"আমি মহারাজার হাতের লেখা চিনি,—পত্রের শিরোনামা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম সেখানা মহারাজার চিঠি।"

"এ চিঠিখানা ছাড়া আর কোন চিঠি আসিয়াছিল ?"

"না আর একখানাও না।

"দেশ থেকে—মার কাছ থেকে ?"

"না—আর কোন চিঠিই আসে নাই।

"রাম অক্ষয়বাবু—আপনি নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন। দুইয়ের এক হইতে পারে,—হয় কুমার স্ব ইচ্ছায় গিয়াছেন, নতুবা কেহ তাহাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। যদি স্ব ইচ্ছায় গিয়া থাকেন তাহা হইলে বাহির হইতে কেহ তাহাকে পালাইতে প্রলোভিত করিয়াছিল। যখন তাহার নিকট কেহ আসে নাই, তখন কেহ পত্র লিখিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। এই জন্য কুমার কাহার পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

"না - আর কেহ এই কয়দিনের মধ্যে স্কুলে কোন পত্র লেখে নাই।"

"পিতা পুত্রে সদ্ভাব কিরূপ ছিল ?"

"মহারাজাকে যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি ছেলেকে খুব ভাল বাসেন।"

"ছেলের কিন্তু মার দিকেই টান ?"

"হাঁ—এই রকমই শুনিয়াছি।"

"কাহার কাছে শুনিয়াছেন,—মহারাজার কাছে ?"

"না—তিনি কিছু বলেন নাই।"

"তবে কি কুমার নিজে বলিয়াছিলেন ?"

"না—তিনিও কিছুই বলেন নাই।"

"তাহা হইলে আপনি এ কথা কিরূপে জানিলেন ?"

"মহারাজার দেওয়ান বিমলাকান্তবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছিল, তিনিই এ কথা আমায় বলিয়া ছিলেন।"

"ও—এখন বুঝিলাম—এই বিমলাকান্তের বয়স কত ?"

"খুব অল্প—পৌঁচিসের উর্দ্ধ নহে।"

"ইনি এত কম বয়সে দেওয়ান হইলেন কিরূপে ?"

"বোধ হয় মহারাজা খুব ভালবাসেন।"

"সম্ভব—কুমার নিরুদ্দেশ হইলে মহারাজার পত্রখানা কি তাহার ঘরে পাওয়া গিয়াছিল?"

"না—খুব সম্ভব সে পত্র কুমার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন—এখন আর বিলম্ব করিবেন না,—চলুন সেখানে গেলে সকলই জানিতে পারিবেন।"

"চলুন—তিনদিন হইয়া গিয়াছে, যাক্ আশা করা যায় ইহা সত্ত্বেও ডাক্তার আমি কোন না কোন সুত্র ধরিতে পারিব।"

(২)

আমরা ওয়ার্ড স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "মহারাজা ও দেওয়ান আসিয়াছেন,—আপনার অফিস ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

রাম অক্ষয়বাবু বলিলেন, "ভালই হইয়াছে—আসুন—আলাপ হইবে।"

আমরা গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—মহারাজা একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকটে বিমলাকান্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেখিলেই মহারাজকে অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয়,—বিমলাকান্ত অতি যুবক, তবে দেখিলে অতি বুদ্ধিমান বলিয়া জানিতে পারা যায়! তিনিই প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "রাম অক্ষয়বাবু সকালেই আপনার কাছে আসিয়াছিলাম,—কিন্তু তখন আপনি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম আপনি এই অনুসন্ধানের ভার দিবার জন্য গোবিন্দরামবাবুর নিকট গিয়াছেন। আপনি মহারাজাকে না জানাইয়া এ কাজ করায় মহারাজা বিশেষ বিস্মিত হইয়াছেন।"

রাম অক্ষয়বাবু বলিলেন, "যখন দেখিলাম পুলিশ কিছুই করিতে পারিল না—"

"পুলিশ যে কিছুই করিতে পারিল না, এ কথা মহারাজ বিশ্বাস করেন না।"

"কিন্তু—"

"আপনি জানেন যে, মহারাজা এ সম্বন্ধে গোলযোগ হয়—লোক জানাজানি হয়, তাহা একেবারেই ইচ্ছা করেন না।"

"তাহাই যদি হয়,—গোবিন্দরামবাবু ফিরিয়া যাইতে পারেন।"

গোবিন্দরাম অতি সরলচিত্তের ন্যায় বলিলেন, "যখন এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছি, তখন এদিকটা একটু বেড়াইয়া যাইব।"

রাম অক্ষয়বাবু কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না,—নীরব রহিলেন,—তখন স্বয়ং মহারাজা কথা কহিলেন;—বলিলেন, "রাম অক্ষয়-বাবু, বিমল যাহা বলিল, তাহা ঠিকই বলিয়াছে। আমাকে না জানাইয়া আপনার কিছুই করা উচিত ছিল না। যাক যখন গোবিন্দরামবাবু কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন,—তখন তাহার সাহায্য না গ্রহণ করাও যুক্তি সঙ্গত কাজ হইবে না। গোবিন্দরামবাবু আপনি যদি আমার ছেলের সন্ধান করিতে পারেন,—তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরঋণী রহিব।"

"আমার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। সম্ভবমত আমি বেলা আটটায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব,—এখন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি?"

"করুন। আমি ও বিমল যাহা যাহা জানি সমস্তই বলিতেছি।"

"আপনার ছেলের এইরূপ আশ্চর্য্য নিরুদ্দেশের আপনি কি কারণ মনে করেন?"

"আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।"

"কিছু মনে করিবেন না,—যথার্থ এ বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার যদি আমার উপর দেন, তবে সকল কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—মহারাণী এ সম্বন্ধে জড়িত আছেন বলিয়া কি আপনার বোধ হয়?"

মহারাজা স্পষ্টতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তৎপরে বলিলেন, "না,—আমার বোধ হয় না।"

"দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে, টাকা আদায় করিবার জন্য কেহ কুমারকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। আপনি কি সেরূপ কোন চিঠি পাইয়াছেন?"

"না—সেরূপ কোন চিঠিও পাই নাই।"

"আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে?' সেই দিন আপনি কি আপনার ছেলেকে পত্র লিখিয়াছিলেন?"

"হাঁ—লিখিয়াছিলাম।"

"চিঠিতে এমন কিছু কি ছিল যাহাতে কুমার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইতে পারেন?"

"না—কিছুমাত্র না।"

"আপনি কি নিজে পত্র ডাকে দিয়াছিলেন ?"

এই প্রশ্নে মহারাজার দেওয়ান বিমলাকান্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মহারাজা নিজে চিঠি ডাকে দিবেন—আপনি কি পাগল হইয়াছেন ? মহারাজা পত্র আমায় দিয়াছিলেন,—আমি দরোয়ান দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।"

"ইহাতে আপনার ভুল হয় নাই ?"

"ভুল ! আপনি কি বলিতেছেন,—আপনার কথার কোন অর্থ নাই।"

গোবিন্দরাম তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সেদিন ক'খানা চিঠি লিখিয়াছিলেন ?"

মহারাজা ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় তিন চারখানা হইবে, এ সব প্রশ্নের অর্থ কি ?"

"একটু আছে।"

"যাহাই হউক আমার বিশ্বাস আমার স্ত্রী কখনই আমার ছেলেকে স্কুল হইতে পলাইতে পরামর্শ দেয় নাই,—তবে আমার বিশ্বাস সে মায়ের কাছে যাইবার জন্য পালাইয়াছে ;—আর এই মাষ্টার তাহার সঙ্গে গিয়াছে। রাম অক্ষয়বাবু, তাহা হইলে এখন চলিলাম,—যদি কোন নূতন সংবাদ পান জানাইবেন।"

আমি বুঝিলাম গোবিন্দরাম মহারাজাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার এই কথায় নিরস্ত হইলেন। অভিবাদন করিয়া মহারাজা দেওয়ানের সহিত বিদায় হইলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে গোবিন্দরাম কুমারের শয়ন গৃহ;—মাষ্টার রাধা বিনোদের ঘর,—সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,—তাহার পর তিনি আমাকে স্কুলে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন। রাম অক্ষয়বাবু আমাদের একটী ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই ঘরে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম,—গোবিন্দরাম আসিয়া কোন কথা না কহিয়া এক খানি কি নক্সা দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "ডাক্তার, —ব্যাপারটার ভিতর রহস্য আছে—রহস্য আছে—এই নক্সা খানা তোমায় ভাল করিয়া দেখিতে আমি অনুরোধ করি—দেখ এই কাল দাগটা ওয়ার্ডের স্কুল,—তাহার পর এইটা বড় সদর রাস্তা, অন্য কোন রাস্তা নাই ;—সুতরাং কুমার আর মাষ্টার এই রাস্তা দিয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "কাজেই—যখন অন্য কোন রাস্তা নাই।"

"সে দিন রাত্রে এই রাস্তায় কে গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি।"

"কিরূপে ?"

"রাস্তার এইখানে একজন পাহারাওয়ালা পাহারায় ছিল—সে বলে সে একবারও এইখান হইতে অন্যত্র যায় নাই; সুতরাং কেহ এইদিক দিয়া গেলে সে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইত। আমি এই কনষ্টেবলের সঙ্গে দেখা করিয়াছি,—সে যে সত্য কথা বলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সুতরাং বোঝা গেল কুমার বা রাধাবিনোদ মাষ্টার এদিক দিয়া যায় নাই—বাঁদিকে রাস্তার শেষে হরি গোয়ালার ঘর,— তাহার স্ত্রীর সে রাত্রে কলেরা হইয়াছিল,—লোক ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল,—ডাক্তার আসিতেছিল কিনা দেখিবার জন্য হরি গোয়ালা ঘন ঘন বাহিরের পথ দেখিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে সমস্ত রাত্রিই লোক জাগিয়াছিল,—তাহাদের সকলকেই আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা বলে কাহাকেও পথ দিয়া যাইতে দেখে নাই,—সুতরাং তাহাদের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়,—তাহা হইলে মাষ্টার ও কুমার এদিক দিয়া যায় নাই।"

"আমি বলিলাম, বাইসিকেলের কি হইল ?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, হাঁ,—বাইসিকেলের কথাও বলিতেছি। যদি ইহারা এই পথ দিয়া না গিয়া থাকে তবে স্কুল বাড়ীর হয় সম্মুখের বা পশ্চাতের মাঠের পথে গিয়াছে, বাড়ীর সম্মুখে তরকারির বাগান,—সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া বাইসিকেলে যাওয়া সম্ভব নহে,—কাজেই বুঝিতে হইবে যে, তাহারা স্কুলের পিছনের মাঠের পথে গিয়াছে,—পিছনে অনেকদূর পর্য্যন্ত খোলামাঠ, মাঝে মাঝে দুই একটা গাছ আছে,—খানিকটা জায়গা জলার মত,—এই দিকটাই আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

"কিন্তু বাইসিকেল—"

"যে ভাল চড়িতে পারে—সে অনায়াসে মাঠের ভিতর দিয়া বাইসিকেলে যাইতে পারে। বিশেষতঃ মাঠের ভিতর সরু পথ আছে, রাত্রেও বেশ জ্যোৎস্না ছিল, একি আবার—"

এই সময়ে একখানা রুমাল হস্তে রাম অক্ষয়বাবু গৃহ মধ্যে আসিলেন। সোৎসাহে বলিলেন, "এতক্ষণে একটা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,—কুমারের কিছু সন্ধান হইয়াছে, এখানা তাঁহার রুমাল।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় এখানা পাইলেন ?"

"আমার স্কুলের পেছনে যে মাঠ আছে,—সেইখানে ক'দিন হইল একজন বেদে আসিয়াছিল। তাহাদের কাছে এখানা পাওয়া গিয়াছে !"

"তাহারা কি বলে ?"

"প্রথমে কিছুই বলিতে চায় না,—তাহার পরে ভয় দেখাইলে বলে যে, তাহারা মাঠে রুমালখানা কুড়াইয়া পাইয়াছে। নিশ্চয়ই বদমাইশ বেটারা জানে যে, কুমার কোথায় আছেন। যাক, পুলিশ তাহাদের গ্রেফতার করিয়াছে। পুলিশের ভয়ে হউক আর মহারাজার টাকার লোভেই হউক, তাহারা নিশ্চয়ই শীঘ্র সত্য কথা বলিবে।"

রাম অক্ষয়বাবু চলিয়া গেলে গোবিন্দরাম বলিলেন, "যাক—এ খবরটা মন্দ নয়। অন্ততঃ এখন স্থির হইল স্কুলের পেছনের মাঠের পথ দিয়াই তাহারা গিয়াছে,—চল দেখা যাক যদি কিছু জানা যায়।"

গোবিন্দরাম আর সে অলস প্রকৃতির উৎসাহ হীন গোবিন্দরাম নাই। তাহার চক্ষু হইতে সেই অনির্ব্বচনীয় তেজ নির্গত হইতেছে। সমস্ত দেহে যেন সহস্র উৎসাহ বিরাজিত হইয়াছে,—আমি বুঝিলাম গোবিন্দরাম প্রকৃতই কোন গুরুতর রহস্য ভেদ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।"

গোবিন্দরাম আমাকে স্কুলের পশ্চাতস্থ মাঠে লইয়া চলিলেন,—মাঠের মাটি লাল ছিল,—এই পথে বা এই মাঠের মধ্য দিয়া যদি তাহারা যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের পায়ের দাগ বা বাইসিকেলের চাকার দাগ থাকিত। আমরা সমস্ত মাঠ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম,—কিন্তু গরুর পায়ের দাগ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

গোবিন্দরাম হতাশভাবে ফিরিতেছিলেন,—সহসা বলিয়া উঠিলেন, "একি এটা কি ?

আমরা একটা সরু পথ ধরিয়া যাইতেছিলাম,—এই পথে আমরা সহসা স্পষ্ট বাইসিকেলের চাকার দাগ দেখিতে পাইলাম।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বাইসিকেলের দাগ সন্দেহ নাই,—কিন্তু আমরা যে বাইসিকেল খুঁজিতেছি,—সে বাইসিকেল নহে। সেখানার বিশেষ বিবরণ লইয়াছি—সেখানা সম্পূর্ণ নূতন,—আর দেখিতেছ এখানার চাকার রবারে তালি দেওয়া,—স্পষ্ট তালির দাগ মাটিতে পড়িয়াছে;—সুতরাং এখানা রাধাবিনোদ মাষ্টারের নহে।"

"তাহা হইলে কুমারের ?"

"তাহার বাইসিকেল ছিল না। দেখিতেছি এ বাইসিকেল স্কুল হইতে এইদিকে গিয়াছিল,—চাকার দাগে তাহা বেশ জানা যাইতেছে, দেখা যাক এই বাইসিকেল কোথা হইতে আসিয়াছে।"

আমরা দাগ ধরিয়া চলিলাম,—কোনখানে দাগ আছে,—কোনখানে নাই,—কোন কোন স্থানে গরুর পায়ের দাগে চাকার দাগ ঢাকিয়া গিয়াছে। আমরা দাগ ধরিয়া ধরিয়া স্কুলের পশ্চাতস্থ মাঠের নিকট আসিলাম। গোবিন্দরাম সেইখানে এক বৃক্ষতলে বসিলেন,—বহুক্ষণ তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, হাঁ—সম্ভব! পাছে দাগ দেখিয়া চিনিতে পারা যায়, এই জন্য বাইসিকেলের রবারটা যে বদলাইবে,—তাহা অসম্ভব নহে। তবে যে লোকের মনে এ কথা উঠিতে পারে,— তাহাকে ধরিতে পারিলে আমি প্রকৃতই হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিব। যাহাই হউক, এ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাকুক,—এখনও মাঠের শেষ দিকটা দেখা হয় নাই,—ডাক্তার তাহাই এখন দেখা যাক।"

আমরা মাঠের শেষাংশে আসিলে গোবিন্দরাম উচ্চ আনন্দধ্বনি করিলেন,—আঙ্গুল দিয়া পথ দেখাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছ,—এ আর তালি দেওয়া বাইসিকেল নহে,—নূতন—সুতরাং মাষ্টার রাধাবিনোদের,—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই—এস দেখা যাক মাষ্টার মহাশয় কতদুর গিয়াছিলেন।"

আমরা এই দাগ ধরিয়া চলিলাম,—কখনও দাগ স্পষ্ট,— কখন অস্পষ্ট,—কখনও একেবারে নাই,—যাহা হউক৷—আমরা এই দাগ ধরিয়া অনেকদূর আসিলাম,—গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার দেখিতেছ লোকটা এইখানে আসিয়া খুব জোরে গাড়ী হাকাইয়াছিল, সম্মুখের চাকা বসিয়া গিয়াছে, ইহাতে বোঝা যায় গাড়ী চালাইবার সময় সে সম্মুখে খুব ঝুকিয়াছিল,—জোরে যাইতে ইচ্ছা না করিলে কেহ এরূপ করে না। একি—দেখিতেছি,—এইখানে লোকটা পড়িয়া গিয়াছিল যে!"

এইখানে খানিকটা যায়গায় একটা বড় দাগ পড়িয়াছে,—লোকের পায়ের দাগও দেখা যাইতেছে,—তাহার পরে আবার গাড়ীর চকার দাগ পড়িয়াছে।

গোবিন্দরাম দুই তিনটা গাছের শুকনা পাতা তুলিয়া লইয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি সভয়ে দেখিলাম সেগুলি রক্তে রঞ্জিত, পথের পার্শ্বেও স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ভাল নয়,—গতিক ভাল নয়,—ডাক্তার সরে দাঁড়াও,—পায়ের দাগ ওখানে ফেলিও না,—ইহাতে আমি কি বুঝিতেছি? বুঝিতেছি যে, লোকটা আঘাতিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর সে উঠিয়া আবার গাড়ীতে চড়িয়াছিল,—তাহার পর অগ্রসর হইয়াছিল,—কিন্তু আর দাগ নাই,—কেবল গরুর পায়ের দাগ! কোন ষাঁড়ে তাহাকে গুতায় নাই তো,—রাত্রে ইহা সম্ভব নহে,—আর কোন চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না,—চল ডাক্তার,—আরও আগে,—এখন বোধ হয় তাহাকে বাহির করা শক্ত হইবে না।"

আমরা আরও অগ্রসর হইলাম,—পার্শ্বে একটা ঝোপ,—তাহার ভিতর কি একটা দেখা যাইতেছিল,—গোবিন্দরাম তাহা টানিয়া বাহির করিলেন,—সেখানা একখানা বাইসিকেল—নূতন,—কিন্তু সম্মুখের চাকাটা প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমরা ঝোপ ঠেলিয়া চলিলাম,—ঝোপের পার্শ্বেই একটা নালা,—সেই নালার ভিতর একজনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—দেহ প্রায় পচিয়া উঠিয়াছে, শৃগাল ও শকুনে দেহের অনেক স্থান শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা উভয়েই সেই গলিত মৃত দেহের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। গোবিন্দরাম অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই মৃত দেহটার আপাদমস্তক একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ঐ দূরে একটা লোক কি করিতেছে, শীঘ্র উহাকে ডাকিয়া আন,—এখনি পুলিশে খবর দিতে হইবে।"

আমি বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, গোবিন্দরামের কথায় চমক ভাঙ্গিল, আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলাম। গোবিন্দরাম ততক্ষণে তাহার নোট বইয়ের খাতা ছিঁড়িয়া রাম অক্ষয়বাবুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে দিয়া সেই পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

সে চলিয়া গেলে গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার আমরা দুইটি সূত্র পাইয়াছি; এক—এই বাইসিকেল—নূতন—আর এক বাইসিকেল—তালিযুক্ত! এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক, আমরা এ পর্য্যন্ত কি কি জানিতে পারিয়াছি।

"প্রথম এই—কুমার স্বইচ্ছায় স্কুল হইতে চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই দড়ি ঝুলাইয়া সে জাঁনালা দিয়া নিচে নামিয়া পড়িয়াছিল। তার পর সে হয় একাকী, নয় অপর কাহারও সঙ্গে পলাইয়াছে। এটাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

"খুব সম্ভব।"

"এখন মাষ্টারের বিষয় দেখা 'যাক্। কুমার জামা, কাপড়, জুতা পরিয়া গিয়াছে,—সুতরাং বোঝা যায় যে, সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছে,—যাই-বার জন্যই 'পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মাষ্টার জামা, জুতা লয় নাই,—ইহাতে বোঝা যায় সে তাড়াতাড়ি যাইতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্যই ইহার একটা কারণ আছে!"

"নিশ্চয়ই।"

"এখন জিজ্ঞাস্য,—সে কেন গিয়াছিল? বোধ হয় সে তাহার ঘর হইতে কুমারকে পালাইতে দেখিয়াছিল,—তাই সে তাহাকে ধরিয়া আনিতে তাড়া-তাড়ি বাইসিকেলখানা লইয়া কুমারের পশ্চাতে ছুটিয়াছিল। তাহার পর সহসা সে খুন হইয়াছে।"

"এই রকমই তো বোধ হয়।"

"এখন কথা হইতেছে,—রাধাবিনোদ তাড়াতাড়ি বাইসিকেলে উঠিয়াছিল কেন? হঠাৎ কাহাকেও ধরিতে গেলে লোকে ছুটিয়া থাকে,—রাধাবিনোদ তাহা না করিয়া গাড়ী লইল কেন? ইহাতেই বোঝা যায় কুমার হাটিয়া যায় নাই,—অন্য কিছুতে গিয়াছিল।"

"তাই আর এক খানা বাইসিকেল।"

"দেখা যাক পরে কি ঘটিল। রাধাবিনোদ স্কুল হইতে অনেক দূরে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া খুন হইল। গুলিতে খুন হয় নাই দেখিতেছ, কোন বলবান লোক লগুড়াঘাতে ইহার মাথা চূর্ণ করিয়াছে,—ইহাতে বোঝা যায় কুমারের সঙ্গে লোক ছিল। অথচ গরুর পায়ের দাগ ব্যতীত আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না।"

"ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"কিসে—অসম্ভব দেখাইয়া দেও।"

"পড়িয়া গিয়াও তাহার মাথা ফাটিয়া যাইতে পারে।"

"কি এই নরম মাটিতে ডাক্তার?"

"সত্যই আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কেন ডাক্তার,—ইহাপেক্ষাও কঠিন সমস্যার আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি। এস এখন দেখা যাক এই তালিযুক্ত বাইসিকেলই বা কোথায় গিয়াছে।"

আমরা দাগ ধরিয়া ধরিয়া একটা বড় রাস্তায় উঠিলাম,—তাহার পর আর দাগ নাই,—রাস্তায় দাগ থাকিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

রাস্তার একটু দূরে একটা ছোট একতালা বাড়ী,—গোবিন্দরাম একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ইহা গোবিন্দ কামারের কারখানা—সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে।

তাহার বাড়ীর দরজায় আসিয়া—গোবিন্দরাম যেন দারুণ যন্ত্রণায় বসিয়া পড়িলেন। দরজায়ই গোবিন্দ স্বয়ং উপস্থিত ছিল,—তাহাকে দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "কেমন আছেন কামার মহাশয় ?"

গোবিন্দ কামার ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কে বাবু,—তুমি ?"

"মানুষ—একখানা গরুর গাড়ী পাওয়া যায় ?"

"না—এখানে নয়।"

"আমার পায় হঠাৎ বাত ধরিয়াছে,—চলিতে পারিতেছি না।"

"তবে বসো।"

"বসিবার ক্ষমতা নাই।"

"তবে লাফাও।"

গোবিন্দরাম কামার মহাশয়ের রূঢ়তায় কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিলেন না,—সহাস্যে বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—কি রকমে যাইব,—বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমিও না!"

"আমি বেলেঘাটা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য একখানা গরুর গাড়ীকে দুই টাকা দিতে রাজি আছি—কি করি,—উপায় ?"

"বেলেঘাটায়—কোথায় ?"

"মহারাজের বাড়ী ?"

"ওঃ—কেন ?"

"তাহার—ছেলের খবর দিতে ?"

"ও—তাহা হইলে তাহার খবর পাওয়া গেছে ?"

"হাঁ—কাশীতে কুমার ধরা পড়েছেন,—দুই এক দিনের মধ্যে এখানে পৌঁছিবেন।"

"ভাল শুনে খুসি হলেম—তাহা হ'লে দু টাকা—"

"হা—দু'টাকা দিব—চলিবার ক্ষমতা নাই।"

"এইখানে বসো,—গাড়ীর জোগাড় দেখ্‌চি।"

সে চলিয়া গেল, গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা বলিয়া

উঠিলেন, "ডাক্তার,—বোধ হয় ঠিক অনুমান করিয়াছি,—হাঁ নিশ্চয়ই আমার ভুল হয় নাই। ডাক্তার,—মাঠে গরুর পায়ের অনেক দাগ দেখিয়াছ, মনে পড়ে ?"

"হাঁ—অনেক।"

"কোথায় ?"

"প্রায় মাঠময়,—পথে,—মৃতদেহের কাছে, ঝোপের পাশে—"

"ঠিক কথা,—কিন্তু আসিতে আসিতে কটা গরু দেখিলে ?"

"কই—একটাও নয়।"

"আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্যজনক নয় কি ? বরাবর অনেক গরুর পায়ের দাগ দেখিলাম—অথচ একটা গরুও দেখিলাম না,—আশ্চর্য্য !"

হাঁ—এটা আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই।"

"এখন ডাক্তার,—সেই দাগ গুলা মনে কর দেখি।"

হঁা—মনে হইতেছে।"

"দাগ গুলা কতকটা এই রকম নয়। ঃ: ঃঃ ঃঃ

কখন বা এই রকম ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ

আর মাঝে মাঝে এই রকম .ঃ ∴ ◦

মনে পড়ে ?"

"না—এত লক্ষ্য করি নাই।

"আমি করিয়াছি। যাহা হউক পরে আবার দেখিলেই চলিবে—আমি নিজে গরু না হইলে বহু পূর্ব্বেই এই গরুর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতাম।"

"কি বুঝিতে পারিতে ?"

"কেবল এই—যে গরুটা এক রকম অদ্ভুত সন্দেহ নাই। কারণ এই গরু কখনও চলে,—কখনও বা দৌড়ায়,—কখনও বা কদমে যায়—এ বুদ্ধি সহজ বুদ্ধি নয়,—কামার এখন নাই,—এস দেখা যাক,—যদি কিছু দেখিবার থাকে।"

পাকা একখানা চালা ঘরে একটা ঘোড়া ছিল,—গোবিন্দরাম তাহার পা দেখিয়া বলিলেন, "পুরাণ নাল,—তবে নূতন পরাণ,—দেখিতেছ না পেরেক গুলা নূতন। এস কামারখানা দেখা যাক।"

আমরা কামারখানায় আসিলাম,—সেখানে কেবল একজন লোক কাজ করিতেছিল,—সে আমাদের লক্ষ্য না করিয়া নিজ কাজ করিতে লাগিল। এই

সময়ে পশ্চাতে পদ শব্দ হওয়ায় আমরা ফিরিলাম,—দেখি—কামার মহাশয়, —তাহার হস্তে এক লগুড়,—সে এমনই ভয়াবহ ভাবে আমাদের দিকে চাহিল যে আমি সত্বর পিস্তলে হস্ত স্থাপন করিলাম।

সে রাগতস্বরে বলিল, "তোরা এখানে কি জন্যে—কি দেখিতেছিস্ ?"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কামার মহাশয় আপনি যে ভাবে কথা কহিতেছেন তাহাতে অপরে ভাবিবে আপনি যেন আপনার কাজ কর্ম্ম দেখাইতে ভয় করেন।"

কামার কষ্টে আত্মসংযম করিল,—বলিল, "ভয়—ভয়টা কি—দেখ না। যাও,—শীঘ্র চলে যাও।"

"তাই—হউক,—এখন আমি হটিয়া যাইতে পারিব।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন, লোকটা কঠোর ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা মোড় ঘুরিলেই গোবিন্দরাম দাঁড়াইলেন ;—বলিলেন, কামারের খুব মিষ্ট স্বভাব সন্দেহ নাই ;—যাহা হউক,—এ স্থান ছাড়িয়া আমি যাইতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "আমার বিশ্বাস যে এই কামার সব জানে। এমন ভয়ানক বদমাইশী চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই।"

আমরা গাছের আড়ালে লুকাইতে না লুকাইতে এক ব্যক্তি বাইসিকেলে আমাদের পার্শ্ব দিয়া মহা বেগে চলিয়া গেল। পথের ধূলিরাশির মধ্যে আমি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত,—মুখ উন্মুক্ত,—কেশ উত্থিত,—নিতান্ত ভয় না পাইলে কাহারও এরূপ অবস্থা হয় না। আমরা বিমলাকান্তকে কাল দেখিয়াছি! কিন্তু এক্ষণে তাহার মুখ দেখিলে তাহাকে আর চিনিতে পারা যায় না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "মহারাজার দেওয়ান। এস ডাক্তার, দেখি ও কোথায় যায়।"

আমরা দুই জনে অগ্রসর হইলাম,—সে দিকে গোবিন্দ কামারের বাড়ী ছাড়া আর কাহারও বাড়ী ছিল না,—তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল,— আমরা দেখিলাম, বাইসিকেলখানা দরজায় রাখিয়া বিমলাকান্ত কামারের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছে।

তাহার বাড়ীর নিকটে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না,—এক টু

অপেক্ষা করিতেই দেখি,—একটা লোক একটা ঘোড়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিল,তার পর সে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে বেলেঘাটার দিকে ছুটিল।

গোবিন্দরাম মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝিলে ডাক্তার ?"

আমি উত্তর করিলাম, "বোধ হয় কেহ পলাইতেছে ?"

"যেই হউক সে বিমলাকান্ত নয়,—সে ঐ দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

যথার্থই বিমলাকান্ত দরজায় দাঁড়াইয়া আছে,—ভিতরে এখন আলো জ্বালান হইয়াছে—সেই আলোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—সে যেন অন্ধকারে কাহাকে দেখিবার চেষ্টা পাইতেছে—আমরা দুই জনে পা টিপিয়া টিপিয়া কামারের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম,—কিন্তু সহসা পদ শব্দ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম।

এক ব্যক্তি কামারের বাড়ীর দ্বারে আসিল—পর মুহূর্ত্তেই বিমলাকান্ত তাহাকে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল—ইহার একটু পরেই একটা জানালা হইতে আলো দেখা যাইতে লাগিল।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এ সময়ে এই কামারের বাড়ী বিমলাকান্ত কাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে ? ডাক্তার,—ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইল,—এস।"

আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া কামারের বাড়ীর দ্বারে আসিলাম,—বাইসিকেল খানা তখনও দ্বারে রহিয়াছে। গোবিন্দরাম একটা দেশলাই জ্বালিয়া চাকা দুইটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন,—তিনি আনন্দধ্বনি করিয়া চাকার এক স্থানে অঙ্গুলি দিয়া আমায় দেখাইলেন। আমি দেখিলাম সেই চাকায় একটা তালি রহিয়াছে।

একটু দূরে উচ্চ ক্ষুদ্র জানালার ভিতর দিয়া আলো আসিতে ছিল।—গোবিন্দরাম বলিলেন, "ঘরে কে আছে দেখিতে হইল,—জানালাটা উঁচু,—তুমি যদি দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইতে পার,—তাহা হইলে আমি তোমার কাঁধে উঠিয়া দেখিতে পারি।"

আমি প্রাচীর ধরিবা মাত্র গোবিন্দরাম আমার স্কন্ধে উঠিলেন,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এস ডাক্তার হয়েছে। যাহা জানিবার তাহা জানা গিয়াছে—চল রাত হইতেছে।"

তিনি কোন কথা না কহিয়া নীরবে সেয়ালদা ষ্টেশনে আসিলেন,—সেখানে খান কয়েক টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৪)

পর দিন সকালে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বেলেঘাটার মহারাজার বাড়ী আসিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী—সুন্দর বাগান,—আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিলে বিমলাকান্ত অগ্রসর হইয়া আসিল,—এখন তাহার মুখে কাল সন্ধ্যার বিভিষীকার ভাব নাই। তবুও বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই।

বিমলাকান্ত অতি সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আপনারা মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন,—কিন্তু শরীর ভাল নহে, কাল যাহা দেখিতে পাইয়াছেন,—সে সংবাদ এখানে পৌঁছিয়াছে,—ইহাতে মহারাজ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।''

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বিমলকান্ত বাবু,—মহারাজার সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক।"

"তিনি শুইয়া আছেন।"

"তাহা হইলে সেই অবস্থায়ই দেখা করিতে হইবে।"

গোবিন্দরামের দৃঢ়ভাব দেখিয়া বিমলকান্ত বুঝিল যে তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করা বৃথা,—সে বলিল, "আচ্ছা আমি সংবাদ দিতেছি,—তিনি কি বলেন জানাইতেছি।"

বিমলাকান্ত ভিতরে চলিয়া গেল,—তৎপরে আধ ঘণ্টার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া মহারাজার বসিবার ঘরে লইয়া গেল।

মহারাজ আমাদের বসিতে বলিয়া বলিলেন, "তারপর,—গোবিন্দরাম বাবু ?"

গোবিন্দরাম বিলকান্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আপনার দেওয়ান মহাশয় এখানে না থাকিলে বোধ হয় ভাল হয়।"

বিমলাকান্ত বিরক্ত ও রুষ্ট ভাবে আমার বন্ধুর দিকে চাহিল—তৎপরে বলিল,—"মহারাজা হুকুম করিলে—"

মহারাজা বলিলেন, হাঁ—হাঁ—তুমি যাও—"

সে চলিয়া গেলে মহারাজা বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু কি বলিতে চাহেন —বলুন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "রাম অক্ষয় বাবু আমাকে ও আমার বন্ধুকে বলিয়াছেন যে এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে আপনি পুরস্কার দিতে চাহিয়াছেন আপনার মুখে এ কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

"নিশ্চয়ই—পুরস্কার দিব।"

"আপনার ছেলের সন্ধান দিতে পারিলে পাঁচ হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছেন ?"

"হাঁ—বলিয়াছি।"

"আর যাহারা কুমারকে ধরিয়া রাখিয়াছে,—তাহাদের ধরাইয়া দিলে আর পাঁচহাজার টাকা দিবেন ?"

"হাঁ—এ কথাও বলিয়াছি।"

"তাহা হইলে মহারাজ টাকাটা দিবার হুকুম করুন।"

মহারাজা ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, "আপনি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করিতে আসিয়াছেন ?"

"কৌতুক জীবনে করি না।"

"তাহা হইলে আপনি কি বলিতেছেন।"

"এই বলিতেছি যে আমি আপনার ছেলের সংবাদ পাইয়াছি,—সুতরাং পুরস্কারের টাকাটা পাইবার অধিকার হইয়াছে। আপনার পুত্র কোথায় আছেন তাহা আমি জানি,—কে তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে—তাহাও আমি জানি।"

মহারাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল,—তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কুমার কাথায় ?"

"তিনি এখন এখানে আছেন—অন্ততঃ কাল সন্ধ্যার পর ছিলেন—গোবিন্দ কামারের বাড়ী।"

মহারাজার যেন কণ্ঠ রোধ হইল,—তিনি কষ্টে বলিলেন, "কে—কে তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে ?"

গোবিন্দরাম সত্বর উঠিয়া মহারাজার নিকটস্থ হইলেন,—তাহার পর তাহার সম্মুখে হস্ত উত্তলিত করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকেই দোষী বলি—আপনিই আপনার ছেলেকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন।"

এই অত্যাদ্ভুত কথায় মহারাজা—লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার যে অবস্থা হইল,—সে অবস্থা আমি আর কখনও কাহারও হইতে দেখি নাই,—কিন্তু তিনি শীঘ্রই আত্ম সংযম করিয়া বসিলেন, "আপনি—আপনি কতদূর কি জানিয়াছেন ?

"আপনার বন্ধু ব্যতীত আর এ কথা কেহ জানে ?"

"না—কেহই না।"

"গোবিন্দরাম বাবু,—যখন আমি পুরস্কার দিতে চাই,—তখন আমি জানিতাম না যে, এই ব্যাপার কিরূপে ঘটিয়াছে,—এখন আপনি যে সংবাদ দিলেন,—তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না,—কিন্তু আমি কথার অন্যথা করিব না,—যাহা পুরস্কার দিব বলিয়াছি তাহা দিতেছি,—তাহার পর আমার বিশ্বাস আপনি ও আপনার বন্ধু এ বিষয় গোপন রাখিবেন।"

"কিন্তু মহারাজ—এত সহজে কাজ মিটিতেছে কই। সেই মাষ্টারটি খুন হইয়াছে।"

তাহা সত্য,—"কিন্তু একজন একটা কুকাজ করিতে গেলে সে কিছুই জানে না,—সে খুনের সময় উপস্থিত ছিল না,—সে আইনানুসারে খুনের জন্য দায়ী হইতে পারে না—সে এ পর্য্যন্ত এই ভয়ানক কথার বিন্দুবিসর্গও জানিত না,—এ কথা শুনিবামাত্র সমস্ত কথা আমাকে বলিয়াছে; গোবিন্দরাম বাবু যেমন করিয়া হয় বিমলাকে আপনার রক্ষা করিতেই হইবে।"

মহারাজা আর কথা কহিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি এ কথা প্রকাশ না করিয়া যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহাতে আমি চিরঋণী রহিলাম,—যাহাতে এই কথাটি প্রকাশ না পায়—এখন তাহার উপায় কি বলুন।"

"আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক,—তবে সমস্ত কথা খুলিয়া না বলিলে কিছুই সম্ভাবনা নাই। আমি মহারাজার সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি,—কিন্তু সব জানিতে না পারিলে কি করিয়া বলিতে পারি তিনি খুন করেন নাই।"

"হাঁ—খুনি পালাইয়াছে।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ,—আপনি আমার কথা সবিশেষ জানিলে কখনও ভাবিতেন না যে কেহ কখনও আমার হস্ত হইতে পলাইতে পারে। গোবিন্দ কামার কাল রেলে ধরা পড়িয়াছে,—আমি তাহাকে ধরিতে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম—বর্দ্ধমানের পুলিশ তাহাকে ধরিয়া আমায় টেলিগ্রাফ করিয়াছে।

মহারাজা বিস্মিত ভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখিতেছি আপনার ক্ষমতার তুলনা নাই—তাহা হইলে গোবিন্দ কামার ধরা পড়িয়াছে! আমি তাহাতে দুঃখিত নই,—তবে বিমলা না বিপদে পড়ে।"

"আপনার দেওয়ান ?"

"না—আমার ছেলে !"

এবার গোবিন্দরাম বিস্ময়ে মহারাজার দিকে চাহিলেন—তিনি বলিলেন, "এ কথাটা সম্পূর্ণ নূতন সন্দেহ নাই—এ কথা আমি কখনও ভাবি নাই।"

মহারাজা বলিলেন, "আমি আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না,—ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার অদ্ভুত ক্ষমতায় আপনি বিমলাকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

"আমি গোপনে এক গরীবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলাম,—কিন্তু বংশের মর্য্যদার ভয়ে সে কথা প্রকাশ করিতে পারি নাই—এই স্ত্রীর গর্ভে বিমলার জন্ম হয়,—তাহার পর তাহার মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য খুব ভাল না বাসিলে আমি কখনই তাহাকে এরূপ ভাবে বিবাহ করিতাম না। তাহার মৃত্যু হইলে আমি বিমলাকে খুব ভাল লেখা পড়া শিখাই,—তাহার জন্য অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হই নাই। সে বড় হইলে তাহাকে বাড়ী আনিয়া দেওয়ান করিয়া রাখিয়াছি।

"যাহাই হউক কোন গতিকে বিমল তাহার জন্মের কথা জানিতে পায়,—সেই পর্য্যন্ত তাহার আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে এই কুমারের প্রতি আক্রোশ ! তাহার জন্যই আমার স্ত্রীর সহিত মনোবাদ ! তাহার বিশ্বাস তাহারই আমার সম্পত্তি পাওয়া উচিত,—যাহাতে সেই আমার সম্পত্তি পায়, এই জন্য সে বদমাইস গোবিন্দ কামারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কুমারকে সরাইতে চেষ্টা পায়। আমি ইহা সন্দেহ করিয়া ছিলাম, বলিয়াই তাহাকে ওয়ার্ডের স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

কিন্তু বিমলা ইহাতেও—নিরস্ত হইল না,—আমি যে পত্র কুমারকে লিখিয়াছিলাম, সে সেই পত্র না পাঠাইয়া আর একখানা পত্র লিখিয়াছিল,—তাহাতে লিখিয়াছিল যে মহারাণী কলিকাতায় আসিয়াছেন,—তিনি তাহাকে দেখিতে চান,—সকালে সে স্কুলের পিছনের বাগানে যাইবে—সেইখানে সব কথা হইবে।

তাহার পর সে তাহার বাইসিকেল করিয়া স্কুলের পিছনে গিয়াছিল,—সেখানে কুমারকে বলিয়া আসে যে রাত্রে একজন লোক ঘোড়া লইয়া

আসিবে—কুমার দড়ি ঝুলাইয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেই সেই লোক তাহাকে তাহার মার নিকট লইয়া যাইবে।

রাত্রে গোবিন্দ আবার ঘোড়া লইয়া যায়,—তাহার পর কুমার বাহির হইয়া আসিলে সে ঘোড়ায় তাহাকে চড়াইয়া—তাহাকে তাহার বাড়ীর দিকে লইয়া যায়,—সেখানে সে কুমারকে আটক করিয়া রাখে।

যখন আপনার সহিত আমি দেখা করি,—তখন এই পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। বিমলার মতলব ছিল আমি তাহার নামে অৰ্দ্ধেক সম্পত্তি উইল করিয়া দিলে সে কুমারকে আনিয়া দিবে,—কিন্তু পারে যাহা ঘটিল,—তাহাতে সে এ প্রস্তাব করিবার সময় পাইল না।

আপনারা এই মাষ্টারের মৃত দেহ দেখিতে পাইলেন,—বিমলা ইহার কিছুই জানিত না। বদমাইস গোবিন্দ কামারও তাহাকে কিছুমাত্র বলে নাই। এই ব্যাপারে সে ভীত হইয়া সব কথা আমায় বলিল,—তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি তাহাকে গোবিন্দ কামারের বাড়ী ছুটিয়া যাইতে বলিলাম।

তাহার পর শুনিলাম কুমার স্কুল হইতে বাহির হইলে এই মাষ্টার তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বাইসিকেলে বাহির হয়,—সে নিকটে আসিলে গোবিন্দ কামার লগুড় মারিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দেয়—তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন গোবিন্দ মৃত দেহটাকে খানায় ফেলিয়া দিয়া কুমারকে নিজ বাড়ী লইয়া আসে।

বিমলা গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া পালাইতে বলে—সে তৎক্ষণাৎ পালায়, তাহার পর, সন্ধ্যার পর আমি কুমারকে দেখিতে যাই, দিনে গেলে কেহ কিছু সন্দেহ করিবে বলিয়া যাই নাই।

এখন কুমারকে আনিলে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, বিমলা পুনঃ পুনঃ এ কথা বলায়,—আমি আরও তিন দিন কুমারকে সেখানে রাখিতে স্বীকার করিলাম, গোবিন্দ কামারের স্ত্রী তাহাকে যত্নেই রাখিয়াছে। এখন গোবিন্দরাম বাবু, আমি আপনাকে সকলই বলিলাম,—আশা করি আপনিও আমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করিবেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমার কাছে সমস্তই খোলাখুলি মহারাজ, আপনাকে আমার প্রথমেই বলা উচিত যে, আইনানুসারে আপনি ঘোর অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আপনি খুনির সাহায্য করিয়াছেন—খুনীকে

পলাইতে দিয়াছেন,—নিশ্চয়ই তাহাকে টাকা দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন।

মহারাজা কোন কথা কহিলেন না, গোবিন্দরাম বলিলেন, "এই সমস্ত বড়ই গুরুতর ব্যাপার—তাহার উপর আপনি আপনার ছেলেকে এখনও এইখানে আসিতে দিতেছেন না।"

"তাহারা শপথ করিয়াছে।"

"এ সকল লোকের শপথের মূল্য কি ?"

"কে জানে যে তাহারা কুমারকে অন্যত্র সরাইয়া ফেলে নাই। আপনার এই বদ বড় ছেলের জন্য আপনি এই ছেলেকে এখনও বিপদে রাখিয়াছেন।"

মহারাজা শোকে দুঃখে লজ্জায় কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আপনাকে সাহায্য করিতে আমি প্রস্তত আছি—কিন্তু আমি যাহা বলির,—তাহা করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।"

"বলুন—আপনি যাহা বলিবেন,—তাহাই করিব।"

"প্রথম আপনার চাকরকে ডাকুন।"

মহারাজা, কোন কথা না কহিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন,—সে আসিলে গোবিন্দরাম বলিলেন,—"গোবিন্দ কামারের বাড়ী কুমার আছেন—যাও—গাড়ী লইয়া তাহাকে এখনই ডাকিয়া আন।"

সে চলিয়া গেলে গোবিন্দরাম বলিলেন, "কুমারের ব্যবস্থা করিয়া এখন আমরা বিমলাকান্তের বিষয় আলোচনা করিতে পারি। আমি সরকারি চাকর নহি,—সুতরাং আমি কোন কথা বলিতে বাধ্য নহি,—তবে গোবিন্দ কামার, তাহার ফাঁসি হইবে, সে এ সম্বন্ধে কত দূর কি প্রকাশ করিবে জানি না,—তবে পুলিশ ভাবিবে যে সে টাকা আদায়ের জন্যই কুমারকে চুরি করিয়াছিল, এবং সে চুরি করিতে গিয়া খুন করিয়াছে। আপনি টাকা কড়ি দিলে বোধ হয় সে কোন কথা প্রকাশ করিবে না। যাহাই হউক,—আপনার বিমলাকান্তকে আর এক মুহূর্ত্তও নিকটে রাখা উচিত নহে।"

"সে আজই পশ্চিম রওনা হইবে,—সেখানে কাজ কর্ম্ম করিবে।"

"ভাল কথা, তাহার জন্যই আপনার স্ত্রীর সহিত মনোবাদ, এখন আপনার মহারাণীকে এখানে আনিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত নহে।"

"আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি। তাঁহাকে আনিবার জন্য লোকও পাঠাইয়াছি।"

গোবিন্দরাম উঠিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমি ও আমার বন্ধু উভয়েই যে এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, ইহার জন্য আনন্দিত হইতে পারি। আর একটী বিষয় মাত্র জানিবার আছে। গোবিন্দ কামার তাহার ঘোড়ার পায় এক রকম নূতন ধরণের নাল পরাইয়াছিল,—ইহাতে মাটীতে ঘোড়ার পার দাগ না হইয়া গরুর পায়ের দাগ হইয়াছিল,—এ বুদ্ধি কি তাহার— না বিমলাকান্তের?"

এই কথায় মহারাজা অতি বিস্মিত ভাবে গোবিন্দরামের মুখের দিকে চাহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "এ রকম নাল কেবল আমাদের বাড়ীই আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রায়ই লড়াই করিতে হইত, তাঁহারা কোন পথে কোন দিকে যান, তাহা যাহাতে শত্রু পক্ষ না জানিতে পারে, সেই জন্য এই রকম নাল প্রস্তুত করিয়া ঘোড়ার পায় লাগাইতেন,—ইহাতে মাটিতে ঘোড়ার পায়ের দাগ না পড়িয়া গরুর পায়ের দাগ পড়িত। এই দেখুন।" বলিয়া মহারাজা আলমারি খুলিয়া গোবিন্দরামের হস্তে দুইটা ঘোড়ার নাল দিলেন। গোবিন্দরাম দেখিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া আর একটা অদ্ভুত দ্রব্য দেখিলাম।"

মহারাজ বলিলেন "প্রথমটী কি?"

গোবিন্দরাম নোটগুলি দেখাইলেন, বলিলেন, "মহারাজ,—আমি গরীব লোক।" তিনি মহারাজা প্রদত্ত নোট পকেটস্থ করিয়া বিদায় হইলেন।

সম্পূর্ণ।

"করুণা"

(১)

দুইদিন পরে আজ কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণা একটু কম পড়ায় মাধব তাহার স্ত্রী 'করুণা'কে ডাকিয়া বলিল—"করুণা, আর কেন?"

করুণা কি করিতেছিল। স্বামীর কথায় তাহার বুকের মধ্যে কি যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অভিমান-মিশ্রিত রাগের সহিত বলিল—"যাও ঐ এক কথা ছাড়া তুমি কি অন্য কথা জান না? যখন তখন কেবল ঐ এক কথা,—"আর কেন করুণা, আর কেন,"—কতবার না তোমায় বলেছি, ও কথা আমায় ব'ল না,—শুনলে আমার কষ্ট হয়। আর, তোমার পায়ে আশ্রয় নিয়ে থাকলে, তোমার যদি এত ভার বোধ হয় ত বল'না কেন, তোমার পায়ে এখুনি মাথা খুঁড়ে মরি।"

স্ত্রীর মুখে এইরূপ মধুমাখা ভৎর্সনা মাধবের কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। সে যে আজ দুই দিন অনাহারে আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তাহার মুখে দুঃখপূর্ণ আনন্দের হাসি ফুটিয়া ফুটিল না। বলিল—"না করুণা, তুমি বুঝ্‌ছ না। তুমি যেমন আমার উপর ভক্তির দাবী কর্‌ছ, আমিও তেমনি তোমার উপর স্নেহের দাবী কর্‌তে পারি ত? অবশ্য তুমি আছ ব'লে আমি যে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও স্বর্গ-সুখ অনুভব কর্‌ছি, আর তুমি বাপের বাড়ী গেলে আমি যে অল্পদিনের মধ্যেই ম'রে যাব' তা জানি,—কিন্তু—"

এই সময় করুণার চক্ষু ছল্‌ ছল্‌ করিতেছিল। স্বামীকে বাধা দিয়া বলিল —"তবে তুমি কেমন করে নিত্যি আমাকে বাপের বাড়ী যেতে বল'? হ'তে যদি মেয়ে মানুষ, তা হলে বুঝ্‌তে—স্বামী কি জিনিষ!—"

মাধব বলিল—"আঃ! আগে আমায় সব কথা ব'লতে দাও। বেশ তুমি ব'লছ, যদি নারী হ'তুম ত বুঝ্‌তুম,—স্বামী কি জিনিষ; কিন্তু তুমিও যদি পুরুষ হ'তে, তাহ'লে তুমিও বুঝ্‌তে—তোমার মত স্ত্রী, পুরুষের কত আদরের —কত সোহাগের!—করুণা! জানি না কোন্ পুণ্যবলে তোমার মত সাধ্বী সতীকে স্ত্রীরূপে পেয়েছি, আবার কোন্ মহাপাপে কুষ্ঠের যন্ত্রণায় দিনরাত ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছি। তাই সময় সময় আমার মনে হয় যে, যে ভাগ্যবান্ তোমার স্বামী, সেই হতভাগ্যেরই আবার এত যন্ত্রণা! ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পারি না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাগল হ'য়ে যাই। এর কারণ জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেউ বল্‌তে পারে না। করুণা আমার বুকে হাত দাও দিকি।" এই বলিয়া মাধব চুপ করিল। আরও কি বলিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারিল না।

করুণা তাহার বুকে হাত দিবে কি নিজের বুকে হাত দিয়া দেখিবে, বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে; তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে টস্‌ টস্‌ করিয়া দুই চারি ফোটা অশ্রু পড়িয়া গেল। পরে স্বামীর

মাথার নিকট বসিয়া তাহার মাথা আপনার কোলের উপর স্থাপন করিয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল।

মাধব যন্ত্রণায় আর কথা বলিতে পারিল না। শান্তিময়ীর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপিত হওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহার যন্ত্রণার কথঞ্চিত লাঘব করিল।

(২)

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে কি জানি কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া সহসা মাধব "করুণা করুণা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

করুণা শিয়রেই বসিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া কত কি ভাবিতেছিল। আজকাল যে তাহার ভাবনার শেষ নাই,--বিরাম নাই। ভাবিতেছিল, এ যাত্রা স্বামীকে কি করিয়া রক্ষা করিবে; ভাবিতেছিল, স্বামী যদি মারা যায়, তবে সেত তাহার অনুগামিনী হইবে। আরও ভাবিতেছিল, সেই নররূপী পিশাচ হরিশ গোমস্তার হাত হইতে কি উপায়ে আপনাকে, আপনার অমূল্য সতীত্ব-রত্নকে রক্ষা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চিন্তার এক একটা উপায়ও স্থির করিতেছিল। এমন সময় স্বামী "করুণা করুণা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বামী স্বপ্নে ভয় পাইয়াছে ভাবিয়া করুণা ব্যগ্রভাবে বলিল—"এই যে আমি এখানে,—কি হ'য়েছে?"

মাধবের নিদ্রা তখনও সম্পূর্ণ ভাল হয় নাই। নিদ্রাঘোরে বলিল--"এঁ্যা—এঁ্যা—হুঁ।" তারপর বলিল—"করুণা, তুমি কি সেই থেকে ব'সে আছ নাকি? —এখন বেলা ক'টা?"

"দেড়টা হবে।"

"তাই ত করুণা, কি একটা স্বপ্ন দেখ ছিলুম—মনে হচ্ছে না—হাঁ—হাঁ মনে হয়েছে, উঃ—কি ভয়ানক স্বপ্ন, হায়! যদি সত্যি হয়—" এই বলিয়া মাধব কাঁদিয়া ফেলিল।

করুণা আপন অঞ্চলে তাহার চোক মুছিয়া দিয়া বলিল—"ওগো, আপনার দেখ্‌লে পরের হয়। বল এখন, কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে।

"না করুণা, সে স্বপ্ন তোমার শুনে কাজ নেই। তোমার কাছে সে কথা মুখে আন্‌তেও আমার লজ্জা কচ্ছে—বুক ফেটে যাচ্ছে। শুন্‌লে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা পাবে—শুনে কাজ নেই।"

"আমি ত আর তোমার মত নই। না বললে বরং মনে করব', তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর না। বল, তোমার পায়ে পড়ি।"

"শুনবে ? শুনে অধীর হবে না—ভয় পাবে না ?"

"না, তুমি বল, আমি যেমন আছি ঠিক তেমনি থাকব।"

"স্বপ্নে দেখলুম—কে যেন তোমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্চে—লোকটা যেন যমদূত—"

শুনিয়া রাগে করুণার মনের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু মুখে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইল না। স্বাভাবিক ভাবে বলিল—"বাঃ! সত্যি নাকি ? বল বল তারপর,—তখন আমি কি ক'চ্ছিলুম ?"

"তুমি ? তুমি তখন ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাচ্ছিলে—"

এই কথা শুনিয়া করুণা কি ভাবিয়া বলিল—"না-না, আমি বোধ হয় তা করিনি। যাক্ ওসব কিচ্ছু না। স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?"

স্ত্রীর সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া মাধব বলিল—"না করুণা, তুমি বাপের বাড়ী যাও—কি জানি যদি সত্যিই হয়। বরাত মন্দ হ'লে আঁকা ময়ূরও জেন্ত হয়, তা'ত জান ?"

"আবার ঐ কথা! যাও—তুমি আমাকে একটুকুও ভালবাস না।"

এই বলিয়া করুণা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

* * * * *

"বেশ, তুমি যে বাপের বাড়ী যেতে চাইছ না, কিন্তু মনে কর দিকি, আমি আরও দশ দিন উঠতে না পারি—ভিক্ষে করে আনতে না পারি, তা' হ'লে কি হবে ? করুণা, আজ দুদিন যে তোমার পেটে কিছু যায় নি, সে কথা কি তোমার মনে নেই ?

এই কথায় করুণা বলিল—"তাই ত, আজ দুইদিন যে পেটে কিছু যায় নি—আমি কি এতক্ষণ পাগল হয়েছিলুম ?" এই বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় মাধব—"যাও কোথা ?" করুণা "আস্‌ছি" বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অঞ্চলে করিয়া কতকগুলি চিঁড়ে-মুড়কী লইয়া করুণা আবার সেই জীর্ণ তালপত্রাচ্ছাদিত গৃহটির মধ্যে প্রবেশ করিল। উপস্থিত স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে এক ছটাক জায়গার উপর এই জীর্ণ গৃহটী আছে

মাত্র। অনেক দিন পূর্ব্বে, যখন তাহাঁর শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত ছিলেন, তখন যাহা ছিল, এখন সে সকল কথা গল্পে পরিণত হইয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়া সে মাধবকে বলিল—"এখন উঠ, এই চিঁড়ে মুড়কী গুলো ভিজিয়ে দিই—খাও। পরে যা' হয় হবে এখন।"

"না, আমি খাব না। তুমি কিছু খাওনি—তুমি খাও।"

"আর তুমি বুঝি পেট ভরে খেয়েচ—না? নাও নাও উঠ, ঢের বেলা হ'য়ে গেছে। আমার মুখে আগুন যে এখনও তোমায় বকাচ্ছিলুম। উঠ শিগ্‌গির, নৈলে এখুনি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ব।"

"আচ্ছা উঠ্‌ছি, কিন্তু তুমি না খেলে আমি খাব' না।

"আচ্ছা আগে তুমি খাওত—"

"খাওত' নয়—বল' খাবে?"

"হঁা খাব'।"

(৩)

প্রাতঃকালে করুণাকে অঞ্চলে করিয়া কি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মাধব বলিল—"এমন চেয়ে চিন্তে আর ক'দিন চালাবে করুণা? বল্‌তে আমায় বারণ কর বটে, তোমাকে যাও বল্‌তেও আমার বুক ফেটে যায় বটে; কিন্তু না বল্‌লেও যে চলে না। তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি—আর আমার আশা কর না,—আর আমি বাঁচব না।

আজ আর করুণা স্বামীর কথায় জলিয়া উঠিল না। কিন্তু স্বামীর শেষ কথায় তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। বলিল—"বালাই! ও কথা মুখে এন' না। আমি বিধবা হব? তোমার পায়ে যদি এতটুকু ভক্তি থাকে, একদিনের জন্যেও যদি ভগবান্‌কে কায়মনে ডেকে থাকি, ত গর্ব্ব করে বল্‌তে পারি করুণা জীবিত থাকতে বজ্রাঘাতেও তার স্বামীর মৃত্যু নেই। দেখ আর এক কথা, তুমি আমায় বাপের বাড়ী যেতে বল। তোমার কি মনে নেই, যে দিন ভিক্ষেয় নিরাশ হ'য়ে, পেটের জালায় অস্থির হয়ে, মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে দু'টি ভাত চেয়েছিলে, সেইদিন ভাত দেবার বদলে মা তোমাকে কি বলে তাড়িয়েছিল। সেই মায়ের কাছে যাব আমি? যদি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে কর্‌তে হয়, যদি পরের বাড়ীর দাসী হ'তে হয়, যদি অনাহারে প্রাণ হারাতে হয়, সেও ভাল, তবু অমন মায়ের মুখ দেখব না।"

করুণা আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। মাধব অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

অল্প শান্তভাব ধারণ করিলে মাধব ধীরে ধীরে বলিল—"তবে পেট চল্‌বে কি করে ?"

করুণা কি ভাবিতে ভাবিতে বলিয়া ফেলিল—"সে ভাবনা তোমার না !"

"আমার না ! তবে আর কে ভাব্‌বে করুণা ?"

করুণা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"ভূল হ'য়েচে—ক্ষমা কর'। কিন্তু যা বলিছি, তা সত্যি—ভাবনা আমাদের না, যিনি আমাদের সৃজন ক'রেছেন—ভাবনা তাঁ'র।"

"তা ব'লে তিনি ত আর চাল ফুড়ে দিয়ে যাবেন না ?"

"যাবেন বৈ কি। চাল ফুড়ে ত তুচ্ছ কথা, একদিন তুমিই ত আমাকে ব'লেছিলে—সমুদ্রের ভিতরেও তিনি আহার যোগান। শুন্‌বে তবে ? আর আমাদের ভাবনা নেই,—হরিশ গোমস্তা আমার দুঃখে দুঃখিত হ'য়েছে, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, যখন যা দরকার হ'বে, তখন তাই পাব।"

অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে কাহারও পদস্খলিত হইলে, সে যেমন আৎকাইয়া উঠে, করুণার কথা শুনিয়া মাধবও তেমনি চম্‌কাইয়া উঠিল। বলিল—"বল কি ! সেই পিশাচের টাকা তুমি নেবে ? সর্ব্বনাশ ! করুণা, তুমি ওদের চেন'না।"

"উদ্বিগ্ন হইও না। খুব ভাল রকম চিনি। ওকে চিনি, ওর মনিব হরলাল জমিদারকেও চিনি। সুশীলা যে ওদের নজরে প'ড়ে গলায় দড়ি দিয়ে ম'ল, তা'ও জানি, আবার ওপাড়ার বামুণদের 'চারু' যে ওদের ভয়ে ভিটে ছেড়ে পালিয়ে গেছে তা'ও শুনিচি। জানি না কি,—সবই জানি—"

"তবে তুমি কোন্ সাহসে ওদের টাকা নিচ্ছ ?"

"আমি কি ওদের টাকা নিচ্চি ? ওদের কি ক্ষমতা যে, একটা পয়সা লোককে দান করে ? আমি নিচ্চি—ঈশ্বরের দান। ওদের দ্বারায় ঈশ্বর আমাদের দয়া কচ্ছেন।"

"না—না, ওদের টাকায় হাত দিও না। কি জানি যদি তোমার ওপর অত্যাচার আরম্ভ করে।"

"টাকা নিলেই যে অত্যাচার আরম্ভ কর্‌বে, আর না নিলে যে কর্‌বে না, তার ত কোন মানে নেই। ওদের যখন আমার ওপর নজর প'ড়েছে,

তখন, টাকা নিলেও করবে,—না নিলেও করবে,—তখন ভগবানের দান ভেবে নেওয়াই উচিত।" এই বলিয়া মনে মনে বলিল—টাকা নেওয়াত তুচ্ছ, তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারি। না নিলে তোমায় বাঁচাব কি ক'রে ? "তাই ত করুণা, আমার ত কোনই উপায় নেই, উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই, কেমন ক'রে তোমায় ওদের হাত থেকে রক্ষা কৰ্ব্ব ?"

"তা থাকলেই কি পাত্তে ? তা হ'লে ত সুশীলার ও দশা হ'ত না। ওর ত কোনই অভাব ছিল না। যেদিকে চাও সেই দিকেই ওর আপনার লোক, তা ছাড়া বেশ দু-পয়সা সঙ্গতিও আছে। কিন্তু কেউ ত কিছু কত্তে পারলে না। যে রক্ষক, সেই যে ভক্ষক ; জমিদার নিজেই যে সাক্ষাৎ পিশাচ !"

"তবে কি করে তুমি রক্ষা পাবে ? তাই বলছি—"

করুণা বাধা দিয়া বলিল—"চুপ কর, আর ও কথা ব'লতে হবে না। শোন, আমার আবার রক্ষা পাবার ভাবনা ! একদিন ব'লিছি, যদি তোমার পায়ে আমার তিলমাত্র বিশ্বাস থাকে, তবে সেই বিশ্বাসই, আমার সতীত্ব, ওদের মত লক্ষ লক্ষ পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করব, আর যদি একান্তই না পারি, তবে এই দেখ এই আমার অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করবার একমাত্র সহায়—"

এই বলিয়া করুণা আপনার বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত একখানি ঝকঝকে শানিত ছোরা কুণ্ঠগলিত স্বামীর সম্মুখে ধরিল। তাহার চক্ষু হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাধব তাহার দিকে তাকাইতেও পারিল না। মস্তক অবনত করিল।

এ কি দেবী—না দানবী !

(৪)

জমিদার হরলাল বাবু তাঁহার পৈশাচিক কার্য্যের প্রধান নায়ক হরিশকে ডাকিয়া বাঁকাসুরে বলিলেন—"কি বাবা, তোমার সে কখন আস্‌বে বাবা ? ৫০৲ টাকার ত সম্মতি কল্লে—এখনও কি হ'ল না বাবা ? আর কেন ভোগাচ্চ, খুলে বল কত চাই, অত ছল চাতুরী কেন বাবা ? আমি সব বুঝতে পারি, তাঁকে সব শুদ্ধ হ'য়ত ২০৲ টাকা দিয়ে বাদবাকী সব নিজেই—"

"বাঁকাসুরে বলিলেন বলিবার অর্থ এই যে তিনি মদে চুর হইয়া আছেন। সেইজন্য তাঁহার কথা বাঁকা।

মনিবের উপরোক্ত কথা শুনিয়া হরিশ বলিল—"কি! আমি আপনার টাকা নিয়েছি?"

"না বাবা তুমি নাওনি, নিয়েচে আমার প্রাণের বন্ধু হরিশ খুড়ো। আমার কথায় কি চট্‌তে আছে ভাই? এখন বলত দাদা কখন তাকে নিয়ে আস্‌ছ?"

"তাই বলুন।" এই বলিয়া হরিশ বলিল—"দেখুন, এটা বড় সতীত্ব ফলায়। যাই হোক্ আজ তাকে আন্‌বই আন্‌ব? কিন্তু আর গোটা কুড়িক টাকা চাই—আপনার দিব্যি বল্‌ছি, নইলে হ'বে না।"

"আচ্ছা নিয়ে যাও—যাও সরকারকে বলগে—"

হরিশ মুচকি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এই সময়, কি জানি কেন, হরলাল বাবুর মনে "সতী" কথাটি জাগিয়া উঠিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, তাঁহার স্ত্রীকে যদি কেহ জোর করিয়া সতীত্ব হরণের চেষ্টা করে তবে সেটা কেমন হয়! ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিলাস-অন্ধ নয়ন মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইল, সতীর সতীত্ব কি অমূল্য বস্তু। তাঁহার কঠোর মনও ক্ষণেকের জন্য কোমল হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার কাম পিপাসা বলবতী হইল। তিনি আবার কঠোর হইলেন। ভাবিলেন—গরীবের আবার সতীত্ব কি? যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া শাক-অন্নে উদর পূর্ণ করে তারা আবার সতী? অভাবে যারা খণ্ড খণ্ড গ্রন্থি যুক্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করে, তারা আবার সতী? তারা যখন সতী নয়, তখন তাদের সতীত্ব হরণ করিতে মমতাই বা কি, ভয়ই বা কিসের? হায় রে নির্দ্ধন!

(৫)

হরিশ আজ সকালে জমিদার বাবুকে বলিয়া আসিয়াছে যে, করুণাকে যে কোন উপায়েই হউক আজ তাঁহার নিকট হাজির করিবেই করিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, তথাপি তাহার করুণার নিকট যাইতে সাবকাশ হইল না, কেন সে নিজেই ভাবিয়া আকুল। তাহার ত অন্য কোন কাজ ছিল না, তবে হয় ত ভয়ে বা—দয়া করিয়া যায় নাই।

আন্দাজ ৪৷৷৹ টার সময় হরিশ করুণার উদ্দেশে গ্রামের প্রান্তভাগে চলিল। তাহার বাড়ী হইতে করুণার পর্ণকুটীরের সন্নিকটে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় লাগিল। কিন্তু অন্য দিন সে দশ মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিয়া

পৌঁছিত। আজ এত দেরী হইবার কারণ এই যে, তাহার পা যেন আজ তাহাকে বহন করিতে পারিতেছে না। এবং মনটা যেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন কেমন করিয়া উঠিতেছে। এক একবার যেন ভুলিয়া ভাবিয়া ফেলিতেছে—"সতী"। যত মনে করে ঐ "সতী" আর ভাবিবে না, ততই যেন বেশী ভাবিয়া ফেলিতেছে।

যাহা হউক সাহসে নির্ভর করিয়া, মোটা বক্সিসের কথা ভাবিয়া, সে কর্ত্তব্য কাজে পশ্চাৎপদ হইল না। আবার চলিল। বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার সময় সে বেশ করিয়া দুই বার দুই গেলাস মদ খাইয়া লইয়াছিল। এখন আবার যেন গলা শুখাইয়া গেল। মনে মনে প্রমাদ গণিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে জল খাইতে নামিল।

মদ খাইয়া উপরে উঠিবে এমন সময় দেখিল তাহার শিকার তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। আর তাহাকে কষ্ট করিয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। কিন্তু কি বলিয়া যে তাহার নিকট প্রথমে আপনার তত্ত্ব কথা প্রকাশ করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে নিশ্চল হইয়া করুণার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া করুণাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল—"কি, আপনি যে এখানে ?—এমন সময় এদিকে কি মনে ক'রে এসেছেন ?"

এইবার হরিশের বাক্ ফুটিল। বলিল—"সুন্দরী! হতভাগা আর কি কত্তে আস্‌ছে—তোমার জন্যই এসেছে।"

করুণা ইহার যথা উত্তর না দিয়া স্বাভাবিক ভাবে বলিল—"আমার জন্যে ? হাঁ তা হবারই কথা বটে। আমরা দীন দুঃখী আর আপনি হলেন জমিদারের গোমস্তা—আপনি যদি আমাদের কষ্টে দয়া না করেন ত আর কর্‌বে কে ?"

এ ঘাটে আর অন্য কেহ নাই। করুণা একাকী কলসী লইয়া জল লইতে আসিয়াছিল ; সুতরাং এখানে তাহার হইয়া একটা কথা বলিয়া তাহার উপকার করে এমন কেহ নাই। বেশ নির্জ্জন।

আজ যে শুদ্ধ হরলাল বাবু মদ খাইয়াছিল, তাহা নহে, হরিশও একটু খাইয়াছিল—এখনও তাহার ঝোঁক কাটে নাই। করুণার উপরোক্ত কথা শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া একটু টলিতে টলিতে বলিল—"না বাবা, আজ আর দয়া মায়া কর্‌তে আসিনি। ১৫৲ টাকা দয়া ক'ত্তে হ'য়েছে, আর লাভ

হ'য়েছে মোট ৫৫৲ টাকা; তুমি যাবা খুব ধড়িবাজ মেয়ে মানুষ, তাই আমার কাছে ১৫৲ টাকা বার করেছ। যাক্ কি বলছিলুম—হাঁ আজ আর দয়া করতে আসিনি, আজ তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। চল বাবা, বাবুর ডাক প'ড়েছে—"

এই বলিয়া সে তাহার গায়ের উপর পড়িতে গেল। কিন্তু একি! সর্পের গায়ে সহসা পা ফেলিয়া দিলে সে যেমন ফোঁস্ করিয়া উঠে, করুণাও তেমনি গর্জ্জন করিয়া বলিল—"খবর দার! পিশাচ, ঐখানে দাঁড়িয়ে কথা বল; যদি প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরবার ইচ্ছে থাকে ত আর এক পাও এগোস নে—"।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কহিনী! সে সামান্য একটা স্ত্রীলোক, আর হরিশ কি না একজন জোয়ান্ পুরুষ মানুষ! সে তাহাকে ভয় করিবে কেন? যদি করে ত ধিক্ তার জীবনে!

হরিশ তাহার কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহার হাত দুইটী চাপিয়া ধরিতে গেল। কিন্তু দেখিল—সে আশা, দুরাশা!

রমণী এখন আর সে রমণী নাই, সে এখন দানবী মুর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে একখানি দীর্ঘ ছুরিকা ধরিয়া বলিতেছে—"পিশাচ, সাবধান! এই দেখ্, আর তোর দেরী নেই, কাল্ তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। খবরদার! ঐখানে দাঁড়া, আর এগিয়েছিস্ কি মরেছিস্—"

কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দেখিয়া হরিশ "বাবা রে" বলিয়া সাত হাত পশ্চাতে হটিয়া গেল। তাহার অন্তরাত্মা ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমি নয়, আমি নয়—বাবু তোমায় ডেকেছে—"

"তাই বল্—চল্, তোর বাবুর কাছে যেতে হয় যাচ্ছি, কিন্তু খবরদার! আমার দেহ ছোঁবার এতটুকুও আশা করিস্নে। চল্—আমার আগে আগে চল্।"

"আমায় মারবে না?—দোহাই তোমার—" "না, চল। হাঁ, আর এক কথা, তুই আমাকে তোর বাবুর কাছে দিয়েই সেখান থেকে চলে আসবি, আর এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বলিস্ না—"

"আচ্ছা বাবা" বলিয়া হরিশ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার অগ্রে অগ্রে চলিল।

(৬)

সন্ধ্যার সময় করুণা জমিদারের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার

পর যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন দুই পার্শ্বস্থিত কত কি বিলাস দ্রব্য তাহার নয়ন পথে পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

পরে করুণা বাবুর বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাবু তাকিয়ায় হেলান দিয়া ধূপ পান করিতেছেন। হরিশ তাহাকে সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দূর হইতে—"বাবু এই আপনার করুণা এসেছে" বলিয়া সরিয়া পড়িল।

শিকারী সমস্ত দিন বৃথা ঘুরিয়া, শেষে সন্ধ্যার সময় একটী শিকার দেখিতে পাইলে, সে যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, এই সময় করুণাকে দেখিয়া হরলাল বাবুরও সেইরূপ আনন্দ হইল। তিনি দুই হাত প্রসারণ করিয়া বলিলেন—"এই যে, করুণাময়ী এসেছ,—এস, এস,—"

করুণা তাঁহার মুখের দিকে আপনার অঙ্গুলি দেখাইয়া ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"বল, মা'। পিশাচ! তুমি কি জান না যে, আপনার স্ত্রী ভিন্ন সকল রমণীই তোমার মা? শুদ্ধ তোমার কেন,? নারী যে জগত-মাতা। পিশাচ, পিশাচ বল্‌লেও যে তোমার উপযুক্ত পদ হয় না—তুমি এত নীচ, এত ঘৃণিত!"—

জমিদার বাবু স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না।

করুণা প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে বলিতে লাগিল—"কামুক! তোর কাম-পিপাসা মিটাবার বিনিময়ে একজনের অমূল্য জীবনদীপ অকালে নিবিয়ে দিচ্ছিস্; ক্ষণিক নশ্বর সুখের জন্যে তুই কিনা ভদ্রবংশের মুখে চূণ-কালি দিচ্চিস, —তুই না জমিদার, তুই না তোর প্রজাদের পিতামাতা? তোর এই কাজ। —ধিক্ তোকে নরাধম!—পুলিস্ জান্‌তে পারে না, তাই তোর পাপের ফল হাতে হাতে ফলে না; কিন্তু এমন একজন মাথার উপর আছেন, যিনি সর্ব্বদা তোর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছেন—তিনি আর কেউ নন—তিনি এই জগৎপিতা—ভগবান্। তুই ধনগর্ব্বে এত গর্ব্বিত; কিন্তু সেই জগৎপিতা যে এক নিমিষের মধ্যে তোর সমস্ত বিষয় ছারখার কর্‌তে পারেন; তোর বুকে বজ্রাঘাত করে এই মুহূর্ত্তে তোকে যমের দ্বারে পাঠাতে পারেন; সে কথা কি তোর একবারও মনে হয় না? যে টাকা সেই পিশাচ হরিশকে দিচ্ছিস্, সেই টাকা সৎকার্য্যে ব্যয় কল্লে পরকালের কাজ কর্‌তে পারিস্, তাও কি

একবার মনে আসে না ? ধিক্ তোকে ! কিন্তু আজ তোর নিস্তার নাই ;— আজ আমিই তোর কালরূপী—করুণা। এই দেখ্ ঢের পাপ ক'রেছিস্ এখন প্রস্তুত হ'—"

এই বলিয়া করুণা সেই ছুরিখানি আপনার বামহস্তে দৃঢ়ভাবে ধরিল। তাহার সর্ব্বশরীর হইতে যেন এক অপূর্ব্ব তেজ বাহির হইতে লাগিল এবং সেই তেজরাশিতে যেন হরলালবাবুর চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় হরলালবাবুর এমন অবস্থা হইল যে, করুণা মনে করিলে তাহার বক্ষে সেই ছোরা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিতে পারিত ; কিন্তু করিল না। "না—না, তুই পিশাচ, তোকে মেরে হাত নষ্ট করব না ; কিন্তু সাবধান! আর যেন আমাকে এখানে আস্‌তে না হয়। একবার ভাল করে চেয়ে দেখ —ঐ দর্পহারী মধুসূদন, অচিরে তোর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত। ভ্রান্ত! ধর্ম্ম আর কত সইবে ?"

এই বলিয়া করুণা সে ঘর হইতে বাহির হইতে গেল, কিন্তু পারিল না। দেখিল একি—জমিদারবাবু ক্ষিপ্তবৎ ছুটিয়া আসিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার পদদ্বয় আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, মা, তুমি আমার মা। তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, আজ থেকে আর আমি এ কাজ করব না। আজ থেকে আমার সকল প্রজাকেই মাতাপিতা সন্তান জ্ঞান করব। আরও কি করতে হবে, তোর অধম সন্তানকে ব'লে দে মা !—"

করুণা তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিল—"ছিঃ বাবা, ওঠ—আমি যে তোমার মেয়ে—"

সম্পূর্ণ।

ঘরের লক্ষ্মী

[লেখক—শ্রীসতীন্দ্রনাথ পাল]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৪

ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধের ভিতর চক্ষু মুদিয়া ছিল, হরিচরণের গাঢ় স্বরে সেটা যেন আবার চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। হরিচরণ একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ তুমিও শেষে আমার বাদী হলে ?"

বিশ্বনাথ তক্তাপোষের এক পার্শ্বে গবাক্ষের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। গৃহের এক কোণে প্রদীপের মিটি মিটি আলো গৃহের সম্পূর্ণ অন্ধকার দুরীভূত করিতে পারে নাই। কেবল অন্ধকারের কাল ছোপটা সরাইয়া দিয়াছিল মাত্র। সেই অর্দ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহের ভিতর বিশ্ব-নাথের মেঘাচ্ছন্ন মুখখানা একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে বিশ্ব প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে, বিশ্বনাথও ঠিক সেই ভাবে স্তব্ধ হইয়াছিল। গবাক্ষের নিম্নেই রাজপথ,—রাজপথে লোক চলাচলের অভাব নাই। পরস্পর পরস্পরের সহিত কত কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। তাহাদের হাসি ঠাট্টা, আনন্দ উৎসাহের বিরাট কোলাহলের দুই একটা কথা মাঝে মাঝে গৃহের ভিতর ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া গৃহটাকে যেন সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। পৃথিবীতে যে দুঃখ দৈন্য নিরাশা বলিয়া একটা কিছু আছে, রাজপথে তাহার কোনই লক্ষণ নাই। হরিচরণ বিশ্বনাথের মুখে একটা কোন উত্তরের আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু বিশ্বনাথ কথা কহিল না। সে কেবল একবার গৃহের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল,—তাহার দৃষ্টি হরিচরণের পার্শ্বে উপবিষ্টা শোভা ও প্রভার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের ভিতর, যেন সমস্ত দেহটাকে চমকিত করিয়া একটা বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিল। সে একটুখানি ঘুরাইয়া একেবারে ভাল করিয়া, গবাক্ষের দিকে ফিরিয়া বসিল। হরিচরণ একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—"ছেলে আর মেয়ে, এ দুয়ের কি প্রভেদ জান বিশ্বনাথ?"

বিশ্বনাথ তথাপি নীরব, হরিচরণ বলিতে লাগিলেন,—"ছেলেতে আর মেয়েতে তফাৎ হচ্ছে এই, ছেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের ভাগ্যের কতকটা অংশ গ্রহণ করে কিন্তু মেয়ে তা করে না। সে জন্মাবার সময় তার নিজের ভাগ্য সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তার সুখ দুঃখের বোঝা সে নিজেই মাথায় করে জন্মেছে; তার মা বাপের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। শোভাও তার বরাৎ নিয়েই এসেছে। হাজার চেষ্টা কল্লেও কি কেউ কারুর বরাৎ নিতে পারে। বিশ্বনাথ কিছু ভেব না,—যদি শোভার অদৃষ্টে দুঃখ থাকে, ওকে সুখী করা যদি ভগবানের ইচ্ছা না হয়,—তুমি আমি হাজার চেষ্টা কল্লেও কি ওকে সুখী কর্ত্তে পারবো।"

বিশ্বনাথের সমস্ত দেহটা ফিরিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে কথাটা

বন্দুকের গুলির মত বাহির হইয়া আসিল,"তবু মানুষ চেষ্টা করে। যক্ষ্মা হয়েছে, মৃত্যু স্থির, নিশ্চয় জানে—তবু মানুষ কি চিকিৎসা কর্ত্তে ছাড়ে? বরাতে তার যাই থাক্ তা বলে বাপ মার যা কাজ, তা বাপ মাকে কর্ত্তেই হবে। তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে যত দূর সম্ভব দেখে শুনে একটা সুপাত্রের হাতে কন্যা অর্পণ করা। তারপর মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হউক্। তোমারও তাই চেষ্টা করা উচিত কিন্তু জেনে শুনে ভাল পাত্র থাক্‌তেও এমন অসৎ পাত্রে মেয়ে দিতে, আজ আমার বয়স এই ষাটের কাছাকাছি হলো এর ভেতর আমি আর কোন বাপকে দেখিনি। প্রফুল্লনাথের মা উপযাচক হয়ে প্রফুল্লনাথের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে, আর তুমি কি না তা অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলে। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তা কর্ত্তে পার, কিন্তু ভাই আমার সঙ্গে তোমার এই পর্য্যন্ত।"

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া হরিচরণের নাসিকাপথে বাহির হইয়া আসিল। হরিচরণ বিশ্বনাথের কথায় সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন, "বিশ্বনাথ তুমি জান না, তুমি আমার বুকের কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছ। এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি, এক সঙ্গে সংসার পেতেছি, আবার এক সঙ্গেই প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি একেবারে ঝাড়া হাত পা; আমার তবুও এক তিল অবশিষ্ট আছে। এ দুটোর বিয়ে হয়ে গেলেই তুমিও যা আমিও তা। এই ষাট বৎসর আমার জন্যে অনেক সহেছ, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছ, তখন এটাও সহ্য কর। ভগবানের উপর নির্ভর করে আমার আনন্দে আনন্দিত হও।"

হরিচরণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রু উছলিয়া উঠিল। হরিচরণ মস্তক অবনত করিলেন। বিশ্বনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। বন্ধুর নয়নের এক ফোঁটা অশ্রু তাহার প্রাণের সমস্ত দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিল। তাহার আর আপত্তি করিবার কিছুই রহিল না। সে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে নামিয়া তাহার তলদেশ হইতে একটা কলিকা বাহির করিল। তাহার পর আবার তক্তপোষের উপর উঠিয়া গবাক্ষের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্ত পকেট হইতে দেয়াশালাই বাহির করিল, বিশ্বনাথ কলিকা হইতে একখানি অর্দ্ধ দগ্ধ টিকা তুলিয়া সবে মাত্র ধরাইতে যাইতেছিল, সেই সময়ে দরজা

খুলিয়া প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহখানা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহের ভিতরকার সমস্ত দৃষ্টি এক কালে, এক সঙ্গে তাঁহার মুখের উপর পতিত হইল। শোভা চকিত দৃষ্টিতে একবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তক নত করিয়া একেবারে মহা জড়সড় হইয়া পড়িল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস প্রফুল্লনাথ, এতদিন তোমায় দেখিনি কেন বাবা, খবর তো সব ভালো!"

প্রফুল্লনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া অবনত মস্তকে তক্তপোষের এক পার্শ্বে বসিলেন। আজ প্রায় পনের ষোল দিন হইল, তাঁহার সহিত আর শোভার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজও হইবে সে আশাও তিনি করেন নাই। সহসা সম্মুখে শোভাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত তার যেন একটা করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। আমার জিনিষকে আমার নয় ভাবিতে যে কত কষ্ট, তাহা তাঁহার অন্তঃরস্থ অন্তর্য্যামীই কেবল বুঝিলেন। তিনি আর একবার বঙ্কিম-ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মনে হইল, সে মুখখানিতে যেন আর সে হাস্যশ্রী নাই, তাহা যেন একটা বিষাদ কালিমায় একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বস্ব হারাণর একটা পরিস্ফুট চিহ্ন তাহার সমস্ত মুখখানার উপর একেবারে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। শোভার মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রফুল্লনাথ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রভার স্বরে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, হরিচরণ নীরব হইবা মাত্র সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রফুল্লদাদা, নীহার দিদি শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে?"

প্রফুল্লনাথ জোর করিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কষ্টে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না, তোর নিহারদিদি কাল শ্বশুর বাড়ী যাবে।"

তাহার পর হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাকাবাবু, আমি মাকে নিয়ে সোমবারে পুরী যাচ্ছি। এদানি তাঁর শরীরটা তত ভাল নেই। শোভার বিয়ের সময় হয়তো উপস্থিত থাক্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু তা ব'লে যেন আমাদের খবর দিতে ভুলবেন না।"

হরিচরণ মহা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সে কি বাবা! তোমাদের কি শোভার বিয়েতে না উপস্থিত থাক্‌লে চলে? তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া শোভার মা নেই। তোমার মা না থাক্‌লেতো কোন কাজই হ'তে পারে না। না বাবা তা হতেই পাবে না, এ সময় তোমাদের কি কোথাও যাওয়া হয়! আর গেলেও সে সময় আস্‌তেই হবে।"

উপস্থিত থাকা তো চাই, কিন্তু উপস্থিত থাকা কি সম্ভব! নিজের বলি-দান নিজে কখন কি দেখিতে পারে? বাক্‌হীন অজ্ঞান ছাগও বলির পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করে। প্রফুল্লনাথ নিজেকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন, "কাকাবাবু সে সময় কি আমাদের উপস্থিত থাকা উচিত?"

হরিচরণ বাবু জড়িত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"কেন, কেন বাবা উচিত নয়?"

প্রফুল্লনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বিবির বিয়েতে আমাদের উপস্থিত থাকাটা হয়তো দুর্লভবাবুর আপত্তি হতে পারে! কাকাবাবু আপনি তো সব জানেন, বাবার সঙ্গে দুর্লভবাবুর কোন দিনই সদ্ভাব ছিল না। সে কথা আমরা ভুল্‌লেও তিনি বোধ হয় এখনও ভুলতে পারেন নি। এখানে উপস্থিত থেকেও শোভার বিয়ের সময় আমরা উপস্থিত থাকতে পার্‌বো না, সেটা আমাদেরও কষ্ট আপনারও কষ্ট। তার চেয়ে আমাদের দূরে থাকাই ভালো। মাও আপনাকে সেই কথাই বল্‌তে বল্‌লেন।"

বিশ্বনাথ কলিকার আগুনটাকে বেশ করিয়া জমকাইয়া তুলিবার জন্য কলিকার উপর ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিল; সে পাখাখানা একপার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব ভালো কথা। প্রফুল্লনাথ চল আমিও তোমাদের সঙ্গে রওনা হব। যাতে আমার মতের মিল নেই, তাতে উপ-স্থিত থাকা আমারও চল্‌বে না। শেষ কি একটা ফ্যাসাদ করে বস্‌বো?

প্রফুল্লনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন বিশ্বনাথবাবু! শোভার বিয়েতে আপনি না থাক্‌লে কি চলে। আপনি গেলে সব দেখ্‌বে শুন্‌বে কে?"

বিশ্বনাথ প্রফুল্লনাথের কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতে-ছিল, কিন্তু হরিচরণ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে কি উঠ্‌লে বাবা!"

প্রফুল্লনাথ কেবল মাত্র কহিলেন, "হ্যাঁ কাকাবাবু, আজকে এখন আসি; রাত অনেক হ'লো।"

হরিচরণ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার অবস্থাতো সবই বুঝ্‌ছো, কি আর বল্‌বো বাবা। বৌঠান্‌কে ব'লো আমার অবস্থা জেনে তিনি যেন আমার সমস্ত অপরাধ মাপ করেন।"

প্রফুল্লনাথ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া বলিলেন, "যাবার আগে বিবিকে একবার মা দেখা কত্তে বলেছেন। একবার দশ মিনিটের জন্য তাকে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন। তাতে বোধ হয় দুর্লভবাবুর আপত্তি হবে না।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বিনোদলালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। প্রফুল্লনাথ আর দাঁড়াইলেন না, তিনি তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বিনোদলালাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণটা যেন একটা তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল। বিনোদলালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিনোদলাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এই যে শ্বশুর মশাই, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

সে দুই হাত জোড় করিয়া হরিচরণকে নমস্কার করিল। তাহার সমস্ত দেহটা বাঁকিয়া চুরিয়া হেলিয়া পড়িতেছিল, সে কিছুতেই আর সেটাকে সোজা করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানা একেবারে সুরার গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু জড়িত, মুখ দিয়া সুরার গন্ধ ভর ভর করিয়া বাহির হইতেছে। হরিচরণ মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস বাবাজি বোস। আমার ঘরে তোমার উপযুক্ত এমন স্থান নেই যে তোমায় বসাই।"

স্কন্ধের উপর অসংযত চাদরখানা মেঝের উপর লুটাইতেছিল। বিনোদলাল সেখানা স্কন্ধের উপর ফেলিয়া তক্তাপোষের একধারে আসিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল। বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "ব্যস্ত হবেন না শ্বশুর মশাই, ওতে ব্যস্ত হবার এমন কিছু নেই ;—আমি ঠিক আছি। বাবা চিঠি লিখেছেন দু তিন দিনের মধ্যেই তিনি এসে পৌছিবেন। এই মাসেই দু'হস্ত এক হয়ে যাবে। শ্বশুর মশাই কেবল স্ফূর্ত্তি,—স্ফূর্ত্তি চালান।"

বিনোদলালের মুখের গন্ধে, কথার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া হরিচরণের একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছিল। মানুষের ধারণাটা যদি সহসা বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয় তাহার অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিনোদ-

লাল একটু নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার জড়িত কণ্ঠে বলিল, "শ্বশুর মশাই আমাকে মাতাল ভাববেন না,—আমি ঠিক আছি। আপনার মেয়েকে আমি এত সুখে রাখবো,—তেমন সুখে তাকে আর কেউ রাখতে পারবে না। এক একখানা গয়না এক এক মোণ ভারি হবে। হুঁ বাবা, গয়নার ভারে একেবারে নড়ন চড়ন রহিত হয়ে যাবে।"

বিনোদ লাল আর দাঁড়াইল না,—আবার টলিতে টলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বনাথ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ভিতরে ভিতরে যেন একেবারে তুষের আগুণে জ্বলিতেছিল। বিনোদলাল গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, "খুব সমন্ধ স্থির করেছ। আমি চল্লুম,—আর তোমার সঙ্গে আমার কোন সমন্ধ নেই। তবে তোমার সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের আলাপ, তাই যাবার সময় একটা সৎপরামর্শ দিয়ে যাই। অমন সুপাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে চিরদিনের জন্য দগ্ধে মারার চেয়ে, হাত পা বেঁধে পোলের উপর থেকে একেবারে গঙ্গায় ফেলে দাওগে, তাতে তোমারও মঙ্গল, তোমার মেয়েরও মঙ্গল। উভয়েই নিশ্চিন্ত হবে।"

বিশ্বনাথ হরিচরণের আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখিল না। মুখ চোখ লাল করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৫)

কাশীতে দুর্ল্লভবাবু যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সে বাড়ীখানি ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই। দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষ হইতে গঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাত হইয়াছে, বিশ্বনাথের স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির চূড়ায় সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। হর হর বোম্‌ বোম্‌ শব্দে সমস্ত কাশীবাসী ভোলানাথের ভক্তগণ কাশী মুখরিত করিয়া বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙ্গাইতেছিল। দুর্ল্লভবাবু তাঁহার দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষের সম্মুখে একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার প্রকাণ্ড সটকার উপরিস্থিত অগ্নি সংযুক্ত কলিকা মৃদু বাতাসে ধীরে ধীরে আপনিই ধরিয়া উঠিতেছিল। সম্মুখে জাহ্নবী মৃদু হিল্লোলে আপন মনে বাহিয়া চলিয়াছে। তাহার সংখ্যা-হীন অসংখ্য বীচিমালার উপর বাল-সূর্য্যের প্রথম কিরণ স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়া নৃত্য করিতেছে, মাঝে মাঝে পাল তোলা নৌকা পালের ভরে মন্থর গমনে আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে। দুর্ল্লভবাবু এক এক চুমুক চা

পান করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে প্রথম সূর্য্য-সংস্পর্শ তাহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। সেই সময় বেহারা আসিয়া কয়েকখানা ডাকের চিঠি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। দুর্লভবাবুর চা পান শেষ হইয়াছিল। তিনি চায়ের পেয়ালাটা মেঝের উপর রাখিয়া, পত্র কয়খানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শিরোনামাগুলি দেখিতে লাগিলেন। পত্রের শিরোনামা দেখিয়া দুর্লভবাবু বুঝিলেন, পত্রগুলির সব কয়খানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে। তিনি কয়খানা পত্র পড়িবার পর তাঁহার কন্যার পত্রখানা ধীরে ধীরে খুলিলেন।

প্রবাদ আছে বাতাসেরও কাণ আছে। বিন্দুবাসিনী যে হরিচরণকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি যে শোভার সহিত তাঁহার পুত্র প্রফুল্লনাথের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সে সমস্ত সংবাদই উমার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। সে যখন শুনিল প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহের কথা হইতেছে; তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার প্রথমেই মনে হইল, কেবল প্রকারান্তরে তাহার পিতাকে অপমান করিবার জন্য বিন্দুবাসিনী প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এত দিনতো কোন কথাই উঠে নাই। যেমন তাহার পিতা তাহার ভ্রাতার সহিত শোভার বিবাহ স্থির করিয়াছেন অমনই এসব কথা উঠিবার কারণ কি? কথাটা উমার কর্ণে পৌঁছিবামাত্র তাহার আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিল না। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কথা যতদূর সম্ভব সুবিস্তৃত করিয়া পিতাকে পত্র লিখিল। সেই দিনই যদি বিনোদলালের সহিত শোভার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সে সেই দিনই তাহা বোধ হয় শেষ করিয়া ফেলিত। তাহার আর একমুহূর্ত্তও দেরী সহিতে ছিল না; কিন্তু কোনও উপায় নাই। দুর্লভবাবু কলিকাতায় নাই; তিনি না আসা পর্য্যন্ত কিছুই হইতে পারে না। তাই সে পত্রপাঠ তাহার পিতাকে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য একখানা পত্র লিখিয়াছিল।

পত্রখানা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভবাবুর মুখ ও চোখের ভাব নানা রূপ হইতে লাগিল। তিনি পত্রখানা দুই তিনবার মনে মনে পড়িয়াও বোধ হয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। উত্তেজনার ধমকে আবার বেশ একটু উচ্চৈস্বরে সেখানা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে অধিক কিছু লেখা ছিল না, মাত্র এই কয় লাইন লেখা ছিল :—

শ্রীচরণেষু !

বাবা ! আপনার পত্র পাইলাম। এখান হইতে যাইয়া কাশীতে আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে পাঠে চিন্তা দূর হইল। এখানে হরিচরণ বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া নানা গোলযোগ বাধিয়াছে। শুনিলাম নাকি অঘোরবাবুর পত্নী তাঁহার পুত্রের সহিত শোভার বিবাহ দিতে চাহিতেছেন। প্রকারান্তরে আমাদের কেবল অপমান ও অপ্রস্তুত করিবার জন্য ইহাই যে তাঁহার একটা মতলব, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ অবস্থায় বিনোদের বিবাহ দিতে দেরী করা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। আপনি পত্র পাঠ মাত্র একবার কলিকাতায় আসিবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিনোদের বিবাহ শেষ করিয়া ফেলিবেন। আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। অধিক কি লিখিব ;—আপনি পত্রপাঠ আর একদণ্ডও দেরী না করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। ইতি :—সেবিকা—আপনার কন্যা—উষা।

পত্র পড়া শেষ হইবামাত্র দুর্লভবাবুর প্রাণের ভিতর একটা প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একবার দুইবার তিনবার চারিবার পাঠ করিলেন। তথাপি যেন তাঁহার পাঠ করিয়া তৃপ্তি হইল না। পত্রখানা যেন বুকের মধ্যস্থলে একটা বিষের তীর নিক্ষেপ করিয়া একটা মহা জ্বালার সৃষ্টি করিল। তিনি যতই পত্রের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া সমস্ত ঘরখানাকে একেবারে জ্বালাইয়া দিবার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। কন্যার পত্র পড়িয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়িল অঘোর বোসের কথা। তাঁহার পুরাতন বিদ্বেষ যাহা কালের প্রভাবে বিস্মৃতির প্রলেপ খাইয়া একেবারে লুপ্তপ্রায় হইবার মত হইয়াছিল, তাহাই যেন আবার প্রাণ পাইয়া নব ভাবে প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিল। অঘোর যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন সে তাঁহাকে পদে পদে অপদস্থ করিবার জন্য কি না শত্রুতা করিয়াছে ? তাহাকে অপদস্থ করিতে, তাহার সহিত তিনি সকল রকম শত্রুতা করিতে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কেবল তাহারই উৎসাহে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছিল। আজ কিনা আবার তাহারই পুত্র তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চায়। একটা বিশ বাইশ বৎসর বালকের নিকট যদি তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর পৃথিবীতে জীবীত থাকিয়া লাভ কি ? দুর্লভ মিত্তির চীৎকার করিয়া

উঠিলেন, "না তাহা হইতেই পারে না,—দুর্লভ মিত্তির জীবীত থাকিতে প্রফুল্ল বোসের সাধ্য কি যে সে হরিচরণের কন্যাকে বিবাহ করে। যেমন করিয়া হউক এ বিবাহ রহিত করিতেই হইবে। ইহাতে যদি আমার সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয়,—তাহাও স্বীকার।"

দুর্লভ মিত্তির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাশীতে আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার কলিকাতায় উপস্থিত হইবার জন্য সমস্ত প্রাণটা আন্‌চান্‌ করিতে লাগিল। তিনি গৃহের ভিতর পায়চারি আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। প্রাণের ভিতর তখন তাঁহার চিন্তার অনন্ত স্রোত বহিতেছিল। এক্ষণে কি করা উচিত, কি করা অনুচিত সেই কথাটাই নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর বিষ ছড়াইয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। দুর্লভবাবু নীরবে কিছুক্ষণ গৃহের ভিতর অস্থির ভাবে পায়-চারি করিয়া চীৎকার করিয়া হাকিলেন, "গোবর্দ্ধন।"

দুর্লভবাবুর খাস খানসামা গোবর্দ্ধন, দুর্লভবাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল। সে পার্শ্বের ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্তে তাম্রকূটে দম লাগাইতেছিল ; বাবুর আহ্বান ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে একেবারে ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সেস্থান হইতেই সাড়া দিল, "আজ্ঞে যাই।"

গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার বুকের তখ-নও জড়তা মরে নাই। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিল। দুর্লভবাবু বিরক্ত ভাবে ফিরিলেন। তাঁহার দেহের প্রতি শিরা, অনুশিরা একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখনি আমাকে কল্‌কাতা রওনা হতে হবে। যা বিছানা বালিস বেঁধে লেগে যা!"

গোবর্দ্ধন বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বাবুর রক্তবর্ণ চক্ষু, গম্ভীর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভীত হইয়া পড়িল। তাহার যখন বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র তখন হইতেই সে দুর্লভবাবুর বাড়ীতে চাকরী করিতেছে। সে যত দুর্লভবাবুর মেজাজের কথা জানিত, তত বোধ হয় অপরে জানিত কিনা সন্দেহ। সে এই সুদীর্ঘ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল দুর্লভবাবুর সৎ অসৎ অনেক কাজই দেখিয়া আসিতেছে। বাবুর মেজাজ কখন কোন পর্দ্দায় আছে; সে বাবুকে দেখিবামাত্র বলিয়া দিতে পারিত। বাবুর মেজাজ দেখিয়া

সে মহা ভীত হইয়া পড়িল, চক্ষু দুইটি মিট্ মিট্ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনি কি বেঁধে ছেঁদে নেব ?"

দুর্লভ বাবুর ভিতরের অগ্নি যেন বাতাস পাইয়া একেবারে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "তবে ব্যাটা তোকে বল্লম কি !"

গোবর্দ্ধন সঙ্কোচিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া পুনরায় বলিল, "আজ্ঞে এখন তো কোন ট্রেণ নেই।"

দুর্লভবাবু ফিরিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর ভাবে মহা কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোকে যা যা বল্‌ছি তাই এখনি কর্ব্বি। আমি কোন কথা শুন্‌তে চাইনি। ট্রেণ থাকুক আর নাই থাকুক সে খবর রাখিবার তোর কোনই প্রয়োজন নাই।

গোবর্দ্ধন আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। বাবুর মেজাজ সহসা কেন এমন বেসুরা বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ যে কি, তাহা সে অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না। নীরবে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন যাহা বলিয়াছিল কথাটা যথার্থ ই। তখন আর কোন ট্রেণ ছিল না। সকালের ট্রেণ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। সে দিনটা দুর্লভবাবু যে কি ভাবে কাটাইলেন, তাহা তাঁহার কেবল অন্তরস্থঃ অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। দিনটা যেন আর কিছুতেই কাটিতে ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, তাঁহার এই সমস্ত দিনটা এমনভাবে নষ্ট করিবার কোনই অধিকার নাই। অস্থির চিত্তে সমস্ত দিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার পরই দুর্লভবাবু কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহার একটু পূর্ব্বেই রজনীর অন্ধকার সমস্ত কাশীর উপর ছড়াইয়া দিয়াছিল। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দে পবিত্র কাশীর, পবিত্র বাতাস তখন ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল।

(১৬)

আজ রাত্রে বিন্দুবাসিনী পুত্রের সহিত পুরী যাত্রা করিবেন, প্রত্যুষ হইতে তাঁহারা কয়েকজনই ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই আহার করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি যখন আহার শেষ করিয়া উপরে উঠিলেন, তখন মধ্যাহ্ণ

উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সমস্ত কলিকাতা নগরী খাঁ খাঁ করিতেছে। শূন্য গৃহ, গৃহে জন প্রাণী নাই। কেবল কতকগুলা জড়-পদার্থ আসবাবরূপে গৃহের চারিপার্শ্বে নির্জীব ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের এক কোণে একখানি পাটী ছিল, বিন্দুবাসিনী সেইখানি গৃহের মেজের উপরে পাতিয়া বোধ হয় একটু বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। কাল নীহার শ্বশুর আলয়ে চলিয়া গিয়াছে, কাল হইতে বাড়ীখানা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। সেই শূন্য যেন আর কিছুতেই পূর্ণ হইতে চাহিতেছিল না। নীহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবার পর হইতে একই অভাব তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। শোভা ও প্রভা শিশু-কাল হইতে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহারই স্নেহরসে সঞ্জিবিত হইয়াছে। তাহারা দিবসে অধিকাংশ সময়ই কন্যার ন্যায় তাঁহার পাশে পাশে ঘুরিত। এই পাঁচ ছয় বৎসর কাল তাঁহার পাশে পাশে ঘুরিয়া তাহারা তাঁহার এত অধিক মায়া কাড়িয়া লইয়াছিল যে, এক মুহূর্ত্তও তিনি তাহাদের না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ কয়দিন নীহার থাকায় তিনি সে অভাব তত অধিক অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু নীহার শ্বশুরালয়ে যাইবার পর হইতে, সে অভাবটা এমন তীব্রভাবে তাঁহার প্রাণের ভিতর প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিল যে, তিনি কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে পারিতে ছিলেন না। কোন কাজেই আর যেন মন বসিতে চাহিতেছিল না। তাঁহার কেমন মনে হইতেছিল, শোভা তাঁহার নিকট আসিবার জন্য, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে। কিন্তু তাহার আসিবার উপায় নাই, পিতার নিষেধ, সে কেমন করিয়া আসিবে? শোভার প্রাণের ভিতর যে যন্ত্রণা হইতেছিল, বিন্দুবাসিনী সমস্ত প্রাণেই যেন তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন। পুরী যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার শোভাকে দেখিবেন বলিয়া পুত্রকে দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার নাম শুনিলে নিশ্চয় শোভা একবার না একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। কিন্তু আজ তিন দিন হইল, প্রফুল্লনাথ শোভাকে একবার তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছে; বোধ হয় হরিচরণ তাহাকে আসিতে দেয় নাই, নতুবা কখনই সে স্থির থাকিতে পারিত না। তাঁহার আভাস পাইবা মাত্র ছুটিয়া উপস্থিত হইত। সে যে তাহাকে মায়ের অধিক ভক্তি করে।

বিন্দুবাসিনী আবার উঠিলেন, পালঙ্কের উপর হইতে একটা বালিস টানিয়া আনিয়া সেই পাটির উপর ফেলিলেন। তাহার পর প্রাচীর গাত্রস্থ আলমারী খুলিয়া তাঁহার সেই চির-প্রিয় রামায়ণখানি ও স্বর্ণমণ্ডিত চস্‌মা খানি বাহির করিলেন। তিনি চস্‌মাখানি মুছিয়া চক্ষে দিতে যাইতেছিলেন এমন সময় নফ্‌রার মা ছুটিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে একটুখানি হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও মা শুভি দিদি এসেছে।"

আজ কয়দিন হইতে শোভার জন্য বিন্দুবাসিনীর সমস্ত প্রাণটা একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি নফ্‌রার মার মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুভি এসেছে, কই, কোথায় ?"

নফ্‌রার মা সেই কথা শুনিয়াই উত্তর দিল, "ওই যে গো তোমার দরজার আড়ালে চুপটি করিয়া দাঁড়িয়ে আছে।"

বিন্দুবাসিনী বুঝিলেন, শোভার এ সঙ্কোচ কিসের ? তিনি নফ্‌রার মাকে আর কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহের দরজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দরজায় শোভা নত মস্তকে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিন্দুবাসিনী যাইয়া সাদরে তাহার হাত ধরিয়া অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "দরজার ধারটিতে এমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন মা ? কিসের লজ্জা ! মায়ের কাছে কি মেয়ের লজ্জা আছে। তোরই সুখের জন্যে তোরই মঙ্গলের জন্যে, তোর বাবা আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছে। এতে লজ্জার কি আছে বল্। আয় ঘরের ভেতর আয়।

স্নেহের মধুরতায় শোভার প্রাণটা যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কেমন যেন আপনা হইতে তাহার নয়নের কোণে অশ্রু দেখা দিল। সে বিন্দুবাসিনীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না। প্রাণপণ শক্তিতে নয়নের অশ্রু নয়নে শুকাইল। অতি সঙ্কোচিত ভাবে জড়সড় হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিন্দুবাসিনী শোভার হাত ধরিয়া তাহাকে পাটীর নিকট আনিয়া বলিলেন, "বোস, তারপর শুনি সব একে একে। কবে বিয়ে হবে, কি নিমিত্ত আজকাল ঠাকুরপো আর আসে না। কোন খবর পাই নি। কবে বিয়ের দিন স্থির হলো।"

শোভা নীরব। কবে বিবাহের দিন হইয়াছে শোভা নিজেই তাহা জ্ঞাত নহে। সে বিন্দুবাসিনীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। বিন্দুবাসিনী পুনরায় বলিলেন, "এখন বুঝি দিন স্থির হয়নি। ছুর্ত

বিভির কাশী থেকে ফিরলে তবে দিন স্থির হবে, মা ?"

বিন্দুবাসিনী দুই তিন বার প্রশ্ন করিবার পর শোভা অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "তাতো আমি বল্‌তে পারিনি।"

নক্‌রার মা তখনও দাঁড়াইয়াছিল। শোভা নীরব হইতে সে বলিয়া উঠিল, "হ্যাগা বুড়ি দিদি, তোমার মুখটি এমন মলিন কেন? শুভ কর্ম্মে কি এমন মুখটি মলিন কর্ত্তে আছে। আমাদের বিয়ের সময় তো আমোদে হেসেই খুন হয়েছিলুম।"

শোভার হইয়া বিন্দুবাসিনী উত্তর দিলেন, "পরের ঘরে যাবে, মুখ একটু চুপ হবে না। তোদের কথা আলাদা। ও ছেলে মানুষ, কখন বাপকে ছেড়ে একদিনও থাকে নি। সেই বাপের কাছ ছাড়া হয়ে থাক্‌তে হবে; তার জন্তে কার না মন কেমন করে? তবে আমাদের মেয়ে ভাল, ও দু'দিনেই স্বামীর ঘর, আপনার ঘর করে নিতে পার্‌বে।"

নক্‌রার মা কথাটা কড়িয়া বলিল, "তা শুভিদিদি খুব পার্‌বে, লোক বস কর্ত্তে শুভি দিদি খুব পারে। যাই আমার বাসন গুনো পড়ে রয়েছে।"

নক্‌রার মা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিন্দুবাসিনী শোভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা একবার তোর প্রফুল্লনাথের সঙ্গে দেখা করে আয়গে। আমি আজ রাত্রেই তোর প্রফুল্লনাথের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। এতদিন তুই আমাদের ছিলি, দু'দিন পরে পরের হবি, যাবার সময় একটু মিষ্টি মুখ করে যাস্। তখন তো তোকে আর যখন তখন এনে খাওয়াতে পারবো না।

শোভা বিন্দুবাসিনীর কথায় কোন উত্তর দিল না,—মাথাটি নীচু করিয়া চুপটি করিয়া রহিল। বিন্দুবাসিনী বলিতে লাগিলেন, "ভগবান যা করেন, তা ভালর জন্তেই করেন। তাঁর কাজে কখন মঙ্গল্ ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। তাই তার আর এক নাম মঙ্গলময়। ভগবানের দান মাথায় পেতে নিতে হয়, ভুলেও যেন মনের কোণে তাচ্ছিল্য না আসে। তিনি যাকে যা দেন, তাই নিয়ে যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তা হলে নিশ্চয়ই সে সুখী হয়। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সকলকে আপনার করে নিবি, সকলেই ভাল বাস্‌বে, তবেই তো বাপমায়ের মুখ উজ্জ্বল হবে।"

শোভা তথাপি নীরব। বিন্দুবাসিনী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "যা আর দেরী করিস্‌নে, প্রফুল্ল দাদার সঙ্গে দেখা করে আয়গে।

তাকে হয় তো এখনি আবার বেরুতে হবে। এখনও তার কি কি জিনিষ কিন্‌তে বাকি আছে।"

বিন্দুবাসিনী তাঁহার স্বর্ণ মণ্ডিত চসমা খানি খাপ হইতে বাহির করিয়া আবার চক্ষে আঁটিলেন। তার পর রামায়ণ খানি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "যা তোর প্রফুল্ল দাদা হয় তো ঘুমুচ্ছে ডেকে তুলগে যা। বেলা পড়তেও আর বড় বেশী বাকি নেই। কি কি কিন্‌তে হবে সকাল সকাল গিয়ে কিনে আসুক গে।"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পা দুইটা যেন অগ্রসর হইতে চাহিল না। যাহার কাছে কাছে দিন রাত্র থাকিয়া সে বড় হইয়াছে, আজ তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তাহার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। রাজ্যের লজ্জা আজ প্রফুল্লনাথের নিকট উপস্থিত হইবার পথে যেন একটা সুদৃঢ় প্রাচীর আটিয়া দিয়াছে। সে প্রাচীর ভেদ করা তাহার পক্ষে মহা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও কিছুতেই আর হইতে পারে না। সে ধীরে ধীরে বিন্দুবাসিনীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রাণপণ শক্তিতে সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রফুল্লনাথের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার দৃষ্টি প্রফুল্লনাথের উপর পতিত হইল। প্রফুল্লনাথ একখানা সোফার উপর মাটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া আছেন। শকুনীর কপট পাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া যুধিষ্ঠির যেমন পাষাণের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন প্রফুল্লনাথও আজ সেইরূপ চৈতন্যহীন জড়ের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব হারাণের সুস্পষ্ট চিহ্ন তাঁহার মুখের উপর জল জল করিতেছিল। শোভা তাহার এরূপ ভাব আর জীবনে কখনও দেখে নাই। প্রফুল্লনাথের মুখের দিকে চাহিয়া শোভার সমস্ত প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; তাহার যেন কেমন ভয় হইল, সে ধীরে ধীরে প্রফুল্লনাথের নিকটে যাইয়া দুই হস্তে তাঁহার একখানি হস্ত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে প্রফুল্লদা,—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

শোভার করস্পর্শে প্রফুল্লনাথের মুখে চোখে কতকটা সজীবতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল! তিনি কষ্টে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না কিছুতো হয়নি। এস বোস।"

শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই শোফার এক ধারে উপবিষ্টা হইল।

প্রফুল্লনাথ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন "আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি মাকে নিয়ে পুরী যাচ্ছি, ফিরতে কিছুদিন দেরী হওয়াটাই সম্ভব। যদি কিছু দরকার হয়—আমার ঠিকানাটা লিখে রেখে দাও, আমায় সংবাদ দিও।"

কতবার কত তীর্থ করাইতে প্রফুল্লনাথ জননীকে লইয়া গিয়াছেন; প্রতিবারই শোভা তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে। গমনের পূর্ব্বে,—গমনের আয়োজনের কত উৎসাহ—কত আনন্দ। প্রফুনাথের কথায়—আজ সেই সকল কথা একেবারে এক সঙ্গে শোভার প্রাণের ভিতর লাফাইয়া উঠিল। শোভা কোন উত্তর দিতে পারিল না,—তাহার যেন কে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। প্রফুল্লনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন, "খুব সাবধানে থেক। এমন কাজ কোন দিন করো না, যাতে লোকে প্রাণে কষ্ট পায়। সব দিক বজায় রেখে, সহ্য করে থেক, পৃথিবীতে বড় হ'তে গেলে অনেক সহ্য কর্ত্তে হয়। আর –"

প্রফুল্লনাথের কণ্ঠ রোধ হইল,—তিনি যাহা কহিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা আর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। শোভা বিহ্বলার ন্যায় প্রফুল্লনাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—"আর! আর কি?"

একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস সমস্ত ঘরখানাকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া প্রফুল্লনাথের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তিনি নিমেষে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "না আর কিছু না। আচ্ছা এখন যাও। আমাকে আবার এখনি বেরুতে হবে, এখনও অনেক জিনিষ পত্র কিনতে বাকি আছে।"

কিন্তু শোভা নড়িল না, সে অবনত মস্তকে বসিয়া প্রফুল্লনাথের আঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই,—উভয়েই নীরব। কেবল প্রকোষ্ঠের উপরিস্থিত ঘড়ি টক্ টক্ করিয়া, এই যে তাহাদের শেষ সাক্ষাৎ তাহাই স্মরণ করিয়া দিতে ছিল। বহুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই, সহসা শোভা তাহার মুখখানি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না,—তুমি পুরী থেকে কবে ফিরবে?"

প্রফুল্লনাথ শোভার মুখের দিকে চাহিলেন—তাহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,—জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, সম্ভব। যদি কখনও ভগবানের ইচ্ছায় আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—তখন যেন হিন্দু অন্তঃপুরের গরীয়সী মূর্ত্তি নিয়ে আমার সম্মুখে

এসে দাঁড়িও। রোগীর সেবায়, তাপিতের সান্ত্বনায়, প্রেমের গৌরবে লক্ষ্মীরূপী যেন তোমায় দেখতে পাই। স্বামীর আলয়ে—সংসার নিকেতনে শতদল পদ্মের সৌরভের মত তোমার সৌরভ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিবি, কোন দিন না শুনতে পাই যেন তোমার কর্ত্তব্যে অবহেলা ঘটেছে।

শোভা অবনত মস্তকে বসিয়াছিল, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া আসিয়া প্রফুল্লনাথের হস্তের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইল।

(ক্রমশঃ)
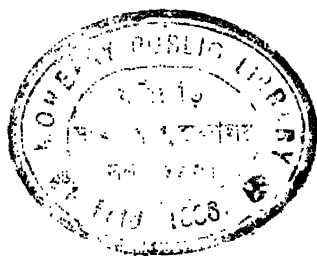
গল্পলহরী

৪র্থ বর্ষ, { ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৩, { ১১শ, ১২শ সংখ্যা

লক্ষ্যহীন।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[লেখক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

[২৬]

এবার সব শেষ প্রিয়ম্বদা, যা কিছু ছিল, সব খুইয়েছি, পৈত্রিক বিষয় আশয় বিক্রি করে আমি অবসর হয়ে বসেছি। ঋণ যা ছিল, তাও শেষ হয়েছে। সুবোধকেও এ যাত্রার মত জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। আমার কাজও ফুরিয়েছে। উন্মত্তের মত কথাগুলি বলিতেই প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া আশ্বাস দিয়া বলিল—"গেছে, বেশ হয়েছে, এবার চল একটু নিরিবিলি যায়গায় সুস্থ হয়ে থাকব, ওতে আর ভাববার কি আছে, দুটা পেট বৈত নয়, এক রকম করে চলে যাবে, জীবনে ত সুখের মুখ দেখনি, একবার নিরিবিলি হতে পাল্লে দেখবে, টাকা পয়সা না থাকলেও একটা শান্তি তাতে রয়েছে।"

একি, যাহাকে ললিতমোহন অপেয় আবিল জল বলিয়া পিপাসার সময় দূরে দূরে থাকিত, সেই যে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ সুপেয় হইয়া তাঁহার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উপস্থিত হইয়াছে। দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে প্রিয়ম্বদাকে সে স্বার্থের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, আজ ললিতমোহনের জন্যে তাহার এ কি করুণার সর্ব্বস্বান্ত দান! ললিতমোহন আর ভাবিল না,

কোন কথা বলিল না, প্রিয়ম্বদাকে জড়াইয়া অবশের মত পড়িয়া রহিল। প্রিয়ম্বদা আবার বলিল—"চল এবার, এমন দূরদেশে চলে যাব, যেখানে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই, নিত্যই আমরা আমাদের কাছে নূতন হয়ে দাঁড়াব, পতিপত্নীর হৃদয়ের ভাব নিত্য যে নূতন আনন্দ এনে দেবে, সে ত শত নিখিলেশও দিতে পার্‌বে না।"

ললিতমোহন স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রিয়ম্বদার কপোল স্পর্শ করিয়া বলিল—"তাই প্রিয়ম্বদা, আমিও সেই কথা ভেবেছি, একটা কাজ এখনও বাকি রয়েছে, আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে, লীলাকে পাই কি না।"

"সুবোধবাবু বেরিয়ে কোথায় গেলেন ?"

"কি জানি, তাকে ত আমি আর ধত্তে পারিনি, হাজত থেকে বেরিয়ে কোন্ দিকে যে ছুটেছে, অনেক খোঁজ করেও তার সন্ধান পেলুম না।"

প্রিয়ম্বদা বলিল—"হায় অভাগিনী লীলা, ওর অদৃষ্টে আর সুখ হল না, যদিও তাকে পাওয়া যায়, তবুত সে মরারও বেশী কষ্ট পাবে।"

রমানাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া ললিতমোহনের হাতে একটা পরোয়ানা দিয়া বলিল—"বাবু, পেয়াদা এটা দিয়ে গেল।"

ললিতমোহন পড়িয়া দেখিল, আদালতের শমন। ললিতার মাতা তাহার নামে নালিশ করিয়াছে, নূতন বিস্ময়ে আর একবারের জন্য চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"প্রিয়ম্বদা, মানুষ এত খল, এত অত্যাচারী হতে পারে, দিন দিনই যেন কে আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ললিতার মা আমার নামে দু'শ টাকার দাবীতে নালিশ করেছে।" একটু থামিয়া আবার বলিল—"জান এ কিসের টাকা, সেবার সুবোধের চাকরীর জন্যে পাঁচশ টাকা ঘুস দিতে হয়েছিল, আমার হাতে তখন টাকা না থাকায়, সুবোধকে বলে আমি ললিতার কাছ থেকে দু'শ টাকা নিয়েছিলাম। তারই জন্যে আবার নালিশ !"

"তোমার কিন্তু এবার কোর্টে সব খুলে বল্‌তে হবে।"

"না প্রিয়ম্বদা, তাতে আর কাজ নেই, সব ত গেছে, দু'শ টাকার জন্য আবার আদালতে দাঁড়াতে যাব।" বলিয়া রমানাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"নায়েব মশাইকে বল, তহবিলে যে টাকা আছে, তা থেকে যেন সুদে আসলে সব টাকা মিটিয়ে দেয়।"

মেঘ-পালিত ক্ষুদ্র তটিনী যেমন সুস্থান কুস্থান জ্ঞান হারা হইয়া পথের লতাগুল্ম, কণ্টক প্রস্তর প্রভৃতিতে বাধা পাইয়াও বেগে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, ললিতমোহনের মনও নিখিলেশের দিকে তেমনই বেগে চলিতে-ছিল, সে যতই ভাবুক, অপমানে অবজ্ঞায় তাহার পথ যতই আবৃত্ত থাকুক, কিছুতেই ত সে মনের গতি রোধ করিতে পারিতেছে না। সম্মুখের প্রস্তর খণ্ডে দ্বিধাবিভক্ত স্রোতের ন্যায় মাঝখানে বাধা পাইয়া সে বিভিন্ন পথই ধরিতেছিল। এবার বাড়ী হইতে আসিয়া কিন্তু সে প্রথমেই নিখিলেশের কাছে গিয়া হাজির হইল। শয্যার উপর শায়িত শিশুটিকে কোলে করিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে নিখিলেশ দেখিতে পাইয়া বিরক্তির সহিত বলিল—"আবার এখানে কবে এলি রে ?"

"এই ত আস্‌ছি, এখনও বাসায় যাইনি, শুন্‌লুম তুই শীগ্‌গিরই দেশে যাচ্ছিস্, তাই তোর সঙ্গে দেখা করেই বাসায় যাব ভেবেছি।"

নিখিলেশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিছানার উপর বসিয়া অতি অনিচ্ছায় বলিল—"বোস।"

ললিতমোহনের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে খোকার সেই কমনীয়তার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সহসা একটা তীব্র উপহাসের স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ওধারের ঘর হইতে কে একজন শ্লেষের স্বরে উচ্চ গলায় বলিল—"আচ্ছা জ্যেঠাইমা, এ লোকটার কি আক্কেল, দিন নেই, রাত নেই, লজ্জার মাথা খেয়ে, এদের পিছনে লেগেই আছে। এত করে বারণ করে দেওয়া হয়েছে, তবু যেন ওর জ্ঞানই হচ্ছে না।"

মৃদুকণ্ঠে জ্যেঠাইমা কি বলিলেন, তাহা ললিতমোহন শুনিতে পাইল না, সে শুষ্কমুখে একবার নিখিলেশের দিকে দৃষ্টি করিয়া আবার সেই দিকেই কাণ দিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট শুনিতেছিল, সরসীর খুড়তুত বোন বিন্দু বলিতেছিল—"আর এমন বেলাজ, সে দিন দিদি পান নিয়ে যেতে ও কি কেলেঙ্কারিটাই কল্লে, কথা নেই, বার্ত্তা নেই হাত ধরে টানাটানি, এটা যেন একটা ভদ্রলোকের বাড়ীই নয়। আমিত আড়ালে থেকে লজ্জায় মরে যাই। তোমরা তাই জ্যেঠাইমা, অন্য হলে ঝাটা মেরে বার করে দিত।"

ললিতমোহনের উত্তপ্ত দেহটা, যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল, সে কোন মতে খোকাকে নিখিলেশের কোলে দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি রে এসব কথা ?"

"সত্যি মিথ্যা সে বিচার নয় নাই কল্লে, কিন্তু তুমি এম্নি উপরে না এসেও ত পার।"

ললিতমোহন অতিকষ্টে এক পা বাড়াইল, সম্মুখের জিনিষগুলি যেন তাহার দিকে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া হাসিতেছিল। আর একবার সে ফিরিয়া চহিল, তাহার মুখ দিয়া কেবলমাত্র বাহির হইল 'তবে যাই।' আবার ফিরিল, আর একবার সেই বালকের হাসিভরা মুখের দিকে তাকাইল, ভাবিল ইহার মত পবিত্র জিনিষ ত পৃথিবীতে দুটি নাই, শিশুর সরল হাসি, যাহাতে সুধু অমৃতই রহিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া সে বালকের ক্ষুদ্রকপোলে একটি ক্ষুদ্র চুম্বন করিয়া আবারও ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার হৃদয় যেন সহস্র হস্ত বাড়াইয়া খোকাকে একবার বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছিল, সে স্পৃহাকে সে দমন করিল, নীরবে আবার একপা অগ্রসর হইল, মনে মনে বলিল—"দধিচী মুনি ত তার মাংস দিয়ে অতিথিকে তৃপ্ত করেছিলেন আমি নয় বন্ধুর প্রীত্যর্থে জীবন বিসর্জ্জন দেব।" বলিয়া আবার চলিল, নীচে নামিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় লোক পরিপূর্ণ। কে একজন নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে দ্রুত পা বাড়াইল, কি জানি আবারও বা কেহ কিছু বলে। আর দাঁড়াইল না, ফিরিয়া চাহিল না, সম্মুখের পথটা বাহিয়া যেন দৌড়িয়া আসিয়া একটা রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"উঃ!"

পেছন হইতে কে ডাকিল—"ললিতবাবু!"

ফিরিয়া চাহিতে ভয় হইল, কি জানি যদি নিখিলের শ্বশুরবাড়ীর কেহ হয়, সে হয়ত ঘায়ের উপর নুন ছড়াইয়া দিতে আসিয়াছে, জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, আগন্তুক বলিল—"আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না ললিতবাবু, না চিন্‌বারই ত কথা, সেই একবার মাত্র দেখা হয়েছিল, আমি কিন্তু আপনার সে উপকারের কথা জীবনেও ভুল্‌তে পার্‌ব না।"

ললিতমোহন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া হাপ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিল, উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোক আবার বলিল—"আপনি না থাক্‌লে সেবার যে আমি পথেই মরে থাক্‌তুম, অমন কলেরার মধ্যে আপনিইত আমায় বাড়ী নিয়ে বাচিয়ে ছিলেন।"

ললিতমোহন এবার চিনিল, বলিল—"ওঃ আপনি, এপথে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"কিছুদিন থেকে আপনাকেই খুজে বেড়াচ্ছি, দেখি যদি কিছু প্রত্যুপকার কত্তে পারি।"

"সে কি, আমি আপনার এমন কি করেছি, না না সে জন্যে আপনার কিছুই কত্তে হবে না।"

"সে দেখা যাবে'খন, আসুন আপনি। বলিয়া আগন্তুক পথ হাটিয়া চলিল। ললিতমোহন তাহার পেছনে পেছনে অতিকষ্টে পোয়াটেক পথ গিয়া একখানা দোতালা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই আগন্তুক বলিল—"আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি।"

ললিতমোহন বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, সহসা কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া পায়ের গোড়ায় পড়িয়া লীলা ডাকিল—"দাদা!"

[২৮]

"লীলা, কোথায়, প্রিয়ম্বদা!"

"ও ঘরে পূজো কচ্ছে।"

বিস্মিত ললিতমোহন দুঃখের সহিত বলিল—"এখনও পূজো কচ্ছে, বেলা যে দুটো বেজে গেল।"

"কি করব বল, কত বুঝিয়েও ত কোনই ফল হচ্ছে না, দিন রাত পড়ে পড়ে কেবল ভাব্‌ছে, থেকে থেকে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে ওঠে, কত ক'রে ধরে বেঁধে তবে পূজোয় বসিয়েছি।"

দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ললিতমোহন কাতর স্বরে বলিল—"হায়! সুবোধ ত জীবনেও এ রত্ন চিন্‌তে পাল্লে না। তার ও'পর আবার ওর বরাত, এমন জ্বরই আমার হল যে, আজও তার ধাক্কা সাম্‌লাতে পারি নি, নৈলে একবার শেষ চেষ্টা করে দে্‌খতুম।"

রাঙ্গা পেড়ে ধব্‌ধবে কাপড় পরিয়া তপ্তগৌরাঙ্গী লীলা পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—"দাদা!"

ললিতমোহন মূকের মত সেই মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। শিবের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী শিবানী যেন আরাধনায় যাইতেছে। লীলা কোমলকণ্ঠে বলিল—"দাদা, মার কোন কাজ ত আমি আজও কত্তে পারি নি, তিনি মারা যেতে ত আমি ওদের ওখানে ছিলাম, অবস্থা যা তাতে কোন কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, বলি বলি করে এদ্দিন তোমায়ও বলা হয় নি।"

ললিতমোহন চোখ মুছিয়া বলিল—"সে হবেখ'ন, কিন্তু তুই যে এখনও খড় খাস্‌নি ?"

লীলা সে কথার উত্তর না করিয়া বলিল—"অনেক দিন হয়ে গেছে, আর হবে'খন বল্লেত চল্‌ছে না, আস্‌ছে একাদশীতেই তোমার আমায় একাজ করাতে হবে।"

"তাই হবে রে, সে জন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না, এখন তুই খেতে যাবি ত, না আমায় আরও পুড়িয়ে মার্‌তে চাচ্ছিস্।"

"এই ত যাচ্ছি" বলিয়া একটি কথাতেই ললিতমোহনের মনের গ্লানি কাড়িয়া লইতে গিয়া লীলা দ্রুত বাহির হইয়া গেল। খোকাকে কোলে করিয়া সরসী গৃহে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কেমন আছেন ললিতবাবু ?"

ললিতমোহন বিস্মিত হইল, বিস্মিতের অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে সরসী ?"

মুচ্‌কি হাসিয়া সরসী উত্তর করিল—"কেন, আমার কি এখানে আস্‌তেও নেই ?" তারপর প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া আবার বলিল—"তুমি কবে এলে দিদি, কৈ আমাকেত একটা খবরও দাওনি—।"

কথাটার মাঝ খানে বাধা দিয়া ললিতমোহন বলিল—"না সরসী তোমার ত এখানেও আসা উচিত হয় নি, আমি যে তোমাদের শত্রু। সে দিন না আমায় দেখে লম্বা ঘোমটা টেনে ঘর ছেড়ে চলে গেলে। "ললিতমোহন থামিল, অভিমান ও প্রাণান্তকর দুঃখ তাহার নয়নপথে উচ্ছলিত হইয়া বাহির হইতেছিল।

প্রিয়ম্বদা সরসীকে ধরিয়া বসাইয়া ললিতমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিল —"কেন, একে তুমি বৃথাই অনুযোগ কচ্ছ, মেয়ে মানুষ ইচ্ছা কল্লেইত কোন কাজ করে উঠ্‌তে পারে না।"

সরসী বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"ললিতবাবু, আপনার কাছ থেকেইত শিখেছি, স্বামীর কথা, স্ত্রীলোক কোন দিন অবহেলা না করে। এখনও আমার মনে পড়্‌ছে, আপনার সে কথা, প্রথম যখন আপনি আমায় দেখে কোলে করে নিয়ে বলেছিলেন—'তোমায় আজ একটি কথা বলে রাখ্‌ছি সরসী, এ যেন জীবনেও ভুল না, স্বামীর বাক্য যেন একদিনের জন্যেও লঙ্ঘন কর' না, তাতেই স্ত্রীলোকের সুখ, তাতেই তাদের শান্তি ও ধর্ম্ম।"

পুরাণ কথাটার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় ললিতমোহন পূর্ব্বস্মৃতির খোচায়

বিচলিত হইয়া উঠিল। বাল্যের সেই সুখ, সেই অযাচিত প্রাণ বিনিময়, নিখিলেশ ও তাহার একত্রাবস্থিতির দিনগুলি আজ যেন এই দুঃখের সময়টার উপর একটা যবনিকা আনিয়া ফেলিল। অস্ফুটস্বরে ললিতমোহন বলিল—সেই নিখিল আজ এই হয়েছে। লোহার খাপ যে কেবল মরিচা ধরে আপনার অস্তিত্বই হারিয়ে বসে, তা নয়, সে আশ্রিতকেও অকর্ম্মণ্য করে তোলে, নাশের পথ দেখিয়ে দেয়।"

সরসী কিছু গম্ভীর হইয়া পড়িল, ললিতমোহন আবার বলিল—"আচ্ছা সরসী নিখিলই তোমাকে বলে দিয়েছিল, আমায় এম্নি করে অপমান কত্তে।"

"তাঁরত কোন দোষ নেই, ও-বাড়ীর সবাকার পরামর্শে এত হয়েছে।"

"তবে যে তুমি বড় আজ এখানে এসেছ, নিখিল জান্‌লে হয়ত রাগ করবে।"

"তাকে না জানিয়ে কি আমি আর এসেছি, না পারি আস্‌তে। সেইত বলে দিলে, ললিতবাবু তোমাদের জন্য বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, একবার দেখে এস।"

ললিতমোহনের মুখ যেন প্রভাতাকাশের মত হাসিয়া উঠিল। সরসী প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া বলিল—"চল দিদি, দেখি গিয়ে লীলা কি কচ্ছে।" পথে যাইতে যাইতে সরসী জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ দিদি?"

প্রিয়ম্বদা হাসিয়া বলিল—"এখন কটা দিন ত যাচ্ছে ভাল, এবার যেন বরাত ফিরে দাঁড়িয়েছে।"

"ললিতবাবু।"

সরসী ফিরিয়া দেখিল, তাহার বড়দাদা বিভূতি। সে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বড় দা তুমি এখানে?"

"আমি এখানে, বড় বিস্ময়ের কথা, আর যে আমাদের এত অপমান করেছে, তুমি কোন্ মুখে তার বাড়ীতে এসেছ।" কর্কশকণ্ঠে একথা বলিয়া বিভূতি যেন দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

সরসী সহজ স্বরে বলিল—"অপমানত তোমাদের তিনি কিছু করেন নি, বরং তুমিই—।" বলিয়া মধ্যপথে থামিয়া যাইতেই বিভূতি এবার সপ্তমে সুর চড়াইয়া লইয়া বলিল—কি বল্‌ছিলে, বলই না, আর যদি আমাদের বাড়ী মাড়াতে হয় ত এখুনি আমার সঙ্গে এস।"

সরসী গর্ব্বভরে ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিল—বড় যে ভয় দেখাচ্ছ বড়দা। তুমি কি ভেবেছ, বড়লোক বলে তোমার ভয়ে এদ্দিন মুখ বুজে পড়েছিলাম, সে ভেব না, ন্যায়কে যদি অন্যায় দিয়ে ঢাক্‌তেই হয়, তবে সেখানেও যে

বল্‌বার মত একটা প্রতিভূ চাই। যার ভয়ে এদ্দিন এম্‌নি অন্যায় করেছি, সে আস্‌তে বল্লে তবেইত এসেছি।" বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়ম্বদার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া লীলার মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—"এত বেলা, তবে তোর খাওয়া হল রে পোড়ার মুখি।"

[২৯]

"ফিট্‌ বাবুটি হয়ে আজ এই রাতে কোথায় বেরুচ্ছ।"

ললিতমোহন গম্ভীর হইয়া বলিল—"বড্ড শক্ত কাজে হাত দিয়েছি প্রিয়ম্বদা, এদ্দিন তোমায় বলতে সাহস পাইনি, কি জানি শুনে তুমি কি মনে কর্‌বে!"

"তবু?"

"পাঁচ সাতদিন হেটে হেটে ত সুবোধটার খোজ পেয়েছি, সে ত বেশ্যা-বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়্‌ছে না।"

প্রিয়ম্বদা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ওতে ত শুনেছি, অনেক টাকা লাগে, অত টাকা সে কোত্থেকে পেল?"

"কেন, সেই আফিস থেকে নিয়েছিল, সেত কম নয়, প্রায় দুহাজার হবে।"

"তুমি এখন কি কত্তে যাচ্ছ?"

"সে কথাইত বল্‌ছিলাম, শুনেছি, ওসব যায়গা থেকে বের করে আন্‌তে হলে, একটু বেশী রকম চেষ্টা করে মাগীদের ওপর অবিশ্বাস জন্মাতে না পাল্লে আর উপায় নেই—

তাই বুঝি রোজ সেখানে যাওয়া হচ্ছে,—না?"

ললিতমোহন উত্তর করিল না, প্রিয়ম্বদা যেন আপন মনে বার দুই শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"না গো তুমি কিন্তু ওতে আর যেয়ো না।"

ললিতমোহন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

প্রিয়ম্বদার মুখ কাল হইয়া গিয়াছিল, সে ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল—"তোমাকে অবিশ্বাস করব—সেত বেঁচে থেকে পার্‌ব না। আমার কেমন ভয় হচ্ছে।"

"যে করে হ'ক তাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে। লীলার জন্যে আমি ত প্রাণও দিতে পারি।" বলিয়াই প্রিয়ম্বদাকে টানিয়া আনিয়া মুখ চুম্বন করিয়া

ললিতমোহন বলিল—"তুমি ভয় পেও না, আমি খুব সাম্‌লে চল্‌তেই চেষ্টা কচ্ছি।"

ঘণ্টাখানেক পরে লীলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কৈ, বৌদি ?"

প্রিয়ম্বদা লীলাকে টানিয়া আনিয়া কোলের মধ্যে লইয়া বলিল—"দাদা যে শ্যামচাঁদের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিদি।"

না বৌদি, তুমি দাদাকে বারণ করে দিও, এই রোগা শরীর নিয়ে যেন অত না খাটেন।"

প্রিয়ম্বদা কি একটা কুৎসিত ঠাট্টা করিতে যাইতেছিল, তাহার মন এখন সদ্যঃস্নাত ব্যক্তির মত পবিত্র নির্ম্মল, এতদিনে যে সে স্বার্থের সমস্ত কাদা ধুইয়া পুছিয়া স্বামীর ইচ্ছাকেই নিজের অভিপ্রায়ের অনুকূল করিয়া লইয়াছিল। আর ত সে কথায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া স্বামীর মতের বিরুদ্ধে এক পাও নড়িতে চাহে না। সমস্ত প্রাণ দিয়া সে স্বামীকেই চাহে, স্বামীর শুভাশুভ বা কার্য্যাকার্য্য যেন সে স্বামীর যিনি স্বামী, সেই ভগবানের চরণেই ফেলিয়া দিয়াছে। ললিতমোহনও এখন রোজই তাহাকে আদরে সোহাগে আপ্যায়িত করিত, শিশিরবিন্দু যেন রৌদ্রতপ্ত দূর্ব্বাদলকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। লীলা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল—"ফের যদি ওসব খারাপ কথা বলত এসব, আমি দাদাকে বলে দেব।"

"ওঃ সে ভয়েত আমি একেবারে মুষ্‌ড়ে যাচ্ছি।" বলিয়া প্রিয়ম্বদা আবারও হাসিয়া উঠিল।

লীলা বলিল—"আচ্ছা বৌদি, নিখিলবাবুর এ কেমন ব্যাভার, দাদার এই অসুখ, এক দিন দেখ্‌তে এল না ?"

প্রিয়ম্বদা অন্যমনস্কের মত ছোট কথায় উত্তর করিল—"ও এমন হয় !"

বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—যাই শুইগে দাদা এসেছেন।"

ললিতমোহন আসিয়া দাঁড়াইতেই প্রিয়ম্বদা জিজ্ঞাসা করিল—"কি করে এলে, আজ কিন্তু আমাকে বল্‌তে হবে।"

জামা ছাড়িতে ছাড়িতে চৌকীর উপর বসিয়া ললিতমোহন বলিল—"বল্‌ছি, তুমি একটু বাতাস কর দেখি।" বলিয়া কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া আবার বলিল—"কাজ অনেকটা এগিয়েছে, সুবোধ বুঝেছে, ও বেজাটা

এখন আর তার হাতে নেই, আমার টাকার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে, আজ যখন আমি যেতেই সুবোধকে বের করে দিয়ে, খাতিরযত্ন করে নিয়ে ঘরে বসালে, তখনি দেখলুম, সুবোধ আমার দিকে চেয়ে ফোস্ ফোস্ কচ্ছে।"

ভীতা লীলা ললিতমোহনের হাত জড়াইয়া ধরিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল—"দেখ, তুমি কিন্তু আর সেখানে যেতে পারবে না।"

আর দু'টা দিন প্রিয়ম্বদা, তবেই ও বেরিয়ে পড়বে" বলিয়া মধ্যপথে বাধা পাইয়া কি চিন্তা করিয়া আবার বলিল—"আমার কেমন একটা ভয় হচ্ছে, কি জানি মদের ঘোরে মাগীর ওপর কোন অত্যাচার ক'রে না বসে।"

"আমার কিন্তু প্রাণটা কেবলই কেঁপে উঠছে, না গো, তুমি আর ও কাজে যেয়ো না।" বলিয়া প্রিয়ম্বদা আকুলনয়নে চাহিতেই প্রিয়ম্বদাকে টানিয়া বুকে আনিয়া ললিতমোহন বলিল—"সে যা হয় দেখা যাবে, রাত অনেক হয়েছে, এস ঘুমোই।"

(৩০)

সরসী বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই নিখিলেশ শেষ করিয়া বলিল—"আবার এ বাড়ীতে ঢুকলে কোন্ মুখে ?"

সরসী জবাব দিল না, বিভূতির আচরণে তাহার মনটা আজ ভাল ছিল না। সে কেবল নিখিলেশের ভয়েই আবার এ মুখ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। নিখিলেশ আবার বলিল—"এত জব্দ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিলে, আবার তাঁর ভাত মুখে দিতে লজ্জা করবে না।"

সরসী জীবনে যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিল, চটিয়া উঠিয়া স্বামীকে বলিল—"তার ভাত, সে ত আমি কোন কালেও মুখে দেব না, যে মানুষকে অমন করে কুপিয়ে কাটতে পারে, তার ভাত খেলে যে পাপ হয়।"

নিখিলেশ সরসীর কথাটার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের খোচা খাইয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"ললিতকে নিয়েই তোমার চলবে, কেমন না ?"

এ কথার উত্তরে সরসী স্বাধীনভাবে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার মুখ দিয়া স্বতঃই যেন বাহির হইয়া পড়িল—"ছিঃ অকৃতজ্ঞ !"

নিখিলেশ যেন অসহ্যভাবে উত্তর না করিয়া গন্‌গন্ করিতে করিতে মুখ ভার করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাহুর মত উকি মারিয়া দুরদৃষ্ট যেন সবলে এই দম্পতীর চিরমধুর মাতৃ-হৃদয়ের মতই পবিত্র হাসিটুকু কাড়িয়া লইল ; সরসী বাহিরের দিকের

জানালাটা খুলিয়া দিয়া শয্যায় পড়িয়া পুড়িয়া দুশ্চিন্তায় চোখের পাতা ভিজাইয়া উঠাইতেছিল। জীবনে একেবারেই নূতন এই মনকষাকষিটা তাহাকে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে নত করিয়া ফেলিল। নিখিলেশ একবার ঘর, একবার বাহির এইভাবে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছিল, সরসীর প্রতি অভিমানটা তাহাকেও সূচীবিদ্ধের যন্ত্রণা দিতেছিল। সরসীর অশ্রুপূর্ণ চোখ দেখিয়া তাহার বেদনাটা যেন দ্বিগুণ হইয়া পড়িতেছিল, তাই সে শীঘ্র ঘটনার একটা কিনারা করিয়া লইবার জন্যে কেবলই পাশ কাটাইয়া ফিরিতেছিল।

সরসীর ক্ষুদ্র অভিমানটুকু আজ যেন ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থায় তাহাকে অভিসপ্তের মত ঘেরিয়া ফেলিল। ললিতমোহনকে লইয়া অযথা তাহাকে যে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করা হইতেছে, তাহা যেন সে আজ আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

নিখিলেশ এবারও বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"পড়ে পড়ে কি ললিতের মুখখানাই ভাবছ?"

সরসী জ্বলিয়া উঠিল, সে বেগে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"তাতে ত কোন দোষও নেই, আমি ত তাঁকে বড়দার থেকেও আপন বলেই জানি, আর তাঁর মত মানুষের কথা ভাবা, সেও যে ভাগ্যের কথা।"

নিখিলেশের সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল, পদদলিত ভুজঙ্গের মত সে আর মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল না, বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না, বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া কে যেন তাহাকে সজোরে ঘার উপর ঘা মারিতেছিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া রুদ্ধ অভিমান ও কান্না, হৃদয়ের সমস্ত বল দিয়া চাপিয়া রাখিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্তে সরসী নিজের ভ্রম বুঝিল, সে এতটুকু হইয়া গিয়া অসাড়ে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে নিখিলেশ আবার আসিল, একপা একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া সম্মুখের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। সরসী এবার আর থাকিতে পারিল না, নিখিলেশের সেই উন্মাদদৃষ্টি তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত করিয়া দিল। সহসা তাহার হাত ধরিয়া সরসী বলিল—"খেয়েছ?"

নিখিলেশ হাত টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে দ্রুত পাদচারণা করিতে করিতে

বলিল—"সে ভাব্না তোমার ভাব্তে হবে না, যাকে ভাব্লে তোমার সুখশান্তি ও পুণ্য হবে, তার কথাই ভাব।"

ললিত্মোহন আসিয়া পেছন হইতে নিখিলেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"কিরে বড় যে ছট্‌ফট্ কচ্ছিস্?"

তদবস্থ ললিতমোহনকে দেখিয়া নিখিলেশ যেন কেমন হইয়া গেল। ললিতমোহন আবাব বলিল—"আমারি জন্যে ঘরেও তোরা শোয়াস্তিতে থাক্‌তে পারিস্ না দেখ্‌ছি, না ভাই, আর যাতে তোদের কোন অসুখ অসুবিধা না হয়, আমি তাই করব, আজকের মত মাপ কর।"

নিখিলেশ জবাব দিতে পারিল না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। বজ্রাহতের মত ললিতমোহন ডাকিল—"সরসী—!"

সরসীও জবাব দিতে পারিল না, স্বামীর জন্য পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর মন আজ কেবলই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সহসা বিভূতিবাবু উপস্থিত হইয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন—নিলর্জ্জ, আবার এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে তোমার লজ্জাও হল না।"

ললিতমোহনের এই অপমান সরসীর অসহ্য মনে হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জিয়া বলিল—"বড়দা, ললিতবাবু ত তোমাদের বাড়ী আসেন নি, আমি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, এটা মনে রেখ যে, আমার বাপ মা ত এখনও বেঁচে আছেন, তাদের একটা মাথা গুজ্‌বার স্থানও রয়েছে।"

(৩১)

অনেক দিন পরে আজ যেন লীলার মুখে একটু হাসি ও একটু প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাতার শ্রাদ্ধ করিয়া স্বহস্তে তাঁহারই স্বর্গকামনায় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া সে যেন একটা তৃপ্তি, একটা আনন্দ লাভ করিতে-ছিল। স্বর্গগতা মাতার করুণ আশীর্ব্বাদ তাহার অদৃষ্টাকাশের কালিমাটাকে যেন ধুইয়া পুছিয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রি আটটা বাজিতেই ললিতমোহন জামাকাপড় পরিয়া বাহির হইতেছিল, হাসিয়া লীলা বলিল—"দাদা, আজ একটু শীগ্‌গীর করে ফিরে এস, তোমায় খাইয়ে তবে আমি খাব।"

"সে কি লীলা? না বোন্, তুই আমার জন্যে উপোস করে থাকিস্ না কিন্তু।"

"না দাদা, সে না হলে ত হবেনা, ও বেলা যে তোমার মোটেই খাওয়া

হয়নি। তুমি যে আজ আমার বামুন। তোমার না খাইয়ে ত আজ আমি খেতে পার্‌ব না।"

"তবে তাই, আমি এখুনি আস্‌ছি।" বলিয়া ললিতমোহন চলিয়া যাইতেই প্রিয়ম্বদা গম্ভীর হইয়া হাসিয়া বলিল—"বামুন খাইয়ে আজকে কিন্তু বর মেগে নিস্ দিদি।"

লীলার মুখও গম্ভীর হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, ললিতমোহন ত তাহার স্বামীর জন্যই আজও আবার বাহিরে বাহির হইয়াছেন। সে অনুযোগ করিয়া বলিল—"তোমায় না এত করে মানা করেছি বৌদি, যে দাদাকে এমন রাতদুপুরে বেরুতে দিও না।"

প্রিয়ম্বদা হাসিমুখে উত্তর করিল—"না দিয়েই কি করি, তোর মুখ কাল দেখ্‌লে যে আমারও প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

"আচ্ছা বৌদি, বলত এ অভাগীকে তোমারই কেন এত ভালবাস? আমার জন্যেই ত তোমাদের যত কষ্ট।"

* * * * * *

রাত্রি এগারটা বাজিতে প্রিয়ম্বদা ললিতমোহনের পায়ের গোড়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতমোহন তখন অসাড়ে ঘুমাইতেছিল, কড়িকাঠ গলাইয়া জানালাপথে চাঁদের আলোটা তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, প্রিয়ম্বদা যে উজ্জ্বল সুখ-সুপ্ত মুখের দিকে কিছুকাল ধরিয়া চাহিয়া রহিল, ধীরে ধীরে তাহাতে ওষ্ঠপুট সংলগ্ন করিয়া লইল, তার পর কি মনে করিয়া দোর খুলিয়া বাহিরে আসিতেই সহসা কে যেন তাহাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। প্রিয়ম্বদা জড়সড় হইয়া পড়িল, সে যেন চাহিতে পারিতেছিল না, অব্যক্ত ভয়ে তাহার মুখ দিয়া শব্দও বাহির হইতেছিল না, আক্রমণকারী প্রিয়ম্বদাকে ছাড়িয়া দিয়া মুহূর্তে তাহার মুখ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষিপ্তের মত বলিল—"ওঃ, বড় তৃষা, খুন কল্লে তবে জুড়ুবে।"

প্রিয়ম্বদার আর ভাবিতে হইল না, মনে হইতেই শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হইয়া উঠিল। হতাশপ্রণয়ী সুবোধ যে তাহার স্বামীর অমঙ্গলের জন্যই আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সাধ্বী সমস্ত ভুলিয়া গেল। প্রাণ দিয়াও স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে, এই দৃঢ় চিন্তায় সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার হৃদয়ে পুরুষের অধিক বল আনিয়া দিল। সুবোধকে সজোরে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া উপস্থিত বুদ্ধিতে বাহির হইতে

শিকলটা টানিয়া দিয়া দোরে পীঠ দিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই সুবোধে শার্দ্দুলআক্রমণে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

প্রিয়ম্বদার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবু সে একপা নড়িল না, কোনমতে একবার চীৎকার করিতে পারিলে কাহারও আশ্রয় পাইবে ভাবিয়া সে এবার শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া লইয়া সুবোধের হাত ছাড়াইতে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সুবোধ আর সহ্য করিল না, বেশ্যার অপমানে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যানজনিত তীব্র কশাঘাতে তাহার হৃদয় যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। ললিতমোহনের রক্তে তৃষ্ণা দূর করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মদের উগ্র নেশায় আক্রান্ত সুবোধের ভাবিবার শক্তি ছিল না। "তবে রে হারামজাদি" বলিয়া রিভাল-ভারটা উঠাইয়া ধরিয়া কর্কশ বিকৃতকণ্ঠে বলিল—"সাবধান বল্‌ছি, নৈলে আগে তোকেই খুন করে তবে ঘরে ঢুকব।"

নিজের জন্য প্রিয়ম্বদার মোটেও ভাবনা ছিল না, প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাচাইতে পারিলেত সে বহুভাগ্য মনে করিবে, কিন্তু সে মরিলেও যদি স্বামীর কোন অমঙ্গল ঘটে, এই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ কেবলই কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কাতর স্বরে বলিল—"সুবোধবাবু! আপনি ভদ্র লোকের ছেলে, ছিঃ এত অধঃপাত আপনার!"

সুবোধ হাসিয়া উঠিল, তারপর রক্ত চক্ষুতে চাহিয়া গর্জ্জিয়া বলিল—"ওসব লেক্‌চারেত কোন কাজ হচ্ছে না, এখন পথ ছাড়্‌বিত ছাড়, নৈলে কিন্তু যেই কথা সেই কাজ।" বলিয়া আবারও সে প্রিয়ম্বদার গলা চাপিয়া ধরিল। প্রিয়ম্বদা কোন পথ খুজিয়া পাইতেছিল না। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল—"ভগবান, কোন দিনত আমার কোন প্রার্থনায় কাণ দাওনি, আজ অভাগিনীর মান রেখ,আমি যেন প্রাণ দিয়েও স্বামীকে বাচাতে পারি।"

সুবোধ আর বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না, নেশার ঘোরে সহসা তাহার মনে পড়িল, আলোকিত বেশ্যাবাড়ীর সেই শয্যাগৃহে ললিতের উপস্থিতি, তাহার সেই আদর, নিজের সুবোধের লাঞ্ছনা, তিরস্কার, ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কথা। মদ যেন তাহার মজ্জায় মজ্জায় ধমনীতে প্রতিহিংসা ফুটাইয়া তুলিতেছিল, সে প্রিয়ম্বদার গলা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দোরের দিকে ঝুকিয়া পড়িতেই কোন্ দৈবশক্তিতে শক্তিমতী প্রিয়ম্বদা উঠিয়া গিয়া পাষাণ প্রতিমার মতই আবারও দোর আগুলিয়া দাঁড়াইল।

সুবোধ গর্জ্জিয়া উঠিয়া এবার বুভুক্ষিতের মত তাহাকে সবলে ছিনাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া রোষারুষিতনেত্রে বলিল—"তবে মর, তা বলে ও বেটাকে খুন না করে আমিত আর যাচ্ছি না।" বলিয়া রিভলভারের গুলিতে প্রিয়ম্বদাকে ধরাশায়িত করিয়া উন্মত্তের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সহসা পেছন হইতে বজ্রমুষ্টিতে সুবোধের হাত ধরিয়া ভৃত্য রমানাথ রিভলভারটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে শব্দে সুপ্তোত্থিত ললিতমোহন হাত বাড়াইয়া শয্যার মধ্যে প্রিয়ম্বদাকে খুঁজিয়া পাইল না। অনিশ্চিত আশঙ্কায় আকুল কান্নায় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। নেশাখোরের মত টলিতে টলিতে দোর ধরিয়া টানিতেই বুঝিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। সেও গম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঝনাৎ করিয়া শিকলটা খুলিয়া গেল, দীপের আলোতে ধরাশায়িনী প্রিয়ম্বদার সেই মৃত্যুবিবর্ণ গৌরবমণ্ডিত মুখ দেখিয়া ললিতমোহন আর দাঁড়াইতে পারিল না; জীবনের প্রথম আজ সে বিহ্বলের মত শবের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর লীলা ঘুমাইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ চীৎকারের শব্দে সে উঠিয়া বসিয়া স্বর লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া শব্দই না পাইয়া এবার হ্যারিকেন হাতে বাহিরে আসিয়া সহসা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ললিতমোহন বালকের মত কাঁদিয়া বলিল—"হ্যারে শেষটা প্রিয়ম্বদাকে খুন কল্লি।"

লীলা আর শুনিতে পারিল না, "দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সুবোধের নেশা তখন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহার মনের কোণে যেন অনুতাপের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি সাড়া দিয়া কে যেন বলিয়া দিল,—ছিঃ, দুর্ব্বল, যে তোকে একদিন মারও অধিক ভালবেসেছে, নিজের সুখের জন্যে খুন ক'রে প্রতিহিংসা চরিতার্থ কল্লি!"

[৩২]

সেদিন যখন প্রিয়ম্বদার এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ জানাইয়া রমানাথ আসিয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাবু আপনাকে একবার অবশ্য যেতে বল্লেন।" তখন নিখিলেশের বৃথা গোঁয়ারতুমিটা যেন একেবারে ধসিয়া গেল। সে

তাড়াতাড়ি রমানাথকে বিদায় করিয়া গৃহে ঢুকিয়া সরসীকে বলিল—"সরসী, চল, এবার দুজনে গিয়ে যদি ললিতকে একটু শান্ত কত্তে পারি।"

প্রিয়দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অবধি সরসীও গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার প্রাণটা যেন আশ্রয় ছাড়িয়া উধাও হইয়া ললিতমোহনের পায়ের তলায় গিয়া নোয়াইয়া পড়িতেছিল। তবু সে সাহস করিয়া আর স্বামীকে কোন কথা বলিতে পারে নাই। সেদিনের ঘটনা হইতে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কোনদিন ললিতমোহন সম্বন্ধে কোন কথাই সে বলিবে না। এখন স্বামীর কথা শুনিয়া তাহার সাহস হইল, বাষ্পরুদ্ধ স্বরেই বলিল—"তাই চল, আহা তোমায় দেখ্‌লেও যে তিনি অনেকটা স্থির হতে পার্‌বেন।" বলিয়াই সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল। তারপরে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার বলিল—"দেখ এখানে আমি আর থাক্‌ব না। বড়দার ও কড়া কড়া কথাগুলো আমার সহ্য হয় না, একেবারে চল, যা দুদিন পাঁচদিন থাকি, ললিতবাবুর বাসায় থেকে তার পর বাড়ী চলে যাব।"

নিখিলেশের মনের গতিও যেন আজ সহসা কেমন ফিরিয়া দাঁড়াইল, যে বিভূতিবাবুকে সে বিবাহের পর হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছে, আজ যেন বাল্যস্মৃতি ললিতমোহনের দুঃখে জড়িত হইয়া তাহাকে সহসা বিভূতির প্রতি একটু কটাক্ষপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মুক্ত কণ্ঠে বলিল—"তাই চল সরসী, এখানে আর থেকে কাজ নেই।"

* * * * *

বিকালে একটা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে ললিতমোহন সুবোধকে বুঝাইতেছিল, লীলা পায়ের গোড়ায় বসিয়া চোখের জলে ধরণীবক্ষ অভিষিক্ত করিতেছিল, এমন সময় নিখিলেশ ও সরসী আসিয়া হাজির হইল, ললিতমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত বাড়াইয়া সরসীর ক্রোড় হইতে খোকাকে টানিয়া আনিয়া তপ্ত বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল। সরসী কাঁদিয়া ফেলিল, নিখিলেশ কিন্তু সুবোধকে দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া বলিল—"এখনও ওকে এখানে স্থান দিয়েছিস; কেন নিজেও কি অপঘাতে মর্‌তে চাস্ না কি?"

ললিতমোহন শান্ত স্বরে বাধা দিয়া বলিল—"ছিঃ নিখিল, ওকে এখন আর কটু কথা বলিস নি, নিজেই ওযে অনুতাপে পুড়ে মর্‌ছে।"

সুবোধ উন্মত্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—বলুন, ত নিখিলবাবু,

আপনি বুঝিয়ে বলুন, এই স্ত্রীঘাতীকে কেন আবার রেখেছেন, এখুনি আমায় পুলিসে ধরিয়ে দিন, ফাঁসিতে ঝুলে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

নিখিলেশ ললিতমোহনের সকৌতুক দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া রহিল। ললিত-মোহন বলিল—"লীলার সুখ না দেখে আশ্রিত স্বর্গে গিয়েও নরক যন্ত্রণা ভোগ করুন, আমি তার জন্যে প্রাণ অবহেলা করেও যে ঐ কাজে হাত দিয়েছিলাম আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে পুণ্যবতী সে চলে গেছে।" ললিত-মোহনের চোখ সজল হইয়া উঠিল। নিখিলেশ অতিষ্ঠ হইয়া বলিল—"স্ত্রী হত্যাকারীকে নিয়ে লীলারই কি সুখ হবে।"

মাঝখানে সরসী বলিয়া উঠিল,—"তবুত স্বামী, স্বামী হত্যা করুক, যাই করুক, সে বিচার ত স্ত্রীর কর্‌বার দরকার নেই।"

লীলা মাথা গুজিয়া বসিয়াছিল, সেও মনে মনে বলিল—"শত হ'ক্, তবু স্বামী, ভগবান্ তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও, আমার যেন একদিনের জন্যেও ও কথা মনে না হয়।"

গভীর আর্ত্তনাদের শব্দে সকলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সুবোধের মাতা ললিতার সহিত প্রবেশ করিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ললিতা ললিতমোহনের পায়ের গোড়ায় ছেলেটিকে রাখিয়া ললিতমোহনের পা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল—"আমার অপরাধের শেষ নেই। তার জন্যে আমি ক্ষমাও চাইনি, আপনিত দিদিকে বিধবা দেখ্‌তে পার্‌বেন না ললিতবাবু, তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন।"

ললিতমোহন মুখ বাঁকাইয়া নিজের কি উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নীরবেই রহিল। ললিতা কোন উত্তর না পাইয়া এবার সে স্বামীর জন্যে কাঁদিয়া উঠিয়া একে-বারে লীলার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া বলিল—"দিদি যা থেকে আর অপরাধ নেই, সেই অপরাধ দিয়ে আমি তোমায় কি কষ্ট যে না দিয়েছি, তাত বল্‌তে পারিনা, সে ত কেবলি স্বামীর জন্যে, তার ভাগ যেন আমার সহ্যই হত না। কিন্তু আজ আমি শপথ করে বল্‌ছি, আমি তোমাদের দাসী হয়ে থাকব। তুমি তাঁকে বাঁচাও, তুমি বল্লেত ললিতবাবু না বল্‌তে পার্‌বেন না।"

ললিতমোহনের ইষ্টসিদ্ধি হইয়া আসিল, সে সস্নেহে ললিতাকে ধরিয়া তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ললিতা, সুবোধের জন্য ভেব না। প্রিয়ম্বদা ত হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেছে, আমি ত সে কথা বলেই তাকে দাহ করে

এসেছি। আমার কোন লোকের মুখ দিয়ে ঘুণাক্ষরেও আর কোন কথা রেরুবে না। তোমরা সাবধান, হৈ চৈ করে যেন সব মাটি ক'রনা।"

[৩৩]

সুবোধ বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া তাহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলি চিন্তা করিয়া যাইতেছিল। লীলা যে নির্দ্দোষ, তাহা ত ললিতা এখন একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে, তবে কিসে কোন্ অপরাধে না জানিয়া না বুঝিয়া ললিতার ভ্রাতার প্ররোচনায় সে এই বিষ খাইয়াছিল। যে বিষ ললিতমোহনের মত বন্ধুর এমন সর্ব্বনাশ করিল। সে তাহার এই পাপ ক্ষালন করিবে কি করিয়া! হৃদয় যে ফাটিয়া যাইতেছে। সহসা ললিতমোহনের কথা মনে হইতে সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, ওঃ! কি উদার এই মানুষটি, যাহার গৌরব-জ্যোতিঃ নিখিলবিশ্বকে হাসাইয়া তুলিয়াছে। রুচির কান্তি শুভ্র পুষ্পগুচ্ছের মত নির্ম্মল, মনোমুগ্ধকর, পবিত্র স্বপ্নের মত হর্ষোদ্দীপক, কলঙ্কহীন মাধুর্য্যের মত সুষমামণ্ডিত; শুচিস্নাত গৌরবের মত পবিত্র, অনন্ত বিশ্বের মাঝখানে যাহা পরিপূর্ণ সুখসম্ভারের মত উদ্দীপ্ত, সেই ললিতমোহনকে সে এভাবে শাস্তি দিয়া তাহার উপকৃত হৃদয়ের উপর চির কলঙ্কের কালিমা লেপিয়া দিল। এ কালী যে কেরোসিনের কালী অপেক্ষাও গাঢ়, ইহা যে মাতৃকলঙ্ক অপেক্ষাও নিন্দনীয়, সতীর মিথ্যা অপবাদের মত মুখ দেখাইবার অযোগ্য, জারজ পুত্রের মত ঘৃণিত—হেয়। সুবোধ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। স্বামীর জন্য গতপ্রাণা প্রিয়ম্বদার দিব্য মূর্ত্তি যেন তাহার চখের গোড়ায় ভাসিয়া উঠিল। প্রিয়ম্বদা যেন একান্তে আসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল—"আপনি বিহ্বল হবেন না, লীলাকে আমরা বড় ভালবাসি, তার হৃদয় ত পবিত্র নির্ম্মল, এই পূর্ণ জ্যোৎস্না হতেও স্নিগ্ধ, ভাগীরথীর পূতধারা অপেক্ষাও পুণ্যপ্রতিষ্ঠাপক, তাকে বুকে করে নিন, তাতেই আপনার সকল পাপ, সকল অনুতাপ শেষ হয়ে যাবে। সতী রমণী যে স্বামীকে নরকের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয় বেগ হতেও উদ্ধার কত্তে পারে।" স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সুবোধের চারিদিক্ হাসিয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিতে পাইল, লীলা মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। সুবোধ একবার ভাবিল, যাই লীলাকে ধরিয়া তুলি, আবার যেন কি মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, না না, আমার এই হত্যাকলঙ্কিত হস্তের স্পর্শে যে ইহার পবিত্রতা নষ্ট হইবে। লীলা চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রভো, আমায় বল দাও;

আমি যেন আর সে কথা মনে না করি, স্বামী যে স্ত্রীর সকল অবস্থাতেই পূজ্য।"

সুবোধ এক পা অগ্রসর হইল, আবার দুই পা পিছাইয়া গেল! নরকের লেলিহান জিহ্বা যেন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল। সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, লীলা আর ভাবিল না, পাপপুণ্য সমস্ত স্বামীর পায়ে বিসর্জ্জন দিয়া সে জোর করিয়া সুবোধকে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। সে স্পর্শে সুবোধ যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল। লীলা মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল,—ভেবে ভেবে পাগল হয়েত কোন লাভ নেই।"

অনেক দিন পরে সেই পুরাণ স্বরটা আবার সুবোধের কাণে গিয়া আঘাত করিল। সেই পুরাণ স্পর্শ, আহা কি মনোমুগ্ধকর। সুবোধ লীলার হাত ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছিল, লীলা বাধা দিল, সুবোধ বলিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, আমি সে রাক্ষসীকে তাড়িয়ে দিয়ে আসি, সেইত আমার এ অবস্থা করেছে।"

সুবোধকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া লীলা কাতরকণ্ঠে বলিল—"দিদিকে কেন বৃথা দোষী কচ্ছ, সবত ভগবানের খেলা। ভগবানের নাম কর। তাকে ক্ষমা কর, দাদাকে দেখেও কি এখনও ক্ষমা কত্তে শেখনি।"

তাইত, সুবোধ লীলার বুকের উপর নির্জ্জীবের মত পড়িয়া গিয়া বলিল—"লীলা, তোমারা ত দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, তুমি কি আমার ক্ষমা কর্ত্তে পারবে।"

লীলা সরসীর কথাটার পুনরাবৃত্তি করিল, বলিল—"স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজার সামগ্রী, তার দোষ সেত স্ত্রী হয়ে দেখ্‌তে পারে না।"

"ললিতবাবু" সুবোধ থামিল, থামিয়া একটা কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তোমায় ত তিনি বড় ভালবাসেন, তুমি বল্লেত আমায় তিনি ক্ষমা কত্তে পারেন।"

ভেজান দোরটা ঠেলিয়া দিয়া ললিতমোহন ধীরপদে প্রবেশ করিয়া দৈববাণীর মত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"লীলাই তোর পাপ ধুয়ে পুছে ফেলে দেবে সুবোধ। তুই কিন্তু এ সতীকে আর কষ্ট দিস্‌ না।" বলিয়া যেমন

আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল। সুবোধ লীলার হাত ধরিয়া মূকের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

[৩৪]

সংসারের ব্যাপারে ললিতমোহন পূর্ব্ব হইতেই বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল প্রিয়ম্বদা. শেষ দুটা দিন প্রিয়ম্বদার কাছ হইতে ললিতমোহন জীবনে যাহা আশা করে নাই, তাহাই পাইতেছিল, হায়, বিধি বাম হইয়া তাহার সে রত্নও কাড়িয়া লইল। তবে আর সে এ পৃথিবীতে থাকিয়া কি কাজ করিবে, তাহার উদ্দেশ্যহীন জীবন দিন দিনই যে ব্যর্থতার উপহাস লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

রাত্রি তিনটা বাজিতে ললিতমোহন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বপ্নের ঘোরে এক মুহূর্ত্ত যেন কাহার বাহুবন্ধন আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কৈ আজত কেহ আসিল না। প্রিয়ম্বদা যে একমুহূর্ত্ত স্বামীকে বিছনায় না দেখিলে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইত, ললিতমোহনকে বুকে টানিয়া লইয়া আপনার প্রাণের কম্পন কমাইয়া লইত। ললিতমোহনের শুষ্ক চক্ষু দিয়া আজ দরদর ধারে জল ঝরিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে যেন শুনিতে পাইল, অলক্ষ্যে প্রিয়ম্বদা বলিতেছে—"তুমিত কাজের জন্যেই পৃথিবীতে এসেছ, সুখ শান্তি সে সবত তোমার কাজের মধ্যেই দেব, তবে এত ব্যাকুল হও কেন। কাজ করিয়া যাও, সময়ে আবার এ অভাগিনী তোমার পা বুকে লইয়া পূজা করিবে।"

ললিতমোহন সহসা হাত বাড়াইয়া দিল, কিছুই মিলিল না। আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া খোলাছাদে গিয়া দাঁড়াইল, সেই নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার কাতর আহ্বানের অপেক্ষায় যেন উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কেহ আসিল না, হাসিয়া একটি কথা বলিল না, তাহার কাজের জন্য অনুযোগ করিল না, তিরস্কার করিল না। চারিদিক্ অন্ধকার, কেবল আকাশের গায়ে ম্লান নক্ষত্রের আভা তাহার হৃদয়ে একটু আলো, একটু আশা আনিয়া দিতেছিল। যুঁই ফুলের সুগন্ধ বহিয়া অবসানপ্রায় রজনীর শিশিরসিক্ত বায়ু তাহার চিন্তাকুঞ্চিত ললাটের উপর হাত বুলাইয়া দিল। সহসা ঝিল্লীরবে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। আকাশের গা ঘেষিয়া সহরের কাকগুলি ডাকিয়া নৈরাশ্য বহন করিয়া আনিল। ললিতমোহন আর পারিল না, অস্ফুটস্বরে আকাশের দিকে স্থিরলক্ষ্য হইয়া বলিল—

"যাও দেবি, যেখানে পাপ নেই, অপবিত্রতা নেই, অশান্তির দাবদাহ নেই, সেই লোকে যাও, সেই যে তোমার যোগ্য স্থান। আমি হতভাগ্য,—পাপী তোমায় মত রত্ন চিন্তে পারিনি।" প্রিয়ম্বদার সেই কষ্ট, সেই সহিষ্ণুতা মনে করিয়া ললিতমোহন আবারও নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া বিকটরবে কাঁদিয়া উঠিল—

ঠং ঠং করিয়া নীচের ঘরের ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। একটা সতরঙ্গ উচ্ছ্বাস একটা পুলকপূর্ণ বেদনা, একটা অনভিব্যক্ত শোক প্রবাহের মধ্যে ললিতমোহন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে আবার বলিল— "যাও দেবি, যেখানে সান্ত্বনায় কৃত্রিমতা নেই, পুণ্যে স্বার্থের লেশ নেই, পবিত্রতায় ঈর্ষা বা উদ্বেগ নেই, যেখানে উদ্বেগে শান্তি আছে, বিরহে মিলন আছে, উপকারের প্রত্যুপকার আছে, মিলনে সুখ আছে, সুখে নিস্তরঙ্গ শান্তির শোয়াস্তি আছে, যেখানে পাপে ভয় আছে, পুণ্যে উৎকর্ষ আছে, সেই লোকে যাও। সেই যে তোমার উপযুক্ত লোক। তোমার মত পতিব্রতার জন্যইত সে লোকদুর্লভ লোক সৃষ্ট হইয়াছে।" অসহিষ্ণু অধৈর্য্যে ললিতমোহন ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। আজ যেন সহসা এই চীৎকারের মধ্য দিয়া তাহার চির আবৃত হৃদয় আবরণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া একেবারে ধরা দিয়া বসিল। সে যে প্রিয়ম্বদাকে কতখানি ভালবাসিত; তাহা জানাইয়া দিল। জানিয়া শুনিয়া বুদ্ধিভ্রংসের মত নিজের খেয়ালে ভুলিয়া প্রিয়ম্বদাকে যে সে নরকের যন্ত্রণায় দলিত করিয়াছে। ললিতমোহন বসিয়া পড়িল, চারিদিকের স্তব্ধ প্রকৃতি যেন তাহার মধ্যে একটা জড় নিশ্চল ভাব আনিয়া দিল। সংজ্ঞাবিরহিত ললিতমোহন ছাদের উপর পড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে শুকতারা নিভিয়া গেল। পথের আলোগুলি যেন শক্রর আঘাতে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। রক্তিমচ্ছটা গায়ে মাখিয়া নবোদিত রবি আপন কর লইয়া নামিয়া আসিতেছিল। লীলা শয্যা হইতে উঠিয়া এঘর ওঘর কোন ঘরেই ললিতমোহনকে খুজিয়া না পাইয়া সারা বাড়ীটা পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছাদে উঠিতেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ললিত-মোহনের ম্লান মুখের প্রতি মাতার মত চাহিয়া একবিন্দু তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মাথা ক্রোড়ে করিয়া জননীর মত নীরবে বসিয়া রহিল।

মৃদু মন্দ ভাবে প্রভাতের বায়ু বহিয়া যাইতেছিল, ধীর গতিতে পুষ্পগন্ধ

লইয়া দেবপূজার উদ্দেশে চলিয়াছে। নবোদিত রবিকর ললিতমোহনের গায়ে পড়িতেই লীলা ডাকিল—"দাদা!"

ললিতমোহন চোখ মেলিয়া চাহিল। সহসা তাহার দুরদৃষ্ট যেন তাহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া দিল, 'কি অবস্থায় তাহারই জন্য পতিপ্রাণা প্রিয়ম্বদা প্রাণ হারাইয়াছে।' সরসী ভাঙ্গাগলায় ডাকিয়া বলিল—"ললিতবাবু, চলুন এবার নীচে গিয়ে শুয়ে থাকবেন।

ললিতমোহন উত্তর দিল না, বেগে কাঁদিয়া উঠিল। নিখিলেশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"খোকাকে নে রে ললিত।"

দুর্ব্বল হস্ত বাড়াইয়া ললিতমোহন খোকাকে ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না। হাতখানা অবশের মত পড়িয়া গেল, ললিতমোহন দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"হ্যারে, একটা প্রাণের জন্যেই কি যত বিপদ্‌আপদ মনকষাকষি এসে জুটেছিল। অভাগীর মৃত্যুতেইত বাতাসের আগে সব ঠিক হয়ে এল।"

নিখিলেশ আহত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতমোহন আবার বলিল—"সে মরতেই ত অধঃপাত থেকে সুবোধ পর্য্যন্ত জীবন নিয়ে বেরিয়ে এল।"

[৩৫]

ললিতা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না, তাহার পাপের পরিণামটা কতবড়, সমস্ত ঘটনার গোড়াতেই যে সে জড়িত ছিল। শেষে তাহারই জন্যে স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত হইল। স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে যতই অন্যায় আচরণ করিয়া থাকুক, হিন্দু রমণী সে, এই হত্যা-ব্যাপারটা তাহাকে একেবারে বসাইয়া দিল। তাহার উপর আবার তাহার আনন্দ ও আশাহীন সমস্ত ভবিষ্যৎটা যেন মুমুর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত তাহার হৃদয়ে ঈষদুষ্ণ আঘাত করিয়া তাহাকে নির্জ্জীব করিয়া তুলিতেছিল, ললিতমোহন যদিও তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকুক, কিন্তু স্বামীত তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, জীবনে ত সে আর সেমুখ হইতে পারিবে না, যাহার জন্যে সে এত করিয়াছে, তাহাকেও দিনান্তে একবার সে দেখিতেও পাইবে না। ললিতারত আর কোন কামনাও ছিল না, মধ্যে মধ্যে যদি স্বামীকে দেখিতে পাইত, তবু যেন তাহার দগ্ধ দেহ ধারণের একটা উপায় হইত; ভাবিতে ভাবিতে সে একবার লীলার পা ধরিয়া কাঁদিত, আবার সরসীর

কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বুকের গুরুভার লাঘব করিয়া লইত। সুবোধের কাছে ঘেঁসিতেও তাহার সাহস ছিল না, কাদা মাখিয়া আবিল জলে অবগাহন করিয়া, কাঁটার আঁচড়ে সে যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া তুলিয়াছে, সুবোধ সে পথে কোথায় যাইতেছিল, ললিতা নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল "ওগো তুমি আমায় বলে দাও, কি কল্লে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

সুবোধ একবার সেই ললিতলাবণ্যবতী ললিতার দিকে ফিরিয়া চাহিল, পাপের পরিণামে তাহার প্রাণও যে দ্বিধা হইয়া যাইতেছিল। মনে মনে বলিল—"ললিতা, তুমি না বড় সুন্দর, বড় উগ্র উন্মাদকর, না আমার নেশা, কিন্তু লীলা যে আরও সুন্দর, তার ভিতর বাহির সবই যে শান্তি ও সান্ত্বনাময়। তবে কোন্ ছলে তীব্র সৌন্দর্য্যের তাপে আমায় ডুবিয়েছিলে ললিতা, আমি যে সবার চেয়ে বেশী পাপী। আমার পাপে আমার দুর্ব্বলতায়ইত এমনটা ঘটেছে। পুরুষের মত শক্তি যদি আমার থাকৃত, তবে তোমার মত শত ললিতাও আজ আমার এদশা কত্তে পাত্ত না।" সুবোধ ললিতাকে ধরিয়া তুলিতে গিয়া সহসা পিছাইয়া গেল। কি জানি ঐ স্পর্শ, ঐ তাপপ্রদ আকর্ষণ আবারও তাহাকে কি করিয়া ভুলিবে।

ললিতা দেখিল, সুবোধ কাঁদিতেছে, কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল—"পাপের ভীষণ পরিণাম তাদের মধ্য দিয়ে বিভাগের যে স্পষ্ট রেখা টেনে দিয়েছে, অনুতাপ ভিন্নত সে রেখা আর মুছিবে না।"

ললিতা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুবোধ কি ভাবিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া অনুতপ্তের স্বরে বলিল—"অনুতাপ কর, ললিতা, সে ছাড়া ত এ পাপ হতে কেউ উদ্ধার কত্তে পারবে না। এ যে মজ্জাগত বিষের মত দিন দিন অধঃপাতের পথে টেনে নেবে।" বলিয়া সে উন্মাদ-দৃষ্টিতে রূপযৌবন সম্পন্না সকল অনিষ্টের কারণ ললিতার দিকে চাহিয়া ভীতিকণ্টকিত হইয়া উঠিল।

[৩৬]

বেলা পড়িয়া আসিতে নিখিলেশকে ডাকিয়া ললিতমোহন বলিল—"চল, আজ একবার গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

পথে বাহির হইয়া ললিতমোহন কথায় কথায় বলিল—"চল বিভূতিবাবুর

সঙ্গে দেখা করে যাই।" বলিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দেখিল বিভূতি-বাবু কোথায় যাইতেছেন। ললিতমোহন ডাকিল—"বিভূতিবাবু!"

বিভূতিবাবু সাড়া দিলেন না। ললিতমোহন বলিল—"কাজের খাতিরে আপনাদের মনে হয়ত অনেক কষ্ট দিয়েছি। সে সব মাপ কর্‌বেন।"

বিভূতিবাবু ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিখিলেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"কি হে, বড় যে আর দেখা যায় না।"

নিখিলেশ ইহার উত্তরে কি বলিবে প্রথমে ভাবিয়াই পাইল না, শেষে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"দেখুন বিভূতিবাবু, স্রোত খাল নালা যতই ঘুরে বেড়াক, তাকেত সাগরে গিয়ে মিস্‌তেই হবে। সত্যের বোঝা কদ্দিন্ আর মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে।"

বিভূতি হাত ছড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

বিরক্তমনে ললিতমোহন আর নিখিলেশ আবার আসিয়া সেই চির পুরাতন জেটিটি অধিকার করিয়া বসিল। আজ সন্ধ্যায় সেই ম্লান ছায়া ধুসর আভা লইয়া নক্ষত্ররাজ্যের মধ্যে যেন একটা ধোঁয়ার ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল, ললিতমোহন চাহিয়া দেখিল, পরপারের গ্যাসগুলি যেন মিটি মিটি করিতেছে। ভাগীরথির প্রবাহ যেন প্রখরতা হারাইয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। সকলই যেন স্তব্ধ, নীরব, স্পন্দ-হীন। প্রিয়ম্বদার জন্যে যেন মৃকের মত নীরবে ললিতমোহনকে ডাকিতেছে। সহসা চিন্তার হাত ছড়াইয়া লইয়া নিখিলেশকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আমি মলেত আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বে, এমনও কেউ নেই রে।"

নিখিলেশ ইহার কি উত্তর করিবে। সে বিনতবদনে বলিল—"ওসব ভাবনা এখন আর ভাবিস্ নি। বেঁচে থাক্‌তেও ত তুই প্রিয়ম্বদাকে নিয়েই থাক্‌তিস না যে, তার জন্যে এমনই পাগল হয়ে পড়েছিস।"

"পাগল কিছু হয় নি, তবে আমার হাতের কাজ যে ফুরিয়ে গেছে, বন্ধন টুটে গেছে, আর কেন? দুঃখ ত ঐ, বেঁচে থাক্‌তে তাকে জান্তে দিই নি, সে আমার কে ছিল। আমি যে তাকে কেবল তাপই দিয়েছি। তার আকর্ষণের পরিবর্ত্তে আমি তাকে আঘাত করে তবে ছেড়েছি।" বলিয়া ললিতমোহন সেই সন্ধ্যার স্তব্ধ রাজ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল।

* * * * *

প্রতিদিনের মত আজও ভোর হইতেই না হইতেই লীলা আসিয়া ললিতমোহনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু কৈ ললিতমোহন ত নাই। লীলার প্রাণ যেন আজ আকুলীবিকুলী করিয়া আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। এত সকালে সেত বিছানা ছাড়িয়া উঠে না। কতদিন ললিতমোহন বলিয়াছে "রাতে তার ঘুম হয়না, ভোর বেলায় ঘুমিয়ে উঠতে দেরি হয়ে যায়"; তবে আজ এত সকালে কেন! সহসা লীলার সে দিনের কথা মনে পড়িল, দৌড়িয়া সে ছাদের উপর গিয়া উঠিল, হায়, সে শূন্য ছাদ যে আজ প্রভাতের বাতাসে ঘুখরিত হইয়া হাহাকার করিতেছে। লীলা অসম্বৃত বস্ত্রে নিঃসম্বল চিত্তে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া আবারও শয়নকক্ষে ঢুকিল। হাত দিয়া দেখিল, বালিশটা চোখের জলে একেবারে ভিজিয়া রহিয়াছে। লীলা আর পারে না, তাহার চোখ ছাপাইয়া গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। টানিয়া বিছানাটা উলটাইয়া ফেলিল। এ কি, সে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নমিত করিয়া আবারও চাহিল। ললিতমোহনের হাতের পরিষ্কার অক্ষরগুলি বড় বড় দাগ হইয়া গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছিল! নিঃসম্বল লীলা "দাদাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সরসী আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা বুঝিতে তাহারও বড় বাকী রহিল না। প্রবল কান্না তাহারও ঠোঁট নাড়িয়া দিল। সে ত্বরিতহস্তে কাগজখানা কুড়াইয়া লইল, তাহাতে লেখা ছিল,

"লীলা আমার কাজ ফুরিয়েছে, আরত এ দুর্ব্বহ ভার বইতে পাচ্ছিনা জীবনের মত তোদের ছেড়ে চল্লাম ভগবান্ তোরদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়েছেন। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুই সুখে থাক্‌বি। সরসীকে ও নিখিলেশকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস্।"

সঙ্গে সঙ্গে সরসীও কাঁদিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ নিখিলেশ প্রভৃতিতে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই পূর্ণ ঘর যেন লীলার দিকে অলক্ষ্যে প্রস্থিত লক্ষ্যহীন ললিতমোহনের অভাব লইয়া তাহাকে দ্বিগুণ শূন্যের মধ্যে টানিয়া ফেলিল। দিনের আলোটা যেন প্রেতের মত হাসিতেছিল। লীলা দেখিল, বিধি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত মানুষের মতই ললিতমোহনের সহিত দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিয়াছে, জীবনে আর ইহা

যুক্ত করা যাইবে না। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করিবে। পৃথিবীর মাঝখানে ভালবাসায়, আদরে সেই শুচিস্নাত ললিতমোহন আরত তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া আসিবে না। লীলা আবার আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সরসী তাহার হাত ধরিতে যাইতে সে হাত ছিনাইয়া লইল। সুবোধ স্তব্ধ, যেন তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত এককালে মাথার উঠিয়াছিল। নিখিলেশের চোখ বাহিয়াও অনেক কাল পরে এই বাল্য বন্ধুটির জন্য দুফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। লীলার সে আর্ত্তস্বরে সুবোধ এবার চমকিয়া উঠিয়া লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গিয়া বলিল—"লীলা, কেঁদে আর কি করবে। আমার পাপেইত সব হয়েছে, একা আমার অনুতাপে ত এ পাপের স্খলন হবে না, এস দু'জনে মিলে যদি অনুতাপ করে কিছু কত্তে পারি।"

জড়দেহের মত দাঁড়াইয়া নিখিলেশও মনে মনে বলিল—"আমার ন্যায় অভাগার জন্যেও ত অবলম্বনের মত অন্য কোন আশ্রয় নেই।"

সমাপ্ত।

পূজারি

লেখক—শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত চল্লিশ বৎসরের মত সেদিনও শ্রীধরগোস্বামী প্রভাতেই গৃহত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া পড়িলেন। গ্রাম্য-পথটী তখন পক্ষী-কূজন মুখরিত। পূর্ব্বদিক চক্রবাল উদীয়মান সূর্য্যের করজালস্পর্শে লোহিতোজ্জ্বল। ধীর-পদে তিনি সে পথ ছাড়িয়া গ্রাম্য মেটে-পথে শস্যক্ষেত্রে ও ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আপনার চিরপ্রিয় মন্দিরটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই ক্ষুদ্র আড়ম্বরহীন কালি-মন্দিরটী গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। বহুবর্ষ পূর্ব্বে পাশাপাশি দুইখানি গ্রামের সুবিধার জন্য জমিদার মহাশয় এইস্থানে একটী কালিবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং

মাসিক পনের টাকা আয়ের একটী ক্ষুদ্র জমি দেবোত্তররূপে দান করেন। ধন-সম্পদ ইহাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। কালের কুঠারাহত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে দাঁড়াইয়া সেখানিও অতীতের গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। দীর্ঘদেহ অশ্বত্থ বৃক্ষ এই ক্ষুদ্র মন্দিরটীর অনেকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ধীরপদে শিখা কুণ্ডয়ন করিতে করিতে নামাবলী গায়ে শ্রীধরঠাকুর অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন;—বয়স তাঁহার সোত্তর পার হইয়া গিয়াছিল। এতাবৎকাল কিন্তু দেব-দ্বিজে ভক্তি তাঁহার সমান ছিল, আর ছিল দৈবের উপর অটুট বিশ্বাস। কেহ কোনদিন তাঁহার এ ভক্তি ও বিশ্বাস টলাইকে পারে নাই।

জগতে যাহাই ঘটুক না কেন সবই মঙ্গলের জন্য;—ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু ঘটিতে পারে না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি মনে করিতেন গ্রীষ্মের বারিপাত হইতে বসন্তের নব-কিশলয় উদ্গম অবধি সকলই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছাতেই ঘটিয়া থাকে।

সু ও কুএর জন্য সমভাবেই ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। ভক্তিপ্রাণ পুরোহিত বিপদ বারণ করিয়া পাপীর মস্তকে সুখের প্রবাহ চালিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার প্রার্থনা যে পূর্ণ হইবেই সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। দর্শন বা অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহার বড় অধিক ছিল না, কিন্তু তথাপি অনেকে তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া তৃপ্তি পাইত।

প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়া তাঁহাকে মন্দিরটী ঝাঁট দিতে হইত। তাহার পর মন্দির-প্রাঙ্গণে দোদুল্যমান নাতিবৃহৎ ঘণ্টাটী তিনি একবার সজোরে বাজাইয়া দিতেন। গ্রাম দুইটীর অধিবাসীবর্গ এতই দরিদ্র যে এই ক্ষুদ্র কর্ম্মগুলা করিবার জন্য মন্দিরে একটী ভৃত্য রাখিবার খরচ অবধি তাহারা দিতে পারে না। ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই গ্রামবাসীরা বুঝিতে পারিত যে আর আধঘণ্টার মধ্যেই শ্রীধরঠাকুর পূজায় বসিবেন। ঘণ্টাটী কিন্তু প্রায়ই বৃথা ধ্বনিত হইত; পূজা আরম্ভ হওয়া না হওয়ার জন্য গ্রামবাসীগণ কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত ছিল না। ধাতুনির্ম্মিত ঘণ্টার করুণ আহ্বানে কেহই বড় একটা মন্দির প্রাঙ্গণে আসিত না, পূজা দেওয়া ত দূরের কথা!

প্রভাত সূর্য্যের প্রথম রশ্মিরেখা দেখিয়াই গ্রামবাসীগণ ক্ষেত্রে কার্য্য

করিতে যাইত। গৃহে বসিয়া থাকিবার মত তাহাদের অবস্থা নহে ; স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলকেই পেটের দায়ে পরিশ্রম করিতে হইত।

কালীবাড়ির দক্ষিণদিক দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোক এই নদীতে স্নান করিতে আসিত এবং স্নান করিয়া কালীদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিত। কচিৎ কখনও একটা পয়সা প্রণামী দিয়া যাইত। শ্রীধরঠাকুরও সেজন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না ; পূজার পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনি মাসে যে দশটী টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতেই শ্রীধরঠাকুর ও তাঁহার শিষ্য নারায়ণের দিনগুলি বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া যাইত। সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না।

সেদিন তিনি নিত্যকার মত মন্দির ঝাঁট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, মন্দির প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ভাণ্ডার ঘর খুলিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন ;—দ্বার ইতিপূর্ব্বে কে খুলিয়াছিল !

বিস্মিত পুরোহিত আপনমনে বলিয়া উঠিলেন,—"কি আশ্চর্য্য, কাল কি আমি দোরটা দিয়ে যেতে ভুলে গেছলুম নাকি ?"

তিনি দেবভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তৈজস পত্রাদি রাখিবার স্থানগুলা খুলিয়া ফেলিলেন। মন্দিরের সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি অতি প্রাচীন, বিবর্ণ ও অল্পমূল্যের দ্রব্য।—সেগুলা যথাস্থানে ঠিকই ছিল। তিনি পূজার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, বাহির করিয়া লইলেন এবং কিঞ্চিৎ অসচ্ছন্দচিত্তে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল, বাল্যে তিনি তাঁহার গুরু, এই মন্দিরের পূর্ব্বতন পুরোহিতের নিকট শুনিয়াছিলেন, যে একদল দেব-ভাণ্ডার লুণ্ঠনকারী তস্কর আছে। তাহারা রাত্রে মন্দিরে অলঙ্কার সম্পদ হরণ করিয়া শিল্প ও বিচিত্র দ্রব্য-বিক্রেতার নিকট সেগুলা বিক্রয় করিয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে এত হীনচেতা যে কেহ হইতে পারে, একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না ;—এমন বিশদৃশ কথা প্রকাশ করিবার তাঁহার প্রবৃত্তিই হইল না। ভগবান কখনই তাহা ঘটিতে দিবেন না। যদিই বা এরূপ হীন কেহ থাকে তবে দেবতার জিনিষে হাত দিলে তাহাকে সেইস্থানেই মরিয়া থাকিতে হইবে, উঠিতে হইবে ;

যাহা হউক বহুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি অলঙ্কারের বাক্সের

সর্ব্বনিম্নতলটী তুলিলেন; ইহার মধ্যে একটী বহু প্রাচীন কারুকার্য্য খচিত সোণার মুকুট ছিল; প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে কালীপূজার সময় প্রতিমাকে মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইত। ভয়ে, দুঃখে শ্রীধরঠাকুর মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পড়িলেন;—সেটী নাই ত!

তিনি সমস্ত দ্রব্য নাড়িয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কোথাও সেটী পাইলেন না। তিনি যখন অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত, সেই সময় তাঁহার শিষ্য নারাণ আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল;—তাহার দেহ-খানি ক্ষুদ্র, বয়স অল্প।

শ্রীধরঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সসব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—"ওহে, মুকুটটা পাচ্ছিনা যে! কোনটা বুঝ্‌তে পেরেছ? সেই দামীটা, যেটা পাল-পার্ব্বণে ব্যবহার করা হয়!"

নারায়ণ শ্রীধরঠাকুরকে কি বলিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; কি বলিবে সে তাঁহাকে?—সেও ত এ বিষয়ে কিছুই জানে না, তবে?

পুরোহিত আবার বলিলেন,—"এখন তুমি ছুটে গিয়ে পুলিসে দারোগা-বাবুকে খবরটা দিয়ে এস, বুঝেছ নারাণ?"

তিনি এতই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে ক্রোধভরে কক্ষমধ্যে দ্রুত পায়চারী করিতে লাগিলেন। ওঃ, সেই সুন্দর মুকুটটী! তিনখানা গ্রামের পর যে সুবৃহৎ কালীবাড়ি আছে সেখানেও যে এমন সুন্দর মুকুট নেই! তাহার গঠনকার্য্য অতি অদ্ভুত ছিল এবং তাহাতে অনেকগুলি বহুমূল্য প্রস্তর ছিল। ক্ষুদ্র মন্দিরে সেটী আজ প্রায় দুইশত বৎসর রহিয়াছে। মাত্র কার্ত্তিকমাসের কালীপূজার দিনই সেটী ব্যবহৃত হইত।

নারাণচন্দ্র মন্দিরের সীমানায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শ্রীধরঠাকুরের আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; তিনি ছুটিয়া গিয়া নারাণকে গমন হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

তাঁহার অকস্মাৎ মনে পড়িল, গত বৎসর যখন মন্দিরের দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত হয় সে সময় তিনি ভক্তশিষ্যের সাহায্যে মুকুটটী গোপন করিয়া সাধারণকে তাহার অস্তিত্ব জানিতে দেন নাই। এখন যদি সাধা-রণে প্রকাশ করেন যে, তাঁহার মূল্যবান মুকুটটী খোয়া গিয়াছে তাহা হইলে দোষটা তাঁহারই স্কন্ধে পড়িবে;—বিপদে পড়িতে তিনিই পড়িবেন। পুলিস এখনি এখানে অনুসন্ধান করিতে আসিলে কথাটা গ্রামের কাহারই

জানিতে বাকি থাকিবে না। শ্রীধরঠাকুরই সাধারণের মতে দোষী সাব্যস্ত হইবেন; হয় ত তাহাতে তাঁহার বিচার হইয়া জরিমানা এমন কি জেল অবধি হইতে পারে। কি দুরদৃষ্ট তাঁহার! সকলই অদৃষ্টের ফের! তিনি স্থির করিলেন ইহা অপেক্ষা কথাটা প্রকাশ না করাই ভাল।

সেদিন পূজা করিবার সময়ও এই কথাটাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার অন্তরে জাগিতেছিল। পূজা শেষ করিয়া তিনি দ্বার জানালাগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

চোরটা প্রবেশ করিল কি করিয়া? সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া তিনি একটা সূত্রও আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। দ্বার ও জনালা সকলগুলিই ঠিক ছিল। তবে বোধ হয় তাহারা বারান্দা দিয়া আসিয়াছিল; বারান্দাটা এতই নীচু যে' যে কেহ তাহার সাহায্যে মন্দিরে আসিতে বা পলায়ন করিতে পারে। এ ধারণাটা কিন্তু পুরোহিতের মস্তকে প্রবেশ করিল না।

তিনি শিষ্যকে বলিয়া দিলেন,—"দেখ বাপু নারাণ, আর যা কর তা কর এ বিষয়ে একটা কিছু কাউকে ব'লো না, যা করবার সব আমিই করব'খণ।"

শ্রীধরঠাকুরের মনটী বড়ই সাদা ছিল; সকল কার্য্যেই তিনি ভগবানের হাত বলিয়া জানিতেন। প্রাণটা তাঁহার ভক্তিতে ভরপুর! তাঁহার মনে হইল লোকে মুকুটটী চুরি করিলে তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিতেন। চোর আসিলে হয় দ্বার ভাঙ্গিয়া আর না হয় জানালা ভাঙ্গিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সেরূপ কিছুই যখন দেখা যাইতেছে না তখন চোর নিশ্চয়ই আসে নাই।—এইটাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন চোরে তাঁহার মুকুট চুরি করে নাই,—করিতে পারে না।

অতঃপর তিনি আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, সেটীও প্রথমটীর মত বিচিত্র; তাঁহার মনে হইল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ দৈবাধীন। বোধ হয় মুকুটটী ভগবানের দরকার পড়িয়া থাকিবে, তাই তিনি দূত পাঠাইয়া পৃথিবী হইতে সেটী লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ব্যাপারটি এ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারেনা। কথাটা মনে হইবামাত্র তিনি মনে মনে দেবীর ধ্যান করিয়া বলিলেন,—"মা'ই দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়ে গেছেন; মায়ের পুণ্য নাম পূত হ'ক!"

নারাণ বেগারা কিন্তু কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। পুরোহিত যখন

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া গৌরবে পুলকিত তনু, ঠিক সেই সময়ে তিন চারিজন বৃদ্ধা রমণী মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইল; সকলেরই তিন কাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছিল; সকলেই এক এক গৃহের গৃহিণী।

শ্রীধরঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাহারা সবজান্তার মত একটু সগর্ব্ব হাসি হাসিয়া বলিল—"কি হয়েছে শুন্‌লুম না পুরুতমশায়?

স্মিত হাস্য করিয়া পুরোহিত বলিলেন—"হাঁ মা সকল, মা কালীর আজ আমাদের বড় সম্মানিত করিয়াছেন—না, না আমাদের কেন, তাঁরই সোণার মুকুটটী স্বর্গে নিয়ে গেছেন।"

এই বলিয়া তিনি ব্যাপারটী সকলকে বুঝাইয়া দিলেন; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি মনগড়া কথা বলিতেও ভুলেন না। তাহার পর তিনি দৃঢ়ভাবে আপনার বিশ্বাস অভ্রান্ত দেখাইতে চাহিলেন যে ভক্তের দল ক্রমশঃ এই অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাস করিয়া লইল।

সংসারে দুই রকম লোকই আছে; ক্ষুদ্র গ্রাম দুইটীতে সংখ্যায় অল্প হইলেও কুলোকের অভাব ছিল না। কথাটা শুনিয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল বলিল—"বুড়ো যেমনি ধূর্ত্ত তেমনি চালাক!"

শীঘ্রই গ্রামের লোকগুলি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদল এই বিচিত্র ব্যাপার বিশ্বাস করিল, অন্যদল হাসিয়া বলিল—"ও শুধু বুড়োর চালাকী, চোরঐ বুড়োই!"

প্রায় এক সপ্তাহ পরে নিত্যকার মত শ্রীধর ঠাকুর অতি প্রত্যুষে উঠিয়া যখন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় একটী বলিষ্ঠ লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীধর ঠাকুর বিস্ময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কে তুমি বাপু?"

লোকটা বলিষ্ঠ—"আজ্ঞে আমার নাম ছিদাম সাঁতরা, পাশের গাঁয়ে থাকি।"

"তা আমার কাছে কেন বাপু?"

লোকটা একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ক্ষিপ্রহস্তে, উড়নী হইতে কি একটা বাহির করিয়া পুরোহিত মহাশয়ের মুখের নিকট ধরিল, ভোরের অস্পষ্ট আলোকে পুরোহিত দেখিলেন সেটী তাঁহার মন্দিরের হারাণ মুকুট!

বিস্ময়ে পুরোহিতের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিলে "তুমিই তা'হলে, তুমিই।

লোকটা কাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—আজ্ঞে না ঠাকুর মশায়, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আমি চুরিই যদি করব তবে ফেরৎ দিতে আসব কেন?"

কথাটা পুরোহিতেরও মনে লাগিল। ঠিকইত লোকটা তাহা হইলে নিশ্চয়ই চুরি করে নাই। চুরি কথাটা মনে করিতেও তাঁহার হৃদয়ে সে এক অব্যক্ত ব্যথা বাজিয়া উঠিতেছিল। লোকটার কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তিনি বলিলেন—"ব্যাপরটা কি হে?"

লোকটা বলিল,—"রাত প্রায় তিনটের সময় স্বপ্ন দেখলুম মা কালী যেন আমার শিয়রে এসে বলছেন,—"দেখ ছিদাম, এই পাশের গাঁয়ে শ্রীধর পুরুতের কাছে একবার গিয়ে এইটে ফিরিয়ে দিয়ে আসিস, এর কোন দাম নেই, নিতান্ত রোদি মাল। আমি এটা পরে দেব সমাজে হাস্যাস্পদ হ'য়েছি।'—বলেই মা অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গেল, চেয়ে দেখি মাথার শিয়রে ঐটে পড়ে রয়েছে!"

পুরোহিত ঠাকুর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জিনিষটা রোদি, মা এটা গ্রহণ করিয়াও ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল।

সেদিন মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার নরেন সেকরার দোকানে গেলেন। বেচারা সেই মাত্র সবে দোকান ঘর ঝাঁট দিতেছিল; হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুরকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহাকে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন,—"ওহে নরেন, এই জিনিষটা একবার কষে দেখত কত দাম হ'তে পারে।"

কষ্টি পাথরে আঁক কাটিয়াই নরেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুরোহিত তাহার চঞ্চল ভাব লক্ষ্য করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—কিহে ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, এটা খাঁটি সোনা নয়, তামার উপর সোনার কলাই করা, আর এ পাথরগুলো নকল পাথর!"

পুরোহিত কম্পিত হস্তে সেটা প্রতিগ্রহণ করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। মনের মধ্যে তাঁহার একটা বিরাট আস্বস্তি মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। দেবতার সঙ্গে এত চাতুরী!

স্বর্ণকারের কথায় ছিদামের স্বপ্ন বৃত্তান্তটা পুরোহিতের মনে দৃঢ় তর ভিত্তি স্থাপন করিল;—নিশ্চয়ই দেবতা এটা ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার

ক্ষণিকের জন্যও মনে হইল না যে চোর সেটীকে অল্প মূল্যের দ্রব্য দেখিয়া ফেরৎ দিতে পারে।

লোকে কিন্তু এবার পুরোহিতকে মোটেই বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলিল,—"বুড়ই চুরি করেছিল, গোলযোগ দেখে সেই ফেরৎ দিয়েছে।"

পুরোহিত পুনরায় মনে মনে দেবীর ধ্যান করিয়া বলিলেন,—"মা নিয়ে গিয়েছিলেন, মাই আবাব ফেরৎ দিয়েছেন, তাঁর পুণ্য নাম পূত হ'ক!"

মন কিন্তু তাঁহার এ কথার সায় দিতে চাহিল না। একটা অশান্তি কাঁটার মত প্রাণের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

আভিজাত্য!

লেখক—শ্রীপরেশনাথ সরকার।

(১)

নির্ম্মল নীল আকাশের মাঝখান দিয়া একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ ভাসিয়া যাইতে ছিল, লক্ষ্মী তীরের ফলাটা দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা সুন্দর, ঐ চলন্ত মেঘখানা কি তীরে বেন্ধা যায় না?

সুন্দরের ইন্দিবর কোরক-নিন্দি স্বচ্ছ সুনীল আধভাব মুকুলিত উদাস নয়ন যুগল একবার গগন প্রান্ত ঘুরিয়া আসিয়া লক্ষ্মীর স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের মত লাবণ্য-বিভাসিত ঢল ঢল মুখ খানির উপর বিদ্ধ হইয়া রহিল!

লক্ষ্মী বলিল—কি বল্ল?

সুন্দর উত্তর করিল—কিছুই বলি না। ভাবচি তুমি যে প্রশ্ন কর সবগুলি কেমন অসম্ভব।

লক্ষ্মী—হাঁ, তাই। আমার অনেক সাধও অসম্ভব!

নির্জ্জন নদীপ্রান্তলীন শ্যামল উপত্যকার একটি বৃহৎ শালবৃক্ষের মূলে দাড়াইয়া ছিল দুইজন—লক্ষ্মী ও সুন্দর। যুবক ও যুবতী! সন্ধ্যার ম্লান আলো ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছিল। নদী চঞ্চল ভৈরব তরঙ্গ ভঙ্গ উচ্ছ্বসিত

হইয়া অনন্তের অভিমুখে ছুটিতেছিল, দিবসের শেষ রাঙা আলো সে তরঙ্গের মাথায় সোনার টোপর পরাইয়া দিতেছিল! কতিপয় জলবিহঙ্গ শালবৃক্ষের শাখায় বসিয়া সমীরণের হিল্লোলে ও নদীজল কল্লোলে কণ্ঠ মিলাইতেছিল।

সুন্দর রাজপুত যুবক, লক্ষ্মীও রাজপুত বালিকা! লক্ষ্মী সুন্দরকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিল। সে বুঝিত না, জানিত না যে সে সুন্দরের সঙ্গে মল্লক্রিড়া করিয়া বনে বনে পাখী তাড়াইয়া, হরিণের পেছু ছুটিয়া, তাহার সবটুকু রমণীত্ব সুন্দরের চরণতলে এমন নীরবভাবে অর্ঘ্য আনিয়া ধরিবে! তবু সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সুন্দর তাহা জানিত, বুঝিত। লক্ষ্মীর আকাশের চেয়ে সুনীল এক জোড়া আঁখির ভিতর দিয়া সুন্দর তাহার প্রাণের বিজন বনে প্রবেশ করিতে পারিত, সে দেখিত, প্রত্যহ কিসের একটা মধুর মলয় ধীরে ধীরে লক্ষ্মী বাগানের সবগুলি ফুল ফুটাইয়া তুলিতেছে! সুন্দরের ভয় হইল—তবে কি হইবে! কথা হইয়াছিল সুন্দরের পিতাকে লইয়া। সে দশটা গ্রামের মোড়ল, আর চন্দ্রবংশীয় ক্ষেত্রি! আভিজাত্যের দিকে তাহার দৃষ্টি সমধিক। লক্ষ্মী যদিও তাহার ওস্তাদের কন্যা, তথাপি যদি বংশ মর্য্যাদায় খাট পড়িয়া যায়, তবে সুন্দরের পিতা কিছুতেই তাহার একমাত্র সন্তানকে এমন বিবাহ দিবেন না! তাই যখন লক্ষ্মী বলিল—আমার অনেক সাধও অসম্ভব, তখন সুন্দর কোনও কথা না বলিয়া লক্ষ্মীর হাতের ধনুকটার উপর নিজের ধনুকটা দিয়া একটি সামান্য আঘাত করিল! এ এক রকম সাংকেতিক চিহ্ন! লক্ষ্মী বলিল কি সুন্দর? সুন্দর দেখাইল এক ঝাঁক কালহংস উড়িয়া আসিয়া অদূরে নদীতে পড়িল!

লক্ষ্মী বড় কুতূহল হইয়া সেই গুলির রম্যক্রিড়া নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। এই অবসরে সুন্দর তাহার ধনুকে গুণ দিয়া লক্ষ্য করিয়া যেমন একটি তীর সন্ধান করিবে, লক্ষ্মী চমকিতের মত তাহার হাত ধরিল, বলিল—সেকি, ক্ষত্রিয় বীর কি শেষে নিরীহ কেলিপর বিহঙ্গের বধ হইয়া উঠিল!

হাতের তীর নামাইয়া রাখিয়া সুন্দর বলিল—তা বটে! লক্ষ্মী তুমি আমার অনেক ভুল সংশোধন কর।

লক্ষ্মী বলিল—হাঁ সুন্দর তুমি অনেক ভুল কর।

দূরের শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি উভয়কে সচকিত করিয়াদিল, সুন্দর বলিল—লক্ষ্মী চল, আজ শীঘ্র বাড়ী ফিরি, আজ পিতার আসিবার কথা। তিনি হয় ত

এসেছেন। ঐত মন্দিরে কাশর ঘণ্টা বেজে উঠল। ঐ তারা, ঐ তারা! ও বেশ রাত্রি হয়েছে দেখছি!

লক্ষ্মী বলিল—যা ঐ পাখীর ঝাঁকটা উড়ে গেল!

সুন্দর বলিল—যা এতগুলি কথা মাঠে মারা গেল! বলত কি বলেছি, লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী—তুমি না হয় আবার বল, কি বলেছ?

সুন্দর হাসিয়া বলিল—লক্ষ্মী, মাঝে মাঝে তুমি যেন এ পৃথিবীত থাকনা!

লক্ষ্মী বলিল,—হাঁ—তাই!

(২)

সুন্দরের পিতা বলিলেন—এইত হ'ল কথা।

ওস্তাদ বলিলেন—তা যদি বলেন ত আর কোন কথাই হতে পারেনা, আপনার পুত্র আপনি যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিবেন, গরীবের সঙ্গে কেন কার্য্য করিবেন! তবে যে আভিজাত্যের কথা প্রথমে তুলিলেন তাহাতে দেখা যায় যে বরং আপনার সঙ্গে কাজ হইলে আমাকেই নামিয়া পড়িতে হয়। আপনি চন্দ্রবংশ, আমি সূর্য্যবংশ। কুল আমারটাই উজ্জ্বল!

সুন্দরের পিতা বলিলেন—"তা'ত, তাত, তবে ত বেধেছি ঐ—হামির সিংহের কন্যার সঙ্গে যখন প্রস্তাব হয়েছে তখন আর—"

ওস্তাদ বলিলেন—"তা দেখুন। সে রাজা, আমি কাঙ্গাল, পথের ভিখারী।"

সুন্দরের পিতা অন্য কোন উত্তর না দিয়া উঠিলেন। ওস্তাদ বলিলেন আপনি কি এখনই যাইবেন! সুন্দর যে এখনো ফিরিল না!

বৃদ্ধ বিজয়লাল বলিলেন "তা সে যখনই আসুক, তাকে আমার কথা বলিবেন। আমার আজই সে সম্বন্ধটা ঠিক করিতে যাইতে হইবে। আর তাকে আমি আগামী পরশ্ব গুরুদক্ষিণা যাহা কিছু দিয়া, খালাস করিয়া নিয়া যাইব। আপনার আশীর্ব্বাদে সে এখন শস্ত্রবিদ।

ওস্তাদ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"সেকি আপনি বরপক্ষ হইয়া কন্যা কর্ত্তার বাড়ী সেধে যাবেন?"

বিজয়লাল হাসিয়া বলিলেন কন্যাপক্ষ হলে কি হয়, সে যে রাজা! তার সঙ্গে কাজ, কটা লোকের ভাগ্যে হয়!

ওস্তাদ—তা হলেই বা কি; মেয়ে ত দেখবেন।

বিজয়লাল বলেন কি, রাজার মেয়ে তা অপছন্দ হলেও পছন্দ! বুঝলেন—কেন— ?

ওস্তাদ—হাঁ, ঐশ্বর্য্যে,—কেমন ?

বিজয়লাল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

দূরে দাঁড়াইয়া সুন্দর ও লক্ষ্মী সবগুলি কথা শুনিল! তখন চন্দ্র উঠিয়াছিল। লক্ষ্মী বলিল—সুন্দর, এখনি বাড়ী যাওয়া হবে না, চল বেড়িয়ে আসি।

সুন্দর ধরাগলায় বলিল—চল!

দুইজনে আবার আসিয়া স্ফুট চন্দ্রালোকে সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিল। মাথার উপর অনন্তগগণে অসংখ্য তারকা রাজি ফুটিয়া উঠিতেছে, পদতলে অনন্ত প্রবাহিনী তটিনী অনন্ত বীচিভঙ্গে অনন্ত কল্লোল তুলিয়া ছুটিতেছে। অনন্ত উদ্দাম মলয়, অনন্ত কুসুম কুলের সুরভি বহিয়া আনিয়া অনন্তের মাঝখানে ছড়াইয়া দিতেছে! আর তাহাদের হৃদয়-যমুনায় কত শত অনন্ত চিন্তার বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, ভাসিতেছে!

লক্ষ্মী এইবার বুঝিয়াছে, যে সে সুন্দরকে ভাল বাসিয়াছে। সুন্দর এইবার বুঝিয়াছে যে, যে আভিজাত্যের গৌরব তাহাকে লক্ষ্মীলাভের অন্তরায় হইয়াছে সে অন্তরায় ভিন্ন পিতার ইচ্ছাই তাহার পথ আজ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে! এ কিন্তু উভয়ের পক্ষেই সম মর্ম্মান্তিক!

দুজনেই আজ প্রণয়ের মূল্য বুঝিয়াছে, দুইজনেই আজ অনন্ত বিরহের সাড়া পাইয়াছে। আবার সেই দুইজন আজ নদী প্রান্তে হতাশ কিন্তু পুলকিত জ্যোছনা তলে ভূমি আসনে সমাসীন! এ অবস্থায় তাহারা প্রেমিক প্রেমিকার মতন হা নাথ, হা প্রিয়তমে বলিয়া হা হুতাশ করিল না! এই চঞ্চল মলয়কে সাক্ষ্য রাখিয়া, এই নিস্তব্ধ শালবৃক্ষকে সাক্ষ্য রাখিয়া, উপরে তারকা খচিত সচন্দ্র গগন মণ্ডল, চরণ নিম্নে খরস্রোতা স্রোতস্বতী, ইহার কাহাকেও তাহারা সাক্ষীশ্রেণীর মধ্যে আনিয়া চির জনমের মতন একটা নভেলী ধরণের মিলন ঘটাইয়া নিয়া অতৃপ্ত চুম্বন বৃষ্টির সৃষ্টি করিল না! দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল, তারপর সুন্দর লক্ষ্মীর ধনুকখানি তুলিয়া লইল, আর লক্ষ্মী সুন্দরের ধনুকখানি তুলিয়া লইল, দুইজনে দুইখানি ধনুক নদী গর্ভে নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মী বলিল সুন্দর বাড়ী চল।

সুন্দর বলিল—চল।

দুইজনে চলিয়া গেল। সেই নির্জ্জন নদীপ্রান্ত দেখিল, সেই আবেগ ময়ী তরঙ্গিনী দেখিল, সেই সচন্দ্র গগন মণ্ডল দেখিল, ক্ষত্রিয় বালক বালিকা তাহাদের ধনু [illegible] ফেলিয়া দিল। তাহারা বুক দিয়া বুঝিয়া নিল, দুইজনে নীরব ভাষায় কত কাহিনী উহার সঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছে!

(৩)

জয়কালীর মন্দির প্রাঙ্গণে খেলার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দর্শক গণকে ক্ষত্রিয় বালক বালিকাগণের ক্রীড়া দেখান হইবে। কিছু জায়গায় একটা আবরণ দেওয়া হইয়াছে, রমণীগণ মধ্য হইতে তীরের খেলা আকাশের গায়ে দেখিবেন। খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সুন্দর চুপ করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে, ক্রমে বালক ও বালিকার যেন একটা মস্ত পাল্লা লাগিয়া গেল। আকাশের গায়ে উভয়ে কেমন সুন্দর সুন্দর কৌশল দেখাইয়া দর্শক গণকে মুগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। কেহ বলেন বালকগণজয়ী; কেহ বলেন বালিকাগণ, এমন সময় প্রশ্ন উঠিল সুন্দর কোথায়, ওস্তাদ বিশ্বেশ্বরের সে প্রধান শিষ্য, সে থাকিতে বালকগণ কেন হারিবে? সুন্দরকে ধরিয়া বাঁধিয়া খাড়া করা হইল। তখন খেলার যে সুন্দর কৌশল বালকগণ দেখাইতে লাগিল তাহাতে দর্শকগণ একবাক্যে বালিকাগণের পৃষ্ঠে পরাজয়ের মসি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। তখন বালিকা গণের ভিতর হইতেও অতি সুন্দর একটি খেলা আকাশের গায়ে কে দেখাইল। সবাই বলিল দেখি দেখি, ওকি এমনত দেখিনি কখনো। আবার আবার, বালিকাগণ বিজয় পতাকা না নিয়া যায় না। সুন্দর তীর ছুড়িল, বালিকাগণের মধ্য হইতে একটি তীর আসিয়া তাহার সহিত সখ্যতা করিল, দুইটি তীর আকাশে জড়াজড়ি করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সুন্দর হাতের তীর ভূমিতে ফেলিয়া দিল। সুন্দর বুঝিল এ তীর কার এবং এর অর্থ কি? আর কোন পক্ষ হইতে একটিও তীর আকাশে উঠিল না। স্ত্রীলোকগণ ভাবিল, পুরুষেরা জিতিয়াছে, পুরুষগণ ও দর্শকগণ ভাবিল মেয়েরা এবার বিজয় মাল্য ধারণ করিল, কারণ তাহারা দেখিল যে সুন্দর অস্ত্র ত্যাগ করিল; তাহারা যদি দেখিতে পাইত মেয়েদের মধ্যেও এইরূপ কেহ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বসিয়া ছিল। ওস্তাদ দূরে বসিয়া একটি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৪)

সুন্দরের বিবাহের পূর্ব্ব দিন বৃদ্ধ বিজয়লাল আসিয়া দেখিলেন, ওস্তাদের

সে কুটীর শূন্য, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন কোথাও তার খোঁজ পাইলেন না! বিজয়লালের প্রাণে বড় বাজিল! সুন্দরলালের সুযশে দেশ পরিপুরিত, বৃদ্ধের দৃষ্টি মূলের দিকে পড়িয়াছিল। বিবাহ প্রস্তাব হামির সিংহের কন্যার সঙ্গে না উত্থাপিত হইলে তিনি ওস্তাদের বিবর্ণ মুখ-খানি মলিন করিয়া দিতে কিছুতেই পারিতেন না। ওস্তাদ আর এক দিন বিজয়লালকে ধরিয়াছিলেন, তারপর তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বিজয়লালের মনটা তেমন ভলে লাগিল না কিন্তু কি করিবেন, ইহারত আর উপায় নাই! বিষণ্ণ মুখে বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন যথারীতি চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া পুত্রসহ বৃদ্ধ হামির সিংহের বাটীতে উপনীত হইলেন। হামির সিংহের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। অগ্র বিবাহের দিন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার কন্যার সঙ্গে, সুন্দর কি অস্ত্র ধরিতে পারিবে?

এ প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধের মস্তকে যেন বজ্র পড়িল, এ কেমন কথা, বরের 'চলন' উঠিয়া আসিয়াছে, আত্মীয় স্বজন সঙ্গে আসিয়াছে এখন এরূপ ভাবের কথা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। তথাপি কি করিবেন, তিনি বর পক্ষ হইলেও এত আর জোরের স্থান নয়। মাথা পাতিয়া অপবাদ সহ্য করিতে হইবে। এক একবার বুক ভরিয়া উঠিতে লাগিল, হা য় বৃদ্ধ ওস্তাদ, কোথায় তুমি এ সময়, এস সহস্র পাদুকা আমার শিরে বসাইয়া দাও!

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—তা বোধ হয় অবশ্য পারিবে, সুন্দরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর ক্ষত্রিয় সমাজে নাই। হামির বলিয়া পাঠাইলেন আজই পরীক্ষা হউক, ক্ষত্রিয়ের বিবাহ, শৃগালের নহে, সিংহী কি শৃগালকে মালা দেবে? দেখা যাউক কি হয়!

বৃদ্ধ হতাশ হইয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন। সুন্দর বলিল, বেশ আমাকে দেখতে দিন।

তখন সুন্দরকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল, সে কক্ষে কেবলমাত্র রাজকন্যা অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সুন্দর সে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। কন্যাপক্ষীয় একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন, তুমি উহার সঙ্গে অস্ত্র ধরিবে? সুন্দর দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্টভাবে উত্তর করিল —না!

বৃদ্ধের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমাগত আত্মীয় স্বজন হায় হায় করিয়া উঠিলেন। তবে কি হইবে, 'চন্দন' অবিবাহিতা অবস্থায় আসিয়া ফিরিয়া যাইবে; ক্ষত্রিয়ের এর মত আর কি অপমান হইতে পারে। কিন্তু উপায় নাই। বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, সে কি কুলাঙ্গার বৃদ্ধ, বিশ্বেশ্বর ওস্তাদ কি তবে সিংহের শিশুকে শৃগালের বাচ্চা করেছে?

"তা নয় বেয়াই, বিশ্বেশ্বর তোমার ছেলেকে সিংহ করেছে, কিন্তু তুমিই তাকে শৃগাল করে তুলেছ"—বলিতে বলিতে ওস্তাদ মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সেইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সবাই মহারাজ বলিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। বৃদ্ধ বিজয়লাল করযোড় করিয়া কহিলেন আমায় মাপ করুন মহারাজ, আপনি ছদ্মবেশে—

মহারাজ বলিলেন—থাক বেয়াই আর অভ্যর্থনায় কাজ নাই, এখন শুভক্ষণে দুটি ফুল এক করা যাউক। আভিজাত্যের গোলত পূর্ব্বেই মিটেছে।

* * * * *

সুন্দর ও লক্ষ্মী হেট মস্তকে দাঁড়াইয়া হামির দুই খানি ধনুক আনিয়া দুই জনের হস্তে দিয়া বলিলেন—ঐ সান্ধ্যতারা সাক্ষি করিয়া আবার তোমরা ধনুক ধর! এস পুত্র, এস কন্যা তোমাদের যে মিলন আত্মায় আত্মায় বহু দিন হইয়া গিয়াছে, আজ সেই মিলন লোক সমক্ষে একবার সত্যই দেখব, চল সভামণ্ডপে, চলুন বেয়াই, এখনত আর আমি গরিব ওস্তাদ নই, আমি হামির! বৃদ্ধ হাসিল। দূরে নহবৎ ইমন কল্যাণ গাহিল।

করুণা

লেখক—শ্রীসতীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

[ক]

স্বামী এম, এ, পাশ করার পর বহুদিন ডেপুটী পদ লাভের জন্য উমেদারী করিয়া বেড়াইলেন শেষে যখন নিতান্ত হতাশচিত্তে গলদঘর্ম্ম হইয়া কপালের ঘাম রুমালে মুছিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "কমলা জুটল না, কি কর্ব্ব বল? আমাদের অদৃষ্টে সুখ নাই। ভগবান্ একবার

আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন না।" বলিয়া হতাশার উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার তখনকার মুখের সেই কাতর, করুণভাব যে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী তাহা আমিই বুঝিয়াছিলাম। আর একজন—যিনি আমার দুঃখের কথা জানিয়াছিলেন, তিনি ত কৈ আমাদের পানে একবারও মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। হা ভগবান! আমাদের একি বিপদে ফেলিলে? এক-বারও মুখ তুলিয়া চাহিলে না?

এমন সময় বাহিরে পিয়ন হাঁকিল, "চিঠি", উনি নিজে উঠিয়া গিয়া পত্রখানি লইয়া আসিলেন। দেখিলাম পত্রখানি সরকারী। তাঁহার মুখ-খানিও আশায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উনি ক্ষিপ্রহস্তে খামের মুখখানি ছিঁড়িয়া পত্রখানি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। বুঝিলাম ভগবান আমাদের কাতর অনুরোধ শুনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় যাইতে হইবে?" স্বামী হাসিয়া উর্দ্ধে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কমলা, পাটনায় যেতে হবে, ভগবান আমাদের এতদিনের শ্রম সার্থক করেছেন। আমাদের অশ্রু পূর্ণ নিবেদন শুনেছেন। আমাকে আগামী বুধবার কাজে জয়েন কর্ত্তে হবে। জিনিস পত্র গুছিয়ে নাও।" হা ভগবান! তোমার লীলা বোঝা ভার।

[খ]

পাটনায় যখন নির্দ্দিষ্ট 'বাংলা'র মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখি একটা যুবতী রমণী দরজা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, আমাদিগকে দেখিয়া সে দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। ফিরিয়া তাকাইলাম, দেখিলাম সে অদৃশ্য হইয়াছে। পাটনায় আমাদের আর যা কিছু অসুবিধা হউক না কেন, বাংলোখানি আমরা উত্তম ও উদ্যানশোভিত অবস্থায় পাইয়াছিলাম। সুখেই দিন কয়টা কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সুখের মাঝে যেন হৃদয়ের কোন এক গুপ্তপ্রদেশে একটুখানি দুঃখের রেখাটানা রহিয়া গিয়াছিল। যখন উনি ১০ টার সময় অফিসে চলিয়া যাইতেন, তখন দেখিতাম সেই যুবতী—যে যুবতী আমাদের এই নূতন গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। সে প্রত্যহ আমাদের বাটীর চতুষ্পার্শে যেন কিসের অন্বেষণ করে। প্রথম প্রথম মনে হইয়াছিল, বুঝি মেয়েটার কোন কু-মৎলব আছে। কিন্তু যখন দেখিলাম যে সে কেবল বাটির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কিসের অন্বেষণ করে। যখন সে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিতাম, মুখে যেন কি এক গভীর নিরাশার চিহ্ন প্রকট। চক্ষু দুইটী যেন করুণ ভাষায় ব্যক্ত করিতেছে, "ওগো বৃথা কেন খুঁজে মর? সে নাই, সে নাই।" পদদ্বয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! তাহারা যেন তাহাদের ব্যথা পরিপূরিত স্বরে বলিতেছে "ওগো আর যে চলিতে পারি না, আমাদিগকে রেহাই দাও না গো।" কিন্তু তবু যেন মুখে চোখে রমণীর আশার ভাব পরিস্ফুট। তবু যেন সেই নিরাশার মাঝে এক একবার উ কি মারিতেছে, আশার ক্ষীণ আলোক। এক একদিন রমণী দূরে গৃহের পানে তাকাইয়া কাঁদিত। সে ক্রন্দনে যে কি ভাব পরিস্ফুট তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। তবে যে সে অশ্রু যে তাহার কত সুখ দুঃখের, কত আশা নিরাশার আলোক অন্ধকার মিশ্রিত! জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকিতাম, আর সুখ-সমুদ্রের মধ্যে ভাসিতে ভাসিতেও যেন এক একটা দুঃখের ঢেউ আসিয়া আমার চিত্তটাকে একনিমিষে বিধ্বস্ত করিয়া দিত। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া তাহার দুঃখকাহিনী শুনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে যে দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাছে আসিয়া ধরা দেয় না। একদিন ভগবানের কৃপায় সে সুযোগ জুটিয়া গেল। সে দিন দুপুরে লেশবোনা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। জানালাটী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া শিল্পকার্য্যটী দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিতে করিতে রমণীটীর পানে তাকাইয়া ছিলাম। দেখিলাম রমণী বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেখান হইতে সরিয়া গেলাম। কারণ—সে যে আমাকে দেখিলে দূরে সরিয়া যায়। আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

নিকটে আসিতেই ডাকিলাম, "ভিতরে এস না বোনটী, দুটো কথা বলি।" বলিয়াই সম্মুখের দরজা উন্মুক্ত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইলাম। কাছে আসিতেই দেখিলাম—পরিধানে একখানি কালপেড়ে শাড়ী, মস্তকের কেশরাশি অবিন্যস্ত—রুক্ষ। মাদুর পাতিয়া বসাইয়া বলিলাম "তোমার নাম কি ভাই?" তখনও তাহার মুখ হইতে বিষাদের রেখা মুছিয়া যায় নাই। ধীরে ধীরে সে উত্তর করিল "করুণা" মাদুরের একপ্রান্তে বসিয়া পা ছড়াইয়া বলিলাম, "করুণা তুমি প্রতিদিন ওখানে দুপুরে ঘুরে বেড়াও কেন?" করুণার চক্ষু দুইটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যেন একটা বহুদিনের বিক্ষিপ্ত মেঘরাশি আজ যেন সহসা জমাট ঘন হইয়া উঠিল। সে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর

করিল "সে ব্যথার কাহিনী শুনে তোমার কি হবে দিদি ?" এ কথায় যে তাহার কত বেদনা লুকাইত ছিল, কত যে গুপ্ত ইতিহাস প্রকটিত ছিল, তাহা বোধগম্য হওয়া তখন আমার অনায়াস সাধ্য হইয়াছিল।

তাহারও কথায় যেন আমারও হৃদয়ে একটী করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। একটা সুপ্ত বেদনা সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। বলিলাম, "করুণা, তোমাকে বল্‌তেই হবে।"

[গ]

সে ছোট্ট একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "দিদি, আমার কথা শুনিয়া যদিও তোমার কোন লাভ নেই, তবুও আমি বলিতেছি। আগেই ব'লে রাখি আমরা ব্রাহ্ম। ঐ যে ঐ পাকা বাড়ীখানা দেখা যাচ্ছে, ঐটেই আমাদের বাড়ী। যখন আমার পিতা ওকালতিতে উত্তরোত্তর পশার বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সেই সময়ে পিতার সহিত আমাদের বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজন করিতে একটী লোককে পিতার সহিত প্রায় প্রত্যহ আসিতে দেখিতাম। বাবাকে তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম সে বি, এ পড়ে। ছেলেটির অবস্থা ভাল নয়, স্বভাব, চরিত্র ভাল।

বাবা তাঁহাকে "মাণিক" বলিয়া ডাকিতেন, বাবা এই নামটা তাঁর আদর করিয়াই রাখিয়াছিলেন। একদিন চায়ের টেবিলে তাঁহাকে ও বাবাকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। শিল্প সম্বন্ধে দুইজনে আলোচনা হইতেছিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিতেই বাবা বলিলেন—"এইত দেখ মাণিক, আমার এই মেয়েটী সব রকম শিল্প বিদ্যা অল্প বিস্তর আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। দেখবে কার্পেটের কাজ কেমন ভাল জানে ?" বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"মা যাওত মাণিকের নাম যে কার্পেটটাতে লিখেছিলে সেটা নিয়ে এসত।" আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। কিছু বলিতে পারিলাম না। যন্ত্র চালিতের মত সেই কার্পেটখানি আনিয়া দিলাম। লতা পাতার মাঝখানে লেখা রহিয়াছে তাঁর নাম "মাণিক।" আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই কার্পেটখানিকে ভাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কার্পেটখানি হাতে লইয়া তিনি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন "বাঃ বেশ হয়েছে করুণা। এটী আর ফিরে পাচ্ছ না।" আমার হৃদয় তখন এক অভিনব গর্ব্বের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। আমি ছুটিয়া পলাইলাম।

তারপর প্রায় একমাস পরে একদিন তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ পাইলাম। সেদিন তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীখানিকে যথাসাধ্য সুন্দররূপে সাজাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন তিনি আমাদিগকে লইয়া গিয়া বাবা ও মাকে এক যায়গায় বসাইয়া বলিলেন "এস করুণা আমার ঘরখানা দেখবে এস।" আসবাব পত্রের মধ্যে দেখিলাম কয়েকটা ট্রাঙ্ক, একটা টেবিল ও খান দুই চেয়ার। আর দেওয়ালে কয়েকখানি চিত্র। তাহারই মাঝখানে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধান একখানি কার্পেট—সেখানি আমারই কৃত—সেই "মাণিক।" আমি হাসিয়া বলিলাম "ওখানাকে আবার অত সুন্দর করে বাধিয়ে রাখতে হয়?" তিনি একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তুমি কি বুঝবে করুণা ওখানি আমার কত আদরের, কত স্নেহের তা তুমি কি বুঝবে?" বলিয়া চুপ করিলেন। আমার হৃদয়ের কোন এক গুপ্ত তন্ত্রীতে একটি আঘাত লাগিল। টেবিলের উপর দেখিলাম—কয়েকখানি কবিতার খাতা। তাহার মধ্যে একখানি খাতায় নাম দেখিলাম—"করুণা।" কবিতাগুলি দেখিলাম, তাঁহার সকল আবেদন, সকল স্নেহ, ভালবাসা সবই একজনের চরণে উৎসর্গীকৃত। একটু মুচকি হাসিয়া বলিলাম—"মাণিক বাবু। আপনার এ চিরবাঞ্ছিতটি কে?" তিনি একটু গম্ভীর চঞ্চল স্বরে বলিলেন "খাতার উপর যার নাম লেখা আছে তাঁকেই—করুণা।" আমি লজ্জায় মুখ ফিরাইলাম। আমার সমস্ত অঙ্গে যেন একটা শোণিত স্রোত বহিয়া গেল। সে কক্ষে আর কেহ ছিল না। কেবল ছিলাম আমি আর তিনি। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "করুণা আমি তোমায় যে রকম ভালবাসি তার এককণা ভালবাসা তুমি আমায় দান করেছ, করুণা! বল দান করেছ। আমি তোমায় যেদিন দেখেছি সেদিন হ'তেই আমার যেটুকু ছিল সেটুকু দিয়ে ফেলেছি, করুণা।" তারপর হাত বাড়াইয়া আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বল করুণা তুমি কি আমায় এতটুকু ভালবাস?" লজ্জায় আমার মস্তক নত হইয়া গিয়াছিল। সেই নত মুখে বলিলাম "বাসি।" তাঁহার মুখখানা একবার পুলকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তারপর তিনি বলিলেন "কিন্তু করুণা। আমার কিছুই নাই তোমার পিতা তোমাকে আমায় দিবেন না। আমি এম্ এ টা পাশ করে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাব ততদিন আমার জন্যে প্রতীক্ষা

কর্ম্মে করুণা।" আমার দু'চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছেল। বলিলাম "করিব।"

এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হইতে বাবা ডাকিলেন "মাণিক" আমরা উঠিয়া গেলাম। 'আমার হৃদয়ে এমন আনন্দ সঞ্চার কোনদিন কোন ক্ষণে হয় নাই। আমি যেন তখন সে জগতে ছিলাম না। কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে তখন বিচরণ করিতেছিলাম।

(ঘ)

তারপর প্রায় বৎসর খানেক পরে তিনি পড়িবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেলেন। তখন যে আমার অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা কি করিয়া বলিব। সে কথা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। আমি কিছুদিন ভুমিশয্যায় লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইলাম। প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে পত্র আসিতে লাগিল। তিনি আমার নিকটে ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার পত্রই আমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল। বেশ সুখেই দিন কয়টা কাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভগবান আমার এ সুখ টুকু সহ্য করিবেন কেন? এখানে প্লেগ দেখা দিল। সারা সহর খানাকে উজাড় করিয়া দিল। তাহাতে আমার পিতা ও মাতাকে কোন অজানা দেশে টানিয়া লইয়া গেল। তাঁহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলাম কিন্তু তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। সেই সময়ে প্রায় দুইমাস পর্য্যন্ত মাণিকবাবুর একখানি পত্রেরও উত্তর দিতে পারি নাই। কাজ কর্ম্ম চুকিয়া গেলে পর তাঁহাকে পর পর কয়েকখানা পত্র দিলাম, কিন্তু উত্তর পাইলাম না। কি জানি বোধ হয় তিনি আমার ধৃষ্টতার জন্য ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। বুঝিলাম আমার সুখের জোয়ারে ভাঁটার সূত্রপাত হইয়াছে। দেনার দায়ে তখন ডুবিয়া গিয়াছি। বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া যে কয়েক হাজার টাকা পাইলাম, তাহাতে দেনা শোধ করিয়া একটি ছোট দ্বিতল বাটি ক্রয় করিলাম। তারপর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই, আজ ছয় বৎসর হইল কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি, কত ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে। তবুও তাঁহার প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছি। 'হাঁ—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আমি কেন এ বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরি, আমার চির বাঞ্ছিতের আবাসস্থল যে এইখানে ছিল। এখন গবর্ণমেণ্ট এ যায়গা কিনিয়া আপনাদের জন্য বাংলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু এস্থানে যে আমার কত স্মৃতি, কত সুখ দুঃখের কাহিনী লিপ্ত

তাহা কি করিয়া বলিব। তাই একবারে ইহার মায়া ত্যাগ করিতে পারি না। এখনও তাঁহার আশায় আশায় থাকি, যদি তিনি আসেন। তিনি যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন তাহা কি কখনও নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে? তাই এইখানে আসিয়া বসি, যদি কখনও আসেন। ভগবানের কৃপায় কিছুদিন হইল তাঁহার দেখাও পাইয়াছি, কিন্তু তিনি আর সে মানুষ নাই। তাঁহার সম্মুখ দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তিনি আমায় চিনিতেও পারেন নাই। কি করিব আমার অদৃষ্ট।" এই বলিয়া করুণা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে করুণার করুণ কাহিনী শুনিয়া যাইতেছিলাম। তাহার কথা শেষ হইতে আমারও নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম "করুণা সে কোথায় থাকে? এত নিষ্ঠুর মানুষ কখনও হ'তে পারে? আমাকে একবার দেখাবে করুণা?" এই কথা শুনিয়া সে বুকের মধ্য হইতে একখানি কি রুমাল জড়ানো কাগজ বাহির করিল। তারপর বলিল "এটি রাত্রে খুলো, দেখো আমার দিব্বি তুমি রাত্রে ভিন্ন অন্য কোন সময়ে খুলে দেখো না।" বলিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি পর্য্যন্ত কৌতূহলী মনকে দমন করিয়া রাখিলাম। তারপর যখন অন্ধকারের কালো ছায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল। ঝিল্লীর গানে যখন পাটনা মুখরিত হইয়া পড়িল। তখন স্বামীর সম্মুখে সেই রুমাল জড়ানো কাগজখানি খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম সেটি একখানি ফটো। আমি ফটোখানি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেটি আমার স্বামীর ফটো। স্বামীর মুখে যেন কি একটা কালো মেঘের ছায়া পড়িল। ঝিকে ডাকিয়া করুণার বাড়ী দেখাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া স্বামীকে বলিলাম "তুমি এত নিষ্ঠুর?" তিনি চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন "সত্যই" আমি বড় নিষ্ঠুর কমলা।"

ঝি হাঁফাইতে হাফাইতে আসিয়া বলিল "সে মেয়েটি এইমাত্র হার্টফেল হ'য়ে মারা গেছে।" আমিও তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হৃদয়ে করুণার বাটির পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। স্বামীর মুখ দিয়া অস্ফুট-স্বরে বাহির হইল "ক্ষমা কর করুণা।" করুণা তখন ক্ষমা অপরাধের বহু উর্দ্ধে।

পবিত্র প্রণয় পরিণাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, লিখিত।

(১)

ভ্রমরের আজ বড়ই আমোদ ; আজ ফুলের বিয়ে। রাত প্রভাত হইতে না হইতেই সে আপন শয্যা ত্যাগ করিয়া ফুলের কাছে হাজির ; শুধু কি তাই, নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছে, আর স্বেচ্ছামত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ? যেন কতই ব্যস্ত। না হইবে কেন ? যে ফুলকে সে আজীবন প্রাণভরা ভালবাসা দিয়া আসিয়াছে, সারাদিন যাহার সুখ সহবাসে কাটাইয়াছে, যাহাকে শ্রুতি মধুর কত গানই শুনাইয়াছে প্রতিদানে যাহার নিকট হইতে সে কত উপাদেয় রসনা তৃপ্তিকর সুখাদ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, জীবনের সেই প্রিয় সঙ্গিনীর আজ সুখোদয় ; অতএব তার সুখে ভ্রমরের সুখ হইবে না কেন ? ভ্রমর ত আর তোমার আমার মত স্বার্থ লইয়া পৃথিবীতে আইসে নাই। সে নিঃস্বার্থ ভাবেই ফুলকে ভাল বাসিয়াছে। যদিও তাহার কার্য্যে কিঞ্চিৎ স্বার্থের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, অন্ততঃ কুটীল ব্যক্তি নিজ দোষ লঘু করিবার জন্য ভ্রমরের কার্য্য স্বার্থ প্রণোদিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু আমি তাহা স্বার্থ বলিয়া ধারণা করিতে পারিতেছি না। কেননা জগতে এরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা কে না করিয়া থাকে ? কত মহা মহা সংসারত্যাগী ঋষি তপস্বি, কত সাধু মহাজন কত সংসার সুখ বিরহিত সংস্কারক, যাঁহারা পরহিতে সমস্ত জীবনটাকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁদেরও কি স্বার্থ চিন্তা ছিল না ? তাই যদি না থাকিবে তবে ঋষি তপস্বির তপে নিযুক্ত থাকিবার কারণ কি ? সাধু মহাজনদিগের সততা আশ্রয় করিয়া লোকহিত কামনা করিবার আবশ্যক কি ? এ সংস্কারকগণের ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কার করিবারই হেতু কি ? কেহ ধর্ম্মোপার্জ্জন দ্বারা নিজের দ্বারা নিজের অক্ষয় স্বর্গ লাভ কামনায়, কেহ বা সংসারাশক্ত মূঢ় মানবগণকে কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছায় এবং কেহ বা পতনোন্মুখ সমাজ বা ধর্ম্মকে উদ্ধার দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা স্থাপন জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূলে একটা স্বার্থ

চিন্তা জড়িত আছেই, তবে সৎ বা অসৎ। সৎ হইলে যদি তাহাকে স্বার্থ নামে অভিহিত না করিতে চাও, তাহা হইলে ভ্রমরের প্রতিদান গ্রহণকেও স্বার্থ বলিতে পার না; কেননা ভ্রমর প্রাণমনে ফুলকে সন্তুষ্ট করিয়াই এ সামান্য প্রতিদান লাভ করিয়াছে; ফুলের সন্তোষ বিধান না করিলে ত প্রাপ্ত হইত না। দেখে এস, এরূপ প্রতিদান প্রার্থী অনেকেই আত্ম-জীবন উৎসর্গ করিতেছে, কেহ ফল পাইতেছে আর কেহ নিরাশ হইয়া কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিতেছে।

যাক্, ও বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। ভ্রমর স্বার্থপর হউক বা নিঃস্বার্থই হউক সে কিন্তু ফুলকে বড়ই ভালবাসে; তাই আজ ফুলের সৌভাগ্যে আপন সৌভাগ্যোদয় মনে করিয়া আমোদে আটখানা হইয়া কত রঙ্গই না করিতেছে। তবু সে এখন জানে না কাহার সহিত ফুলের বিয়ে। কে বর, সে রূপবান ও গুণবান কি না তাহা না জানিয়াই কেবল বিবাহের কথা শুনিয়াই নাচিয়া উঠিয়াছে; বরের প্রকৃত পরিচয় পাইলে না জানি কি করিত। জগতে ভালবাসার টানই এইরূপ। যে যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে সে তাহার সুখে আপনাকেও সুখী মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। পাঠক মহাশয় যদি কখনও সেরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন তবে আপনার তৎকালীন অন্তর দিয়া ভ্রমরের অন্তরটা বুঝিয়া লইবেন; আর যদি না পড়িয়া থাকেন তবে বৃথা কষ্ট স্বীকার করিবেন না, কেন না নীরস প্রাণে প্রণয়ের অঙ্কুর উদ্ভাবন করাইবার চেষ্টা করা আর উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে সুশীতল পানীয় সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা একই কথা।

বলিয়াছি অতি প্রত্যুষেই ভ্রমর ফুলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ফুল তখনও লজ্জার আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রিয় সখাকে মুখ দেখাইতে পারিতেছিল না। তাহার এ হঠাৎ বিবাহের কথা ভ্রমর কিম্বা সে নিজে পূর্ব্বে কিছুই জানিত না; আগের দিন সন্ধ্যাকালে ভ্রমর যখন ফুলের নিকট যথা রীতি বিদায় লইয়া বাটী যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন ফুলের নৈশ-সঙ্গিনী "সুষমা" আসিয়া এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। নিশার আঁধার তখন পশ্চিম তোরণ হইতে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া আপনার দেহজাল বিস্তার করিতেছে,—অন্ধকারে একলাটী বাড়ী যাইতে বিশেষ কষ্ট হইবে ভাবিয়া ভ্রমর আর সে দিন সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিল না; তাই পরদিন উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রিয় সঙ্গিনীর সুখে সুখ অনুভব

করিবার জন্য তৎ সকাশে উপস্থিত হইল। ফুল তখনও লজ্জায় মুখটী বুজিয়াছিল ; কিন্তু ভ্রমরের মধুর সজিত শুনিয়াও রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া আর মুখ বুজিয়া থাকিতে পারিল না ; হাসিয়া আটখানা হইল। তা কি থাকিতে পারা যায় ? পূর্ব্বদিন যাহার নিকট অকপটে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছে যাহাকে আদর করিয়া, সখা বলিয়া বুকে ধরিয়াছে, আজ তাহার নিকট কি রূপে মৌনভাব অবলম্বন করিবে ? ফুল ত প্রথমে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল, তারপর অন্যের অবোধ্য ভাষায় ভ্রমরকে বলিল "আমার বিবাহ তা তোমার অত আমোদ কেন ?

ভ্রমর বলিল "আমোদ হবেনা, বলকি সখি! আজ তোমার বিয়ে, আমার কত আহ্লাদ।" এতদিন কেবল একলাটী ফুটিয়া নিষ্ঠুর সমীরণকে সৌরভ বিতরণ করিতেছিলে আজ তবু একজন উপভোগ করবার লোক পাবে, বল দেখি ফুল, তাতে কত আমোদ ?

ফুল। সত্য সে কথা, আমার কিন্তু একটুও আমোদ হচ্ছে না। আমি ভাবছি বেশ একলাটী ছিলাম, নিজের আমোদে নিজেই আটখানা হ'তেম, এ আমার কি হচ্ছে—একজন কর্ত্তৃত্ব ক'রতে আস্‌বে কেন ? তার আনুগত্য স্বীকার ক'রে আমায় থাকৃতে হবে, কথায় কথায় চোখ রাঙ্গাইবে, আমার অম্লান বদনে সহ্য ক'রতে হবে ; পরোপকার ব্রত পালন ক'রতে পারবো না।

ভ্রমর। তা কি হ'তে পারে ? তুমি স্ত্রীলোক, অতটা স্বাধীনতা প্রয়াসী হওয়াই অন্যায়। দেখ, স্ত্রীলোকের নিজের কোন বল নাই, পুরুষের বলই তার প্রধান বল। তুমি যখন আজ সে বল প্রাপ্ত হ'তে চ'লেছ, তখন স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করা উচিৎ নয়।

ফুল। স্বীকার করি ; কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে, কেমন বর, জান্‌তে না পারলে আমি এ বিবাহে স্বীকৃত হই কি প্রকারে ?

ভ্রমর। তোমার ন্যায় সুন্দরীর বর অবশ্য সুন্দর হওয়াই সম্ভব। তা না হ'লে কি এ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছে ? তুমি ভাই, আর অন্যমত করিও না, বড় সুখে ব্যাঘাত দিও না। আজ আমি তোমাদের সন্তোষ করবার জন্য সারারাত জেগে কত নূতন "রাগের" সৃজন ক'রেছি। দেখো তখন আমি কত আমোদ সৃজন করি।

ফুল। হ'লেও, তুমি একবার জেনে এস কোথায় কাহার সহিত আমার বিয়ে, নতুবা আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না।

ফুলের এই শেষ কথা শুনে ভ্রমর তখন একটি "নবরাগের" আলাপ করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। উন্মাদ তখনও ভাবে নাই যে ফুলের বিবাহের সঙ্গে তাহার সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কত মানবের সুখের বাসাও এইরূপে অকালে ভাঙ্গিয়া যায়।

(২)

কি জানিয়া আসিলে? ফুল ভ্রমরকে এই প্রশ্ন করিল।

ভ্রমর কহিল "শুনিলাম মলয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির হইয়াছে। তা ভালই হইয়াছে, পাত্র নেহাৎ মন্দ নয়—পরোপকারী, তবে কিঞ্চিৎ ক্রোধন স্বভাব। তাতে আর বিশেষ কি আসে যায়? সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আর কয়জন পাওয়া যায়? একটা একটা না দোষ থাকেই, তবে মারাত্মক না হইলেই হইল।

ফুল। আমি কিন্তু মলয়কে বিবাহ ক'রব না। তুমি পুনরায় গিয়ে মা বাবাকে বলিয়া আইস এ বিবাহে আমি স্বীকৃতা নহি, মলয়ের স্বভাব যেরূপ উগ্র তাহাতে আমি তাকে লইয়া সুখী হইতে পারিব না; সারাজীবন মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইবে। আরও একটু কারণ আছে—আচ্ছা, থাক্ সে কথা।—

ভ্রমর। থাক্ কেন, কি বল্‌ছিলে বলই না। সব কথা শুন্‌লে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; নতুবা তোমার পেটের কথা কি করিয়া লোকে বুঝিতে পারিবে? বল কি বল্‌ছিলে?

ফুল। সে কথায় তোমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌বে, অতএব তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই। যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিয়া আইস।

ভ্রমর। ফুল! লোকে অহরহ আমায় "কাল কুৎসিৎ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। তাতে যখন আমার প্রাণে কষ্ট হয় না, তখন এমন কি কথা তোমার—যাতে আমার প্রাণে আঘাত লাগ্‌তে পারে। যতই কেন গুরুতর হউক না, আমি সে কথা শুন্‌বই, নচেৎ এক পাও নড়িব না।

তখন ফুল বলিল, "শোন ভ্রমর! আমি যে কারণে মলয়কে বিবাহ করিতে পারিব না। যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি। লোকে তোমায় কাল—কুৎসিৎ বলে বলুক, তোমার কিন্তু অন্তর বড় সাদা। মলয় যদিও পরোপকারী কিন্তু সে কুটিল ও ক্রোধন স্বভাব। দেখ নাই তোমাকে আমি ভালবাসিয়া বক্ষে ধারণ করি দেখে সে

এক এক সময় কি প্রলয় কাণ্ড উত্থাপন করে—আমাদের উভয়কেই কি কষ্ট দেয়? পরন্তু কাতর সেই মলয়কে তবে আমি কিরূপে ভালবাসিতে পারি? তাহা ছাড়া আমি যখন একবার তোমায় ভালবাসিয়াছি তখন আবার মলয়কে ভালবাসিলে ব্যিচারিণী হইব, সমস্ত জগৎ আমাকে ঘৃণা করিবে এবং আমার চির সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইবে। বল দেখি তবে ভ্রমর! আমি এই সমস্ত সৌভাগ্যের পরিবর্ত্তে কেন মলয়কে পতিরূপে গ্রহণ করিব? তুমিই বিচার করনা কেন, আমি যাহা বলিলাম তাহা প্রকৃত কি না?

ফুলের কথায় ভ্রমরের চক্ষু খুলিল। সে এতদিন নিজেই ফুলকে ভাল বাসিয়া সুখী হইতেছিল, আজ তদুপরি ফুলের প্রাগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সখেদে বলিতে লাগিল "ফুল! জানিতাম না তুমি আমায় এত ভালবাস। আমি ভাবিতাম বুঝি আমার ভালবাসার প্রতিদান কামনায় আমায় বক্ষে স্থান দান কর। সে জন্য আমি কখনও তোমাকে প্রণয়ের চক্ষে অবলোকন করি নাই। যাহা হউক, আমাদের এ ভালবাসা ত স্থায়ী হইবে না। নৃশংস মলয়ের তাড়না হইতে আমরা কিছুতেই রক্ষা পাইব না। সে যে কোন উপায়ে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবেই। এমদবস্থায় তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর; আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা।

ভ্রমরের এই কথা শ্রবণ করিয়া ফুল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন তাহার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। ভ্রমর বড় লজ্জায় পড়িয়া গেল। হাজার হউক, একটা স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা, সবে মাত্র নব যৌবন প্রাপ্তা, একটা সংসার অনভিজ্ঞা রমণী একটা পুরুষের কথা যে এরূপে উড়াইয়া দিবে ভ্রমর তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। কাজে কাজেই সে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল "তুমি হাসিয়া উঠিলে যে? আমার কথায় বিশ্বাস হইল না বুঝি?

ফুল। বিশ্বাস খুবই হইয়াছে, তবে হাসিবারও কারণ আছে। শোন ভ্রমর, আমি যে 'জন্য হাস্য' করিয়াছি। এ সংসারে প্রণয় অতি গূঢ় পদার্থ। ইহা এই পাপ পৃথিবীর বস্তু নয়,—স্বর্গীয়, এবং সকলে ইহা সমভাবে উপভোগ করিতে পারে না। অনেক সময় লোকে পাশবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া প্রণয়ের অবমাননা করিয়া থাকে। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহারা মনুষ্য

নামের অযোগ্য,—পশু অপেক্ষাও ঘৃণ্য ! কারণ অনেক পশুর মধ্যেও প্রকৃত প্রণয়ের অভাব নাই। যাহার অন্তঃকরণ সেই স্বর্গীয় প্রেমে উন্মাদিত তাহার কি কেহ কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে ? আমি তোমায় সত্য সত্যই প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি ; এ ভালবাসা পার্থিব সুখের আশায় বা পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে,—ইহা স্বর্গীয় ও অবিনশ্বর। আজ যদি দুষ্ট মলয়ের নিদারুণ উৎপীড়নে আমায় ধরাশায়িনী হইতেও হয়, তবু জানিও এ ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে সেই পবিত্র প্রেম তিরোধান হইবে না। আমি পরলোকে গিয়াও সেই প্রেম পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তোমার নাম জপমালা করিয়া রাখিব। ঈশ্বর না করুন, আমাদের সে প্রেমে যেন বিচ্ছেদ না হয়। কিন্তু আজ আর কোন মতেই আমায় ত্যাগ করিয়া নিজাবাসে গমন করিতে পারিবে না। যেহেতু আমি যখন তোমায় কায়—মন—প্রাণ অর্পণ করিয়াছি তখন আমি সর্ব্বোতভাবে তোমারই রক্ষণীয়া। দুষ্ট মলয় আমাকে না পাইলে নিশ্চয়ই অনর্থ ঘটাইবে এবং আমরা যে তাহার নিকট সহজেই পরাজিত হইব তাহা বালাই বাহুল্য। "ভ্রমর অগত্যা ফুলের কথায় সম্মত হইয়া সে রাত্রি তাহার নিকট যাপন করিতে স্বীকৃত হইল।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল, সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় রসিক মলয় বর সাজে সজ্জিত হইয়া নানারূপ সৌগন্ধ ছড়াইয়া ধীর পদে ফুলের নিকট উপস্থিত হইল। ফুল পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিল ; সে মলয় আসিবার পূর্ব্বেই ভ্রমরকে স্বীয় বক্ষো'পরি ধারণ করিয়া যেন কতকটা লজ্জায় —কতকটা ভয়ে জড়সড় হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। মলয় তাহাকে বিকসিতা করিবার জন্য কত রকম প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিল, ধীরে ধীরে তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল কিন্তু ফুল দারুণ অবজ্ঞা ভরে একটিও উত্তর করিল না। অনেক চেষ্টায় যখন কৃতকার্য্য হইল না তখন মলয়ের ভারী রাগ হইল, সে আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া নিজের স্বভাবতঃ কোপন স্বভাব প্রযুক্ত ফুলের এই ধৃষ্টতার পুরস্কার দিতে যত্নবান হইল। দেখিতে দেখিতে সারা আকাশ জুড়িয়া মেঘ উঠিল—শোঁ শোঁ শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল,—নিরীহ ফুল সে ঝড় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ধূলায় লুটোপুটী খাইতে লাগিল, কিন্তু তবুও একটি বারের জন্য মুখ ফুটিল না। মলয়েরও বিরাম নাই, সে এই ভাবে সমস্ত রাত্রি ফুলকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল।

এদিকে কিন্তু আর একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। যখন ফুল ও ভ্রমরের

মধ্যে কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, তখন আর একজন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের সেই পবিত্র প্রণয় সম্ভাষণ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি মলয়ের এই রূঢ় কার্য্যে বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাদের প্রণয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া অনেক উচ্চে তাহাদের আসন নির্দ্দেশ করিয়া সেই উচ্চাসনে তাহাদিগকে অধিরূঢ় করাইবার জন্য জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। এদিকে উষার আলোক তখন পূর্ব্ব গগণে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল,—দিবস আগত প্রায় দেখিয়া ও সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে কাতর হইয়া মলয় যেন তখন কতকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল ; ফুল তখনও পর্য্যন্ত ভ্রমরকে অঙ্কচ্যুত করে নাই। ব্রাহ্মণ ধুল্যবলুণ্ঠিত ফুলকে সযত্নে তুলিয়া আনিয়া ও যথাবিহিত মন্ত্রপূত ও মলয়জ শিক্ত করিয়া ভগবান মস্তকে অর্পণ করিলেন। পবিত্র প্রণয়ের সদগতি হইল,—প্রগাঢ় অনুরাগের পুরস্কার স্বরূপ ভ্রমর ও ফুল একযোগে সর্ব্বোচ্চ আসন লাভ করিল। "ইহাকেই বলে "পবিত্র প্রণয় পরিণাম।"

পাশ ফেল্

লেখক—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(১)

লীলার কটিদেশ ধারণ করিয়া অতি নিকটে আনিয়া নীরেন্দ্র বলিল—লীলা, কুটনো কুটে, চন্দন ঘষে, ঝি তাড়িয়ে তোমার অনেক সময় কাট্‌তে পারে, আমার কিসে কাটে বল ? সবটুকু গেলে কি নিয়ে থাকি আমি ?

লীলা কটাক্ষে ভুবন-বিজয় করিয়া কহিল—কেন, বইয়ের পাতায়।

নীরেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বেশ স্পষ্ট গলায় বলিল—বইয়ের সবটাই কল্পনা আর যুক্তি তর্ক। অত কল্পনার আকাশে বেড়াবার মত পাখা ত নেই। যেখানে থাকবার আমার পাখা দু'টি—

লীলা বলিল—সে দুটি হচ্ছে কি ?

নীরেন্দ্র লীলার চারু হস্তদ্বয় ধরিয়া মুখের কাছে আনিয়া বলিল—এই দু'টি এই দু'টি।

'ইস্' বলিয়া লীলা হাত টানিয়া লইল। "এতকাল বইয়ের পোকা হ'য়ে এখন তার নিন্দে করুছ কোন্ মুখে ?

'মুখ ত একটা বই দুটো নয়। আর এতকাল যে বইয়ের পোকা ছিলুম, তোমায় চিনি নি বলে।'

লীলা হাসিয়া কহিল—এখন চিনেছ বুঝি ?

নীরেন্দ্র কহিল,—চিনি নি আবার! চিনেছি বলেই ত বল্‌ছি ঐ আশ্রয়চ্যুত গাছতলাতে দাঁড়াবার স্থান আমায় হবে না ?

'যাও।'

'যাব না ত! যাব বলে আসিনি।'

'বেশ, তবে বোস্।'

'শিরোধার্য্য। আর একটা চাইবার আছে যে।

'চাওয়া চাওয়ি আমি বুঝিনে, স্পষ্ট কথা বল।'

'তোমাকেও যে বস্‌তে হচ্ছে।'

লীলা বলিল—সময় নেই যে। বিন্দি এখনি ভাড়ারের চাবি খুঁজবে। বামুনঠাকরুণ তরকারি চাইবে! পুরুষ ত—

নীরেন্দ্র বলিল—বলে যাও, বলে যাও, ঘোড়া দানা মাগবে! গরু বাচ্ছা চাইবে, আর কি আছে বল।

"না, বলব না। কেবল ঠাট্টা, কাজের কথাতেও ঠাট্টা!"

আমি ত কাজের কথায় ঠাট্টা করি, তুমি যে কাজের নাম করে মর্ম্মান্তিক পরিহাস করছ লীলা! আমার পরিহাস একটু হাস্যরস আনতে পারে, তোমার যে একেবারে চোখের জল এনে দেয়।

লীলা অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—রাগ করেছ, আমি সব সময় তোমার কাছে থাকি না বলে! ছিঃ।

'একটা উপায় বলে দাও—'

'বললে রাখবে ?' শোন, বলি। ব্যাঙ্কে ত গাদা গাদা টাকা পড়ে রয়েছে। তাই দিয়ে খুব বড় বড় জমিদারী কেন। জমিদারির কাজে, দেখবে, সময় হুহু করো কেটে যাবে।"

"আমি ত সময় কাটাতে চাই নে! আমি তোমাকে চাই।"

"এখন চাইলে সকল সময় পাবে না। তখন কাজের অবকাশ পেলে চাইবে, আর চাইবার আগেই দেখবে যে পেয়েছ।"

'পাব ত ?'

'নিশ্চয় ।'

'বেশ। বুঝলুম, চাতক 'ফটিকজল' করলেই জল পায় না। সময় হ'লে তবে পায়।'

এই সময় শব্দ হইল—মহারাণী।

(২)

'এই ছেলেটি মরাত্মক রকমের স্ত্রৈণ হইবে—এই ভবিষ্যদ্বাণীটা যে এমন করিয়া ফলিবে তাহা কেহই বুঝে নাই। চন্দনপুকুরের বিখ্যাত ধনী মহেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্রের পক্ষে এই দারুণ অপবাদটি আদৌ রুচ শুনায় নাই। সে লীলার কাছে গিয়া বলিয়াছিল—লোকে আমায় কি বলে জান ? স্ত্রৈণ।' লীলা তখন নয় বছরের ছোট্ট মেয়ে। কিন্তু এই কথাটা বুঝিবার ক্ষমতা যেন নয় বছর আগেই সে পাইয়াছিল, বলিল—ছিঃ! নীরেন্দ্র বলিয়াছিল—ছিঃ কি বল, তাদের উপর আমার ভারি ভক্তি হয়ে গেছে। তাদের দুপুর বেলা খেতে নিমন্ত্রণ করে এসেছি !

তখন সবে মাত্র মহেন্দ্র মিত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার শ্যালক কোম্পানীর কাগজের ও টাকা কড়ির রক্ষণ কর্ত্তা। গৃহিণী পুত্র প্রসব করিয়াই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, দুইটি বালক বালিকা।

মাতুল নীরেন্দ্রকে অনেক বলিয়াছিলেন, ঘরে টাকা ফেলিয়া রাখা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে ; জমিদারী ও তেজারতি—

খানিকটা শুনিয়াই নীরেন্দ্র বলিয়াছিল—বণিক হ'তে চাই নে, মামা !

মামা বলিলেন—বণিক কি রে ! ব্যবসায় বসতি লক্ষ্মী !

নীরেন্দ্র বলিয়াছিল—কেতাবে লেখে ! আগে সব বই শেষ করি দাঁড়াও। তবে অন্য কথা।

মামা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—তোর মত না থাকে ত—

'একেবারে নেই মামা, একেবারেই নেই। ও মতলব ছেড়ে দাও।'

ও পাড়ার বখা ছেলেরা তাদের আড্ডায় ডাকিতে আসিল, নীরেন্দ্র লীলার মত জানিতে চলিল। ছেলের দল বুড়ার দলকে গিয়া খবর দিল। বুড়ার দল চিরদিন মত দিয়াই আসিয়াছে, বলিল আরে ছ্যাঃ, ছোঁড়াটা ত বেজায় স্ত্রৈণ ! কি বল, মু—খু—র্য্যে ?

'মু-খু-র্য্যে' কথাটা টানিয়া টানিয়া বলার তাৎপর্য্য ছিল, মুখুর্য্যে এ গূঢ় ইঙ্গিতটিতে ধাক্কা খাইয়া বলিল—লক্ষ্মীমন্ত পুরুষই লক্ষ্মীর আশ্রয়ে থাকে, আর সব লক্ষ্মীছাড়া!

আপনাকে 'লক্ষ্মীমন্ত' স্ত্রীকে 'আশ্রয়' অপরকে 'লক্ষ্মীছাড়া' বলিয়া তখনকার মত সান্ত্বনা পাইলেও, রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন দেখ, মহেন্দ্র মিত্রের ছেলেটা একেবারে গোল্লায় গেছে। ছেলেটা বেজায় স্ত্রৈণ!

মধ্যে দিনকতক কথাটা চাপা পড়িয়াই ছিল, নীরেন্দ্র একদিন বলিল দেখ, লোকে আর আমায় সেইটে বল্‌ছে না কেন? আমি—

লীলা বলিল—তুমি কি?

সে অম্লান মুখে বলিল—বেজায় স্ত্রৈণ!

আবার সেদিন মামার বাড়ী গিয়া মামাকে বলিল—মামা, শীঘ্র জমিদারি কেন! ভারি সখ্‌ হয়েছে।

মামা সবিস্ময়ে বলিলেন—সে কি রে—তোর—

নীরেন্দ্র বলিল—বোঝ না মামা। লীলা বলেছে—

মামা উঠিতে উঠিতে বলিলেন—সন্ধান দেখি।

আপনার মনেও ঘরের কোণে বলিলেন—এ্যা ছোড়াটা হ'ল কি? এত বড় স্ত্রৈণ!

মামি বলিলেন—খোকা কাঁদছে একটু ধরতে পার না!

মামা কোল পাতিয়া বসিয়া বলিলেন—কৈ দাও দাও বল্‌তে হয় কাঁদছে।

(৩)

লীলার রাণীর মত রূপ, রাণীর মত স্বভাব, ঐশ্বর্য্যময়ী হাবভাব দেখিয়া স্বর্গীয় রাজা মহেন্দ্র মিত্র তাহাকে রাণী বলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুমার তাহাকে মহারাণী বলিয়া ডাকিত। তদবধি সে ঘরে বাহিরে মহারাণী।

সে আজ্ঞা করিত কঠোর, কিন্তু স্নেহসিক্তস্বরে যেন তাহা অনুনয় অনুরোধের মতই শুনাইত। তিরস্কার করিলেও কেহ তাহা অধিকক্ষণ মনে রাখিতে পারিত না। গরীবের ঘরের মেয়ে, ধনীর গৃহে (রাজার গৃহে নয়, যেহেতু মহেন্দ্র মিত্র খেতাবী রাজা) আসিয়া এমন মানাইয়াছিল যে, জন্মান্তর না মানিয়া উপায় ছিল না।

সেদিন হরিদাসকে বকিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল, হরিদাস

লীলার স্বভাব জানিত, সে যায় নাই। অর্দ্ধঘণ্টা না কাটিতে দ্বিতল হইতে ডাক আসিল হরিদাস!

মুখ ভার করিয়া হরিদাস মহারাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

লীলা'বলিল– উঃ রাগে যে মুখখানা বড় কাল হয়ে গেছে, হরিদাস!

হরিদাস অকারণ বিকশিত হাস্যে মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, আজ্ঞে!

লীলা বলিল—তোমার ছেলে মেয়েকে পূজার সময় কি দিতে হবে বলে যাও। বাবু কাল কলকাতা যাবেন।

ফরমাস করিয়া হরিদাস বলিল—মহারাণী যেন দয়াময়ী!

লীলার আনন্দ ধরে না। সে ঘরে ঢুকিয়া আনন্দে অধীর হইয়া, সদ্যঃ-জাগ্রত স্বামীকে গিয়া বলিল, আমি দয়াময়ী হ্যাঁ গা?

নীরেন্দ্র অবিচলিত স্বরে বলিল—সে ত সকলই জানে! তবে সেইটেই আমি পছন্দ করি না।

লীলা সাশ্চর্য্যে বলিল - কি পছন্দ কর না?

'যে, তোমার দয়ার ভাগটা এই ঘরের বাহিরে বড় বেশী ছুটোছুটি করে! আমার তৃষ্ণার্ত্তি জল অন্যকে দিতে চাইব কেন?

'তাই বুঝি?'

'নয় ত কি? দেখ, বিয়ের আগে নির্ম্মল—

সবেগে নীরেন্দ্রের মুখে হাত চাপা দিয়া লীলা বলিয়া উঠিল—ফের সেই কথা!

মুক্ত হইয়া নীরেন্দ্র কহিল—হ্যাঁ। শোনা কথা বলে নির্ম্মলকে আমি দোষী কর্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—...

কি দেখ্‌ছ?—স্বর বড় তীব্র।

ও কি লীলা, এত অল্পেই তুমি রেগে যাও! আর বলব না।

না বলতেই হ'বে। তোমার মনের ভিতর যা আছে, মুখে তা'কে চাপা দিতে চেষ্টা করা বৃথা।

মনের ভিতর! তাইত, বড় ধোঁকা লেগে গেল। মনের ভিতর খুঁজে যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।

লীলা মিটি মিটি হাসিতে লাগিল।

নীরেন্দ্র কহিল—মামা ত জমিদারীর সন্ধানে গেছেন। তাঁকে বলে দিয়েছি, যত বড় জমিদারি কিনতে পাওয়া যায়, তারই চেষ্টা করতে।

ললিত-হাস্তে অমিয় ঢালিয়া দিয়া লীলা কহিল—জমিদার—হুজুর!

নীরেন্দ্র তাহার গলা ধরিয়া নিজের মুখ উঁচু করিয়া বলিল—তোমার চেয়ে পদ আমার নিচেই রইল। তুমি হলে—রাণী, মহারাণী!

৪

খাসবাদের জমিদারদের বড়ই অবস্থা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই বিষয় আশয় বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন, হঠাৎ নীরেন্দ্রের মাতুল খাসবাদে গিয়া পড়িলেন। জমিদার রামনাথ তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কাগজ পত্র দেখাইতে লাগিলেন। দায় মুক্ত সম্পত্তি আর মুনফাও মোটা। মাতুল আসিয়া বলিলেন—দামটা তুমি করলেই ভালো হয়।

লীলাও বলিল—সেই ভালো।

মামা বলিয়া দিয়াছিলেন—বিশগুণ পনের বেশী দেওয়া চলে না।

বোট সাজাইয়া নীরেন্দ্র খাসবাদ পৌঁছিল এবং দশদিন পরে বোট লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মামাকে বলিল—বিশগুণে বড় ঠকান হয় মামা, ওটা তেইশ গুণই রফা হল।

মামা বলিলেন—সে কি! এত বেশী—

সে বলিল—ওটা হ'য়ে গেল মামা! রামনাথ বাবু—

মামা বলিলেন—তিনি বিক্রী করছেন, তিনি ত বেশী চাইবেনই।

নীরেন্দ্র বলিল—তিনি যে খুব বেশী চেয়েছিলেন, তা নয়, ও হয়ে গেছে মামা!

লীলা বলিল—এই রকম করে' জমিদারি কর্ব্বে, বটে!

নীরেন্দ্র স্থির ভাবে বলিল—আমি কর্ব্ব না ত তুমি কর্ব্বে! তোমার জমিদারী যে!

লীলা বলিল—তবে, আমার মত না নিয়ে ওটা অত বেশী দাম দিলে কেন?

নীরেন্দ্র বিচলিত হইল, কহিল—কি রকমে কি হল বুঝতে পারছি না।

লীলা কহিল—যা হয়ে গেছে—

নীরেন্দ্র বলিল—হাঁ!

যাহা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—দরদামের সময় রামনাথ বসুর টুকটুকে

মেয়েটি বসিয়া ছোট ছোট চাহনিতে নীরেন্দ্রের মাথাটি গোলমাল করিয়া দিয়াছিল। নীরেন্দ্র সমস্ত সর্ত্তেই স্বীকার পাইয়াছিল। বোটে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়াছিল—আরো কিছু সর্ত্ত থাকিলেও সে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

পরদিন আবার নদীতে স্নানে আসিয়া সেই মেয়েটি যখন ছাদের উপর উপাবিষ্ট চিন্তামগ্ন নীরেন্দ্রের পানে সেই স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—আমায় আপনার বোটের ভিতর দেখাবেন ?

এই প্রশ্নে নীরেন্দ্রের চিত্ত এমন করিয়া উঠিল যে, সে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল—এসো—না !

প্রত্যেক জিনিষটি দেখিয়া বালিকার সুখ্যাতি আর মুখে ধরে না, সে বলিল—আপনি খুব বড় লোক বুঝি ?

মিথ্যা বলিবার প্রলোভন হইল না। বালিকা আবার প্রশ্ন করিল—আমার বাবাও খুব বড় লোক ছিলেন, আপনার মত নয় !

কিসে জানলে ?

বাবা যে কাল বলছিলেন—পিরি, কি রকম বড় লোক দেখলি—তিনগুণ পণ—এক কথায় বিশহাজার টাকা দিয়ে গেল।

নীরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—তোমার নাম বুঝি পিরি ?

বালিকা বলিল—ওটা ডাক নাম ! ভালো নাম একটা—

নীরেন্দ্র বলিল—বল না শুনি—

প্রীতিময়ী !

দিন রাত্রি এই চারি অক্ষরের কথাটি নীরেন্দ্রের কানে যেন শত বীণার ঝঙ্কারের মত, ললিত-রাগিনীর মূর্চ্ছনার মত সুর তুলিতে লাগিল।

কিসে যে কি হইল, ভালো করিয়া সেই বুঝিল না, তা অন্যে কি বুঝিবে ?

৫

এমন জানিলে কখনই জমিদারি কেনার কথায় লীলা মত দিত না। সে নীরেন্দ্রকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকে নাই। এই সেদিন দশদিন ছাড়িয়া কি কষ্টেই যে সেই দিন কাটাইয়াছে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। আর তাহার ময়ূরটাই জানে !—আকুল হস্তে সে ময়ূরটার পুচ্ছ ছিঁড়িয়া দিয়াছে ! আবার নীরেন্দ্র জমিদারী দর্শনে যাইবে শুনিয়াই সে বেঁকিয়া বসিল।

নীরেন্দ্র বলিল—একবার যাওয়া দরকার। নইলে চলবে কেন ?

লীলা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—ওঃ কি আমার জমিদারী গো! চলবে না! একা তোমারই যেন জমিদারি আছে! এই, এত বড় ভারতবর্ষের যিনি জমিদার, তিনি কি ভারতবর্ষে আসেন?

হাসিয়া নীরেন্দ্র বলিল—তাঁর কত লোকজন!

লীলা বলিল—তুমিও লোকজন রেখে দাও।

নীরেন্দ্র বলিল—একবার যাবই।

লীলা বলিল—তবে আমিও যাব।

নীরেন্দ্র বুঝাইল, পরের বারে লইয়া যাইবে। উত্তম বাংলা তৈয়ারী হইতেছে, শেষ হইলেই লীলাকে জমিদারি দর্শনে লইয়া যাইবে। রাণীকে কি যেখানে সেখানে লইয়া দাঁড় করান যায়!

এ যুক্তিটা মানিতে হইল!

খাসবাদ হইতে কয়েক দিন বাদে চিঠি আসিল—এখনও কিছুদিন সে এইখানেই থাকিবে।

লীলার উত্তর গেল—থাক।

নীরেন্দ্র লীলার সম্মতি পাইয়া সুখেই খাসবাদে বাসা বাঁধিল। রামনাথ বাবুর বাড়ীতেই তাহার দিন ও রাত্রির কিয়দংশ কাটে।

হঠাৎ একদিন সে বাসা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। রামনাথ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কলিকাতা যাইবেন।

শুনিয়াই নীরেন্দ্র বলিল—এখান থেকে হয় না!

রামনাথ বলিলেন—পাড়াগাঁয় মনের মত পাত্র মেলে না!

চকিতে নীরেন্দ্র কহিল—এত দুর্ল্লভ!

রামনাথ।—তা বৈকি।

নীরেন্দ্রের মুখের ভাব দেখিয়া রামনাথ চট্ করিয়া বলিলেন—বাবা, তোমাদের মত পাত্র ত—আবার থতমত খাইয়া গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই নীরেন্দ্র বলিল—আমার আপত্তি নাই।

রামনাথ বাবু আকাশ হইতে পড়িলে এত বিস্মিত হইতেন না। তথাপি বলিলেন—কিন্তু যিনি আপনার—

'তাঁকে আমি খুব চিনি। তাঁর অমত হ'বে না!'

সেই দিন হইতে পরে যে কয়দিন নীরেন্দ্র খাসবাদে ছিল, প্রীতিকে আর দেখিতে পায় নাই।

নীরেন্দ্র সমস্ত পথ চিন্তা করিতে করিতে আসিল, লীলাকে এই আট বছর দেখছি, তা'কে চিনি নে আমি!

৬

লীলা কহিল, "আমার কাছে কথা বল্‌তে তুমিত কখনো কিন্তু কিন্তু কর নি। আজ—"

নীরেন্দ্র নতমুখে কহিল, আজ যে কথা বলব ভাবছি, ইচ্ছা না করলেও সঙ্কোচ আমার মুখ বন্ধ করছে।

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ততোধিক গম্ভীর মুখ দেখিয়া লীলা কহিল, তবে বল না।

নীরেন্দ্র কহিল, "না বলতেই হবে। সঙ্কোচ আমায় ত্যাগ করতেই হ'বে।"

লীলা সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল।

নীরেন্দ্র বলিল—খাসবাদের জমিদার—

"সে ত তুমি।"

"না, না, আগেকার জমিদার, তাঁর—"

"থামলে কেন?"

"বল, রাগ করবে না?"

"না, বল,।"

নীরেন্দ্র বলিল—প্রীতি বলে যে একটি মেয়ে আছে—

লীলা বলিল—শীঘ্র বল,—আমার বড় ভয় হচ্ছে।

"সে, আমায় ভালোবাসে।"

"কে?"

"ঐ যে বললুম, প্রীতি।"

লীলা বলিল—তারপর।

"তারপর কি—তুমিই বল।"

"আমি! আমি কি বলব। আমিত কিছুই জানিনা।"

"আমার কি করা উচিৎ, তাই বল।"

লীলা অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—সে তোমায় বিয়ে করতে চায়?

নীরেন্দ্র মাথা তুলিতে পারিল না। লীলা বলিল—বুঝেছি, সে তাই চায়—তুমি?

"আমি !—বলিয়া নীরেন্দ্র আবার মাথা নমিত করিল।"

লীলা বলিল—তবে তোমার ইচ্ছেও তাই! তারপর রমানাথ বাবু—

"তিনিই ত এই প্রস্তাব করেছেন।"

লীলা বলিল—একদিন সময় আমায় দাও। ভেবে বল্‌ব।

নীরেন্দ্র বসিয়াছিল, দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—কাল আমায় উত্তর দেবে ত? আর তাও শুনে যাও—

লীলা তখন অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে।

৭

পরদিন লীলা বলিল—যে কখানা নভেল আমি পড়েছি, সব তা'তেই আছে, হিন্দু স্ত্রী জগতে একটা উজ্জ্বল আদর্শ।

"সে হিসাবে—

নীরেন্দ্র একটু রসিকতার ভাণ করিয়া বলিল—হাতে ত একখানা উপন্যাস এখনো রয়েছে দেখ্‌ছি। ওখানা কি?

লীলা বইটি গোপন করিবার চেষ্টা পাইল; নীরেন্দ্র জোর করিয়া দেখিল, বলিল—'দিদি,! শেষ করেছ?'

"করেছি। হ্যাঁ—যা বলছিলুম—"

"আচ্ছা, লীলা ঠিক করে' বল দেখি—ওর মধ্যে কা'কে তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল? সত্যি বল—"

"অমরনাথকে!"

"অমরনাথকে! আশ্চর্য্য করলে! ওত পাষণ্ড, পামর—

'উপন্যাসের নায়ককে সত্যের আসনে বসাবার কোন দরকার দেখি না। যাক্—সে কথা। ভেবে দেখলুম, হিন্দুর হিন্দুত্ব রাখাই কর্ত্তব্য!'

'তোমার যা বলবার—খোলাসা করে বল। আমার মনের অবস্থা এত গোলমেলে হয়ে আছে যে স্পষ্ট নহিলে বুঝবার শক্তি হবে না।'

লীলা বারেক মাত্র দীপ্তনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।—বলিয়াই সে ঘরের বাহিরে গিয়া বামা ঝিকে বলিল—টপ্ করে একটা ডাব কেটে নিয়ে আয় ত! বড় গলা শুকিয়ে গেছে।

নীরেন্দ্র কাছে আসিতেই বলিল—তুমি আজ যদি বিকেলে নৌকা করে বেড়াতে না যাও; নৌকা ঠিক রাখতে বল, আমি সন্ধ্যে বেলা একটু বেড়াব। অনেকদিন গঙ্গায় বেড়াই নি।

নীরেন্দ্র সাহ্লাদে কহিল—সে ত বেশ হবে। আমিও যাব'খন।

লীলা বলিল—আচ্ছা।—কিন্তু সন্ধ্যার অনতি পূর্ব্বেই সে বলিয়া পাঠাইল বড় মাথা ধরিয়াছে।

নীরেন্দ্র যখন অন্দরে আসিয়া সস্নেহে বলিল চল, গঙ্গার শীতল বাতাসে মাথা ধরাটা সেরেই যাবে।—লীলা দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজী হইল। একটা যেন, অভেদ্য রহস্য জাল সুমুখে পড়িয়াছিল, কেহই তাহা দেখিতে পাইতেছিল না।

৮

অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহে, এক শীতল রৌদ্র-করদীপ্ত মধ্যাহ্নে যখন নীরেন্দ্র প্রীতিময়ীকে সঙ্গে লইয়া বোট হইতে বাঁধা ঘাটে নামিল, উচ্চরবে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে চাহিয়া দেখিল—একটা মহাসমারোহ নীরবে তাহার অপেক্ষা করিতেছিল, দর্শন মাত্রে ঝঙ্কার দিল। প্রীতিকে শিবিকায় উঠাইয়া সে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত গৃহে প্রবেশ করিল। বাড়ীটির সকল দিকেই হর্ষোল্লাসের পতাকা যেন পত্ পত্ করিয়া উড়িতেছিল।

যাহার ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় এই সমারোহের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিতে গিয়া নীরেন্দ্র দেখিল, একটা খোলা তোরঙ্গের সম্মুখে স্তব্ধ ভাবে লীলা বসিয়া আছে।

নীরেন্দ্র কহিল—বিরাট আয়োজন করেছ যে লীলা!

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, ম্লানমুখের উপর হাসির ছায়া ফেলিয়া, যতদূর সম্ভব ধীরকণ্ঠে বলিল—পছন্দ হয়েছে? তা হ'লেই হল!

"কিন্তু এ সব কি লীলা?"

লীলা নিরুত্তর।

'তুমি কি, তুমি কি—

'আমি পশ্চিমে যাচ্ছি।'

'পশ্চিম! কৈ, আমিত কিছু জানি না।'

'না।'

নীরেন্দ্র বলিল—তবে?

নতমুখে, মৃদুস্বরে লীলা কহিল, এখন ত জানলে। আমায় একটু ছেড়ে দাও। গাড়ী সাজাতে বলেছি, এখনো সব গোছান হয় নি।

'আজই!'

সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া লীলা কহিল, আজই কি!—এই মুহূর্ত্তে!

একখানা আসন টানিয়া নীরেন্দ্র বসিল, আস্তে আস্তে বলিল—একথা আগে বল নি কেন লীলা!

শালের রুমাল খানা তুলিয়া ভাঁজ করিয়া বলিল, কি কথা?

নীরেন্দ্র দুঃখিত ভাবে বলিল—আমাকে ছেড়ে যাবে! এখন,—যা করে ফেলেছি—তার—আর—

লীলা আবার চাহিল, বলিল—বোঝনি কেন? এক আকাশে চন্দ্র সূর্য্য একই সময়ে ওঠে কি?—ওঠে না। কেন ওঠে না, জান?

নীরেন্দ্র বলিল—জানি! কিন্তু—

লীলা বলিল—সমস্যা এত জটিল না যে এর ভেতর আবার কেন, কিন্তু আসতে পারে!

নীরেন্দ্র বলিল—কিন্তু আমি বল্‌ছি, তখন মত দিলে কেন? তোমার মত না পেলে এ কাজ আমি করতুম না।

'করতে না? নিশ্চয় করতে। তা আমি বুঝেছিলুম, নিজের সে মানটুকু তাই আমি নষ্ট করিনি।'

'তোমায় চিনেছিলাম; ছেলেবেলা থেকেই তোমায় বুঝেছিলাম—সেদিনও বুঝলাম, আমার মত চাওয়া একটা মৌখিক শিষ্টাচার মাত্র।

'শিষ্টাচার মাত্র?'

'নিশ্চয়! আমার মত জানবার আগে তুমি নিজে একটা মত তৈরী করেছিলে। যদি তোমার মতের বিরোধী আমি হতুম, তুমি সামলাতে পারতে না, বিদ্রোহ করতে।'—একটু নীরব থাকিয়া সে পুনরায় বলিল—আমার সময় বড় কম, একটুখানি চুপ কর, যাবার দিন আর অশান্তি টেনে এনো না।

কিয়ৎপরে নীরেন্দ্র বলিল—কোথায় যাবে?

লীলা বলিল—কিছু ঠিক করিনি।

নীরেন্দ্র বলিল—সঙ্গে কে কে থাকবে?

লীলা আপনমনে তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া বলিল—এ বাড়ীর কেই না, কেবল নির্ম্মল থাকবে।—চাবিটা কোথায়?—রাগিয়া সে লোহার সিন্দুক খুলিয়া নোটের তাড়া বাহির করিয়া ক্যাশবাক্সে পুরিতে লাগিল।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে নীরেন্দ্র চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারই অর্থ, তাহারই সব, তাহারই গৃহ ত্যাগ—আশ্চর্য্য! তাহার ঘরে সে যেন চোর।

তাহারই সম্মুখ হইতে তাহারই সব লইয়া, আততায়ীর মত লীলা ঘরের বাহির হইয়া গেল। এত দুর্ব্বল সে!

বাহিরের বাদ্যধ্বনি, পূজাবাটীর বিজয়ার বিরহ-বেদনা বাদ্যের মত একটি কাতর আর্ত্তনাদের হাহাকারে নীরেন্দ্রের চিত্ত ভরিয়া দিল। মুহ্যমানভাবে ঘরের ভিতরে সে বসিয়া এই ওলট পালটের কথাই ভাবিতে লাগিল। চিন্তা এত জটিল হইয়া পড়িল যে সে অধিকক্ষণ সে অবস্থায় থাকিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া দেখিল, পুরাঙ্গনাগণ নববধুকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিতেছে; উৎসবের কোনও ক্রটী নাই। লীলার প্রভাব এ বাড়ীর কীট পতঙ্গেও মানিত। সেত কিছুই দেখিতেছে না, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ভুলচুক কেহ করিতেছে না।

নীরেন্দ্র কাশ্মিরী বারান্দার সবুজ রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য মনে কোথায় শূন্য দৃষ্টি ফেলিয়া কি যেন দেখিতেছিল, হঠাৎ লীলার স্বরে সে চমকিয়া ফিরিল।

'এই পর্য্যন্ত আয়োজন আমি সম্পূর্ণ করেছি। তারপর যা কর্ত্তব্য তা থেকে আমি বিদায় নিয়েছি! লীলা গললগ্ন-কৃত বাসে প্রণতা হইল।

'যেওনা, লীলা, যেওনা। তুমি ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না,—এই ধরণের অনেক কথা বক্ষে গুঞ্জরিয়া উঠিল, কিন্তু—একটিও বাহির হইল না। চক্ষের সম্মুখে যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। তাহারই মত্ত বায়ুতে দৃষ্টি যেন কিয়ৎকালের জন্য লুপ্ত হইল।

যখন সে সম্মুখে চাহিল, দ্বি-অশ্ব-সজ্জিত যান ফটকের বাহির হইয়া গেল। তাহার কাঁচের গবাক্ষে দুইটি উতলা আঁখির ছায়া যেন সে অল্প দেখিতে পাইল।

প্রীতি আসিয়া বলিল—তুমি যে বলেছিলে, এখানে একজন রাণী আছেন, তাঁকে দেখাবে চল না।

নীরেন্দ্র এই সরলা বালিকার সরল প্রশ্নে কেন আরো বিচলিত হইয়া পড়িল, বলিল—রাণী আর নেই, প্রীতি!

'নেই! সে কি? কোথা গেছেন?

'তা, জানি না।

প্রীতি কহিল—তুমি কিছু ভাবছ?

নীরেন্দ্র ক্ষুদ্র 'হাঁ, বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল।

প্রীতিময়ী ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। নীরেন্দ্র আপন মনে বলিল—না গেলেও পারতে, লীলা। তুমি এ আকাশে সূর্য্য হতে পার, চন্দ্র এলেও সংঘর্ষের কোন ভয় ছিল না। একটা মস্ত ভুল!

(১০)

মামা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—নীরেন, এ কি শুন্‌ছি?

নীরেন্দ্র অপরাধীর মত বলিল—কোথায় শুন্‌লে?

মামা বলিলেন—তবে সত্য।

নীরেন্দ্র কহিল—হ্যাঁ মামা!

মামা ক্রোধপূর্ণস্বরে বলিলেন—তবে আর চিন্তা নাই। তুমি লক্ষ্মীছাড়া।

নীরেন্দ্র লজ্জা সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিল—লক্ষ্মী যদি নিজে ছেড়ে যান, রাখব কি করে মামা? জানই ত লক্ষ্মী অচঞ্চলা নন্।

মামা বলিলেন—খুব হয়েছে, খুব হয়েছে। কেলেঙ্কারীর সীমা রইল না।

'কেলেঙ্কারী কি দেখলে মামা? সে এমন কোন কলঙ্কের কাজ করে যায়নি, আর আমিও—

'থাক, তোমার কৈফিয়ৎ আমি শুনতে চাই না, যা দেখছি যথেষ্ট।

তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে নীরেন্দ্র কহিল, এখনি চল্লে মামা? বেলা হয়েছে, আহারাদি করে—

মামা 'থাক,—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

নায়েব মহাশয় সম্পর্কে ঠাকুরদা হইতেন; নীরেন্দ্র তাঁহাকে খাতির করিত, ঠাকুরদা আসিয়া বলিলেন—রাণী বৌএর বাপের বাড়ী যাবার সম্ভাবনা ত দেখি না, কোথায় গেলেন, কিছু বলে গেছেন কি?

নীরেন্দ্র বলিল—বাপের বাড়ী যান নি, সেখানে কে আছে? তিনি পশ্চিমে কোথায় গেছেন, পৌছে খবর দিবেন, বোধ করি।

নায়েব মহাশয় একটু থামিয়া, পরে কহিলেন—যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

'বলুন না।

'ছোট রাণীর সঙ্গে তাঁর কোন বচসা—

'দেখাই হয় নি, ঠাকুরদা—

'তবে তোমার সঙ্গে—

'তাও না।

নায়েব মহাশয় বলিলেন—এ কি রকম হল, তা ত বুঝতে পারছি না। আজ সকালে আমায় ডেকে বল্লেন—ঠাকুরদা দেখবেন, উৎসবের যেন কোন ক্রটী না হয়। কত উৎসাহ, কত আনন্দ দেখলুম। দুপুর বেলা ডাকিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন নৌকা কটার সময় ঘাটে পৌছবে মনে করেন? আমি বললুম, ২ টো ৩ টা হবে। তখন বল্লেন, সে সময় আপনি সমস্ত লোকজন নিয়ে ঘাটে হাজির থাকবেন।

নীরেন্দ্র বলিল—কিছু বুঝছি না ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা দাঁড়াইয়া বলিলেন—এখনো যদি ঘোড়া ছুটিয়া ষ্টেশনে যাওয়া যায়, বোধ করি মাকে ফেরাতে পারা যায়।

নীরেন্দ্র বলিল—তবে ঘোড়া সাজান, ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করিয়া কহিলেন—কিন্তু তুমি গেলেই ভালো হয়, আর কেউ গেলে ফিরবেন কি?

চমকিতের মত নীরেন্দ্র কহিল—কেউ গেলেই তিনি ফিরবেন না, ঠাকুরদা তাঁর মনের ভাব আমি জানি!

রাত্রে প্রীতি বলিল—তোমার এত কথা, আজ যে একেবারে চুপ করে রইলে! ঘুম পাচ্ছে?

'না—বলিয়া নীরেন্দ্র প্রীতির হাত নিজ হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল প্রীতি, এ বাড়ীর যে রাণী ছিল, সে চলে গেছে কেন, জান?

প্রীতি কহিল তুমি না বললে কেমন করে, জানব? বল না কেন চলে গেছেন?

নীরেন্দ্র বলিল—তোমারই জন্য!

অভিমান ক্ষুব্ধ, রোষযুক্তস্বরে প্রীতি বলিল—আমার জন্যে! আমি কি করলুম, তাঁকেত আমি দেখিনি।

নীরেন্দ্র কহিল—না, দেখনি। না দেখবারই সম্পর্ক তোমাদের। পাছে দেখা হয়, তাই সে তার আসন ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন সে শূন্য আসন তোমায় দখল করতে হবে।

প্রীতি বলিল—সে খুব হিংসুক বুঝি?

অন্ধকারের ভিতর নীরেন্দ্রের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তখনি সে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল—হবে। আগেত ছিল না!

(১১)

ষ্টেশনে আসিয়া লীলা নির্ম্মলকে বলিল—দেখবার মত, পশ্চিমে কোন্‌টা সব চেয়ে ভালো ?

নির্ম্মল পশ্চিমের মধ্যে বর্দ্ধমান অবধি গিয়াছিল, তবে ভূগোলে ও ইতিহাসে এবং কাব্যে অনেক দেশের কথা পড়িয়াছিল, বলিল—আগ্রায়, তাজমহল !

লীলা ক্যাশবাক্স খুলিয়া বলিল আগ্রার দুখানা সেকেণ্ডক্লাশের টিকিট কেন।

নির্ম্মল বলিল। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট ? সে অনেক টাকা লাগবে।

লীলা হাসিয়া বলিল টাকা লাগবে বলে মান সম্ভ্রম নষ্ট কর্‌তে হবে ?

'তত টাকা তোমার কাছে—

'সারা জীবন যদি সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে দেশ ঘুরে বেড়াই ; টাকার অভাব একেবারেই হবে না, নির্ম্মল নিশ্চিন্ত থেকো ! দেখ, আর এক কাজ করা যায় না। আমারা যে গাড়ীতে থাকব, তাতে আর কেউ না ওঠে—

'কেন হ'বে না ? রিজার্ভ করলে—5ট করিয়া টাইমটেবল্ খুলিয়া সে বলিল পাঁচখানা টিকিট কিনলেই রিজার্ভ হয়।'

'তাই কেন গে। এই নাও, টাকা।

'সেত এখান থেকে হবে না। হাওড়ায় গিয়ে, নয়ত চব্বিশঘণ্টার খবর তারে পাঠালে তবে হয়! তা' চল না, হাওড়ায় যাই, সেখান থেকে রিজার্ভ করে, ডাকগাড়ীতে উঠব।'

একটু চিন্তা করিয়া লীলা বলিল না, এখানেই থাকি, তার করে দাও তুমি।

নির্ম্মলকে ওয়েটিংরুমের বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া, লীলা গবাক্ষে চাহিয়া রহিল। সেখানে আর একটি মহিলা একটি ক্ষুদ্র শিশু ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছিলেন, পূর্ব্বাবধি তিনি লীলার আকারে ব্যবহারে একটু আকর্ষিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে নির্জ্জন দেখিয়া বলিলেন—আপনি আগ্রায় যাবেন কি বেড়াতে ?

লীলা কহিল, তা বই কি !

মহিলাটি বলিলেন—কোথা থেকে আসছেন ?

অপ্রসন্ন মুখে লীলা কহিল সেইটি বল্‌তে পারব না, চান্‌ত স্বামীর নাম বল্‌তে পারি।

'স্বামী আছেন ?

'আছেন।'

'তাঁর নাম করতে পারেন?'

'কেন পারব না? ভক্ত কি দেবতার নাম করে না? পূজার সময় যদি দেবতার নাম উচ্চারণ করতে না পেত, পূজার মন্ত্রই যে আধখানা হয়ে পড়্'ত।'

'আপনি খুব লেখা পড়া শিখেছেন বুঝি?'

সে কথার উত্তর না দিয়া লীলা জিজ্ঞাসিল "আপনি কোথা যাবেন?"

মহিলা উত্তর দিলেন "আপনারই সঙ্গে। আমার স্বামী সেখানে ডাক্তারি করেন।"

লীলা সোল্লাসকণ্ঠে কহিল বটে! এতদিন বাপের বাড়ী ছিলেন বুঝি? এই ছেলেটি হয়েছে আপনার? কি সুন্দর ছেলেটি। আমার কোলে একবার দিন না।

এই সময় বাহির হইতে কে বলিল সরযু, টিকিট কিন্‌তে হবে, ট্রাঙ্ক থেকে টাকাটা বের করে দাও তিনি ভিতরে প্রবিষ্ট হইলেন।

লীলা খোকাকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে মহিলার নিকট গিয়া বলিল টিকিট আর না কিন্‌লেও চলবে। ওকে বলুন, আমি গাড়ী রিজার্ভ করেছি, পাঁচজন যাওয়া চলবে। আপনারা দুজন, আমি আর নির্ম্মল।

'সে কি হয়?

'খুব হ'বে। আপনি ওকে তাই বলুন! আরো বলুন, আমি কখনো দেশের বাহিরে যাইনি, নির্ম্মল কিছু জানে না, ছেলে মানুষ, আপনারা সঙ্গে থাকলে আমার অনেক সাহস।

কাজেই মহিলাটি স্বামীকে বলিলেন, তিনি শুনিয়া বলিলেন তাও কি হয় সরযু—ও কে?

লীলা বলিল "সরযু, আপনি ওঁকে বলুন, আপনারা যদি সঙ্গে না থাকেন, এই সাহসী পুরুষটাকে সঙ্গে রাখবই। সে খোকাকে চুম্বন করিল।"

অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন, বাহিরে যাইবার কালে লীলা সরযুকে দিয়া বলাইল বাহিরে নির্ম্মল আছে, একবার ডেকে দিন্‌।

নির্ম্মল আসিলে তাহাকে বলিল গাড়ী রিজার্ভ হ'ল! এঁরাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ইনি আমার দিদি হন্‌।

সরযু লীলার কোল হইতে খোকাকে লইয়া বলিলেন ভাই, তোমার স্বভাবটি কি মিষ্টি ! পরকে এমন আপনার করতে পার !

লীলা। কৈ আর পারি দিদি ! বলিয়াই কে যেন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।

সরযু। ভাই, তোমার পরিচয় পেলাম না, তোমার নামটি

লীলা। লোকে রাণী বলে ডাকে ! কেউ কেউ মহারাণীও বলে।

সরযু সহাস্যে বলিলেন দুটীই তোমায় খাটে, ভাই !

(১২)

লীলা আগ্রায় আলাদা বাসা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সরযু ছাড়িল না, বলিল তবে দিদি বলিয়া ডাকিলে কেন ?

লীলা, সরযুর এই কথার উত্তরে বলিয়াছিল, দিদি, একটা সম্বন্ধ পাতাবার জন্য ছট ফট করছিলুম। পাতাতে আর হল না, ভগবান একেবারে খাঁটী জিনিষ মিলিয়ে দিলেন।

একদিন সরযু বলিল, ভাই তোমার কোন পরিচয় আমি পাইনি। ঐ নির্ম্মলটি তোমার কে ?

'ও যে কে ঠিক বলতে পারি না। তবে ছেলেবেলা থেকে দুজনের বড় ভাব।'

'তিনি জানেন ?'

'কে ?'

'তোমার স্বামী ?'

'জানেন, দিদি, যা ভাবছে তা নয়।'

'রাগ করে এসেছ ?

'রাগ ! রাগ করব কার ওপর, দিদি ! রাগ কি করা চলে ? তুমিই বল। বলিয়া হাসিয়া সরযুর হাত ধরিল।'

সরযু বলিল না ভাই, তা চলে না। তবে—

লীলা বলিল—সেই কথাটা বলে আর গোপন কিছুই থাকবে না দিদি !

সরযু আর কিছু বলিল না।

একটি ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া নির্ম্মল দৈনিক সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল; পশ্চাৎ হইতে লীলা ডাকিল—নির্ম্মল !

নির্ম্মল চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল, বলিল, কি লীলা ?

সরযু বলিল—এ প্রশ্ন কেন, লীলা! আমার স্বামী, তাঁর স্ত্রীর কাছে ভালোবাসা পাবার আশা যতটুকু করেন—

লীলা হঠাৎ বলিল—ততখানি দিতে পেরেছ? সত্য করে' বল, দিদি। তোমার এই উত্তরের উপর একটা জীবন নির্ভর করছে।

সরযু অবনত মুখে বলিল—পেরেছি কি না, জানি না—চেষ্টা করেছি। আমাদের ত ভাই পারাপারির বিবেচনা, তর্ক নেই, পারতে হবে বলেই চেষ্টা করা আমাদের—

'আমাদের' মানে কি, দিদি?

'আমাদের মত স্ত্রীর! শুধু ভালোবাসার সম্পর্ক ত আমাদের নয়। স্বামীকে পূজা, ভক্তি করা, তাঁর সেবা করা

সেইটে আসে কোথেকে জান? ভালোবাসা থেকে। ভালোবাসার অঙ্কুর—তার থেকে পূজা, ভক্তি সেবা উৎপন্ন হয়।'

'হবে, তা জানি নে। আমি বিদ্বান নই, ভিতরে যে কথাটি আছে, তা বার করে ফেলতে পারি নে।'

লীলা বলিল—তা না পার, বুঝতে পার ত!

সরযু বলিল—তাও ঠিক বল্‌তে পারি নে। যতটুকু পারবার তাই পারি হয়ত।

লীলা বলিল—আমার কথার সেইমত উত্তর দাও।

সরযূ বলিল—ভালোবাসা কি, তাই যখন জানি না

লীলা বলিল—সত্যই তুমি মূর্খ দিদি!

সরযূ বলিল—কিছু এসে যাযে না, বোন। হাঁড়ি হেঁসেলে একটু বিদ্যে থাকলে, স্বামী, পুত্রকে সুখী করা যায়।

লীলা বলিল—কিন্তু আমি ভাবছি, আমি ভালোবাসতাম কিনা!

সরযূ হাসিয়া বলিল সেটা বোধ হয় পাড়ার কলু বৌ জানে, কি বল বোন?

আমি নয়; আমায় একটু ভাবতে দাও,—আমি সমস্যার পূরণ করতে চাই।"

(১৪)

হাজার প্রস্তুত থাকুক না কেন, ঝড়ের সময় বৃক্ষ যেমন আপনাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না,নীরেন্দ্র অনেক চেষ্টা করিলেও লীলার চিন্তা ত্যাগ

করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। দমকা ঝড় মধ্যে স্তব্ধ হইলে বৃক্ষ আবার যেমন সহজভাবে মাথা তুলিয়া লয়, প্রীতির মধ্যে নীরেন্দ্র একটু স্থির ভাবে থাকিতে যত্নবান্ হইল, কিন্তু ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ ঝটিকায় আবার নুইয়া পড়িল। খুব সহজভাবে সে বুঝিল, লীলা যে প্রীতিকে এ গৃহে স্থান দিয়াছিল, সে নিজের কথা ভাবিয়া নহে; আপনার চিন্তা যে মুহূর্ত্তে তাহার প্রবল হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই সে আত্মদমনে অসমর্থা হইয়া পড়ে। লীলার চাঞ্চল্য যে খুব বেশী হইয়াছিল, তাহা নীরেন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। এত দ্রুত, এত ঝটিতি সে চলিয়া গেল, একটা ক্ষুদ্র অবসরেও তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবার সময় দেয় নাই!

প্রীতির যে কোন দোষ নাই, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল, অথচ প্রীতিকে অপরাধী না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

জমিদারীর কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। দেওয়ান অনুযোগ করিল, নীরেন্দ্র কঠোরভাবে বলিল—"বিক্রয় করুন।"

দেওয়ান বুঝিল না, নীরেন্দ্র আবার বলিল—যার জমিদারী সেই যখন ত্যাগ করিতে পারিয়াছে—

দেওয়ান বলিল—মহারাণীর কথা বলিতেছেন? আজ তাঁর তার পেয়েছি, তিনি লিখেছেন—

"কার তার পেয়েছেন?"

"মহারাণীর! তিনি লিখেছেন—"

"থাক্—আমার এত কম সময় যে, জমিদারীর কাজে তা নষ্ট করতে ইচ্ছা নাই। আপনি পারেন, সামলে চলুন।"

অবনতমস্তকে দেওয়ান বাহির হইয়া গেল। লীলা তার করিয়াছে, তাহাকে নহে, দেওয়ানকে! জমিদারির তত্ত্ব লইয়াছে, তাহার নহে?

ইচ্ছা হইল, দেওয়ানকে তলব দিয়া তারটি দেখে। তখনই মনে হইল, না, লীলার উপর আমার যে ভাব আছে, নিঃসম্পর্ক তারটি দেখিলে, সে ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে কাজ নাই। যদি সে আমাকে লেখে, যেখানে থাকুক, আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিব। যদি তাহা প্রীতির প্রতি অন্যায় করা হয়, আমার উপরও ন্যায় হইবে না।

প্রীতি সে রাত্রে বলিল—আমাকে বাবার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও না।

নীরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। কালই পাঠাইবে প্রতিশ্রুতি দিয়া সে বলিল—এখন কিছুদিন তুমি এখানে আসিতে পারিবে না।

প্রীতি ভাবিল, সে রাগ করিয়াছে, বলিল—আমি যাব না।

কেন? যাও না।

তুমি রাগ করছ যে!

কৈ না।

তবে, আসতে পাব না বলছ কেন?

রাগ করে বলি নি প্রীতি, আমি বুঝেছি, এঘরে এনে তোমায় ভুল করেছি। একটা ছোট ঘরে দু'জনে সমান অধিকার নিয়ে থাকতে পারে না। কম বেশী নিয়ে বিরোধ বাধলে বেচারা ঘরই মারা যায়! আজ তার কথা বুঝতে পারছি, এক আকাশে চন্দ্র সূর্য্য একই সময়ে ওঠে না কেন?

প্রীতি এত যুক্তি তর্ক বুঝিল না, সে তার হাস্য-প্রফুল্ল, হর্ষজড়িত নেত্রদ্বয় করুণভাবে তুলিয়া নীরেন্দ্রের মুখের পানে স্থির করিল। বুঝি বিন্দু দুই বারি সেখানে টল্ মল্ করিতেছিল।

(১৫)

যতদিন প্রীতি ছিল, তাহার সংসর্গে নীরেন্দ্র আনন্দ না পাইলেও তাহার যেন একটা মস্ত অবলম্বন ছিল। প্রীতি যাইবামাত্র নিরবলম্বনীয়ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নীরেন্দ্র বলিল—এখন কর্ত্তব্য কি!

গৃহের মধ্যে এমন একটি স্থান নাই, যেখানে লীলার স্মৃতিস্পর্শের চিহ্নশূন্য।

প্রীতিকে বিদায় দেওয়া চলে, লীলাকে বিদায় দিবার উপায় নাই! অথচ কি রহস্য গূঢ়,—প্রীতিকেই পাওয়া সুলভ, লীলা সুদূর, সুদূরে!

তবে নিকটে ছাড়িয়া মায়ামৃগের মত কেন সে দূরে দূরে বেড়াইবে? শেষে কি সে মুখের গ্রাসও হারাইবে? তখন যে তাহার কিছুই থাকিবে না।

একটা চিন্তা তখনি মনে আসিল—যখন প্রীতিকে বিবাহ করি, তখন লীলাকে হৃদয়ভাগী হইতে বঞ্চিত করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল কি না? কখনই নয়, কখনই নয়, এমনটা যে হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারে নাই।

ব্যথা বাড়িয়া উঠিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দেওয়ান ঘরে ঢুকিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—সে তারটা আপনার সঙ্গে আছে?

আছে, দেখিবেন?—বলিয়া তারটি খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিতে গেল। নীরেন্দ্র বলিল—পড়ুন।

মর্ম্ম এইরূপ—কুমার জমিদারির কার্য্যে বিশেষ দক্ষ নহেন; অসুবিধা ও সাহায্যের প্রয়োজন বুঝিলে, মামার আশ্রয় লইবেন। যদি কোন কার্য্যে আমার সহায়তা আবশ্যক হয়, সাহ্লাদে আমি তাহা দিব! অন্যের উপর সে ভার দিতেও আমার আপত্তি নাই।

'অন্যের উপর' কথাটা তপ্ততৈলে তরকারীর মত শব্দ করিয়া উঠিল। 'অন্য'টি কে? প্রীতি! প্রীতি! লীলার যত রাগ প্রীতির উপর! সে বেচারী নির্দ্দোষ! লীলা তাহাকেই হিংসা করিয়াছে।

দেওয়ান বলিল—এক কথা—

নীরেন্দ্র বলিল—আমাকে কথা বলিবার জন্য আপনাদের রাণীর অনুরোধ আছে কি?

দেওয়ান মনে মনে চটিয়া চলিয়া গেল। সে বুঝিল, আজকালকার

ছোঁড়ারা প্রেম করেই ম'ল! নীরেন্দ্রের ব্যবহারে একটুখানি চটিলেও প্রফুল্ল হইবার অনেক কারণই তাঁহার ছিল।

এই সময়ে বেহারা একখানি খামে ভরা চিঠি আনিয়া নীরেন্দ্রের হাতে দিল। হাতের লেখা সু-পরিচিত। ডাকঘরের ছাপ আগ্রার! শিরোনামা তাহারই। চিঠি খুলিয়া পড়িল ঃ—

শ্রীচরণ কমলেষু—

আমার এ চিঠিতে কোন অনুযোগ আমি করিব না, করিবার কিছু নাই, কোন হেতু নাই। তোমার সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য, শুধু কর্ত্তব্য নয়, প্রধান কার্য্য। সে কার্য্য সম্পাদন করিতেছি। তোমার যদি সংবাদ দিবার না ইচ্ছা থাকে, আমি অনুরোধ করিব না। কাহারও নিজের বাছা পথ হইতে বিচ্যুত করিতে আমি ইচ্ছা করি না।

আমার নিজের পরে যে কর্ত্তব্যের সামান্য শৃঙ্খলটুকু আমি স্বেচ্ছায় রাখিয়াছি, তাহা তোমার নিকট হইতে কিছুর প্রত্যাশা করিয়া নহে। যে ভার নমিত করিয়াছি, তাহার চিন্তার সময় করিতে গেলে সংসারে কাজের সময়ের বড়ই অভাব ঘটে।

একটা কৈফিয়ৎ আমার দিবার আছে, দিলাম। তাহা এই, সেদিন উৎসব সমারোহের মধ্যে যখন তুমি আমার ঘরে আসিয়াছিলে; তখনকার আমার আচরণ যদি অদ্ভুত বোধ করিয়া থাক, ভাবিয়া দেখিও, তাহার জন্য দায়ী আমি নহি।

আমার প্রতি তোমার যেটুকু দাবি ছিল, তাহা ইচ্ছা করিলে তুমি লইতে পার, কিন্তু অন্যের অংশ কমাইয়া সে দাবীর স্পর্দ্ধা আমি রাখি না।

প্রণতা—লীলা

চিঠিখানি হাতে করিয়া, পাণ্ডুর মুখে নীরেন্দ্র ছাদে চলিয়া গেল।

(১৬)

একটা কুণ্ডে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, হঠাৎ বায়ু-তাড়নে ভীষণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। লীলার চিঠিখানা লীলাকে এমন এক মূর্ত্তিতে নীরেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল যে, গভীর গাঢ়বর্ণে পূর্ব্বের লীলাকে আর কোথাও দেখা গেল না। নীরেন্দ্র চাহে নাই যে, লীলা এমন কিছু করুক। তাহার মনের ভাবটা এই রকমের ছিল যে, লীলার উপর রাগ করিবার আমার কোন কারণ নাই। বেড়াইতে গিয়াছে, মনস্থির করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

লীলা যে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেও, নীরেন্দ্র লীলার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাকে বুঝিয়াছে বলিয়া তাহার গর্ব্ব ছিল, তাহা ক্ষুণ্ণ হইলেও, লীলাকে সাধারণ স্ত্রীর চেয়ে উঁচু ভাবিয়া নীরেন্দ্র একটু সান্ত্বনা পাইয়াছিল। কিন্তু আজ একি হইল? সেই লীলা!

চিঠিখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, নীরেন্দ্র এক মুহূর্ত্ত পরে আপনার মনে ঠিক করিয়া লইল—প্রীতির প্রতি এখন হইতে ন্যায় আচরণ করিতে হইবে।

সে আজ্ঞা দিল, বোট সাজাইয়া খাসবাদ হইতে প্রীতিকে লইয়া আসিতে !

প্রীতি আসিলে, তাহাকে এমন জোরে আলিঙ্গন করিল যে প্রীতি প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল ।

'প্রীতি, আজ থেকে তুমি এ ঘরের রাণী ! তোমারই সব, সব তোমারই অধিকার। সে অধিকার তোমার হাতে অক্ষুণ্ণ থাকবে ত প্রীতি ?

ইহার উত্তরে আবেগপূর্ণ ভাষায় দিবার মত বাক্‌চাতুর্য্য প্রীতির ছিল না, সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল।

(১৭)

লীলা নির্ম্মলকে বলিল—নির্ম্মল, সবাইকে খবর দিয়েছ ত ?

নির্ম্মল অস্বীকার করিলে, লীলা বলিল—দাও, দাও, সব তার করে দাও।

তোমার যেখানে, যেখানে করবার, আর আমাদের দেওয়ানকে আমার নামে তার করে দাও।

নির্ম্মল বলিল দেওয়ানকে ? কুমারকে না ?

লীলা বলিল দূর, তাঁকে কি তার করতে পারি। চিঠি লিখ্‌ব।

কি চিঠি লিখিবে, ভাবিতে তিন চার দিন সময় গেল। অবশেষে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে দিল। পত্র প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া লীলার দিন কাটিতে লাগিল। সেই প্রিয় হস্তে শিরোলিপি বহিয়া কোন প্রিয়পত্র আসিল না।

প্রথমে মাথা টিপ টিপ, পরে জ্বর ভাবও দেখা দিল। সরযুর স্বামী ডাক্তার, সরযুকে জ্বরের সময় ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই লীলা বলিল দেখ দিদি, ভাসুরের সম্মুখে যদি বেরুতে হয়, আমি গলায় দড়ি দেব। চিকিৎসার কথা এইখানেই চাপা পড়িতেছে, শুনিয়া সরযুর স্বামী অন্য ডাক্তার আনিতে চাহিলেন, লীলা সরযুর সম্মুখে নির্ম্মলকে ডাকিয়া বলিল যমুনার ধারে একটা বাসা দেখ, নির্ম্মল এখানে আর থাকা হ'বে না।

সাংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় নির্ম্মল এমন শিশু ছিল যে, লীলার কথায়, একটা বিশৃঙ্খল ও যা তা সংসারের ছবি কল্পনা করিয়া সে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। লীলা তাহাকে বলিল যাও, আর দেখ, যেন এমন যায়গায় বাসাটা হয়, চাইলেই তাজমহল দেখা চলে! তাজ দেখে আমার অরুচি হয় না।

সরযু বলিল তুই যে'কি বোন, বুঝতে পারলুম না।

লীলা বলিল তা ত পারবেই না। আচ্ছা বলত দিদি, পুরুষের রাগ বেশী না—

সরযু বলিল আমার চেয়ে তার উত্তর নিজের কাছে ভালো পাবি বোন।

'কোন কাজের নও, দিদি, নির্ম্মল ঠিক উত্তর দেবে।

'যেমন বোন, ভাই তেমনি হবে ত !

'সব সময় তা হয় না দিদি! এই নির্ম্মলই তার প্রমাণ। সে যাকে ভালোবাসে, তাকে ছাড়তে পারে না, আর আমি যাকে ভালোবাসি থাক্, সে তুমি বুঝবে না, দিদি।

'আমার বুঝেও কাজ নেই।' বলিয়া সরযু চলিয়া গেল।

লীলা পুনরায় এক পত্র লিখিল—

শ্রীচরণেষু,

তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তোমার ক্রুদ্ধমূর্ত্তি আমি কিছুতেই ভাবিতে পারিতেছি না,তাহা ত কখনো দেখি নাই। কিন্তু কেন রাগ করিলে?

আমি জানিতাম, আমার উপর তুমি রাগ করিতে পার না! আমার সে ভরসা কেন কাড়িয়া লইলে?

আর কি লিখিবার আছে? আমার প্রতি তুমি বিরূপ, এ চিন্তায় আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া যায়।

চির আশ্রিতা লীলা

'বাসা করিলে ভয়ানক অসুবিধা হইবে, একথা বলিতে বলিতে নির্ম্মল লীলার ঘরে ঢুকিল, লীলা চিঠিখানি খামে ভরিয়া তাহা নির্ম্মলের হাতে দিয়া বলিল এবার রেজেষ্টারী করে দিতে হবে।

'আচ্ছা' বলিয়া কাজের কথা পড়িবার উপক্রম করিতেই লীলা বলিল আচ্ছা নির্ম্মল, তুমিত আমাকে খুব ভালবাসিতে, এখনও বাস; বল দেখি, আমার ভালবাসার পাত্র কে?

নিমিষের তরে নির্ম্মলের বক্ষ স্পন্দন স্তব্ধ হইল, নির্ম্মল কি একটা বলিতে গিয়া, সম্বরণ করিয়া লইল। পুনরায় প্রশ্ন হইল।

নির্ম্মল সহজভাবে উত্তর দিল বোধ করি, আমিই!

কি! বলিয়া লীলা আসন ছাড়িয়া উঠিল।

নির্ম্মল ভীত হইয়া বলিল এতে রাগের কি কথা আছে, রাণী! আমার বুঝবার প্রণালী ত সেদিন তোমায় বলেছি। সেই প্রণালীতে ভেবে দেখলুম—

কি প্রণালী?

যে, ভালবাস্‌লে, ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী কে—

দূর হও বলিয়া তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া লীলা মুখ ফিরাইল।

(১৮)

রেজেষ্টারী রসিদ ফিরিয়া আসার পর একমাস অতীত হইয়াছে, বাঞ্ছিত আকাঙ্খিত পত্র লীলা প্রাপ্ত হইল না। সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

সে ভাবিতে লাগিল, দুইদিনেই কি প্রীতির প্রভাবে এত দূর হইল যে নীরেন্দ্র এক কলম লিখিয়া তাহার সংবাদ লইল না!

সরযুকে আকাড়িয়া ধরিয়া সে বলিল, দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ভাই?

সরযু লীলার স্বরে বাষ্পের আভাষ অনুমান করিতে পারে নাই, সে স্বভাব-সিদ্ধ প্রফুল্লতার সহিত বলিল, কি বিরহের বেদনা কেমন, ভাই?

হঠাৎ লীলার আঁখি অশ্রুতে ভরিয়া গেল—ও কি, ও কি, কাঁদছিস্, বোন বলিয়া সরযু তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া ধরিল। সেখানে মুখ রাখিয়া লীলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দিদি, চন্দনপুকুরের নাম শুনেছিস্?

'ওমা, শুনি নি, আবার! আমার বাপের বাড়ী যে চন্দনপুকুরে! সেখান কার কাউকে চিনিস্? বল না খবর নেই।'

'কুমার—'

'আমাদের জমিদার যে! লোকটা নাকি স্ত্রীর ভারি বশ। তাঁকে চিনিস নাকি? কোন সম্বন্ধ আছে? আমার ত ভাই, তাকে ভাল মনে হয় না।'

'কেন?'

'আবার বিয়ে করেছে শুনলুম। একটা মেয়েকে দেখিয়া—

'জানি। এবার যখন বাপের বাড়ী যাবি—

'আসছি, ভাই, খোকা কাঁদছে—বলিয়া সরযু ত্বরিত বাহিরে গেল।

উঃ কি করতে যাচ্ছিলুম। ভাগ্যে খোকা কাঁদল, তাইত! নির্ম্মল, নির্ম্মল!

কয়েকদিন হইতে নির্ম্মলের সঙ্গ লীলার পক্ষে বিষের মত হইয়াছিল, নির্ম্মল সে জন্য কাছে আসিতই না। আজ আহ্বান শুনিয়া লীলার ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইল। লীলা সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—নির্ম্মল, তুমিও আমার প্রতি বিরূপ? পৃথিবীর সকলে আমার উপর রাগতে পারে—

আমি পারি না, রাণী। কেন ও কথা তুলে আমায় কষ্ট দাও।

কষ্ট আমি দিই না, নির্ম্মল, আমার যে কষ্ট—

তা কি আমি বুঝছি না, রাণী! চল, রাণী ফিরে চল। গৃহীর সন্ন্যাসে অধিকার নেই। চল—

কোথায়? কোথায়? বল নির্ম্মল, কোথায় যাব?

নির্ম্মল বলিল, সে তুমিই জান! বলিয়া সে অল্প হাসিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কোথায় যাইবে? তাহার স্থান কোথায়? কোথায় যাইবে না। সে এইখানেই থাকিবে।

(১৯)

নীরেন্দ্র লীলার দ্বিতীয় পত্র পাইয়া মনে মনে বলিল—লীলা, তোমার উপর রাগ করেছি আমি, এমন ভেবে থাক, ত ভুল করেছ। দোষী আমি রাগ করব কি করে?

প্রীতি তাহাকে বলিল—দেখ, এ বাড়ীর রাণীকে আমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে!

'হঠাৎ এ সদিচ্ছা কেন হল, জান্তে পার কি?

সদিচ্ছা কি আবার! চিঠি লেখা কি দোষের?

দোষের নয়। তা আমি বলছি না। হঠাৎ এ খেয়াল কেন হল, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

অমনি—অমনি!

সে যদি তোমার চিঠি না নেয়—

তাও ত বটে। সতীনের চিঠি—

এ সম্বন্ধটুকু বুঝেছ দেখছি। আমি ভেবেছিলুম—

প্রীতি চমকিয়া উঠিল, বলিল—তা নয়—

নীরেন্দ্র কহিল, নয় কেন? নিশ্চয়ই! তোমাদের সে সম্বন্ধ যে বিধাতার সৃষ্টি, ভুলতে পারবে কেন?

প্রীতি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই সময়ে বাহির হইতে কে বলিল ভিতরে আসতে পারি কি?

কে?—বলিয়া নীরেন্দ্র পরদা উঠাইয়া বাহিরে গেল। সেখানে নির্ম্মল শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়াছিল। নীরেন্দ্র ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—তুমি না আগ্রায় ছিলে, নির্ম্মল!

ছিলুম।

নীরেন্দ্রের কণ্ঠের ভিতর একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল; কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছে না। নির্ম্মলের মুখ শুষ্ক কেন? যদি—যদি—

সেখানকার খবর—

খবর নিজে এসেই নিন্। বাহিরে—

নীরেন্দ্র কঠিন হইল, বলিল—বাহিরে কি?

নির্ম্মল বলিল—রাণী অপেক্ষা করছেন।

মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া নীরেন্দ্র বলিল—দাঁড়াও।

সে ঘরে ঢুকিল; প্রীতিকে বলিল—তোমার সতীন এসেছে!

প্রীতি ভাবিল, এখনই তাহার যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র লইয়া নীরেন্দ্র তাহাকে পরিহাস করিতেছে। সে বলিল আমার কি?

কিছুই নয়—বলিয়া নীরেন্দ্র বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীর কাছে গিয়াই সে বলিল—এস, লীলা!

লীলা অবশ, অলস চরণ বাহিরে ফেলিল। নীরেন্দ্র তাহার হাত ধরিল। লীলা প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল।

লীলার নমিত আনন স্বহস্তে তুলিয়া ধরিয়া নীরেন্দ্র বলিল—মন ঠিক করতে পেরেছ তা হ'লে!

লীলা সবিস্ময়ে চাহিল।

নীরেন্দ্র আবার বলিল—আমি জানতুম লীলা, রাগের প্রথম বেগ কমিলে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিবে!

রাগ!—লীলা জোরের সঙ্গে বলিল—রাগ.

নীরেন্দ্র বলিল—ঘরে এস।

বাধা দিয়া নীরেন্দ্র বলিল—রাণীর রাজত্বে রাণীর নালিশ চলে না। এস—

কিন্তু, আমি বলছি কি, তুমি রাগ করেছ—

পাগল ! রাগ করব কেন ! হাসি পাচ্ছে আমার !

আমি ফিরেছি বলে ?

না, তুমি আমায় চিনতে পারনি বলে !

ঠিক ; এখনও হয়ত পারি নি। তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না কেন ?

তোমায় ফিরে চাই বলে ! তোমার চিঠি ত আমি চাই না। আমি তোমায় চাই। তৃষ্ণা না হলে তুমি জল না খেতেও পার। চিঠিতে তোমার তৃষ্ণা কতকটা মিটতে পারে, হা জল, হা জল করতে হবে না—তাতে আমারই ক্ষতি !

দিদিও এই কথা বলেছিল সে দিন তৃষ্ণা বেশী হলেই জলাশয়ে ছুটতে হবে। দেখছি ঠিক ! এই আমার জলাশয় ! * * * *

বলেছি ত, তৃষ্ণার সময় পুকুর ছোট কি বড়, জল মন্দ কি ভাল এত চিন্তা মনে আসে না পায়ে কাদা লাগবার ভয়ে নদী ছেড়ে কেউ পলায় না।

পালিয়েছিলে ত !

মাঠে গিয়ে পড়েছিলুম, হা জল, হা জল !

দেখবে ?

লীলা বলিল—এখনই। ডাক-না। * * *

ও দিদি, ও কি করছ ভাই ?

এই দেখনা, আমার দিদিকে চিঠি লিখেছি— * * *

জল ভালই আছে, দেখলুম কর্পূর মিশে বেশ সুস্বাদ্ আর সুগন্ধ হয়েছে। * * * দু'তীরই বেশ বাঁধা, কাদা বড় নেই,—সহজেই জলে তৃষ্ণা নিবারণ করছি। * * *

"তুমি এবার যখন আসবে"—

প্রীতি বলিল—ও তৃষ্ণা জল, এ সবের মানে কি ভাই !

লীলা তাহার গাল টিপিয়া ধরিল, সস্নেহে বলিল—তুই একটা গরু।

নীরেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বলিল—নির্ম্মল বাড়ী যাচ্ছে—

লীলা বলিল—কেন। তাকে থাকতে বল না। সে এখান থেকে গেলে তার কষ্ট হবে।

নীরেন্দ্র বলিল—আবার আগ্রা আছে, না হয় কষ্টের অবসান হবে। যাই বল, নির্ম্মলের জিত, আমার হার !

কেন ?

নয় ?

না, তোমারই জিত। তুমি প্রাণ, কেননা তুমি টল নি ; আমিই হেরেছি, ফেল্—একদম্।